তুমি মধু মঞ্জরী

প্রতিভা বসু

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মেঘের পরে মেঘ

এক

টিকিট। টিকিট দেখি দাদা।'

কলকাতার একমাত্র লেল্যাণ্ড বাস। বিদেশ থেকে সদ্য এসেছে, সদ্য তাকে ছাড়া হয়েছে রাস্তায়, বিদ্যুৎবেগে সে আধঘণ্টায় শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে এসে পৌঁচচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে ডিপোতে। গাঢ় কালচে নীলের ঝলকে, রাজরাজেন্দ্রাণীর মতো চলনে, আশ্চর্য সুন্দর চেহারায় স্তব্ধ করে দিচ্ছে শহরবাসীকে। ফুটপাতে চলতে-চলতে পথিক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখবার জন্য, রাস্তার ধারের দোতলা বাড়ির অধিবাসীরা ছুটে এসে দাঁড়াচ্ছে বারান্দায়, তেতলার জানালা খুলে যাচ্ছে পটাপট।

এমন একটিমাত্র অপরূপ যানের আরোহী হতে কার না শখ গেছে তখন? চলন্ত দোতলায় বসে, উঁচু থেকে পথচারীদের দিকে তাকিয়ে করুণা করতে কে না ভালো বেসেছে? রাজা-মহারাজারাও রোলস্‌রয়েস গাড়ি ছেড়ে একদিন উঠেছেন এটাতে, মহামান্য রাজকর্মচারীরা ধরে ফেলেছেন নিজেদের দিয়ে, উঠেছেন ভদ্রলোকেরা, ভদ্রমহিলারা, ছেলেরা, মেয়েরা, যুবকরা, যুবতীরা—সব। সবাই। মানসী দত্তমল্লিককে নিয়েও পার্টির পরে একদিন বেড়াবার উপলক্ষে গাড়ি ছেড়ে বাসে চড়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে এলেন তার ভাবী স্বামী সোমেশ্বর বাগচি।

মানসী একগাল হেসে গালে টোল ফেলে মিষ্টি করে বললো, 'সুন্দর তো।' সোমেশ্বর দোতলায় উঠতে-উঠতে টলমলায়মান মানসীর হাত ধরে ফেলে বললেন, 'আগে সাবধান। পড়ে যাবে—ওপরে চলো, তারপর দেখবে আরো কত সুন্দর।'

রাত এগারোটার শেষ বাস, সাংঘাতিক ভিড় ছিল না, কাজেই সামনের দিকেই একটা ফাঁকা আসন পেল তারা। মানসী উচ্ছ্বসিত হয়ে রাস্তা দেখতে ব্যস্ত হলো আর সোমেশ্বর দেখতে লাগলেন মানসীকে। কিন্নরীকণ্ঠী মানসী, কোকিলকণ্ঠী মানসী। যার গানের সুর সারা বাংলা দেশকে ভাসিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বম্বের বাতাস মুখর করতে চলেছে, যাকে সোমেশ্বর এতোদিনের চেষ্টায় বিয়েতে মত করাতে পেরে ধন্য হয়েছেন। সেই মানসী যার জন্য হিন্দুস্থান গাড়ি বেচে স্কোডা কিনেছেন সম্প্রতি।

এরই মধ্যে উজ্জ্বল দিনের রোদের মতো নীলবেগ্‌নিসবুজে-মেশা ফ্লুওরেসেন্ট আলোয়, ভরা-সিঁথির মতো মাঝখানের রাস্তা দিয়ে এগুতে-এগুতে, খাকির জোব্বা পরা নির্মল কণ্ডাক্টর আশ-পাশের লোক-জনকে সচকিত করে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে 'টিকিট, টিকিট দেখি দাদা' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো।

সোমেশ্বর অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে পয়সার জন্য হাত দিলেন পকেটে, তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে অস্ফুটে বললেন, 'ইডিয়ট।'

বলবার কারণ ছিল তাঁর। টিকিট চাইতে এসে টিকিট না-নিয়ে হঠাৎ গালে হাত দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকা মানসীর অনাবৃত ঘাড় আর পিঠ আর এলানো খোঁপায় ঘেরা গালের এক পাশের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো নির্মল। চমকেও উঠেছিল, কিন্তু বাসের ঝাঁকানিতে বোঝা গেল না সেটা। ভেতরে-ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা তার লাফিয়ে উঠল জোরে। ঠোঁট নাড়লো মনে-মনে : 'টুনি! টুনি না? টুনিই তো!'

শুধু মনে-মনেই নয়, উত্তেজনায় নিজের অবস্থা ভুলে প্রায় ডেকেই উঠছিল জোরে। পলা-রং শিফন পরা, চুল রোল করা, নখে রং মাখা প্রায় ফর্শা সুন্দরী সুগন্ধি মেয়েটির পিঠের উপর প্রায় ছুঁইয়ে ফেলেছিলো নিজের শিরা-ওঠা ঘামে-ভেজা নোংরা হাতটা। সোমেশ্বর তাকে বাঁচালেন হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে। রুষ্ট গলায় বললেন, 'হাঁ করে আছো কেন, তাড়াতাড়ি দাও, বালিগঞ্জ।'

তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিল নির্মল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে যদিও সময় লাগলো একটু, তবু সহজ হয়েই টিকিট দুটি দিলো, তারপর অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে নেমে এল একতলায়। এনামেল-করা রুপোলি রড ধরে ধুঁকতে লাগল অসুস্থ রোগীর মতো।

সহকর্মী নলিনী এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি, 'কী হলো? শরীর খারাপ করছে নাকি?'

'বড্ডো।'

'এই দ্যাখো; এখন উপায়?'

'কিছু হবে না। দয়া করে তুমি যদি ওপরে যাও তাহলে সুবিধে হয় আমার।'

'তাই ভালো। ওপরে যা ঝাঁকুনি, তুমি নিচেই থাকো।'

নির্মল জবাব না-দিয়ে দাঁড়িয়েই রইলো চুপচাপ। কখন মেয়েটি নামবে তারই অপেক্ষায় যেন কাঁপতে লাগল ভেতরটা।

দেরি হলো না, দু-এক স্টপ পরে নেমে এলো ওরা। প্রথমে সোমেশ্বর, পেছনে মানসী দত্তমল্লিক। আর ওরা নেমে যেতেই চলন্ত বাস থেকে এতোখানি ঝুঁকে পড়লো নির্মল, বুকের রক্ত তার তোলপাড় করে উঠলো, ইচ্ছে করলো সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাস্তায়। হয়তো লাফিয়ে নামতেও যাচ্ছিলো, কে একজন চিৎকার করে ধরে ফেললো খাকি বুশশার্টের কাটা কোণ, ধমকালো 'খেপেছো নাকি হে।' সারা বাসে একটি গুঞ্জন উঠলো তাকে নিয়ে, হাতের ভাঁজে মাথা রেখে সে যখন সিঁড়ির রডটাতে হেলান দিলো সবাই বুঝল গরমে অস্থির হয়েছে লোকটা তাই পড়ে যাচ্ছিল।

ঐ ট্রিপের পরেই সেদিন শেষ হলো নির্মলের ডিউটি। মেসে ফিরে এল। অখিল মিস্ত্রি লেনের নোনাধরা কোনো-এক মান্ধাতার আমলের তেতলা বাড়ির একতলার ভাপসা-গন্ধ এইটুকু একটি চার-দেয়াল-ঘেরা চৌকো সিমেন্টের ফালিতে এক কোণে একটি গুটোনো বিছানায় ঢেলে দিলো নিজেকে। এতো তার ক্লান্ত লাগলো যে কলে গিয়ে হাত মুখটা পর্যন্ত ধুতে ইচ্ছে করলো না। কম আশ্চর্যের কথা নয়, এখনো এই সুদীর্ঘ দশবছর পরেও টুনিকে চিনতে তার এক-পলক দেরি হলো না। এই সাজসজ্জা সত্ত্বেও। আর সব চাইতে আশ্চর্য—এখনো, আজও টুনির জন্যে তার হৃদয়ে এতো ব্যাকুলতা, এতো কষ্ট। এখনো মুখে-মুখে চোখ বুলিয়ে সে টুনিকেই খোঁজে। সেই কবেকার টুনি, তার ছোট্টো টুনি-পাখি, যে-মেয়ে একদিন চিরুনি দিয়ে খোঁপা বাঁধতো, নন্দদুলাল ফুলের মালা মাথায় জড়িয়ে গামছায় মুখ মুছে কপালে খয়েরের টিপ পরে ব্যাকুল চক্ষু মেলে জামতলায় দাঁড়িয়ে থাকতো তার আশায়। সেই চেহারাটা ভেবে আজও বুক কাঁপলো নির্মলের।

কিন্তু আজকের এই সুবেশ সুন্দর, হয়তো বা বিবাহিত মেয়েটির সঙ্গে মিল কই তার? এই মেয়ে আর তাকে চিনবে না কোনোদিন, চিনলেও চেনে বলতে লজ্জিত হবে। ভাবতেও বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো।

মাথার রগটা টিপে ধরে, অন্ধকারে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কত কথাই যে মনে পড়লো। কত ঢেউ যে বুকের তটে আছাড় খেয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলো। কড়কড়ে ভাত তেমনি ঢাকা থেকে-থেকে আরো কড়কড়ে হলো, খাওয়া হলো না। দেশলাই সিগারেট তেমনি পড়ে রইলো পাশে। ধরানো হ'লো না। যেন কবেকার অন্ধকার স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে ফেললো রাস্তা, যেন কবেকার কোন জন্ম জন্মান্তর আগের একটা ধুধু কাহিনী মনে পড়লো কি পড়লো না।

বেড়ে উঠলো রাত, তবু ঘুম নেই। অন্যদিন ঘুমুতে-ঘুমুতেই ফিরে আসে কাজ থেকে। এসেই গোটা চারেক সিগারেট টানে, রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে মস্ত এক গ্লাস চা আনিয়ে খায়, তারপর বারোয়ারি কলতলায় গিয়ে চৌবাচ্চার তলানি থেকে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে ঘটি দিয়ে জল তুলে হুড়হুড় করে মাথায় ঢালে, সবই যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে। এক থাবায় আধখেঁচড়া ক'রে ভাত খেয়ে অমনি ঢ'লে পড়ে বিছানায়। তারপর নিটোল একটি স্বপ্নহীন ঘুম।

আজ কী হলো? এই মেয়েটি আজ আবার তাকে অশান্ত করলো কেন? যে-মেয়ে শ্যামলা ছিলো, বিনা কাজলেই যে-মেয়ের চোখ কাজল ডোবানো ছিলো, লজ্জার ভারে আনত মধুর ছিলো যে-মেয়ের মুখ, তার সঙ্গে—এই মেয়ের আজ কী মিল খুঁজে পেলো নির্মল কণ্ডাক্টর যার জন্য শান্তি গেলো তার, গেলো আহার, গেলো নিদ্রা।

ছোটো চৌকো ঘরের চারকোণে চারজন শোয় তারা। আজ তিন-জনের ঘুমের ঘন নিঃশ্বাস ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠলো, অসহ্য হয়ে উঠলো ঘরের গরম, অন্ধকারে তালপাতার পাখাটা খুঁজলো, তারপর অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে এলো সরু গলিটায়। মাথার ওপর বিশাল আকাশের বিস্তৃতি যেন অনেকটা শান্তি দিলো মনে। উল্টোদিকের বাড়ির একতলা সরু বারান্দায়, যেখানে তিন-চারটে ছাগল রাত কাটায়, পাশে খোলা ডাস্টবিনটা দুর্গন্ধ ছড়ায়, একটা ষাঁড় সেই সব চিপোতে-চিবোতে ঝিমোয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, সেখানে সে বসলো উবু হয়ে হাঁটুর উপর তার লম্বা দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে, তারপর বদলে গেলো ছবি। গলিটা আর গলি রইলো না, আঁকা বাঁকা কাঁচা রাস্তা হয়ে গেলো, কলকতা শহরটা নিমেষে সবুজ গাছে ঢাকা পড়ে গেলো, ফাঁকে-ফাঁকে দেখা গেলো, এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি। ঘোষের বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি, বামুনপাড়া, ফাঁকে-ফাঁকে টলটলে জল, পুকুর, ডোবা আর খানা-খন্দ।

নির্মল কতকাল পরে আবার ফিরে তাকালো তার ফেলে আসা হারিয়ে-যাওয়া সোনার মতো দিনগুলোর দিকে।

প্রিয়নাথবাবু অক্ষম। প্রায় দু-বছর যাবৎ অর্ধাঙ্গ অবশ হ'য়ে প'ড়ে আছেন বিছানায়। শান্ত সমাহিত হ'য়ে শুয়ে আছেন পিঠের তলায় বালিশ হেলান দিয়ে, তাকিয়ে আছেন জানালায়। দুই চোখে সারা আকাশের মেঘ। প্রিয়নাথবাবুর স্ত্রী নিজের দৈন্যদশা নিয়ে অবিরত কপাল চাপড়াচ্ছেন, ভাগ্যকে গাল দিচ্ছেন মুহুর্মুহু, বকছেন স্বামীকে, বকছেন মেয়েকে, রান্না করতে গিয়ে বাড়ন্ত চালের হাঁড়ি দেখে কেঁদে ফেলছেন ঝরঝর ক'রে। এই অভাবের জ্বালা তিনি সইতে পারছেন না।

আর প্রিয়নাথবাবুর মেয়ে? টুনি? বেচারা দিনরাত ফরমাশ খাটছে মা'র, নিঃশব্দ ম্লানমুখে মালিশ করে দিচ্ছে তার দুঃখী বাবার সরু পায়ে, বাসন মাজছে, মসলা পিষছে, তালি দিচ্ছে

ছেঁড়া কাপড়ে—তবু বকুনি খাচ্ছে পদে-পদে মা'র কাছে। মেয়ের বিরুদ্ধে যেন তাঁর আর নালিশ ফুরোয় না। কেমন করে ফুরোবে? মেয়েটা যে মেয়ে এ-কথা কি এক দণ্ডের জন্যও ভুলতে পারেন তিনি? যদি তাঁর একটাই সন্তান, তবে সে কেন ছেলে না-হয়ে মেয়ে হয়ে জন্মালো? সেটা তো সম্পূর্ণই টুনির দোষ! অযাচিত হয়ে আসবার দরকার ছিলো কী তার? এ ছাড়াও টুনির মা ননীবালার মেয়ের উপর রাগের আরো একটি মস্ত কারণ ছিলো : গান করতো টুনি। গলায় তার সুর যেন উপচে পড়তো সারা দিন। অনেক দুঃখ-দৈন্যেও সেটাকে সে তাড়িয়ে দিতে পারতো না, ঝেড়ে ফেলতে পারতো না। খেজুরের গুঁড়ি-পাতা পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে-মাজতে তার গলা ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করত। সব কষ্টের তার সেই সঙ্গীটির উপর ননীবালা একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন। নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে রূঢ় গলায় সেই সুর তিনি ভেঙে খানখান করে দিতেন। কিন্তু নির্মল মুগ্ধ হয়েছে, গান পাগল করেছে তাকে, মনে হয়েছে একটা কিছু না-করলে আর চলে না সত্যি। বলে-কয়ে ধরে-পড়ে কতবার কত জনকে নিয়ে এসেছে দু-একটা গান শিখিয়ে দেবার জন্য। আর সেই গান যখন টুনির গলায় মধু হয়ে ঝরেছে, কানায়-কানায় ভরে উঠেছে তার হৃদয়।

গুম হয়ে থাকতেন টুনির মা, রাগে গরগর করতেন। বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে শোনাতেন : 'ইঃ। গান। গান শিখছেন মেয়ে। গান শিখে তিনি আমার তিন কুল ধুয়ে দেবেন। ভদ্রঘরের মেয়ে, তার আবার অত গান-বাজনার কী দরকার? খেতে নেই শুতে রাঙাপাটি।' অবিশ্যি তা তো তিনি বলতেই পারেন। গান-বাজনায় যতটুকু সময় টুনি অপচয় করবে সেই সময়টুকু ঘরের কাজে মন দিলে আরো একটু আয়াস হয় তাঁর। টুনি ভয়ে চোর হয়ে গেছে। নির্মল বলেছে, 'কী বোকা! এতো কিসের ভয়! অভাবে-অশান্তিতে কাকিমার মাথার ঠিক নেই।' তবু চোখ থেকে টুনির ভয়ের ছায়া নামে নি। ও বড়ো ভীরু ছিলো, বড়ো নরম আর শান্ত।

কিন্তু ননীবালার মেজাজ আরো বিগড়োতো যখন নির্মল কোনো জিনিস একান্ত করে টুনির জন্যেই নিয়ে আসতো। অথচ তেমন জোর দিয়ে কিছু বলতেও পারতেন না, নিজের প্রতিবাদটা নিজের মনের মধ্যে রুষতো ফুঁশতো, ঝালটা শেষে দিকভ্রান্ত হ'য়ে যে-কোনো উপায়ে মেয়ের উপরেই পড়তো গিয়ে। এই অক্ষম স্বামী নিয়ে নির্মলের উপরই তাঁর ভরসা। নির্মলকে কিছু বলবেন এমন সাহস তাঁর ছিলো না। একটু প্রশ্রয় না-দিলে সে-ই বা বশ মানবে কেন? ভগবান কি তাঁকে একটা ছেলে দিয়েছেন যে আজ না হোক, কাল অন্তত খেটে খুটে উপার্জন ক'রে তাঁদের দুঃখ ঘোচাবে? ঐ তো পরের ছেলে নির্মল। নির্মলই তো ধরে আছে ভাঙা হাল, ছেঁড়া পাল খাটিয়ে সেই তো বেয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ফুটো নৌকো। ভরাডুবি থেকে সে-ই বাঁচিয়ে রেখেছে।

'এমন কপাল' নির্মলের কাছে বসে কপালে করাঘাত হেনেছেন তিনি, 'যে আশেপাশে নিন্দে করতে, ক্ষতি করতেই সকলে পটু, দুঃখে কষ্টে মরে গেলেও একটা আধুলি সাহায্য করতে কেউ নেই। বুঝলে বাবা, সেইজন্যেই বলি যে এই তোমার উপহার-টুপহারগুলো—ও-সবের দরকার কী? তোমার কাকার জন্য একটা যদি ফুড আনো বলবার কিছু নেই, সংসারের জন্য যদি কিছু করো তাও কেউ বলতে পারবে না—কিন্তু এই টুনির জন্য যদি—বোঝোই তো সব। এমন বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।' আড়ে-আড়ে নানাভাবে নির্মলকে এ-সব বুঝিয়েছেন তিনি। নির্মল চুপ করে শুনেছে, আর তারপরেই হয়তো কলকাতার পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘুরে-ঘুরে চমৎকার এক স্বরলিপি-পদ্ধতি কিনে এনেছে পরের সপ্তাহে।

তখন ছাত্র সে। সবে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে। কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়ে। কুড়ি একুশ বছর বয়স। কিন্তু কলকাতার মতো মহানগরীতেও তার মন টেঁকে না, চলে আসে ত্যেক সপ্তাহে এখানে, এই পানাপুকুর আর শেওলা-ধরা এঁদো গ্রামে। মা বলেন, 'ওরকম হপ্তাতেই আসিস নি বাছা, খুব তো কাছে নয়, এতে শরীর খারাপ হয়, টাকাও নষ্ট।'

মাকে জড়িয়ে ধরে নির্মল বলে, 'তোমাকে না-দেখে যে থাকতে পারি না, মা।'

মা'র দু'চোখে স্নেহ ঝরে পড়ে। 'শোনো আমার বুড়ো খোকার কথা। কী যে বলিস।'

আর সন্ধ্যাবেলা নির্জনে দেখা হতেই চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে টুনির, 'তুমি কেন এমন রো?'

'কী করি?'

'প্রত্যেক সপ্তাহে আসবার কী দরকার?'

'অত আমি হিসেব দিতে পারবো না।'

'আবার বই এনেছো কেন?'

'গান শিখবে না?' খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবার নির্মল, 'আমি একটা টিউশনি য়েছি জানো?'

'টিউশনি?'

'পনেরো টাকা মাইনে। কাউকে বোলো না কিন্তু। এ-টাকা আমি সব একা তোমার জন্যে চ করবো।'

'আমার জন্যে? আমার কী দরকার?' আবার ভয় নেমেছে টুনির চোখে।

নির্মল পলকহীন হয়ে তাকিয়ে থেকেছে সেই টলটলে দুটি চোখের দিঘিতে, আস্তে বলেছে, তামার জন্যে ওস্তাদও রেখে দেবো টুনি।'

'না, না—'

'আরো কী ভেবেছি জানো?'

'কী?'

'আমি পড়া ছেড়ে দেবো। কী হবে পড়ে? তার চেয়ে চাকরি করা ঢের ভালো।'

অস্থির হয়ে পড়েছে টুনি, 'দোহাই তোমার। ও-সব তুমি করতে যেয়ো না। তুমি পড়া না।'

'পড়া আমার হবে না।'

'কেন?'

'কলকাতায় মন টেঁকে না।'

এবার টুনি চোখ নামিয়ে নিয়েছে। মন তারই বা টেঁকে কই? তারপর ঘন হয়ে উঠেছে ন্ধ্যার আঁধার। ঝোপে-ঝাড়ে হাজার বাতি জ্বালিয়েছে জোনাকির দল, পুকুর থেকে গন্ধ ঠেছে জলের, নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে ভারি হয়ে উঠেছে গ্রামের রাত। অনেক পরে নি মুখ তুলে চাপা-চাপা রুদ্ধ গলায় বলেছে—'তুমি কিছু বোঝো না কেন?'

'কী আবার বুঝবো?'

'এভাবে—এভাবে—তুমি কি কখনো কিছু বুঝবে না?'

'বুঝি, বুঝি। সব বুঝি।' হাসি-ভরা চকচকে চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে বলেছে নির্মল, 'যার -বিদ্যের ক্ষমতা আছে তার জন্যে যে তাই ব্যবস্থা দরকার সে আমি খুব বুঝি।'

'সবাই কত যা-তা বলে—'

'বলুক গে। আমরা তো কলকাতাই চলে যাবো।'

'কলকাতা!'

'কলকাতা না-গেলে কিছু হয় না। এই পাড়াগাঁয়ে বসে থাকলে কেবল জুজুর ভয়।' আ একটা টোকা দিয়েছে সে টুনির গালে, 'টুনি, টুনটুনি, টুনি পাখি।'

লজ্জায় আরক্ত হয়ে পালিয়ে গেছে টুনি।

তারপর একদিন নির্মল সত্যিই পড়া ছেড়ে দিলো। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে যে-ছে তিনটে লেটার পেয়ে, দশটাকার জলপানি পেয়ে দেশের দশের বিধবা মায়ের মুখ উজ্জ্ব করেছিলো, মাস্টারমশাইরা যে-ছেলে জজ হবে বলে রায় দিয়েছিলেন, সমাজপতিরা ভেত ভেতরে বুক ফেটে গেলেও মুখ ফুটে বলেছিলেন, 'সাবাস, সাবাস' তার এই আচমকা খেয়া সবাই সচকিত হলো। ফার্স্ট ইয়ার থেকে খুব ভালো করে, প্রথম পাঁচজনের একজন হয়ে স সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে, মা কত আশায় বুক বেঁধে তাকে কলকাতা পড়তে পাঠিয়েছেন, ব তাঁর আকাঙক্ষা, ভবিষ্যৎ জীবনের কত উজ্জ্বল ছবি রচনা, সব—সব গেলো। সরোজি দুঃখে, ক্ষোভে প্রায় কেঁদে ফেললেন, 'তুই কি আমাকে একবার জিগ্যেস করাও দরকার ম করলিনে? যা নিজে বুঝলি তাই করলি?'

নির্মল মিষ্টি করে হাসলো, 'ঐ দ্যাখো। এ নিয়ে এতো কী কষ্ট তোমার বলো তো? প করলেই বুঝি একটা মস্ত দিগ্‌গজ হয়ে যেতুম? কিন্তু এ-কথা তো বোঝো যে, পাশই ক আর যা-ই করি, চাকরি না করলে আমাদের চলতো না?'

'যখন চলতো না তখন চলতো না। তাই বলে এখুনি তুই পড়া ছেড়ে দিবি?'

'ভালো একটা কাজ পেয়ে গেলাম, না-নেওয়া বোকামি হতো না?'

'এখুনি তোর কাজ করবার হয়েছে কী? না-খেয়ে তো আর মরে যাচ্ছিলাম না।'

'তা না-ই হলো, বয়েস তো আমার কম হলো না? এখন চাকরি করারই সময়।'

বাবার মৃত্যুর পরে বছর দুয়েক নষ্ট হয়েছিল নির্মলের, সে-কথাটাই উত্থাপন করল ('একুশ বছর বয়সের ছেলে আর আই. এ. পড়ে না।'

'না, তা পড়বে কেন?' এবার সরোজিনী গঞ্জনা দিলেন, 'পড়াশুনো ছেড়ে সবাই-ই স তাড়াতাড়ি তোর মতো পরের সংসারের গোলামি করে।'

এ-কথায় একটু থমকে গেছে নির্মল, কিন্তু তক্ষুনি হেসেছে—'কাউকে কিছু করতে প কি খারাপ?'

'না, খারাপ কেন হবে? তুই যে তাদের দাসখৎ লিখে দিয়েছিস। রাগে দুঃখে মুখ খু গেছে মা'র। 'প্রিয়নাথ দত্তমল্লিকের সাতপুরুষের জমিদারি তো বাঁধা আছে তোর কাছে। ত তার বউ-মেয়েকে খাওয়াতে তোর চাকরি নিতে হবে।'

ব্যথিত গলায় নির্মল বলেছে, 'তিনি আমার মাস্টারমশাই, তিনি আমার গুরু। তুমি আজ সেই সম্বন্ধটাও অস্বীকার করবে?'

'গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা একেবারে। গুরুর জন্যে সব উৎসর্গ না করলে কি আর তোম এখন চলে?'

'না মা, চলে না। যেমন ছাত্রের জন্য একদিন রাত না জেগে পড়ালে গুরুরও চলতো না।'

প্রিয়নাথবাবু মাস্টার ছিলেন এই রাধানগর হাইস্কুলের, আর নির্মল ছিলো তাঁর পরমপ্রিয় ত্র। তার বাবা যখন মারা গেলেন, আর সরোজিনী শোকার্ত হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা ছাড়া ব ভুললেন সংসারের, নির্মল অমনি স্বাধীন হয়ে তাড়াতাড়ি স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিলো। ার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ঘুড়ি ওড়ানো, পাড়া বেড়ানো আর লাট্টু খেলা। ধীরে ধীরে ঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ভদ্রলোকই তখন তাকে আবার একদিন হাতে ধরে স্কুলে নিয়ে ভর্তি করে লেন, ভালোবেসে পড়ালেন, পরীক্ষার সময় প্রাণপাত করলেন তার জন্য, আর সে যখন তী হয়ে স্কুলের গণ্ডি পার হলো, আনন্দের অংশটা তাঁরই ছিলো সব চেয়ে বেশি। আর ারপর একদিন এই বিপদ এলো অতর্কিতে।

স্কুল থেকে ফিরছিলেন প্রিয়নাথবাবু, কোনো ফেল-করা রুষ্ট ছেলে ছুটে এসে জব্দ করবার ন্য রাস্তার মোড়ে কলার খোসা রেখে গেলো কয়েকটা, সেই খোসাতে পা হড়কেই ভেঙে গলো তাঁর কোমর থেকে পায়ের জোড়ার হাড়টা। আর তিনি উঠতে পারলেন না শয্যা থকে।

সরোজিনী ছেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'সত্যি করে বল তো নিমু, সবই কি তোর প্রয়নাথ মাস্টারের জন্যই?'

জবাব দিলো না নির্মল।

'বল না সত্যি ক'রে, খুঁজে-পেতে এই যে অ্যালুমিনিয়মের কারখানায় পঞ্চাশ টাকা াইনের এক কাজ নিলি তুই, তার মূলমন্ত্রটা কী?'

'মূলমন্ত্র হচ্ছে টাকা। টাকার বড়ো দরকার, মা।'

'খুব দরকার, না? মায়ের সাধ আকাঙক্ষার চেয়েও বেশি। লেখাপড়া করে পাঁচজন ভদ্রলোকের মত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়েও বড়ো।'

নির্মল মা'র হাত দুটো নিজের গলায় জড়িয়ে এবার হেসেছে শুধু। আর কিছু বলে নি। কী াভ? মা কি বুঝবেন এ-সব কথা? বড়ো-বড়ো করুণ চোখে টুনি যখন তাকায় তার দিকে, বিশ্বসংসারে এমন কী আছে যা সে বিনিময় করতে না-পারে তার জন্য?

আজ কতকাল পরে মনে পড়লো সেই সব কথা, সেই সব দিন, সেই সব স্মৃতির সমুদ্র াজ মথিত হলো। মনে পড়লো, মা কত যত্ন করে খাবার সাজিয়ে বসে অপেক্ষা করতেন, াইরে সাইকেলের পরিচিত বেলটি শুনলেই বেরিয়ে আসতেন ব্যস্ত হয়ে। দুপুরবেলাকার খর সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেদনায় করুণ হয়ে উঠতো তাঁর চোখ। আর যখন টুনির কাছে াসে দাঁড়াতো, গালের কাছটা লাল হয়ে উঠতো তার, মুখ ভার করে একটু পরে বলতো, এতো দেরি?'

নির্মল হেসে বলতো, 'অঙ্ক কষে আসতে হয় কিনা?'

'অঙ্ক!' টুনি অবাক।

নির্জন জামরুল তলার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঘামতে-ঘামতে নির্মল গম্ভীর মুখে জবাব দিতো, হ্যাঁ, অঙ্ক বৈকি।'

'ফ্যাক্টরির চাকরিতেও অঙ্ক লাগে?'

'হুঁ-উ।'

'ঈশ্!'

'কী ঈশ্?'

'অঙ্ক ভীষণ বিচ্ছিরি।'

'আর অঙ্কও কি সোজা অঙ্ক নাকি?' চোখ বড়ো-বড়ো করে নির্মল সেই অঙ্কের তালিক দিয়েছে, 'ধরো, ফ্যাক্টরিতে খাবার ঘণ্টা বাজলো, পিলপিল করে সব বেরুলো গেট দিয়ে- পাঁচ মিনিট। আমি মাঠ-ঘাট ভেঙে ঝড়ের বেগে সাইকেল চালালাম। তারপর—তার একটা মস্ত বড়ো হিসেব ঘুরতে লাগলো মগজে। যথা—শ্রীমতী টুনিপক্ষী ছাড়া আর কে খিড়কির ঘাটে—এক, তার মা'র খাওয়া এই মুহূর্তে শেষ হয়েছে কিনা—দুই; তিনি ঘাটে এ একঘণ্টা কুলকচি ক'রে আঁচিয়ে, জলে বাসনের পাঁজা ডুবিয়ে, ঘরে গেছেন কিনা—তিন; খেয়ে পিচ্ করে জানলা দিয়ে পিক ফেলে, পাৎলা চুল বালিশে মেলে মেঝেতে পাটি গে শুয়েছেন কিনা—চার, তারপর 'অ টুনি, হেঁসেলে যেন বেড়াল ঢোকে না আবার। গোবর- ন্যাতাটা ভালো করে বুলিয়ে নিস। এখন আবার খিড়কির ঘাটে তোর কী দরকার রে বাপু,' ইত্যাদি ইত্যাদি বলা হয়েছে কিনা—'

'ধ্যেৎ।'

'ধ্যেৎ। এতো সব হিসেব বুঝি সোজা কথা? তারপর শ্রীমতী কখন রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে সদর বন্ধ করে, দয়ার অবতার হয়ে অধীনকে দেখা দেবার জন্য জামরুল তলায় দাঁড়াবেন, কখন সরকারবাড়ির পদিটা বাসন ধুয়ে চলে যাবে, ঘাট থাকবে সুমসাম, কেবল মাথার উপর নীল আকাশ আর তার তলায়—'

ঝরনার জলের মত ঝরঝর করে এবার হেসে ফেলেছে টুনি, 'এই বুঝি অঙ্ক?'

'অঙ্ক নয়? এতোখানি হিসেব করে এতগুলো মাইল ডিঙোনো তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিকের কাজ! অঙ্ক বলছো কী তুমি? নির্মল টুনির চোখে চোখ রেখেছে, 'আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, ঠিক এই মাত্রই তুমি সব সেরে এখানে এসে দাঁড়িয়েছ কিনা?'

হাসির আভায় দুই চোখ উদ্ভাসিত করে মুখ নিচু করেছে টুনি।

নির্মল ঘাম ঝেড়েছে কপালের, 'একটা খবর আছে।'

'কী?'

'লিফ্ট্ হলে একটা, মাইনে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'

খুশিতে টলটলে হয়ে উঠেছে টুনি, 'আজ জানলে?'

'এক সপ্তাহ আগেই জেনেছি।'

'বলো নি তো!'

'খবর তো তখনো পাকা ছিলো না।'

'আজ বুঝি ঠিক হয়ে গেলো?'

'হ্যাঁ।'

টুনি এবার একটু চুপ করে থেকেছে, একটু উদাস হয়ে তাকিয়েছে রোদ্দুর-ঝলসানো পুকুরের জলে, কচি-কচি জামরুল পাতা দাঁতে কাটতে-কাটতে বলেছে : 'বাবা কী বলেন জানো?'

'কী?'

'আমাদের জন্যেই তোমার সব ব্যর্থ হলো।'

'মাইনে বাড়ছে দ্বিগুণ, কাজ পেয়েছি ভালো, ব্যর্থ?'

'বাবা বলেন তোমার মতো পরিষ্কার মাথা কোনো ছাত্রের দ্যাখেন নি তিনি। তাঁর ভীষণ দুঃখ তুমি পরীক্ষাটা দিলে না বলে।'

নির্মলের মুখেও যেন ছায়া পড়েছে একটি, কিন্তু তক্ষুনি হেসেছে, 'ভারি পরীক্ষা। বেশ তো, এতো দুঃখ কিসের, একসময় না-হয় দিয়েই দেওয়া যাবে।'

'আর তোমার সময় হবে কিনা। সকাল থেকে রাত অব্দি কাজ।'

'তার ফাঁকে-ফাঁকেই অন্তত পাশ করবার মতো পড়া আমি তৈরি করে নেবো ঠিক।'

'পারবে?'

'কেন পারবো না? তুমি বললে আমি কী না পারি?'

'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?' একটু ভেবে নিয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছে টুনি, 'ছুটি নিয়ে, পরীক্ষাটা দিয়ে দিলে হয় না? বাকি তো নেই বেশি?'

'সবে কাজে ঢুকেছি, এখন কি ছুটি দেয়?'

'দেয় না বুঝি?'

'মনিবরা সবাই সমান। এই দ্যাখো না, এক মিনিট দেরি করে এলে তোমার কাছেই কত কৈফিয়ৎ দিতে হয়, আমি তো ভয়ে মরি, বুঝি বরখাস্তই করে দিলে, অবিশ্যি ওরা ঠিক তোমার মতো এতো কড়া মনিব নয়।'

'যা!' টুনি একেবারে লজ্জায় লাল।

তার কথায়-কথায় লজ্জা। আর সেই লজ্জা যে কত মধুর ছিলো, তা তো নির্মল আজ এই মুহূর্তেও ঠিক তেমনি করেই অনুভব করতে পারছে বুকের মধ্যে।

একদিন টুনির মা থমথমে মুখে বললেন, 'আর তো আমাদের গ্রামে টেঁকা দায় নির্মল।'

নির্মল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আতঙ্কিত হলো, 'কী হয়েছে কাকিমা?'

'না, কী আর হবে।' দাওয়ায় বসে শাকপাতা কাটতে-কাটতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। ছোট্টো মাটির উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে মসলা পিষতে-পিষতে একবার এদিকে তাকালো টুনি।

নির্মল বললো, 'কেউ কিছু বলেছে?'

'বলবেই বা না কেন?' ননীবালা চোখ টান করেছেন, 'হাল, চাল তরিবৎ এগুলো তো মানো? না কি মানো না?'

নির্মল অকাতরে ঘাড় হেলিয়েছে, 'হুঁ—উ—উ। নিশ্চয়ই মানি।'

'তবে?'

'কী তবে কাকিমা? অপরাধ হয়েছে নাকি কোনো?'

'অপরাধ নিরপরাধের কথা নয়, কথা হচ্ছে সমাজে বাস করতে গেলে পাঁচজনের কথা মতোই চলতে হয়, তা নৈলেই নিন্দে।'

'বুঝি কেউ নিন্দে করেছে আমাকে?'

'তোমাকে আর কেন করবে? সোনার আংটি আবার বাঁকা। পুরুষ মানুষের তো সাতখু মাপ। কিন্তু তুমিই বলো দেখি বাছা, আমাদের মতো ঘরের এতো বড়ো মেয়ে যদি গলা ছেড়ে দিন-রাত গান-বাজনা করে, তুমি কাকে না কাকে ধ'রে নিয়ে আসো শেখাতে, তাহলে লোবে দুটো বিচ্ছিরি কথা কেনই বা বলবে না?'

'ও, এই?' এতোক্ষণে আসল কথা টের পেলো নির্মল। এবার একটু হাসলো সে, 'টুনি গান শুনলে সকলেরই হিংসে হয় কিনা কাকিমা, তাই ওরকম করে। ও-সব কিছু না।'

'তা তো ঠিকই।' কাকিমার তরকারি কাটা বন্ধ হয়েছে, 'তুমি অবিশ্যি অনেক করো, আমি সেজন্য কৃতজ্ঞও তোমার কাছে, কিন্তু তাই বলে তো হক কথা না-বলে পারিনে।'

ওদিকের বারান্দা থেকে মসলা পিষতে-পিষতে টুনির ভীত চকিত হাত থেকে গেছে হরিণের ভয় নেমেছে তার চোখে। কী জানি, মা আবার কী বলবেন ঠিক আছে কিছু?

নির্মল দরাজ গলায় হেসেছে, 'বা বে, বলবেন বৈকি ? দোষ করলে খুব বকে দেবেন।

'ঠাট্টা তামাশা করে তো আর জীবন কাটে না?'

'তাই তো।'

'হাজার হোক আমরা তোমার গুরুজন।'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার মাস্টারমশাই তোমাকে ছেলের মতোই ভাবেন।'

'মাস্টারমশাইকেও আমি আমার পিতৃতুল্যই ভাবি, কাকিমা।'

'তা হয়তো ভাবো। কিন্তু এ-কথা কি ভেবেছো—ক'দিন পরে তুমি যখন আর্ধেক রাজ আর কুঁচবরন কন্যার মেঘবরন চুল এনে ঘর আলো করবে তখন এই কালো মেয়ের গতি কী হবে? মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে? গান দিয়ে তো পেট ভরবে না।'

'তা হয়তো ভরতে পারে।' চোখ কুঁচকে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে নির্মল। 'কলকাতা আজকাল গানের ভীষণ আদর। জানেন কাকিমা, কত মেয়ে এই গান গেয়েই স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিচ্ছে সংসার।'

'ছি ছি ছি।' ননীবালা মরমে মরে গেছেন এ-কথা শুনে। 'নির্মল, তুমি আমার পেটে ছেলের বয়সী, আমার মুখের কাছে বসে তুমি এমন কুচ্ছিৎ ইঙ্গিতটা করতে পারলে?'

নির্মল হকচকিয়ে গেছে, 'কেন? কেন? কী বললাম?'

ওদিকের বারান্দা থেকে টুনিও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হাত কেঁপে উঠেছে তার।

ননীবালা হাঁক দিয়েছেন, 'তোর হলো? যা না বাপু, রান্নাঘরে গিয়ে একটু উনুনটা তাতিয়ে দে—'

কাঠের বারকোষে লাল-লাল আঙুলে মসলা তুলে ঘরে ঢুকে গেছে টুনি। নির্মলের বুকটা কড়কড় করেছে, মনে হয়েছে লঙ্কা বেঁটে ওর হাত না জানি কত জ্বলছে, নরম-নরম হাতে শিলের উপর নোড়া ঘষতে না জানি কত কত কষ্ট হয়েছে ওর। ওর নিচু-করা-কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম লেগে রয়েছে চোখের মধ্যে। অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে বলেছে, 'আমি কি কিছু অন্যা বলেছি কাকিমা?'

ননীবালা গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছেন, 'তুমি বোঝো না? গারিব হতে পারি, তাই বলে সম্ভ্রম খোয়াতে পারিনে তো? আমরা দত্তমল্লিক বংশ, আমাদের বংশের মেয়েরা আগে সূর্যের মুখ দ্যাখে নি। আর তুমি বলছো সেই ঘরের মেয়ে বাঈজিদের মতো গান গেয়ে রোজগার করবে? ছি! এর আগে আমার মরণ হলো না কেন?'

নির্মল একেবারে সনির্বন্ধ হয়ে উঠেছে, 'আপনি ভুল বুঝেছেন কাকিমা, আমি ও-সব কিছুই ভাবি নি। কলকাতায় অনেক বড়ো-বড়ো ঘরের মেয়েরাও আজকাল—'

'থাক। বড়ো ঘরের বড়ো কীর্তি। ও-সব আমি শুনতে চাইনে। না-খেয়ে মরি সে-ও ভালো, তবু যেন এমন দিন আমার না-আসে।'

এবার চুপ করে গেছে নির্মল। ননীবাবা বঁটি কাৎ করে তরকারির চুপড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'শুনলাম তোমার মা নাকি ললিত হালদারের ছোটো নাৎনির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ করছেন। তা ভালো। পাবে-থোবে অনেক।'

নির্মলের কাছে খবরটা নতুন। কিন্তু তবুও এতোক্ষণে পাল্টা জবাব দেবার মতো প্রশ্ন পেয়েছে একটি, মৃদু হেসে বলেছে, 'টুনিরও তো শুনলাম চৌধুরী বাড়ির তিনু চৌধুরীর সঙ্গে আপনি সম্বন্ধ ঠিক করছেন।'

'ও মা।' ননীবালা একেবারে গালে হাত দিয়ে তাজ্জব। 'কে বলেছে? যতো সব মিথ্যে কথা!' পাছে কান-ভাঙানি দেয় কেউ এজন্যে তিনি কত সন্তর্পণে কথা চালাচালি করেছেন অনাদি ঠাকুরের সঙ্গে, এর মধ্যেই জানাজানি?

ভারি মুখে নির্মল বলেছে, 'কিন্তু তিনু চৌধুরী তো টুনির পায়েরও যোগ্য নয়।' বলতে-বলতে বাইশ বছরের ছেলের বুক তেতাল্লিশ বছরের বিপত্নীক তিনু চৌধুরীর উপর ঈর্ষায় টগবগিয়ে উঠেছে।

'তা, কী আর করি—' আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়েছেন ননীবালা, 'ঘটটা বুঝে তো ফলটা? আমার মেয়েই বা এমন কী?'

'কী নয়?' রীতিমতো রাগ ফুটেছে নির্মলের গলায়, 'সারা গ্রামে ওর মতো আর ক'জন মেয়ে আছে শুনি?'

'সে-কথা তুমি বললে তো আর হবে না? বিয়ের বাজারে আমার মেয়ের দর আমি জানি। সেজন্যেই তো বলি বাবা, একটু তো বুঝে-সুঝে চলতে হয়? এই গাঁয়েই তো বাস করতে হবে সকলের সঙ্গে।'

'উঁহু! সে আমি কথা দিতে পারিনে।' পাকা ভদ্রলোকের চিন্তিত মাথার মতো নির্মলের মাথাও এপাশ-ওপাশ হেলেছে এবার।

'তুমি কথা দিতে পারো না মানে? তোমার কথাতে কী এসে যায়? টুনির মা অবাক।

'মানে বিয়ের পরে টুনি খুবসম্ভব কলকাতাতেই থাকবে কিনা—'

'বিয়েব পরে।'

'মেয়ের বিয়ে দেবেন না?'

'তা তো দেবো।'

'তাই বলছি।'

'কী বলছো?'

'বলছি টুনির জন্যে আমি পাত্র ঠিক করেছি, এখন দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা। তবে ঐ তিনু কঞ্জুষের চেয়ে সে যে শতগুণে ভালো এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

মুহূর্তে আলো হয়ে উঠেছেন টুনির মা। 'কোথায় বাবা? কোথায়?' গলার স্বরই বদলে গেছে একদণ্ডে।

'পাত্র এই গ্রামেরই।'

'কী করে? ঘরে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে তো?'

'তা মোটামুটি আছে বৈকি।'

'আমি বাবা কিছুই চাইনে, যদি মেয়েটা দুটো খেতে-পরতে পায়। এই বলে তিনি সবই চেয়েছেন। 'তা ছেলেটি কেমন?' গলা বাড়িয়ে ঘন হয়ে এগিয়ে এসেছেন নির্মলের কাছে নির্মল পরম উদাসীন থেকে বলেছে, 'লোকে তো ভালোই বলে।'

'জমি-জমা কিছু—'

'তাও আছে, বছরের ধান হয়। পাকা বাড়ি আছে।'

'আহাহা। তবে তো চমৎকার। দেখতে-শুনতেও বোধহয়—'

'তা মন্দ কী—রং ফর্শা, মুখ-চোখও ভালো, আর স্বাস্থ্য এমন যে একদিন তার একটু সর্দিও হয় না।'

'আর স্বভাবচরিত্র?'

'অতিশয় ভালো।'

'সংসারে আর-আর আছে কে? ক'টি ভাই-বোন?'

'না, সে-বিষয়েও নির্ঝঞ্ঝাট। টুনি খুব সুখে থাকবে সেখানে।'

গদ্‌গদ ননীবালা একেবারে চুপড়ি-টুপড়ি ফেলে এলিয়ে গেছেন, 'চাকরি-বাকরি করে কিছু?'

'তাও করে। মাইনেও ভালো।'

'আমার টুনির কি এতো ভাগ্য হবে?' হাত জড়িয়ে ধরেছেন নির্মলের, 'এমন সোনার চাঁদের হাতে দেবার যোগ্যতা কি আমার আছে?'

'কেন থাকবে না কাকিমা?' নির্মল একেবারে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ছেড়েছে—'টুনিকে আপনি অত ছোটো করে দ্যাখেন কেন? আমি তো ভাবছি সেই ছেলেরই কি এতো যোগ্যতা আছে যে সে টুনিকে পাবে?'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি তাকে বলেছো তো বাবা আমাদের কী অবস্থা?'

'হ্যাঁ। এ-সবই সে জানে।'

'কিছুই যে দিতে-থুতে পারবো না—'

'দরকার নেই।'

'তাহলে তুমি এক্ষুনি ঠিক করে দাও। বলো, কবে নিয়ে আসবে তাকে মেয়ে দেখাতে।'

'একগ্রামের ছেলে, মেয়ে তো তার দেখা।'

'দেখা! কবে দেখেছে?'

'রোজই তো দ্যাখে।'

'রো-জ দ্যা-খে!' এবার টুনির মা একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছেন নির্মলের মুখের দিকে, ধীরে ধীরে বলেছেন, 'তার নাম কী বলতে পারো?'

মৃদু হেসে মাথা নিচু করেছে নির্মল, 'আমাকে যদি অপছন্দ না করেন—'

'তোমাকে!'

'মাস্টারমশাই যদি—'এবার ঘন-ঘন মুখ মুছেছে সে, বারে-বারে লাল হ'য়ে উঠেছে কান

'তোমাকে অপছন্দ করবো!' টুনির মা তেমনি অপলকে তাকিয়ে থেকেছেন তার মুখের দিকে।

লাজুক ভঙ্গিতে নির্মল আবার বলেছে, 'যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, ছ'মাস পরে ামার চাকরি পাকা হলে, তখন আমি—আমার মাইনেও তখন আরো কিছু বাড়বে—'

'নিমু, আমি কী বলে তোমাকে আমার—' ননীবালার গলা বন্ধ হয়ে এসেছে কৃতজ্ঞতায়।

নির্মল উঠে দাঁড়িয়েছে তাড়াতাড়ি, 'আমি আজ যাই কাকিমা, আমার একটু তাড়াতাড়ি াছে কিনা—'

াত্তিরে খেতে বসে মাকে বললো নির্মল, 'আমি বিয়ে করবো, মা।'

মা আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'আমিও সে-কথাটাই বলব ভাবছিলাম।'

'তোমার শরীর কত খারাপ হয়ে গেছে', মা'র দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো নির্মল। কড়ে যেন ছোটো হয়ে গেছে মানুষটা, অথচ বয়স আর এমন কী। ভারি মায়া হলো। টুনি ালো মেয়ে, মাকে সে সুখী করতে পারবে।

সরোজিনী সস্নেহে হাসলেন, 'একা ঘরে আর মন টেঁকে না আমার।

'বউ এলেই ঘর ভরে যাবে?'

'যাবে না? শ্রী ফিরবে বাড়ির, তুইও আর এতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াবিনে।'

'আমি বুঝি ঘুরে বেড়াই?'

'তা একটু বেড়াস বৈকি। চাকরি কি তোর সারাদিনই?'

এর আর কী জবাব দেবে নির্মল, কথাটা তো সত্যিই। মা'র কাছে আর সে কতটুকু থাকে? া ভাত বেড়ে বসে থাকেন, দয়া করে এসে খায়, বিছানা পেতে রাখেন, অনুগ্রহ করে শোয়। ত্যি, সন্তানের মতো অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে আর কিছু না। কেবল নিয়েই খালাস। তারপর যেই াখাটি গজালো অমনি উড়লো আকাশে। দিলো কী সে?

'শোন—' সরোজিনী ছেলের দিকে তাকালেন, 'হালদার-বাড়ির লাবিকে দেখেছিস বড়ো য়েছে পরে?'

নির্মল বুঝলো, টুনির মা যে-কথা বলেছিলেন ধীরে-ধীরে এবার সেই প্রসঙ্গেই আসছেন া। বড়ো-বড়ো গ্রাসে সে ভাত খেতে-খেতে বললো, 'আমার কি এতোই ভাগ্য যে হালদার-াড়ির মেয়েদের এই চর্মচক্ষে দেখতে পাবো।'

'তা, ঠিক।' সরোজিনী হাসলেন, 'ললিত হালদার একটু বেশিই পর্দানশিন। মেয়েদের কেবারে ঘরের দাওয়াটিতে পর্যন্ত পা বাড়াতে দেন না।'

'মেয়েরাও তেমনি আস্ত-আস্ত এক-একটা রাঙা আলুর বস্তা।'

'সে আবার কী?'

'একেবারে ভেড়া সব।'

'বলছিস কী?'

'অমন বিচ্ছিরি শাসন শোনে কেন মেয়েগুলো?'

'ও মা, গুরুজনের কথা শুনবে না? আর ললিত হালদার কি একটা যে-সে লোক? একটা াঘ।'

'বাঘই। বাঘও নয়, রাক্ষস।'

'কী যে বলিস যা-খুশি তাই—'

'ঠিকই বলেছি, কিন্তু যাকগে, ললিত হালদারের কথায় আমাদের দরকার কী?' খাওয় শেষ করে জল খেলো নির্মল।

মা বললেন, 'দরকার একটু আছে বাছা। আমি ভাবছি ঐ লাবির সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি।

'কেন, তারা কি বলেছে কিছু?'

'কত কথাই তো বলেছে।' উদাসভাবে নিঃশ্বাস ছাড়লেন সরোজিনী, 'আর বলতেই ব বাধা কী? বাড়াবাড়ি করতে কি তুই কম করিস?'

মা'র ইঙ্গিতটা বুঝেও না-বোঝার ভান করলো নির্মল, 'কিসের

'সারাটা দিন পড়ে থাকিস প্রিয়-মাস্টারের ঘরে, লোকে দ্যাখে না?'

'দেখবে না কেন? আমি কি চোর নাকি যে চুপে-চুপে যাবো?'

'কী দরকার তোর ওদের ওখানে সারাদিন?'

'মাস্টারমশায়ের অসুখ না? আমি ছাড়া আর-কেউ যায় সেখানে?'

'সবাই নিন্দে করে তোকে।'

'কেন?'

'অত বড়ো একটা মেয়ে ঘরে। ওরাই বা কী? ওদেরও তো একটা কলঙ্কের ভয় আছে মেয়ের বিয়ে দেবে না?'

'আমার যাবার সঙ্গে বিয়ে দেবার বাধাটা কোথায়?'

'দুর্নাম হয় যদি তোকে জড়িয়ে, তখন? কে বিয়ে করবে ঐ মেয়ে?'

'আমাকে জড়িয়ে দুর্নাম হলে অবিশ্যি আমারই দায়িত্ব।' বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়লো নির্মল

ছেলে বড়ো বুঝের, এই মনে করে খুশি হলেন সরোজিনী।

খেতে-খেতে ধাঁ করে বাঁ হাতটা মা'র কাঁধে রেখে, যেন আচমকা মনে পড়েছে এরক ভাবে, বললো নির্মল, 'তার চেয়ে এক কাজ করি না মা?'

'এই দ্যাখো, দিলি তো ছুঁয়ে, আবার চান করাবি আমাকে।'

নির্মল চোখ-ভরা হাসি নিয়ে জিব কাটলো, 'মনেই ছিলো না। আর কেনই বা থাকবে তুমি আমার মা না? তোমাকে আমি সব সময় ছোঁবো। আর মাছ বুঝি তুমি খাও ি কোনোদিন? নাড়ীভুঁড়ি ধুতে পেরেছো?'

'শোনো ছেলের কথা।' সরোজিনী উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'বুড়ো ঢেঁকির কথা শুনলে রাগ হ কিনা।'

নির্মলও উঠে দাঁড়িয়েছে, এবার ভালো করেই বাঁ হাতে জড়িয়েছে মাকে, 'রাগও হ আবার শোনোও তো সব কথা। আরেকটা কথা শুনবে?'

ছেলের আদর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাছের আঁশের গন্ধে তিনি নাকে কাপড় দিয়েছে 'সাধে কি বলি যে বিয়ে কর। এ-সব আর ঘাঁটতে পারিনে আমি।'

'বিয়ে করলেই বুঝি আর তোমাকে ঘাঁটতে হবে না?'

'না। আমি কেন ঘাঁটবো? তোর বউ তোকে রেঁধে দেবে। আমি তো একরকম ঠিক করেছি, এখন তুই মেয়ে দেখে পছন্দ করলে সামনেই যে-তারিখ পাবো এক করে দেবো হাত।'

'যদি পছন্দ না হয়?'

'পছন্দ আবার হবে না। রং গোলাপ ফুলের মত। আর ললিত বুড়ো দিতে-থুতেও ক দেবে না। মুরুব্বি পাবি একটা মাথার উপর।'

'আর তারপর গুণবান দাদাশ্বশুরের সঙ্গে বারোয়ারিতলায় বসে ঘোঁট পাকাবো প্রিয় মাস্টারের বিরুদ্ধে, তার কালো মেয়েটার যাতে বিয়ে না হয়, ভাংচি দেবো জনে-জনে।'

'আহা। তা কেন?'

'তাই তো। তাছাড়া আর কী। একটা লোক পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে তবু কেন ভিক্ষে করছে না বাড়ি-বাড়ি এই আক্রোশেই তো মরে যাচ্ছে সারা গ্রামের লোক। আর সব চেয়ে আশ্চর্য, তুমিও যোগ দিচ্ছো সেই সঙ্গে।'

'আমি কেন যোগ দিতে যাবো।'

'তা নয়তো কী? যে-লোকটা তাঁর সব চেয়ে শত্রু তার বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা পাতাতে চাইছো।'

দ্বিধায় পড়লেন সরোজিনী। বুদ্ধি তাঁর প্রখর নয়, এমনিতে মানুষটা ভাল। সাতে নেই পাঁচে নেই, আছেন চুপচাপ নিজের ছেলে নিয়ে নিজে। দিন চলে যাচ্ছে সুখে-দুঃখে। তাছাড়া সতিাই তো তিনি তাঁর ছেলের বিষয়ে প্রিয়নাথ মাস্টারের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর দুঃখের সব চেয়ে চরম দিনগুলোতেই তিনি বন্ধু হয়ে জড়িয়ে আছেন মনের মধ্যে। আর মেয়েটা! মেয়েটাই কি কম লক্ষ্মী নাকি? এসেছে, বসেছে কতদিন রেঁধে রেখে গেছে। এখন কালের প্রবাহে সবই ভুলে গেছেন তিনি, সেই সঙ্গে ওদেরও ভুলেছেন। কিন্তু তাই বলে তাদের শত্রুর সঙ্গে তো জোট পাকাতে পারেন না?

মায়ের এই দ্বিধান্বিত অবস্থার সুযোগ নিল নির্মল, 'তার চেয়ে তোমাকে যাঁরা বিপদের দিনে করেছেন, তাঁদেরই তুমি একটা উপকার করো না।'

'আমি কী উপকার করতে পারি? আমার সাধ্য কতটুকু? তুই তো যা পারিস করিসই।'

'তাতে তো আরো অপকারই হয়। দুর্নাম হয় ওদের।'

'তাই তো।'

'তার চেয়ে আমি বিয়ে করি না টুনিকে।'

'কী!' সরোজিনী উপকারের তালিকা শুনে অবাক।

'কী আবার। টুনির মতো ভালো মেয়ে আর আছে নাকি তোমাদের গ্রামে। সব ক'টা তো ঝগড়াটি আর হিংসুটি আর কুচুটে—' মা'র অপলক চোখের দিকে সে তাকালো। চোখ নামিয়ে নিলেন সরোজিনী। মুখ একেবারে আসন্ন বর্ষার আকাশের মতো থমথমে।

'কী হল? রাগ করলে নাকি?'

জবাব নেই।

'বলো না।'

'আমার বলবার জন্যে কি তোমার কিছু আটকে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই!'

'এতোদিন ধরে যা-যা করেছো সবই বোধহয় আটকে ছিলো, না?'

'কী করেছি?'

'মাস্টারের সেবার নামে ভাব করেছিস মেয়েটার সঙ্গে। আবার কী!' এক ঝাপটা মেরে সরোজিনী রান্নাঘর ছেড়ে কুয়োতলায় এলেন, অন্ধকারে শুধু তাঁর দড়ি টেনে বালতি ফেলার আওয়াজ শোনা গেলো, ঝপঝপ করে জল ঢালার দ্রুততায় বোঝা গেলো তাঁর উত্তেজনা।

তাঁদের পুকুর নেই। অনেকদিন আগে শুকিয়ে একটা ডোবা হয়ে আছে বাড়ির পেছন দিকে। গভীর করে এই কুয়োটি নির্মলের বাবাই মরবার আগে খুঁড়িয়েছিলেন। সুন্দর টলটলে

জল। সবাই বলতো মিঠে জল। গ্রামের লোক রিজার্ভ ট্যাঙ্কের জলের চাইতেও এই জল পছন্দ করত বেশি। গরমের সময় এই ঠাণ্ডা কুয়োর জলে প্রাণ ঠাণ্ডা হতো।

নির্মলও আঁচাতে এলো সেখানে। খোশামুদে গলায় বললো, 'তুমি অনর্থক রাগ করছো মা। ঘরে এসো, আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলবো—'

'বুঝতে আমার কিছুই বাকি নেই বাছা। মাস্টারের কথা ধরছিনে, তার বউয়ের কথাই ভাবছি। পরের ছেলেকে এমন ফাঁদ পেতে ধরতে কি ননীবালার বিবেকে একটুও আটকালো না? ছি ছি ছি। গ্রামের মধ্যে শেষে এই সব কেলেঙ্কারি কাণ্ড ? মেয়ে দেখিয়ে ছেলে ভুলোনো? ম্লেচ্ছদের মতো দেখাশুনো করে বিয়ে?'

নির্মল দিশাহারা। ভেবেই পায় না কী যুক্তিতে সে ঠাণ্ডা করবে মাকে। তাঁর অহেতুক সংস্কারকে সংস্কৃত করবে।

তারপর একদিন নয়, দু'দিন নয়, দিনের পর দিন চললো এই মন কষাকষির পালা। মা কোনোরকমেই বুঝতে পারেন না যে-মেয়েকে নির্মল রোজ দু-বেলা দেখছে তাকে আবার বউ করে ঘরে আনবে কেমন করে? যে-মেয়ে ওর সঙ্গে বছরের পর বছর মাথার ঘোমটা ছেড়ে কথা বলেছে, নতুন করে ঘোমটা টানবে কোন লজ্জায়? তিনি শুনেছেন সাহেব-মেমরা নাকি এমনি করেই বিয়ে করে। তা তারা করুক। তারা হলো অন্য রকম। তাদের আবার ঘর, সংসার, আর বউ-গিরি। তাই বলে তাঁর ঘরে এই কাণ্ড ? গ্রামের মাতব্বররা আছেন না? বিধবা মানুষ সকলের দয়াতেই শান্তিতে আছেন, শেষে সকলকে ক্ষেপিয়ে অবশ প্রিয়নাথের কালো মেয়ে ঘরে এনে কি তিনি সাত হাত জলের তলায় ডুববেন? অবশ্য শেষ পর্যন্ত মত দিতেই হলো তাঁকে। কী করবেন, সমাজ ত্যাগ করলেও ছেলে তো আর ত্যাগ করতে পারেন না? আর ছেলে তাঁর যেরকম জেদী। আবদার দিয়ে-দিয়ে অবিশ্যি তিনিই মাথা খেয়েছেন, এখন বুঝুন তার ফল।

তবু মন্দের ভালো, ভাবই করুক, যা-ই করুক, মেয়েটা নিতান্ত সুস্থির। একদিন বেড়াবার অছিলায় ভালো করে দেখে এলেন গিয়ে। দেখেছেন তো কতবারই, তা বলে এখনকার দেখার সঙ্গে তো আর তুলনা হয় না? আর দেখে বেশ ভালোও লাগলো। বড়ো হয়ে অনেক সুন্দর হয়েছে দেখতে। কই, আগের মতো কালোও তো নেই, অথচ লাজুক আছে তেমনি।

মা'র মত পেয়ে খুশিতে সেদিন লাফাতে লাগল নির্মল। মাকে দুঃখ দিতে কার ভালো লাগে? মা'র অমতে, মা'র বিরোধিতায় কাজ করতে কোন ছেলের না মন খারাপ হয়ে যায়? সেদিন যেন আবার নতুন করে ভালোবাসা হলো মা-র সঙ্গে তার। মা আর ছেলের সম্বন্ধ আরো যেন নিবিড় হলো।

সব ঠিক। কেবল টুনির মা বললেন, 'ছ'মাস পরে যখন তোমার চাকরি পাকা হবে, তখনই বিয়ে হবে। সেই তো ভালো। কী বলো?'

নির্মল বললো, 'বেশ তো।'

'নির্মলের মা কিন্তু ভারি অস্থির হলেন, বললেন, 'কেন, ঘরে কি তোর খাবার নেই, তোর বউ এলে কি আমি তাকে একমুঠো ভাত দিতে পারবো না যে চাকরি পাকা না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা?'

নির্মল বললো, 'তা হোক, এতো তাড়াহুড়োর দরকারই বা কী?'

'কী আবার। শুভকাজ ফেলে রাখার নিয়ম নেই শাস্ত্রে।'

'ফেলে রাখলে কী হয়?'

'কত কিছু হয়। শেষে হয়তো হয়ই না। আর পেছনে কত শত্রু তার ঠিক আছে কিছু?'

নির্মল হাসলো মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে, 'না-হলে তো তুমি খুশিই হবে, কী বলো? তোমার তো আর মত ছিলো না।'

'অলুক্ষণে কথা আর বলিসনে, যা। মনে-মনে যাকে বউ বলে বরণ করেছি, তাকে তো ভালোও বেসেছি। না কি বাসি নি? মুখে কি তোর কিছু আটকায় না?'

মাকে আদর করেছে নির্মল, 'তুমি ভারি ভালো, মা। তুমি খুব ভালো।'

মা'র কাছে বললো বটে, দেরিই ভালো, কিন্তু দেরিতে তার নিজেরও মত ছিলো না। কিন্তু টুনির মা যখন বলছেন তখন আর কী করে সে? তবু পরের দিন গিয়ে বললো, 'মা বলছেন, অত দেরি না-করাই ভালো?'

বলতে দারুণ লজ্জা করলো তার, মানে তারও। স্বভাবত লজ্জা-শরম নির্মলের একটু কমই, মা তো সব সময়েই বলেন, 'বেহায়া। নিজের বিয়ের কথা আবার নিজে বলে নাকি অত?' তা কী করবে, নিজেই যেখানে নিজের গুরুজন সেখানে লজ্জার ধার ধেরে কী লাভ?

টুনির মা মুখ মলিন করলেন, 'এই ক'টা দিন তুমি দিদিকে সবুর করতে বলো বাবা। আমার তো মেয়ের বিয়ে, একটু তো সাধ-আহ্লাদ আছে। একটু সময় দাও আমাকে।'

সময় পেলেই তিনি যে সাধ-আহ্লাদ পুরোবার কী সম্পদ জোগাড় করতে পারবেন বুঝতে পারলো না নির্মল। তবু চুপ করে রইলো। তিনি দাতা, সে গ্রহীতা, জোর খাটাবার তার অধিকার নেই।

মাকে সে বোঝালো। মা বুঝলেন। বললেন, 'আহা, তাই তো আপন বুকের ধন, জন্মের মতো পরের হাতে তুলে দেবে, সময় তো চাইতেই পারে। তা বাপু থাক, আর তাড়াহুড়া করে কাজ নেই। ছ'মাস আর কী, দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে যাবে।'

ফুরিয়েই গেলো। শুধু সময়ই ফুরোলো না, সবই ফুরোলো। আর এতোদিন পরেও সেই ফুরিয়ে যাবার যন্ত্রণাময় স্মৃতিটা ছাইচাপা আগুনের মতো সামান্য ভাবনার বাতাসেই তপ্ত হয়ে উঠলো নির্মলের বুকে। প্রথম ফুরোলেন তার মা। কিছুই না, বলতে গেলে। একটু বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি হলো কি হলো না, বুকে ঠাণ্ডা বসে তিনদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেলেন তিনি। ভালো করে কিছু বুঝতেই পারলো না সে, চিকিৎসা পর্যন্ত করাবার সময় পাওয়া গেলো না। মেয়েদের মতো বুকে মাথা রেখে জোরে-জোরে কাঁদলো। মা ছাড়া যে আর কিছুই ছিলো না তার।

কাটলো ছ'মাস। চাকরি পাকা হলো। মাইনেও বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেলো। এবার বিয়ে।

কিন্তু টুনির মা বললেন, 'আর ক'টা দিন সবুর করো বাবা।'

নির্মল অবাক। আরো সবুর করতে হবে? ননীবালা কি জানেন না তার মাতৃহীন, স্ত্রীলোকহীন একা বাড়ি তার পক্ষে এত কষ্টের। বরং তাঁরই তো নিঃসঙ্গ নির্মলের কাছে তাড়াতাড়ি মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। একটু গম্ভীরভাবে বললো, 'আমার রোজ এখানে

আসা-যাওয়া করতে অসুবিধে হয়। তখন মা ছিলেন, আসতাম, এখন প্রত্যেকদিন এখানে আসা-যাওয়ার কী কৈফিয়ৎ দেবো আমি সকলের কাছে?'

'সবই তো বুঝি, তবে একটু অসুবিধে আছে কিনা, মানে—' দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন তিনি।

এবার নির্মল ম্লান, গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকে দূরের দিকে।

এদিকে প্রিয়নাথবাবুর অবস্থা দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে। পুঁজি ভাঙিয়ে আর ক'দিন চলে বলতে গলে সমস্ত ভারটাই নির্মলের উপর পড়লো এসে। দরকার হলে মাইনের বেশি ভাগটা তো সে দিতোই, এমনকি নিজের সিগারেটের খরচটি পর্যন্ত তুলে দিতে হতো কোনো কোনো মাসে। কী ভেবেছিলেন তিনি তখন? এখনকার নির্মল কণ্ডাক্টর ভাবলো মনে-মনে কেন তিনি ক্রমাগত টালবাহানা করে-করে পিছিয়ে দিচ্ছিলেন, বিয়েটা করলে টুনিকে নি তৎক্ষণাৎ আলাদা হয়ে যাবে সে, আর আলাদা হলে তাঁদের কী হবে? এই কি ছিলো তাঁ মনের কথা? যে-কর্তৃত্ব তিনি এখন চালাচ্ছিলেন নির্মলের উপর, জামাই হলে, মেয়েকে একবার হাতের মুঠোয় পেলে আর কি শেষে শাশুড়িকে ততো মানবে? না কি সব টাকা এমন নিঃশেষে তুলে দেবে তাঁর হাতে? এই কি তখন ভেবেছিলেন টুনির মা ননীবালা। কী কী ভেবেছিলেন? গলির মাথার উপরে অনন্ত আকাশের অজস্র তারায় তাকিয়ে এ-কথা আজ ভাবলো নির্মল।/

গ্রাম থেকে তার কাজের জায়গা বড়ো সহজ দূরে ছিলো না। ট্রেনে গেলে দুই স্টেশন পরে। মাঠ-ঘাট ভেঙে পাগলের মতো সাইকেল চালিয়ে সে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি চালায়। তার স্বাস্থ্য বলেই শীতে গ্রীষ্মে এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম সহ্য হয়, অন্য কেউ হলে হয়তো পারতো না মা'র মৃত্যুর পরে ছেড়ে-যাওয়া বাড়ির তালা-বন্ধ একা-ঘরে সত্যি আর ঢুকতে ইচ্ছে করে না টুনি এলে ঘর-বাড়ি আবার আলোকিত হয়ে উঠতো, নষ্ট হয়ে যেতো না জিনিসপত্রগুলো। ও ই সব ঠিক-ঠাক ক'রে যত্ন করে রেখে দিতো। এখন ওখানকার মেসেই খায় বলে, খেতে আস বাবদ দুপুরকার ছুটিটুকুতে আর সে এখানে আসতে পারে না। সমস্ত দিনের পরে, কাজ সা হলে সন্ধ্যার অন্ধকারে চলে আসে ক্লান্ত দেহে। আর এলেই কি সে টুনিকে দেখতে পায়? ক কর্তব্য আছে। আছে মাস্টারমশায়ের বিছানায় বসে দুটো কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয় ননীবালার দুঃখের ফিরিস্তি শোনা, তারই ফাঁকে দুটি করুণ কাতর দুঃখী চোখের চকিত পরশ

শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে উঠেছিলো নির্মল। তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিলো। একদি রীতিমতো জোর দিলো সে গলায়, 'আমি আর দেরি করতে পারবো না।'

টুনির মা অমনি বললেন, 'তোমার মা মারা গেছেন মাত্র কয়েক মাস, সাক্ষাৎ গর্ভধারিণী একটা বছর তো তোমার অশৌচ পালন করা উচিত?'

'ও-সব আমি মানি না।'

'হিন্দুর ছেলে, একটু-আধটু মানতে হয় বৈকি বাবা।'

উদ্ধত হয়ে জবাব দিলো নির্মল, 'যা মানি না তা মানিই না। আপনি যদি অন্য কারণে বি পেছিয়ে দিতে চান সে-কথা আলাদা, কিন্তু এটা আমি মানবো না।'

'গ্রামের লোকেরা বলবে কী?'

'বলাকে কি আপনি খুব ভয় পান? অনেক কথা তো এখনো বলছে।'

টুনির মা মুখভার করলেন, 'আমরা সাবেকি লোক, ও-সব অশৌচের ব্যাপার না-মে পারি না।'

নির্মল একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'আমার মা'র মৃত্যুর আগেও তো সব ঠিক হয়ে াঁচমাস কেটেছে, তখনো তো আপনার আপত্তি ছিলো। মা'র কত ইচ্ছে কত সাধ অপূরণ থকে গেলো, আমি তো ভাবছি মা'র প্রথম বাৎসরিক কাজে, টুনিরও কাজ থাক কিছু। হয়তো ার্গে গিয়েও তৃপ্তি হবে তাঁর।'

টুনির মা এর কোনো জবাব না-দিয়ে উঠে গেলেন সেখান থেকে। আর কী-যে রাগ হলো র্মলের, বলা যায় না। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলো সে। বেরুবার মুখে, অন্ধকারে মাধবীতলায় পচাপ দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান টুনিকে সে দেখেও দেখলো না, কেবল তার মৃদু গলার ীত চকিত করুণ ডাকটি ভেসে এলো পেছনে, 'শোনো।'

যুদ্ধ লেগেছে তখন। চারদিকে এই কথা, এই প্রসঙ্গ, এই আলোচনা। দিগ্বিদিকে টাকা ড়ানো, চাকরি ছড়ানো, ভয় ছড়ানো। দিকে-দিকে লোক ছুটছে, হাঁটছে, খাটছে, তাঁবু বানাচ্ছে, রোড্রামের কনট্রাক্ট নিয়ে লক্ষপতি হচ্ছে। যাচ্ছে সৈন্য হয়ে, যাচ্ছে ডাক্তার হয়ে, যাচ্ছে সবক হয়ে। জাপানি বোমা পড়লো বলে কলকাতা শহরে। তারপর আর কী! গেলো সব। াগর, গ্রাম, বাণিজ্য, বন্দর সব ছাতু।

হঠাৎ নির্মলও একদিন গিয়ে যুদ্ধের চাকরিতে নাম লিখিয়ে এলো। প্রত্যহের এই প্রতীক্ষার ার থেকে তো অন্তত বাঁচা যাবে। অবিশ্যি সবটাই যে রাগ ছিলো তা নয়, টাকার মোহও মন্দ ছিলো না। তারপর কাউকে না-জানিয়ে একেবারে সব ঠিক ক'রে এসে খবর দিলো টুনির াকে।

আতঙ্কিত হয়ে টুনির মা বললেন, 'সে কী?'

'কী আর।' আত্মপ্রসাদে হাসলো নির্মল। 'আপনাদের ভালোই হলো।'

'ভালো হলো? তুমি গেলে কে দেখবে?'

'টাকা পাঠাবো বেশি করে। টাকারই তো মূল্য।'

প্রিয়নাথবাবু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, 'টাকাই কি বাবা সব?'

'অনেকখানি তো।'

'না, না, কিছুই না।' তিনি হাত চেপে ধরলেন আবেগে, 'তুমি কাছে না-থাকলে আমার কছুই কিছু না।'

'আপনি ব্যাকুল হচ্ছেন কেন? কোনো অসুবিধে হবে না।'

টুনির মা'র মুখে ছায়া পড়েছে, চিন্তার ঘন রেখায় কুঁচকে গেছে কপাল। দ্রুত গলায় বলছেন, 'তবে বিয়ে করে যাও।'

'আর সাতদিনের মধ্যেই আমাকে রওনা হতে হবে কাকিমা। এখন আমার বিয়ে করার সময় কোথায়। আর তাছাড়া যারা যুদ্ধে যায় তাদের জীবনের সঙ্গে কি অন্য জীবন জড়ানো উচিত?'

'নিমু, এ তুমি কী করলে—' প্রায় চোখে জল এসে গেছে ননীবালার। হয়তো এতোদিনের ার্থপরতার কথা ভেবে একটু অনুতাপও হয়েছিলো মনে-মনে, কে জানে। নির্মল কিন্তু খুব খুশি হয়েছিলো এই আঘাতটা দিতে পেরে।

কিছুদিন থেকে মনে-মনে টুনির উপরেও একটা গভীর অভিমান জমা হচ্ছিলো তার। সেও তো কিছু বলতে পারে। জোর দিতে পারে মাকে। কেন এতো মেনে নেয়? কিসের এতো লজ্জা? আসলে নির্মলের দুঃখটা তার কিছুই নয়। নির্মলের কোনো কষ্টই তার কষ্ট নয়।

আজ মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। সে-বেচারার দোষ কী? তার মতো ভীরু শান্ত মেয়ে, অমন প্রচণ্ড মা'র বিরুদ্ধে কী করতে পারে? সে নিজেই বা পারছিলো কই?

ফেরবার সময় দেখা করবার নীরব নির্দিষ্ট জায়গাটিতে এসে চুপ করে দাঁড়াতেই টুনি একেবারে বুকের কাছে এসে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলো। ঠিক এতোখানির জন্য প্রস্তুত ছিলো না নির্মল। এইটুকু থেকে বড়ো হতে দেখলো সে, লজ্জায় মুখ তুলতেই যে লাল হয়ে যায়, দুঃখের সঙ্গে বনিবনাও করে থাকতেই যে অভ্যস্ত, হঠাৎ তার এই আবেগ নির্মলের সারা হৃদয় মথিত করে দিলো।

বাড়ির পিছন দিককার নিরালা পুকুরের ধার, ঝোপঝাড়, হিজলের ডাল আর শ্যাওলার রাজত্ব। বুনো ফুলের মাঝে, বেল কামিনীর মিঠে মিঠে গন্ধ, চারদিকের ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে উদ্বেলিত নির্মল সহসা দুই হাতে তাকে জাপটে নিলো বুকের মধ্যে, ঘন চুলে ভরা মাথাটার উপর মুখ ঘষতে-ঘষতে বললো, 'এই ভালো, এই ভালো। কাছাকাছি থেকে আর আমি পারছিলাম না ছেড়ে থাকতে।'

'না, না, না। তুমি যাবে না। তুমি যাবে না।'

টুনির সেই কান্নাভরা বেদনার গুঞ্জন দিকে-দিকে ভেসে বেড়ালো, নির্মলের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো নিজের আহাম্মক বাগের জন্য। একটা হালভাঙা নৌকোর মতো শিথিল হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টুনির কেঁপে-কেঁপে ওঠা মাথাটায় ক্রমাগত হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তারপর অবিশ্যি অনেক চেষ্টা করেছিলো সে এ থেকে মুক্তি পাবার। কিন্তু পারলো না। যুদ্ধের চাকরিতে একবার নাম লেখালে কি আর তার উচ্ছেদ আছে?

প্রিয়নাথবাবু হাহাকার করে উঠলেন, ননীবাবাও চোখ মুছলেন আঁচলে, নির্মল নিজেও স্থির থাকতে পারলো না, একমাত্র টুনিই চুপ।

যাবার আগের দিন সারা বেলা কাটালো সে তাদের সঙ্গে, ননীবালা মেয়েকে বিশ্রাম দিলেন সেদিন, নিজেই রান্না করলেন নানারকম, ব্যথিত গলায় বললেন, 'মাঝে-মাঝে ছুটি আছে তো?'

খেতে-খেতে নির্মল বললো, 'তা হয়তো আছে।'

'যে-কোনো একটা ছুটিতে এসে বিয়ে করে যেয়ো।'

কোণে পুতুলের মতো নিঃশব্দ নিস্পন্দ টুনির দিকে তাকিয়ে নির্মল বললো, 'এতো ভাবছেন কেন। কত লোক যাচ্ছে, ফিরে আসছে, ছুটি তো হামেশাই পাচ্ছে তারা।'

ননীবালা বললেন, 'তবু তো ভয় করে।'

'ভয় কিছুই নেই। বরং প্রচুর টাকা নিয়ে একদিন যখন ফিরে আসবো, কত ভালো লাগবে আপনাদের।'

ঘরের জানালার কাছে তাকিয়ে-থাকা প্রিয়নাথবাবুর গলা পাওয়া গেলো, 'তাই তো। টাকাই তো সব।'

যাবার সময় টুনির কাছে বিদায় নিলো নির্মল 'তবে যাই?'

টুনি চুপ।

'টুনি!'

সাড়া নেই।

'কথা বলো।'

মানুষটার কি প্রাণ নেই? কাঁধের উপর দুই হাত রেখে চোখে-চোখে তাকালো নির্মল। চারটি চোখের অপলক দৃষ্টি যেন অনন্ত কালের জন্য থেমে রইলো। তারপর কখন মেঘ গলে বৃষ্টি নামলো, বৃষ্টির অবিরল ধারায় নির্মলের নতুন-কেনা শার্টের বুক চুপচুপে হয়ে ভিজে গেলো কখন কে জানে। ঝড়ের দাপটে ব্যাকুল গাছের মতো ছটফট করতে-করতে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো টুনি, 'তুমি যেয়ো না, যেয়ো না।'

আর তারপর?

তারপর আজ এই। এই তো বসে সরু গলিটায়, এই তো বসে-বসে যা নেই, তার জন্যই সমস্ত মনপ্রাণ ব্যাকুল করে ঘুমকে বিদায় দিয়েছে, যা ছিলো তার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে, রাস্তায় আকাশের তলায়।

কিন্তু টুনি! তুমি কি আজ সব ভুলে গেলে? সব? এক কণা স্মৃতিও কি নেই আর তোমার মনের মধ্যে? কিছুই নেই?

রাত হয়েছে। দু-একটা রিকশর টুংটুং, নির্জন বেড়ালের পা টিপটিপ, আর ককুরের ঘেউঘেউ। গোরুটা জাবর কাটতে-কাটতে কখন বসে পড়েছে, গলি জুড়ে ছাগলগুলো শুয়েছে ঘেঁষাঘেঁষি করে, আর নির্মল ভাবছে রাত শেষ হয়ে আবার আলো ফুটবে কখন।

এই কলকাতা শহরে আবার কি কখনো আমি তাকে দেখতে পাবো না? কতটুকু শহর? এর মধ্যে খুঁজে-খুঁজে কি আবার বার করতে পারবো না সেই মুখ? কখনো কি আর দাঁড়াতে পারবো না সেই সুন্দরী সুগন্ধি মেয়েটির মুখোমুখি? চোখে চোখ রেখে একবার জিগ্যেস করতে পারবো না কোনোদিন সে চিনতো কিনা এই হতভাগাকে, যে-হতভাগাকে দেখে আজ তার ঘৃণা নেমেছে চোখে, লজ্জাবোধ হয়েছে সুবেশ ভদ্রলোকটির পাশে বসে একদা চিনতো বলে। যে-হতভাগ্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পাগলের মতো তাকেই খুঁজে বেড়িয়েছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। একটু দাঁড়িয়ে রইলো, তাকিয়ে রইলো, তারপর হাঁটতে লাগলো কী জানি কোনদিকে। হাওয়া দিলো ফুরফুর করে। এই গলিতেও ঈশ্বরের দাক্ষিণ্য। সে আছে। আছে। এই তো মাথার উপর আছে জ্যোৎস্নাধোয়া আকাশ, চোখের উপর তারা, আর নির্মল কণ্ডাক্টরের অখিল মিস্ত্রি লেনের এমন এঁদো পচা মেসের গলিতেও তার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস। তার আশীর্বাদ।

দুই

পরিপূর্ণ হয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে, ঝকঝক করছে কলকাতা শহর। পিচের রাস্তায় গাছের ছায়া। মানসী বাস থেকে নেমে তার ঝুলন্ত খোঁপায় রং-করা আঙুল বুলিয়ে ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। সোমেশ্বর বললো, 'সুন্দর হাওয়া দিয়েছে, না?'

মানসী তেমনিই সামনের চলে-যাওয়া বাসটার দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলো, 'হুঁ।'

'কী করবে? হেঁটেই যাবে, না একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ধরবো?' বড়ো রাস্তা থেকে সামান্যই

দূর মানসীর বাড়ি। হাঁটা কিছুই কঠিন নয়, কিন্তু সে-অভ্যেস তার নেই। গাড়ি এখনো কেনে নি সে, কিন্তু যাদের গাড়ি আছে তারা আছে তার দরজায়। তাছাড়া এখানে-ওখানে যখনই গানের ডাক পড়ে গাড়ি তো তারাই দেয়। কাজেই বাস ট্রাম রিকশ, হাঁটা কোনোটারই আর দরকার হয় না তার।

অন্যমনস্ক মানসী আবার বললো, 'হুঁ।'

সোমেশ্বর অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, 'হুঁ কী? কী দেখছো তুমি অমন করে?'

কী দেখছে? মানসী নিজেও যেন ভাবলো সে-কথাটা। নামবার সময় যে-লোকটা হুড়মুড় করে পিছন-পিছন দু-চোখ দিয়ে ধাওয়া করেছে, মুখোমুখি না-দেখলেও সে-লোকটার অসভ্য দৃষ্টি অনুভব করে রাগে সারা শরীর চিড়বিড়িয়ে উঠেছে তার, তাকে দেখছে নাকি? না কি চলন্ত বাসের ল্যান্ডিং-এর একেবারে প্রান্তে, হাতের মুঠোয় একটুখানি ভর রেখে শরীরের প্রায় সবখানিই বার করে দিয়েছে যে-লোকটা আর একটু হলেই যে-লোকটা পড়ে যেতো তার পায়ের কাছে, একটা ল্যাম্পপোস্টের চকিত আলোয় তার মুখখানা দেখেই সে থমকেছে? বুঝে উঠতে পারলো না ঠিক। দোতলা লেল্যাণ্ড ডেকার, রাজার মতো গর্বিত ভঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ বাঁক ফিরে যত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো তার চোখ থেকে, তত দ্রুত একটা কিছু ভুল দেখতেই বা বাধা কী? তবে কি মানসীর মনের গভীরতম প্রদেশে এখনো কোনো একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বপ্ন ছায়া ফেলে রেখেছে? কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আলগা করে রেখেছে একটুখানি জায়গা? যে-জায়গাটুকু সবুজ ঘাসের আস্তরণে এখনো শ্যামল। নয়তো আজ হঠাৎ চমৎকার পার্টির পরে, চমৎকার গান গেয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে অতিশয় ধনবান ভাবী স্বামীর সঙ্গে এমন নিরালা নির্জন রাতে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে এই ভ্রান্তি হবে কেন চোখের? সোমেশ্বরের কথায় হাসলো একটু, মৃদু গলায় বললো, 'কিছু না।'

'লোকটাকে ধরে চাবকানো উচিত।'

শিহরিত হয়ে মানসী বললো, 'কাকে?'

'কাকে আবার! ঐ লোফারটাকে। কী ভাবে ঝুলে পড়েছিল দেখেছো?'

'চেনা-চেনা লেগেছিলো বোধহয়।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে-ধীরে হাঁটতে লাগলো মানসী।

'তাহলে হেঁটেই যাবে?'

'আহা। এটুকু আবার হাঁটবো না তো গাড়ি চড়বো নাকি?'

'তাই ভালো।' সোমেশ্বর গদ্‌গদ হলো, 'এসময়ে হাঁটতেই ভাল লাগে। আর তোমাদের পাড়াটিও সুন্দর।'

'তা ভালোই।'

'একখণ্ড জমি তো কিনেছি লেকের ধারে, দেখি এ-বছরের মধ্যে তুলে ফেলতে পারি কিনা বাড়িটা।'

'আমাকে ভাড়া দেবেন তখন।'

'তাই তো। সেই ভাড়ার টাকাটা আবার নিজের আঁচলের চাবি দিয়ে নিজের আলমারিতেই তুলতে হবে তোমায়, মন্দ কী!' রসিকতা করে খুব হাসল সোমেশ্বর। আর মানসী ইঙ্গিতটা বুঝে চুপ করে রইলো।

'মানসী', সোমেশ্বরের গলা বেশ গাঢ় হলো এবার, 'আর আপত্তি নাকরে তারিখটা ঠিক করে ফেলো, কেমন?'

মানসী আস্তে বললো, 'বেশ তো।'

'অন্তত লোকজন ডেকে একটা উৎসব তো হয়ে যাক, তারপর না-হয়—'

'তাই তো।'

'তোমার যেন কিছুতে মন নেই। কেন বলো তো? এই তো খানিক আগেও কত মুডে ছিলে।'

'কই, না তো।' সমস্ত চিন্তার জটে একটা ঝাঁকানি দিলো মানসী। বাসের অগুনতি লোকের মধ্যে কে-একটা লোকের মুখে কী ভুল সে দেখেছে তার ঠিক নেই, আর তাই নিয়ে কী সব বাজে চিন্তা। নিজেকেই নিজে চোখ রাঙালো। যার চেহারা ভালো করে মনে নেই তাকে ভেবে কেবল সময়ের অপব্যবহার। শেষ তাকে কবে ভেবেছে মানসী, তাই কি মনে পড়ে আজ? ছেলেবেলাকার এক ভাঙা পুতুলের স্মৃতি। স্মৃতি স্মৃতিই। তাই নিয়ে মানসীর মন কোন পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে পিছু হটতে চায়? পেছনে কী আছে? কেবল গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন কতগুলো যন্ত্রণার ইতিহাস। না না, আর আমি ফিরে তাকাতে চাই না। যা গেছে তা গেছে, যা হয়েছে তা ঠিক হয়েছে। হবার জন্যই যায়।

'মণি।'

বুকটা ধড়াস করলো মানসীর। সোমেশ্বরের আবেগভরা গলা নীরব রাস্তায় ভয় ধরিয়ে দিলো তাকে। পায়ের গতি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন দয়া করে, মা হয়তো ভাবছেন কত কিছু।'

'কিচ্ছু ভাবছেন না।' একেবারে গা ঘেঁষে পাশে-পাশে হাঁটলো সোমেশ্বর, 'তিনি জানেন তাঁর মেয়ে ঠিক জায়গায় ঠিক মানুষটির হাতেই আছে।'

তা ঠিক। সে-কথা মানসীও জানে বৈকি। দেরি করলে চিন্তা করা তো দূরের কথা, সারারাত না-ফিরলেও কি তিনি খুব বেশি বিচলিত হবেন? বরং তাঁর বোকা মেয়ে একটু চালাক হয়েছে ভেবেই আরো নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন পায়ের উপর একটি পাৎলা চাদর টেনে দিয়ে।

তবু সে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো, প্রায় ঝড়ের বেগে। ভারি সোমেশ্বর হয়রান হলো তাতে। মানসী পাৎলা মেয়ে, সারা শরীর তার পুষ্ট কিন্তু এতো পুষ্ট নয় যাকে মেদ বলে, কাজেই দৌড়তেই বা তার কষ্ট কী? কিন্তু সোমেশ্বর তা পারে না। শুধু তো শরীরের ভারই নয়, দৌড়ে, ছুটে, হাঁপিয়ে, ঝাঁপিয়ে তাকে কি কখনো কোনো কাজ করতে হয়েছে আজ পর্যন্ত? কলকাতার বনেদি বড়লোক তারা, বাপ-দাদার সম্পত্তি গিয়ে-গিয়েও যা আছে তাতেও নাতি পর্যন্ত কেটে যাবে সুখে। না-হয় রোলস রয়েসের বদলে আজকাল হিন্দুস্থান গাড়িতেই পর্যবসিত হয়েছে অবস্থা, তবু এই বাগচিরা বাগচিই। এই তো সেদিন বাপ মারা গিয়ে স্বাধীন করে গেলেন তাকে। ভাগ্যের সুলগ্নে সে একমাত্র পুত্র হয়েই জন্মেছিলো, সবই তার, আর তা একা তার পক্ষে যথেষ্ট।

গান-বাজনার উপর ঝোঁক বাগচিদের বংশানুক্রমে। চতুর্থ পুরুষ আগে সোমেশ্বরের প্রপিতামহের বাপ রত্নেশ্বর বাগচির আমলে ভারতবর্ষের সব চেয়ে বিখ্যাত ওস্তাদদের সম্মেলন হতো বাড়িতে। পুজোর সময় আর জন্মাষ্টমীর সময় একপক্ষকাল পর্যন্ত চলতো সেই

উৎসব। হাজার হাজার টাকা জলের মতো বেরিয়ে যেতো ঐ ক'দিনে। রত্নেশ্বর নিজে ছিলেন মস্ত মৃদঙ্গ-বাজিয়ে, বড়ো-বড়ো ধ্রুপদীদের সঙ্গে বাজিয়ে হয়রান করে দিতে পারতেন, রাতের পর রাত বাজিয়ে একফোঁটা ক্লান্ত হতেন না। আর-কোনো নেশা ছিলো না তাঁর, শুধু এই আর তাঁর ছেলে বীরেশ্বর শুনতেন বাঈজির গান, মশগুল হয়ে থাকতেন বাগানবাড়িতে, চুর হয়ে থাকতেন নেশায়, লাশের মতো গৌরবর্ণ মোটা শরীরটা টেনে তুলে খাস-চাকর রামকিঙ্কর তাঁকে নিয়ে আসতো ভোর-রাত্রে বাড়িতে, ডুরে শাড়ি-পরা, ঘোমটা-টানা ছোটো বউ, ফোলা-ফোলা ঘুমভাঙা, কান্না-রাঙা চোখে দরজা খুলে দিতো শোবার ঘরের। তারপর মাথায় ঠাণ্ডা জল দিতো, চন্দন-পাখার বাতাস দিতো, হাত বুলিয়ে দিত পায়ে, বীরেশ্বর আমেজ করে ঘুমুতেন। তারপরে রামেশ্বর। সোমেশ্বরের ঠাকুরদা। ততদিনে জমিদারির তেজও যেমন কমে এসেছে, আধুনিকতার হাওয়াও বইছে তেমনি জোরে। তিনি আমূল পরিবর্তন করে ফেললেন সব। ফরাস-তাকিয়ার বদলে পাতলেন সোফা-সেট, গলায় তুলসীর মালা ফতুয়া গায়ে ম্যানেজার তারিণী সরকারের বদলে এক স্যুট-বুট পরা ছোকরাকে নিয়ে এলেন জমিদারির রাশ টানতে। ছিপছিপে চেহারা, তীক্ষ্ণ নাক, জ্বলজ্বলে চোখ, বিলেতের জল খেয়েছে সাত বছর। ব্যয়-বাহুল্য কমিয়ে, বাগানবাড়ির পাট উঠিয়ে আবার গুছিয়ে নিলেন সব রামেশ্বর। পাঁচ মেয়ের পর এক ছেলে সুরেশ্বরকে বিলিতি স্কুলে পড়ালেন। আর সুরেশ্বরের ছেলে এই সোমেশ্বর। সে তার পিতার চেয়ে আরো বেশি অগ্রসর। কলেজের গণ্ডিও ডিঙিয়েছে সে, ঘুরে এসেছে বিলেত থেকে। দেনার দায়ে তিনটে বাড়ি বিক্রি হলেও, শ্যামবাজারের বসতবাড়িটা সেখানে তেমনি অটুট চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে মাথায় গোল গম্বুজ নিয়ে। গম্বুজের মাথায় এখনো তেমনি আলো জ্বলে, সেই আলো বহুদূর থেকে দেখতে পায় লোকেরা, বলে রাজবাড়ির আলো। মস্ত ফটকের ভেতরে তাকালে প্রথমেই মাঠের মাঝখানকার মোটা লোহার চেনে আবদ্ধ সবুজ লনটা চোখে পড়ে, চারদিকে রং-বেরঙের ফুলের বর্ডার, আর সেই লনের ঠিক মধ্যিখানে, মস্ত সিংহমুখ ফোয়ারা থেকে ছিটকে-ছিটকে জল পড়ে সারাদিন। এপাশে ওপাশে গোল হয়ে ঘুরে গেছে লাল সুরকির রাস্তা, একেবারে একতলা সমান উঁচু বাড়ির শ্বেতপাথরের বারান্দা পায়ের তলায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ধাপে-ধাপে উঠে গেছে প্রশস্ত সিঁড়ি। এতোদিন এই বাড়িতেই বাস করেছে সোমেশ্বর। এই সিঁড়ি দিয়েই নেমে এসে হিন্দুস্থান গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেতে গেছে, গেছে বড়ো-বড়ো হোটেলের নির্দিষ্ট কামরায়, অনেক রাত হয়ে গেছে বাড়ি ফিরতে। তাকে নামিয়ে দিয়েই গাড়িটা গেটের বাঁ-দিক জুড়ে পাশাপাশি চারটে গ্যারেজের একটাতে গিয়ে বিশ্রাম নিয়েছে আবার কালকের রাত জাগবার ধকল সহ্য করবার জন্য। কর্তাদের আমলে এই ঘরগুলোতে ঘোড়া থাকত শোনা যায়, হাতিও নাকি ছিলো দুটো। কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়িতে মোটা লোহার শিকলে বাঁধা থাকত সারাদিন, সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতো। এখন সে-যুগ নেই, সোমেশ্বরের ঠাকুরদার আমল থেকেই মোটর গাড়ির চল হয়েছে। হাতিশালে হাতি আর ঘোড়াশালে ঘোড়া—এ-কথাগুলো এখন স্বপ্নের কথা। সেই ঘরগুলোর চেহারাই কি এরকম ছিলো? এই গ্যারেজের মতো? না কি সেই সব ব্রুহাম-ফিটনের সহিসরাই এই খাকি প্যান্ট আর বুশশার্ট-পরা ড্রাইভারদের মতো নিরলংকার ছিলো।

এই বাড়িটাও অবিশ্যি কিছুদিন থেকে পছন্দ হচ্ছিল না সোমেশ্বরের। বড়ো পুরোনো ধরনের। বাড়ির অধিবাসীদেরও সহ্য হচ্ছিলো না। কিন্তু যদ্দিন সুরেশ্বর বাগচি বেঁচে ছিলেন

াকতেই হয়েছিলো, তাঁর মৃত্যুর পরেও ছিলো কিছুদিন, কিন্তু মানসীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার ারেই ছেড়ে দিলে। পঁচাশি বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমা রইলেন সেখানে ভিটে আগলাতে, আর ইলো তাঁর বিধবা মেয়ে, অর্থাৎ সোমেশ্বরের একমাত্র পিসি তাঁর তেরোটি সন্তান নিয়ে, আর ইলো রাশীকৃত আশ্রিত-আশ্রিতার দল। সোমেশ্বর মাসোহারা দিয়ে চুকিয়ে দেয় তাদের সঙ্গে ব দেনা-পাওনা। নিজের মা মারা গিয়েছিলেন শিশুবয়সে, নিঃসন্তান সৎমা আছেন কাশীতে, ার মাসোহারাও যায় জমিদারি থেকে—আর সে নিজে শ্যামবাজারের পচা রাস্তা আর ুরোনো বাড়ি ছেড়ে এসে উঠেছে কুইনস পার্কের মস্ত এক ফ্ল্যাটে। আছে পাত-পা ছড়িয়ে াধীনভাবে। বয়স ভারি হয়ে এসেছে, চুলের রং তামাটে হয়েছে, বাঙালির পক্ষে প্রায় অস্তমিত যৌবন। এতোদিন বিয়ে করেনি কেন তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। কেউ বলে সেটা বিলেতে থাকতেই সেরে এসেছিলো, কেউ বলে কৌমার্যই তার চিরব্রত। আবার কেউ-কেউ লে বুড়ো বয়সে সুরেশ্বর বাগচি ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নাকি নিজেই বিয়ে করে াসেছিলেন, সেই থেকেই এই ভীষ্মত্বপ্রাপ্তি। তা যা-ই হোক, এখন সে মানসীর জন্য বুক বিছিয়ে দিতে পারে রাস্তায়, জমিদারি লাটে উঠিয়ে সন্ন্যাসী হতে পারে। এই কোকিলের মতো লার মেয়েটির জন্য সে না-করতে পারে কী?

গান! গানই পাগল করেছে তাকে। গানের জন্য আলাপ করেছে খুঁজে-খুঁজে, গানের জন্যই াই মেয়েটির আকর্ষণ আজ পর্যন্ত ছাড়াতে পারছে না। তা নৈলে এই মেয়ের বিমুখতাই কি স কম সহ্য করেছে। এই তো, এই যে দৌড়ে-দৌড়ে হাঁটছে সে, তার পেছনে ছুটতে কি কম ষ্ট হচ্ছে তার? দুধের মতো মসৃণ গায়ের রঙে ঝলকে-ঝলকে রক্ত দেখা যাচ্ছে, দুই ভাঁজ ুৎনির ফাঁকে অকথ্য ঘাম।

বাড়ির দরজায় কলিং-বেলে হাত রেখে হাঁফ ছাড়লো মানসী দত্তমল্লিক। যেন ঘাম দিয়ে ্বর নামলো তার। মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'আপনার কত কষ্ট হলো হাঁটতে।'

ঘাড়ে গলায় রুমাল ঘষতে-ঘষতে সোমেশ্বর সংশোধন করলো, 'হাঁটতে নয়, দৌড়তে।'

'আমরা সব নিতান্ত গরিব ঘরের মানুষ,' গলায় বেশ দরদ দিলো মানসী, 'হাঁটা-চলা সবই ্যস্ত-ব্যস্ত, আপনার তো কষ্ট হবেই।'

'তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছো?'

'না। ছি।'

'তবে এ-সব বাজে কথাগুলো বলো কেন?'

'ঠিক বলেই বলি। রাগ করলেন?'

'রাগ করে আর থাকতে পারি কই?'

তা সত্যি। রাগ করে সে থাকতে পারে না। তা যদি হতো তবে কি আজ এই মেয়েকে াগে আনতে পারতো? মানসী স্বভাবতই শান্ত নম্র। মধ্যে-মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ কেন যে এমন কটা নিষ্ঠুরতা বেরিয়ে আসে, বুঝতে পারে না সোমেশ্বর।

তা হোক, তবু মেয়েটা ভালো। সচ্চরিত্র।

মানসী আবার কলিং-বেলে চাপ দিল জোরে, বললো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মা আমার ন্য মোটেও ভাবছিলেন না।'

'কী করে জানলে?'

'গভীর ঘুম না হলে কি দু'বার বেল বাজাতে হয়?'

'তাই তো। তবু তো তুমি কত দৌড়ঝাঁপ করলে।'

'আমার ভুল হয়েছে।'

'তোমার বাড়িটি বেশ।'

'হ্যাঁ, লেকটা একেবারে কাছে কিনা।'

'সুন্দর লন্ আছে একটি।'

'সরকারি লন্, কী-ই বা লাভ তাতে।'

'আহা। লাভ-লোকসানের কথা কী! একটা আউটলুক আছে না? কত ফ্ল্যাট ভেতরে গেলে বেশ, কিন্তু এনট্রেন্স্‌টা একেবারে রেচেড। অতি হতচ্ছাড়া। আমি এ-বিষয়ে খুব পার্টিকুলার. বাড়ি পছন্দ করবার আগে তার বাইরের শোভাটা দেখে নিই।'

'ভালোই করেন।'

'বাই দি ওয়ে, মণি, একটা কথা—

'বলুন,' মানসীর হাত বেলের উপর আরো জোরে চাপ দিলো।

'সামনের মঙ্গলবার, দ্যাট মীন্‌স্ টোয়েনটিয়েথ্ মার্চ, আমাদের এনগেজমেন্টের উৎসবট আমরা সেরে ফেলি না।'

'সামনের মঙ্গলবার!'

'তুমি তো বলেইছিলে আর দেরি করবে না, সামনের মঙ্গলবার তোমার জন্মদিনও আছে আরো একটু লার্জ স্কেলে পার্টিটা যদি দাও তাহলে—কিছু মনে কোরো না, খরচ কিন্তু আমি দেবো।'

মানসী চুপ করে রইল। সে জানতো না মঙ্গলবার তার জন্মদিন, জানতো না মা কখ নিমন্ত্রণ করেছেন এঁকে। ভাবতে লাগলো সত্যি-সত্যি তার জন্মদিন কবে। সত্যিই তার বয় কত। এ-সব খবর মা নিজেই কি জানেন? যখন ছোটো ছিলো বয়সের কথা ভাবে নি, কেউ জিগ্যেস করলে মা বলতেন 'এই ছ' সাত', অতএব সে নিজেও তাই বলতো। সেই বলাট বহুদিন চলবার পরে একদিন মা'র গলা জড়িয়ে ধরে রাত্রিবেলা জিগ্যেস করলো, 'মা, আমা কি এখনো ছ' সাত বছর বয়স? তুমি কবে বলেছিলে, তার পরে তো কতদিন হয়ে গেলে আমি এবার বড়ো হবো। পুঁটির কেমন তরতর করে দশ হয়ে গেলো, আমি বুঝি সে ছ'সাতেই পড়ে থাকবো?'

হাত দিয়ে গলার বাঁধন ছাড়িয়ে দিলেন মা, বললেন, 'মেয়ের খালি পাকা কথা। পুঁটি আ তুই বুঝি সমান?'

'হ্যাঁ তো। সমান তো। আগে তো সমান ছিলাম।'

'নে চুপ কর। বকবক করিস নি মেলা।'

টুনি দুঃখিত মনে চুপ করেছে কিন্তু জিগ্যেস করলে ছ' সাতও বলে নি আর, কিছুই ব নি।

তারপর ন-দশ হয়েও অনেকদিন ছিলো, আর তার পরে ষোলো-সতেরোর গণ্ডি কাটাতে তার প্রায় গলদঘর্ম হতে হলো। আর মিথ্যে কথা বলতে-বলতে মা নিজেই ভুলে গেলে মেয়ের জন্মতারিখের কথা। হঠাৎ একটা জন্মদিনের খবর শুনে তাই অবাক না-হয়ে পারলে না সে। আর তাকে চুপ করে থাকতে দেখে, সম্মতি ভেবে খুশি হলো সোমেশ্বর। খুব ঘন হ

াছে দাঁড়িয়ে, প্রায় কানে-কানে বলার মতো আস্তে করে বললো, 'আর কোনো ওজর না, কেমন?'

দরজা খুলে দিলেন মিসেস দত্তমল্লিক। আর খুলেই সামনে মেয়েকে আর সোমেশ্বরকে অত ান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সদ্য ঘুমভাঙা স্তিমিত চোখ সতেজ হয়ে উঠলো। গুরুজনসুলভ লজ্জায় তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন। আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই মাকে অনেক বারের মতো আরো একবার নতুন করে দেখতে পেলো মানসী।

কনুই পর্যন্ত ঢাকা ধবধবে সাদা অতিশয় দামি পাৎলা কাপড়ের ব্লাউজ পরেছেন তিনি, পরনে দামি সরু কালোপাড় তাঁতের ধুতি, পায়ে সাদা কাপড়ের অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো স্যান্ডেল। দেখাচ্ছে বেশ। চুলের ডৌলটি মা'র বরাবরই সুন্দর, তাকে তিনি আরো সুন্দর ক'রে আঁচড়েছেন। কে বলবে যে এই মা একদিন মোটা খাপি ছেঁড়া শাড়িতে আধো শরীর ঢেকে পুকুরঘাটে ব'সে বাসন মেজেছেন, জল ঘেঁটে-ঘেঁটে হাজা হয়েছে হাতে। মনে-মনে হাসলো মানসী। আমাকে দেখলেই কি আজ কারো মনে পড়বে সে-কথা? যে-লোকটা বাস থেকে প্রায় ঝুলে পড়েছিলো রড ধ'রে সে-ই কি ভাবতে পারবে কিছু?

উপরে উঠে এসে ঘরে ঢুকে ড্রয়িংরুমের আলো জ্বাললো সে। ঝলমল ক'রে উঠলো দক্ষিণখোলা, মোজেক করা, মানসী দত্তমল্লিকের সুরুচিসম্পন্ন বসবার ঘর।

মানসী দত্তমল্লিক। কলকাতার বিশিষ্ট অধিবাসী। গানের জগতের মধ্যমণি। গুণী-সম্প্রদায়ের একজন। আবার মনে-মনে হাসলো মানসী। মা বললেন, 'তোমাদের পার্টি বেশ জমেছিলো তো?'

জমবে না? পার্টিটা বস্তুত কাকে নিয়ে ছিলো তা বোধহয় আপনি জানেনই না।' সোমেশ্বর হাসিতে সারা শরীর দোলালো।

'কাকে নিয়ে?' মিসেস দত্তমল্লিকও কথাগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে খুশির গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলেন।

'আপনার প্রতিভাশালিনী মেয়েকে নিয়ে। ওকেই আজকের সম্মিলনীতে আমরা প্রধান অতিথির পদ দিলাম। নেক্সট সভায় ঠিক হয়েছে একটা মানপত্র দেওয়া হবে। তা আমি বলছিলাম কী—'

'বলো—' মা'র গলা গদ্‌গদ।

মানসী ভেতরে ঢুকে গেলো পর্দা ঠেলে।

প্রথমে নিজের ঘরে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। মাঝারি সাইজের সুন্দর খোলামেলা ঘরটি। দক্ষিণদিকে তাকালে সোজা লেকের আকুল জলরাশি। আকুল? বিশেষণটা ভুল হলো। লেকের জল কোনো সময়েই আকুল নয়, ঘুমন্ত। প্রচুর আলস্যে আচ্ছন্ন সেই জল। পড়ে আছে, শুয়ে আছে, আকণ্ঠ-খাওয়া ময়ালের মতো নিষ্প্রভ, নিস্তেজ। লেকের দিকে তাকালেই মানসীর আর একটি মেয়েকে মনে পড়ে যায়, যে-মেয়েটির একটিমাত্র ভঙ্গিই শুধু তার স্মৃতিতে লেগে রয়েছে, যে-ভঙ্গি তার কান্নার। কান্নার পাথার, চোখের জলের বন্যা। সেই কান্না কেউ দেখে নি, শুধু মানসী দেখেছে। মানসী তাকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কাঁদতে দেখেছে, হাসবার সময় কাঁদতে দেখেছে, কথা বলার ভঙ্গিতে কাঁদতে দেখেছে, দেখেছে শুয়ে কাঁদতে, বসে কাঁদতে, বিনিদ্র রাতে বালিশ ভিজিয়ে কাঁদতে। কত যে গভীর সেই কান্না, কত নিঃশব্দ, কত বেদনাময়, তা-ও মানসী জানে। কান্নার দেয়াল-ঘেরা একটি বাড়িতে থাকতো সে, সেখানে আকাশ ছিলো না বাতাস ছিলো না, কিন্তু রাত্রিবেলা তারারা ছিলো। তাদের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে, ঠাণ্ডা

সবুজ নরম একটুকরো আলোর ইশারা পেয়েছে সে, ঐ একটি স্তম্ভিত মুহূর্ত সারাদিনের কান্নার পরে। আর সব সমুদ্রের নোনা স্বাদ।

মানসী শিথিল হাতে ভেজিয়ে দিলো দরজাটা, তারপর দামি শাড়িটা লুটিয়ে দিলো ছোটো চৌকো কার্পেটে, আলনা থেকে একটা সাদা শাড়ি টেনে নিয়ে গায়ে জড়ালো। কিন্তু ব্লাউজটাও খোলা দরকার। কী জবরজং। অতএব ব্লাউজটাও সে ছাড়লো, তারপর বাথরুমে এলো। কেমন যেন লাগছে, স্নান না-করলে আর ঠাণ্ডা হবে না মাথা।

সময়ের হিসেব ছিলো না।

দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কা দিলেন মিসেস দত্তমল্লিক। 'চান করছিস নাকি ? এই অসময়ে এতো রাত্রে কল খুলে এ কি স্নানের ঘটা?'

একটু থমকালো মানসী। যেন কতদূর থেকে আবার ফিরে এলো সে।

মিসেস দত্তমল্লিকের বিরক্ত কণ্ঠস্বর আবার ঝংকৃত হলো, 'অদ্ভুত মেয়ে। ওদিকে সোমেশ্বর যে বসে আছে সে-খেয়ালও কি নেই? না-হয় ও চলে যাবার পরেই চান করতিস। আয়, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয়। ও যাবে। তোকে ডাকছে।'

ঝরনার ঝরোঝরো শব্দে অনেকক্ষণ মানসী ডুবে যেতে দিল মা'র সেই ব্যস্ত উদ্বেলিত গলার আওয়াজকে। তারপর একসময়ে ধীর গলায় জবাব দিলো, 'কিছু বলছ?'

'হ্যাঁ বলছি!' মিসেস দত্তমল্লিক রুষ্ট না-হয়ে পারলেন না, 'কানে শুনিস না নাকি? এতোক্ষণে খেয়াল হলো?'

ভেতর থেকে টুনির শিথিল গলা তেমনি নিরুৎসুক হয়ে দরজার বাইরে এসে পৌঁছলো 'কেন?'

'কেন মানে? সোমেশ্বর বসে রয়েছে আর তুই এতোক্ষণ ধরে স্নানই করছিস?'

'তুমি যাও না—'

'সে পরামর্শ তোমাকে দিতে হবে না। দয়া করে একবার বেরিয়ে এস। ওর গাড়ি এসে গেছে, ও এবার যাবে।'

'যাক না। আমি কী করব?'

মিসেস দত্তমল্লিক মেয়ের কথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে জ্বলে গিয়ে বললেন, 'কী আবার করবি। লোকটা যাবে, বিদায় দিবি। যেমন পাঁচজন ভদ্রলোক ভদ্রলোককে দিয়ে থাকে যাবার সময়ে।'

'তুমিই তো আছো। আমার একটু দেরি হবে।'

মিসেস দত্তমল্লিকের চাপা-চাপা ক্রুদ্ধ আওয়াজ সহসা প্রখর হয়ে উঠলো, 'যেমন জঙ্গল থেকে এসেছিস তেমনি জঙ্গুলে স্বভাব। ভদ্রতা অভদ্রতার জানিস কিছু? আজন্মের ছোটোলোকি অভ্যেস যাবে কোথায়?'

অনেকদিন আগের আর-একজন ভদ্রমহিলাকে ঝাপসা-ঝাপসা দেখতে পেলো মানসী এই গলার শব্দে। আর-কিছু না-ব'লে বাথটব থেকে নেমে গা মুছে, জামার উপর শাড়ি জড়িয়ে বাইরে এলো।

চুল থেকে জল পড়ছে টুপটুপ। এখনো মানসীর কত চুল! নানা রকম আধুনিক খোঁপা করবার সুবিধের জন্য লম্বায় অনেকটা কেটে নিয়েছে সে, তবু আছে। ঘন, কালো, ঢেউ-ঢেউ আয়নায় দাঁড়িয়ে ভেজা চুলটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে আবার মুছলো। মুখ মুছলো, হাতের পাতা মুছলো—তারপর চিরুনিটা ছোঁয়ালো কি ছোঁয়ালো না, বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বিদায় দিতে শুধুমাত্র দোতলার ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত নয়, একতলার দরজা পর্যন্তই আসতে হলো তাকে মিসেস দত্তমল্লিকের ইঙ্গিতে। সোমেশ্বর খুশি হয়ে বললো, 'কাণ্ড দ্যাখো, আবার একতলায় নেমে এলে?'

'তাতে কী হয়েছে?' আবছা হাসলো মানসী।

সোমেশ্বর গাড়ির পা-দানিতে পা দিয়ে ঘাড় ফেরালো, 'তাহলে ঐ কথাই রইলো?'

'কী ?'

'মঙ্গলবারই ঠিক হলো সব তোমার মা'র সঙ্গে। আমি নিমন্ত্রিতদের একটা লিস্ট নিয়ে আসব'খন।'

'মঙ্গলবার! পরশু?'

'তোমার মা! সত্যি! ওয়ানডারফুল! এরকম শিক্ষিত একজন মহিলা আমি দেখি নি। তিনি আমাকে প্রকৃতই ভালোবাসেন।'

মানসী দীর্ঘশ্বাস নিলো।

'তবে চলি!'

'আসুন।'

'কাল সকালে আসবো আবার, কেমন?'

'আসবেন।'

'তোমার রিহার্সেল নেই তো কোনো?'

'না।'

পা-দানি থেকে পা নামিয়ে একটু এগিয়ে এসে মানসীর হাতটা একটু ছুঁলো সোমেশ্বর, মৃদু হেসে বললো, 'রাত কাটাবার খোরাকটুকু নিয়ে যাই, যা কড়া তুমি, ভয়ই করে আমার।' মানসী ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠলো, কিন্তু জ্যোৎস্না রাতের মতোই একটা হাসি ফুটে উঠলো মুখে।

কিন্তু কেন? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভাবলো সে। এর চেয়ে ভালো, সুন্দর, সুখের আর কী জীবন আমি আশা করতে পারি? সমাজে সোমেশ্বরের পদমর্যাদা প্রায় শীর্ষস্থানে, তার স্বামিত্ব যে কোনো মেয়ের কাম্য। তবে আমার আটকাচ্ছে কোথায়? কেন আমি দিনের পর দিন তারিখের পর তারিখ পিছোচ্ছি—আর নিজেও গুটিয়ে যাচ্ছি শামুকের মতো? এর কারণটা কী?

দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস দত্তমল্লিক, বললেন, 'চলে গেলো?'

মানসী মা'র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ।'

মেয়ে ভেতরে ঢুকলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। এতোক্ষণে আবার খোলস ছেড়ে আসল মানুষটি বেরুলো তাঁর দেহ থেকে। পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, ভালোয়-ভালোয় এখন দু-হাত এক করতে পারলে আমি বাঁচি।' গা থেকে আঁচলটা ফেলে ব্লাউজটা ছেড়ে নিলেন, ভেতরকার সাদা লেসের ছোটোহাত আঁটো বডিসটাও খুলে ফেললেন চলতে-চলতে। মিসেস দত্তমল্লিকের বৃদ্ধ বুকের দিকে এক পলক তাকিয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল মানসী। পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে মিসেস দত্তমল্লিকও বসলেন মুখোমুখি, কোমরের পেটিকোটের দড়িটা খুলে ঢিলে করে হাওয়া খেতে-খেতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে লাগলেন পার্টির কথা।

ব্রাহ্মণদের দ্বিজ বলে না? মা'র প্রশ্নের হুঁ-হাঁ জবাব দিতে দিতে ভাবলো মানসী। কেন বলে? তাদের কি দু'বার জন্ম হয়? না তো। কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তো তারা ব্রাহ্মণ হয় না, হয় পৈতে নেবার পরে। পৈতে নেবার পরে তাদের আরেক জন্ম হয়, তাই তারা দ্বিজ এতোকাল পরে এই ব্যাখ্যাটা বিশদভাবে মনের মধ্যে মানসী আলোচনা করলো, আর দ্বিজ বলে সাপেদের। তারা খোলস ছাড়ে। সেটা তাদের আরেক জন্ম। আর দ্বিজ আমার মা।

'সবই ঠিক হয়ে গেলো, কে জানতো ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে আমরা এখানে এসে দাঁড়াবো।

মা'র বিগলিত কণ্ঠস্বর মানসীর চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'যাই শুই গে।'

'কী-কী গান করলি আজ?'

মানসী আড়মোড়া ভাঙলো। 'ঐ তো সব আজেবাজে—'

'কেন? আজেবাজে কেন? "প্রিয়তম"-এর গানটা গাস নি?'

মা'র চোখে চোখ রেখে, মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে মানসী বললো, 'না।'

'ও মা, তবে কী গেয়েছিস। ঐটাই তো সকলে শুনতে চায়। "বুকে এসো, নয়নে নয়ন রেখে?" সেটা?'

'না।'

'কেন?'

'এমনি।'

'এমনি আবার কী! একশোবার বলে দিলাম—'

রাগে গজগজ করলেন মিসেস দত্তমল্লিক, তারপর কোমরের আলগা কাপড় ধরতে-ধরতে চলে এলেন শোবার ঘরে, একেবারে নিজের বিছানায়। গা ঢেলে দিয়ে বললেন, 'কে কী বললো?'

পাশাপাশি ঘর। মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে দু'জন দু'জনকে দেখতে পায়, দু'জন দু'জনের সঙ্গে কথা বলতে পারে। আগে মানসী মা'র সঙ্গে একঘরেই শুতো, এ-ঘরটা অমনি পড়ে থাকতো, কাপড়ের আলমারি আর ড্রেসিং টেবিল বুকে নিয়ে। কিছুদিন যাবৎ একটা ছোট্টো খাট পেতে সে এ ঘরে শুচ্ছে। খুট ক'রে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে মা'র চোখের আড়াল হ'য়ে বললো, 'কী আর—'

'এই যে তুই আধখানা-আধখানা কথা বলিস না, আমার ভীষণ রাগ ধরে।'

'কী বলবো।'

'কে কে এসেছিলো, কী কী বললো, গান ভালো হয়েছিল কিনা, সব বলবি তো?'

'তুমি গেলে না কেন? তোমার তো নেমন্তন্ন ছিলো।'

'তোদের সব সমানবয়সীদের মধ্যে আমি কী করে যাবো?'

'তুমি তো যাও।'

'গেলে তো আবার তুই-ই বিরক্ত হোস।'

'না তো।'

'না তো আবার কী! আমি আর বুঝি না কিছু?'

চাঁদের আলোতে ঘর অন্ধকার হলো না, হলেই ভালো ছিলো। আজ মানসী অন্ধকারকেই র্থনা করছে মনে-মনে। হঠাৎ জানালা দুটো বন্ধ করে দিলো, তারপর বিছানায় ডুবে গিয়ে ', 'বড্ডো ঘুম পেয়েছে, মা।'

মিসেস দত্তমল্লিক সন্ধ্যা থেকে লম্বা ঘুম দিয়ে জেগে উঠেছেন, তাঁর ঘুম পাবার কথা নয়, কী করেন, মেয়ের কাঁধে আজ আবার ভূত চেপেছে, আবার আগের মতো স্তব্ধ ভাব রছে সে, বেশি না ঘাঁটিয়ে চুপ করেই রইলেন।

কিন্তু বেশ তো ছিলো যাবার সময়ে, কী হলো হঠাৎ? কতদিন ধরেই তো বেশ আছে, কত র্তি, আনন্দ, বেড়ানো, খেলানো, নিজেই যেচে সোমেশ্বরের সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছে, বার ঢং ধরলো কেন?

'আচ্ছা মা,—' মানসী ও-ঘর থেকে বিছানায় শুয়েই বললো, 'মঙ্গলবার আমার জন্মদিন কেন?'

একটু চুপ করে থেকে মিসেস দত্তমল্লিক বললেন, 'জন্মদিন, তা-ই।'

'আমার তো কখনো জন্মদিন হয় না।'

'হয় না বলে যে কখনো হবে না তার কী মানে।'

'তাছাড়া আমার জন্মের তারিখও বোধহয় তোমার মনে নেই।'

'কেন থাকবে না। এই রকম শীত-গ্রীষ্মের প্রথম দিকেই তুই জন্মেছিলি।'

'এই মার্চ মাসেই?'

'তা হবে।'

'ঠিক কুড়ি তারিখে?'

'ঐ রকমই—'

'কোন সনে?'

'সন-ফন অত জানিনে।'

'তবে কেন করছো?'

'থাম তুই।'

'কতগুলো লোককে ডেকে, একটা মিথ্যে জন্মদিনের ত অনেকগুলো উপহার ওয়াই কি তাহ'লে তোমার উদ্দেশ্য?'

খুব কঠিন কথা। আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো মিসেস দত্তমল্লিকের। মেয়ে তাঁর যত নামই ক, বয়েস তার যতই বাড়ুক, ঠিক আগের মতোই শান্ত আছে সে, ভীরু নেই কিন্তু শিথিল, ্যমনস্ক, মা যা করেন তাতে কথা কাটে না, প্রতিবাদ করে না। সে-অভ্যেস তার নেই। কের এই প্রতিকূলতার ছোট্টো একটু কণাই বৃহৎ বলে মনে হলো তাঁর। ঝাঁঝিয়ে উঠে কী তে গিয়েও গলা তাঁর থেমে গেলো, এতো বড়ো, এতো বিখ্যাত মেয়েকে আর আগের দাবিয়ে রাখতে তিনি যেন সাহস পেলেন না সহসা। বললেন, 'এ-সব বলে তুমি আমাকে করতে চাইছো, না? দশমাস পেটে ধরে জন্ম দিয়েছি কিনা, তারই এই শাস্তি।'

'জানি তুমি রাগ করবে বললে, কিন্তু এ-সব ছল-চাতুরী আমার ভালো লাগে না।'

'ছল-চাতুরী মানে? তুই বলতে চাইছিস কী?' এবার রাগ ফুটলো গলায়, 'নিজের মেয়ের করবো সেটা আবার ছল-চাতুরী কী রকম?'

'আমার বয়স কত?'

'আমি তোর সঙ্গে তক্ক করতে চাই না। মেঘে-মেঘে বেলা তোমার কম কাটে নি।'

'সেটাই তো আমি জানতে চাই।'

'যদি বলি ছাব্বিশ, বিশ্বাস করবি?'

'কেন করবো না, মা? তুমি লুকোলেও আমার অন্তর তো সবই জানে। কিন্তু তুমি বল সেদিন এ-কথা?'

'কী?'

'আমার ছাব্বিশ বছর বয়স?'

'মেয়েদের বয়েস কেউ জিগ্যেস করে না।'

এবারে মানসী চুপ করলো, কিন্তু একটু পরে বললো, 'এই মার্চ মাসেই বাবা মা গিয়েছিলেন মনে আছে তোমার?'

মিসেস দত্তমল্লিকের বিছানা থেকে কোনো সাড়া এলো না এবার। মানসী একটু অপেক্ষ ক'রে বললো, 'বাবার বাৎসরিক কাজটা এবার খুব ভালো ক'রে করবো।

মিসেস দত্তমল্লিক চুপ। তাঁর আরো কথা মনে পড়ে গেছে, মনে পড়েছে প্রিয়নাথবাবু মৃত্যুর এক বছর আগে ঠিক এমন দিনেই নির্মলও বিদায় নিয়েছিলো তাঁদের কাছ থেকে। আ সেই বিদায়ই চির বিদায়। ভাগ্যিস! সেই একটা কারখানার ছোঁড়া, তাকে অবলম্বন ক'রে বেঁ থাকতে গেলেই হয়েছিলো আর কি। নিজেকে তারিফ করলেন। বিয়েটা বারে-বারেই ঠেকি রেখেছিলাম ব'লে তাই না আজ এখানে এসে পৌঁছোতে পারলাম। কে জানে বোকা মেয়েট আবার সে-কথা মনে পড়ে যাচ্ছে না তো?

যাচ্ছে না? যা একদিন এই মানসী দত্তমল্লিকের সারা বুকের পাঁজর খসিয়ে দিয়েছিলো, দুমে মুচড়ে একাকার ক'রে দিয়েছিলো দিন আর রাত্রির ব্যবধান, কালো করে দিয়েছিলো সূর্যে আলো, তা কি এতো সহজেই ভুলে যাবার? মুছে যাবার? স্মরণশক্তি নামক পদার্থটা কি ত এতোই তরল? না কি এ শুধু স্লেট-পেন্সিলের একটি দাগ মাত্র?

দক্ষিণের হাওয়াভরা মস্ত ঘরের মস্ত জানালায় এক আকাশভরা তারা আর মুঠো-মু নরম চাঁদের আলোয় তাকিয়ে ছাব্বিশ বছরের মানসীর কেবল আজ আঠারো বছরের টুনি মনে পড়ে যাচ্ছে বারে-বারে। যে টুনি একখানা দরমার বেড়াঘেরা টিনের ঘরে শেয়াল-ডাক রাতে মলিন শয্যায় শুয়ে একজন মানুষকে ভাবতে-ভাবতে ঘুমের গভীরে তলিয়ে যেতো, ঘু ডাকা দুপুরের অসহ্য গরমে ঘামতে-ঘামতে রুমালে ফুল তুলতো, সন্ধ্যায় পাখির ডাক শে হ'তে-না-হতেই, বাঞ্ছিত মানুষটির আশায় উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকতো পথের দিকে।

সকাল থেকে তো শুধু কাজ আর কাজ। দশটার সময় আছে বাবাকে মাথা ধোয়া খাবার এনে দেওয়া, বাতাস করা, মালিশ করা, বিছানা ঠিক করা—করুণ চোখে তাকি থাকতেন তিনি মেয়ের মুখের দিকে, আর শুধু সেই তাকিয়ে থাকা দিয়েই যে কত ক বলতেন, কত বেদনা ঝরাতেন তা জানতো টুনি। তাই চোখ নামিয়ে নিতো সে, চোখে চো পড়লে যদি তার কান্না দেখতে পান তিনি। আর তারপর দুপুরে— কানা-উঁচু বড়ো থাল ভাত বেড়ে নিয়ে মা আর মেয়ের খেতে বসা, কখনো পুঁইয়ের চচ্চড়ি, কখনো কলমি-শাকে

ঝাল, কখনো-সখনো ন্যাটামাছ, পুঁটিমাছ। মাছের অভাবে মা'র কষ্ট হতো, টুনি কিন্তু নির্বিকার। সুন্দর হয়েছে খেঁসারির ঘন ডাল, সর্ষেবাটার পুঁই কিংবা লঙ্কাবাটা দিয়ে কলমিলতার ঝোল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে পারলেই হ'লো, তারপর তো দুপুর আছে। সকালের পর যে-দুপুর, আর বিকেলের পর যে-সন্ধ্যা—এটাই তো জীবনের সব চেয়ে বড়ো কথা, বড়ো পাওনা। সেখানে খাওয়া পরা নিয়ে খুঁতখুঁত করার কতটুকু মূল্য? কিন্তু টুনির সেই ভাবা আর তার মা'র ভাবা, দুটো তো এক ছিলো না। পৃথিবীর আর কে-ই বা ভেবেছে সে-কথা? তার আনন্দ যে কী গভীর তা কি আর-কেউ জেনেছে? খেয়ে উঠে মা মাদুর বিছিয়ে, বালিশে চুল মেলে দিয়ে শুতেন। তাঁর হাতের কাছে পাখাটি রেখে একটি মস্ত পান সেজে দিয়ে, ঘরের দরজাটি ভেজিয়ে এসে পুকুরঘাটে দাঁড়াতো টুনি। খেজুর গাছের গোল-গাল গুঁড়ি পাতা, ধাপে-ধাপে সিঁড়ি, জামরুল আর হিজলের ছায়ায় আচ্ছন্ন। তাকিয়ে থাকতে-থাকতে তার নিবিষ্টতা চমকে দিয়ে একটি ঢেউ উঠতো জলে। টুপ করে একটি ছোট্টো ঢিল ডুব দিতো তার তলায়, তারপর সব অন্ধকার।

দুটি উত্তপ্ত হাতের পাতা থেকে চোখ ছাড়িয়ে নিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াতো। বুকের ভেতরটা এতো ধকধক করতো যেন শাড়ির উপর থেকেও তার ওঠাপড়া চোখে পড়ে যাবে।

'কে?'

কে আবার। রোদ্দুরে ঝলসানো অপরূপ সুন্দর একখানা হাসিমুখ। চোখের ভারি-হয়ে আসা পাতাদুটি না-তুলেই তো সে-কথা টুনি বুঝতে পেরেছে। দেখতে পেয়েছে তার ঘামে ভেজা শার্ট, খোলা-বোতাম উন্মুক্ত বুকের তরুণ লাবণ্য।

নির্মল রুমার বের ক'রে হাওয়া খেতে-খেতে বলেছে, 'জল। শিগগির একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দাও।'

'ঈশ্। এই রোদ্দুরে!' টুনি ছুটে গিয়ে মস্ত একগ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে এসেছে; নিয়ে এসেছে ময়লা ছেঁড়া উনুনে হাওয়া দেবার ঝুলি-মলিন তালপাখা। কিন্তু তার দরকার কী? ঝিরিঝিরি হাওয়া দিয়েছে জামরুল পাতা থেকে, হাওয়ার ঝাপটা ঝাঁট দিয়ে নিয়ে গেছে পুকুর-পাড়ের সব আবর্জনা, জল তিরতির করে কেঁপেছে শিহরিত আবেগে, তারপর মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে-না-তাকাতেই শেষ, পলক ফেলতে-না-ফেলতেই বিদায়।

'এবার যাই?'

'এখুনি?'

কবজির ঘড়িতে চোখ রেখেছে নির্মল।—'কাঁধের উপর দুটো পাখা দিয়ে দিলে ভগবানের এমন কী ক্ষতি ছিলো বলো তো?'

'তার চেয়ে খাবার ছুটিটা আর-একটু বেশি ক'রে নিলে ভালো হয় না?'

'তার চেয়ে চাকরি না-করে মাইনে পেলে আরো ভালো হয় না?'

'ঠাট্টা কী? কী তাত রোদ্দুরের! এর মধ্যে যাওয়া যায়?'

জ্বলন্ত পৃথিবীর চারদিকে তাকিয়ে টুনির নিজের শরীর গরম হয়ে উঠতো, নিজেকে সে কল্পনা করতো ছায়াহীন খেতের উপর দিয়ে, মাথার উপর মধ্যাহ্নসূর্যের আগুনের তলায় সাইকেল চালাচ্ছে, প্রায় কান্না পেয়ে যেতো।—'এই রোদে আর তুমি এসো না।'

'তাই তো ভাবছি।' নির্মলের চোখে-মুখে বিজ্ঞতার ঘন রেখা।

'কী ভাবছো?'

'কথাটা ব'লেই ফেলি কাকিমাকে।'

'কী কথা?' উৎসুক চোখে তাকিয়েই বুঝে ফেলেছে টুনি, কান গরম হ'য়ে উঠেছে, গাল গরম হ'য়ে উঠেছে, বুকের রক্ত ঘন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে।

নির্মল হেসেছে তার দিকে তাকিয়ে, 'কিন্তু তার আগে তো টুনি পাখির মতটা জানা দরকার।'

'ধেৎ!'

'কোয়ার্টার পেয়েছি, সুন্দর লাল ইটের ছোটো বাড়ি, আর সেই বাড়িতে—বলো না?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে টুনি চুপ।

'বলো না, লক্ষ্মীটি।'

টুনির চোখ মাটিতে স্থির।

'বলো।' নির্মলের গাঢ় গলা যেন দুপুরের রোদকেও নিস্তব্ধ ক'রে দিয়েছে। প্রজাপতির রঙিন পাখার মতো থরথর করেছে মুহূর্তগুলো। থরথর করেছে টুনি। টুনির দিন আর রাত ভ'রে উঠেছে সেইসব থরোথরো মুহূর্তের সোনায় আলোয়।

সে-সব দিন কি ভোলবার? ভোলা যায়? কালের প্রলেপ শুধু পলেস্তারাই ফেলতে পাবে, উচ্ছেদ করবে এমন শক্তি তার কোথায়? আর কাকে উচ্ছেদ করবে? যার কথা ভেবে আজকের এই ভাগ্যের চরম চুড়োয় পৌঁছেও সে ছাব্বিশ বছরের কৌমার্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলো না, তাকে?'

নির্মলের পর এই সুদীর্ঘ আট-দশ বছরের ব্যবধানে আর কি এমন কোনো মানুষের সান্নিধ্যে সে আসে নি যাকে তার ভালো লেগেছে, যাকে দেখলে আলো ফুটেছে চোখে, যার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কখনো কোনো চকিত মুহূর্তেও বুকও কেঁপে উঠেছে জোরে? সুমন্ত্রর কথাই তো মনে করতে পারে। অনেক দূর হেঁটেছিলো সে, মানসী তাকে অনেক দূর নিয়ে এসেছিলো আমন্ত্রণ জানিয়ে, তারপর হঠাৎ কবে কোন রাত্রে ঠিক এমনি ক'রেই টুনি এসে দাঁড়ালো তার সব মাধুরী নিয়ে, সব দুঃখ বেদনা, সুখ আর আনন্দ নিয়ে। মানসী দুইচোখ ভ'রে তাকে দেখলো, দেখলো তার টলটলে বিন্দু-বিন্দু অশ্রুর শিশির, তারপর হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে গেলো কখন। হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে উপলব্ধি করলো, টুনির কাছে আজকের এই মানসী মৃত, জড়, অচেতন পদার্থ। টুনি তাকে এমন সর্বস্বান্ত ক'রে রেখেছে যে আজও সেই ক্ষতি মানসী সামলে উঠতে পারে নি। সুমন্ত্র সব শুনলো চুপ করে, তারপর চলে গেলো নিঃশব্দে।

মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল বৈকি। খুব খারাপ লেগেছিলো। কিন্তু তাই বলে ঠকাতে তো পারে না।

অভাব। অভাব। অভাব। মলিন মুখে মা হাত পেতেই আছেন। তাঁর ঐ এক ভঙ্গি, ঐ এক সুর, অভাবের বিলাপ ছাড়া আর কোনো কথা নেই তাঁর মুখে। কোনো আবেদন নেই। আজ তাঁর চাল নেই, কাল তাঁর ডাল। পরশু কাপড় নেই, তার পরের দিন প্রিয়নাথবাবুর একটি ওষুধ না-আনলেই নয়, কত যে তালিকা—অন্ত আছে কোনো? পাঁচটা টাকা দিতে পারো? দশটা দিতে পারো? পনেরোটা দিতে পারো? চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। আজ যে অমুক

াওনাদার আসবে, তাকে যে না-দিলেই নয়, কাল ভেবেছি তমুক করবো তার জন্যও ক'টা টাকা চাই—এই ক'রে ক'রে মানুষটাকে মা যেন একেবারে টেনে নামিয়ে দিলেন, সামান্য কয়েকটা মাস অপেক্ষা ক'রে আই. এ.-টা পর্যন্ত পাশ করতে দিলেন না। অত বড়ো সংসারের অত চাহিদা যার মাথায় দিনরাত করাত চালাচ্ছে তার কি আর চাকুরে না-হ'লে চলে! দেখতে-দেখতে বাইশ বছরের যুবক বেয়াল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ের দায়িত্বে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠলো। তবু শান্তি নেই।

প্রিয়নাথবাবু অস্থির হ'য়ে বললেন, 'না, না, আর না। আর ওর কাছে কিছু বোলো না।' অবশ, পঙ্গু, দুঃখী প্রিয়নাথের ক্ষীণ গলা ননীবালার গর্জনে থেমে গেলো, 'তাহ'লে আর কী! হাটে গিয়ে নিজে বিক্রি বসি।

বাবার মুখে অশেষ যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে মুহূর্তে, তালপাতার পাখাটা হাতে নিয়ে হাওয়া করেছেন জোরে-জোরে, অসহায়ের সহায় ভগবান নামক অত্যন্ত জরুরি একটি কল্পনাকে ঘন-ঘন স্মরণ করেছেন মনে-মনে, তারপর নিঃসাড়ে চোখ বুজে প'ড়ে থেকেছেন মরার মতো। টুনি এসে আস্তে-আস্তে হাত রেখেছে কপালে, বাপ আর মেয়ের দুই জোড়া ব্যথিত চোখ মিলিত হ'য়ে যেন হালকা হ'য়ে গেছে সব দুঃখ। আচমকা টুনি ব'লে উঠেছে, 'বাবা তোমার ডান পা-টা তো কই এখন আর বেশি সরু দেখাচ্ছে না!'

'অ্যাঁ,' যেন স্বপ্ন দেখে ধড়মড়িয়ে উঠেছেন প্রিয়নাথবাবু, 'ঠিক বলছিস?'

'হ্যাঁ বাবা! আমার ক'দিন ধ'রেই মনে হচ্ছিলো, আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

'তা হবে।' গলায় যেন সাগরের ঢেউ, 'কলকাতা থেকে এবার নিমু যে-মালিশটা এনেছে, তার দাম তো বড়ো সোজা নয়।'

'আমার মনে হয় কী জানো?'

'কী রে?'

'আমরা যদি একবার কলকাতা যেতে পারতাম, যদি একজন বড়ো ডাক্তার দেখাতে পারতাম—' টুনির গলা ভেঙে এসেছে, বুকের ভেতরটা একেবারে ব্যথা ক'রে উঠেছে, বাবার আরো-সরু-হ'য়ে-আসা পা-টার দিকে তাকিয়ে নিচু হ'য়ে সেই পায়ে সে মাথা রেখেছে, বাপকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অজস্র কান্নার আবেগে নিজেই ভেঙে পড়েছে আকুল হয়ে। শেষে প্রিয়নাথকেই মেয়েকে শান্ত করতে হয়েছে হাসির আড়ালে কান্না লুকিয়ে।

কেন? কেন অত শাস্তি পেয়ে গেলেন তার বাবা? রাধানগর হাই স্কুলের অতি শান্ত, অতি সজ্জন, অতিশয় ভালোমানুষ প্রিয়নাথ মাস্টার? কী পাপ করেছিলেন তিনি? কী অপরাধে ঈশ্বর তাঁকে এতো বড়ো সাজা দিলেন? আজকেও মানসী তার কোনো ব্যাখ্যা পেলো না মনে-মনে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সে। অসময়ে স্নান ক'রে চুলগুলো ভেজা, কেমন ভার লাগছে শরীরটা। রেকর্ডিং আছে এক সপ্তাহ পরে, কনট্রাক্ট করেছে বম্বের বিশিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, শিগগির যেতে হবে সেখানে, তার জন্যেও অন্তত সাবধান থাকা উচিত ছিলো। স্নান করাটা ঠিক হয় নি। মাথা ধ'রে উঠেছে। গলা ভেঙে গেলেই তো সব গেলো। উঠে নীল আলোটা জ্বেলে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা অ্যানাসিন বের ক'রে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে নিলো। মাথার উপর ঘূর্ণমাণ পাখার স্পীডটাও কমিয়ে দিলো এক মোচড়ে।

আজকে নির্মলকে ভাবতে গিয়ে প্রিয়নাথবাবুকেই বেশি করে মনে পড়লো তার। ঘুম এলো না, কান্না এলো। জানালার কাছে উঠে এসে আধভেজা চুলে বিলি কাটতে-কাটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায়?

থাকলে তো আজও তিনি বেঁচে থাকতে পারতেন। এই বাড়ি তাঁর পায়ের ধুলোতে পুণ্যস্থান হ'তো, এই সব ঘরে তিনি হেঁটে বেড়াতেন। মানসী তাঁকে হাঁটবার উপযুক্ত চিকিৎসাই করাতে পারতো এখন। মা হাঁটলেন না? এই তো কয়েক বছর আগের কথা। অনভ্যস্ত পায়ে জুতো প'রে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গোড়ালির হাড় ভেঙে গেলো। কী এসে গেলো তাতে? এলো সার্জন, এলো ব্যান্ডেজ, ওষুধ এলো কত রকমের, ব্যবস্থা হলো কত-কিছুর, তিন মাস মাসাজ করা হলো লোক দিয়ে নিয়মিত। এখন কি তার চিহ্নও আছে? সেই পায়ে আবার জুতো পরে কত তিনি ঘরে বেড়ান, কত তাঁর শখ, কত আনন্দ। তখনও মানসীর তার বাবার কথা মনে হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো গ্রামের সরকারি হাসপাতালের বুড়ো দয়াল ডাক্তারের চিকিৎসায় প্রিয়নাথের পা জোড়া না-লাগলেও ইওরোপ-ফেরতা বত্রিশ টাকা ভিজিটের এই ডাক্তার সেহানবিশের চিকিৎসায় থাকলে নিশ্চয়ই লাগতো। তখন নির্মলও বলেছিলো, 'চাকরিটা পাকা হলেই মাস্টারমশাইকে আমি কলকাতার ডাক্তার এনে দেখাবো। আর তার জন্য টাকাও জমাবো আমি।'

কিন্তু সে-আশা আর তার পূরণ হ'তে পারলো না। কী আশাই বা পূরণ হ'লো তার! মানসী ঠোঁটের কোণে হাসলো।

তারপর চকিত হয়ে ও-ঘর থেকে মিসেস দত্তমল্লিকের নিটোল ঘুমের ঘন নিঃশ্বাসের উত্থান-পতন শুনলো। শুনতে-শুনতে তার নিজের দীর্ঘশ্বাস ভাসলো বাতাসে। আর নির্মলের মাকেও মনে পড়ে গেলো হঠাৎ। ছোটোখাটো এইটকু মানুষটি, ভালোবাসায় ভরা মন। ছেলের চেয়ে তাঁর গরজই শেষে বেশি হয়ে উঠেছিলো। 'ও ননীবালা,' পুজোর মধ্যে একদিন ডুরে শাড়ি হাতে ক'রে এলেন তিনি, 'আর তো বাপু খালি ঘরে আমার মন টেঁকে না। এবার দিয়ে দাও মেয়েটাকে।'

মা হাসলেন, 'আমার কি অনিচ্ছা দিদি? আপনার ঘরে যাবে, আমার মেয়ের কত ভাগ্য, কিন্তু ভাবছি কী, এমন শুধু হাতে-পায়ে কেমন ক'রে ওকে বিদায় দেবো। ডাক্তার বলছে শীতটা পেরুলেই আপনার দেওর আবার ঠিক আগের মতো উঠতে-হাঁটতে পারবেন, আর ওঠা-হাঁটা মানেই স্কুলে যোগ দেওয়া। স্কুলে গেলেই টাকাকড়িরও তো একটা সুরাহা হবে।'

'তা তো ঠিকই।' ভালোমানুষ সরোজিনী একেবারে গ'লে গেছেন, 'তা টাকাকড়ির জন্য তুমি ভাবছোই বা কেন? আমি কি কিছু চেয়েছি?'

'আপনি দেবী,' মা তাঁর মন-গলানো কথায় চিঁড়ে ভিজিয়েছেন, 'আপনি যে কিছু নেবেন না, চাইবেন না, তা তো আমি জানি। কিন্তু দিদি—' একেবারে হাত চেপে ধরেছেন, 'আমার তো সাধ আছে একটা?'

তা আছে বৈকি? নির্মল চাকরিতে পাকা হয়ে তো সেটা ভালো করেই মিটছে তাঁর। তাঁর সংসার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আস্তে-আস্তে, এতোদিনের জমাট ঘন অন্ধকার ঠেলে তিনি আলোর রেখা দেখতে পেয়েছেন। এর মধ্যে গলার হার ছড়া ছাড়িয়ে এনেছেন মহাজনের কাছ থেকে শাঁখার পাশে চ্যাপটা দু-গাছা তামার পাতের চুঁড়িও গড়িয়ে নিয়েছেন। আর একখানা খয়েরি পাড় তাঁতের শাড়ি।

সেই শাড়িখানা প'রেই তিনি নির্মলের মৃত মাকে দেখতে গিয়েছিলেন, নতুন শাড়ির খসখসে আঁচলে চোখ মুছেছিলেন, তারপর বাড়ি এসে কেচে শুকিয়ে মাড় দিয়ে তুলে রেখেছিলেন ভাঁজ করে।

আর টুনি?

টুনিও গিয়েছিলো বৈকি। সরোজিনীর ঠাণ্ডা সাদা বুকে পড়ে থাকতে দেখেছিলো নির্মলকে, দেখেছিলো নিঃসঙ্গ নিঃস্ব-হয়ে যাওয়া একটি মানুষের কাঙাল কান্না, দেখেছিলো মৃত্যুর মহিমা। সুন্দর লেগেছিলো, স্বর্গের মতো লেগেছিলো, কেউ না-বলতেই সে চন্দন ঘষে নিজে-নিজে সাজিয়ে দিয়েছিলো সরোজিনীকে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়েছিলো, মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিয়েছিলো। গ্রামের কর্তারা, গিন্নিরা বলাবলি করেছিলেন তাই নিয়ে, হাসি-মস্করা করেছিলেন, ছোকরারা টিটকিরি দিয়েছিলো, অসভ্য বেহায়া নির্লজ্জ—কত-কিছু বিশেষণই যে উপহার পেয়েছিলো সেদিন তার আর অন্ত নেই। বাড়ি ফিরে ননীবালাই কি কম নির্যাতন করলেন? কেবল প্রিয়নাথবাবু তার পিঠে হাত রেখে বসে ছিলেন চুপচাপ। তাঁর বিষণ্ণ গম্ভীর বেদনা-সজল মুখের দিকে তাকিয়ে টুনির সব দুঃখ গলে জল হয়ে গিয়েছিলো, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলো সে।

কেন কেঁদেছিলো? সরোজিনীর মৃত্যুতে তার কী? তবে কি সে তাঁকে ভালোবেসেছিলো? না কি তিনি নির্মলের মা বলে? না কি নির্মলের কান্না আর তার কান্না অভিন্ন ছিলো না?'

ননীবালা তাতেও রাগ করেছিলেন। আদিখ্যেতা ভালো লাগে নি তাঁর। বলেছিলেন, 'কী ঢং! তবু তো এখনো যাস নি ওখানে। গেলে তো বুঝি আর নিজের মাকেই চিনবি না।'

তাই তো ননীবালা আগে থেকেই সাবধান হয়েছিলেন। মেয়েকে নিজের অধীনে রেখে হাতে রাখছিলেন নির্মলকে, 'সবুর করুক না একটা বছর। এই তো মা মরলো, এখুনি বিয়ে কী?'

প্রিয়নাথবাবু রাগ করেছিলেন, 'তুমি বলছো কী? আরো দেরি করতে চাচ্ছো?'

'তোমরা কি হিন্দু না খৃস্টান? মেয়ের না-হয় পাখনা গজিয়েছে, পা বাড়িয়েই আছে যাবার জন্য, সঙ্গে-সঙ্গে তোমারও কি ভীমরতি ধরলো নাকি?'

'কী আশ্চর্য!' প্রিয়নাথবাবুর গলায় রাগ ফুটেছে, 'ভদ্রমহিলার কত শখ ছিলো বউ নিয়ে ঘর করবার; তা তো দিলেই না, আর এখন ওর এই শূন্য ঘরেও তুমি ওকে একা-একা থাকতে দেবে নাকি? থাকতে পারে? মা ছাড়া ওর আর-কেউ আছে নাকি দেখবার শোনবার?'

'ও-সব ম্লেচ্ছ কাণ্ড আমি করতে পারবো না,' রাগে গজগজ করেন ননীবালা, 'কেন, অসুবিধেটা কী, শুনি? বাড়িতে তো আর থাকে না। থাকে তো কাজের জায়গাতেই। কেবল রাত্তিরটুকুই যা বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ। তা রোজ-রোজ আসবার দরকারটাই বা কী? খাওয়া-দাওয়ার তো আর অসুবিধে নেই সেখানে।'

প্রিয়নাথবাবু তবু বলেছেন, 'তোমার যে কী ইচ্ছে তা আমি সত্যি বুঝিনে। মাইনে বেড়েছে, কোয়ার্টার পেয়েছে, বিয়ে ক'রে এখন বউ না-নিয়ে গেলে চলে?'

ননীবালার চোখের দৃষ্টি জ্বলে উঠেছে এবার। এক ধমকে তিনি চুপ করিয়ে দিয়েছেন স্বামীকে, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলো না তো। ধারদেনাগুলো শোধ হলো না, দুটো পয়সা জমলো না হাতে, এখুনি বিয়ে। আরে বাপু, ও কি তোমার ছেলে যে বিয়ের পরেও তোমার এখানে তোমার দায় নিয়েই পড়ে থাকবে? সে-দায়িত্ব কি ওর আছে যে চিরদিন

বসিয়ে খাওয়াবে তোমাকে? সে-কপালটুকুও সঙ্গে আনো নি তুমি। ও হলো মেয়ে। বিয়ে দিলেই পর। তখন এই পেটের মেয়েই আলাদা ভাতে শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।'

এই কথা!

স্তব্ধ হয়ে গেছেন প্রিয়নাথবাবু। স্ত্রীর সঙ্গে বোধহয় আর কথা বলতে ইচ্ছে করে নি তাঁর। একেবারে চুপ হয়ে গেছেন, ঝরঝর করে ঘাম নেমেছে সারা গায়ে। তিনি পঙ্গু, উপার্জনহীন, উপায়হীন। কী বলবেন তিনি? কে শুনবে তাঁর কথা? জোর ক'রে কিছু করার মতো মনের শক্তি তাঁর দেহের শক্তির সঙ্গে-সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

একদিন নির্মল বললো, 'টুনি শোনো।'

'কী?'

'তোমাকে একটা গ্রামোফোন কিনে দেবো আমি।'

'গ্রামোফোন?'

'হ্যাঁ। অনেক রেকর্ড থাকবে, তাই থেকে তুমি গানগুলো তুলে নেবে।'

'না, না—'

'না না কী? একে-ওকে খোশামোদ করার চাইতে ঢের ভালো।'

'না, গ্রামোফোন তোমাকে কিনতে হবে না।'

'তোমাকে আর সর্দারি করতে হবে না।'

'আমি শিখবো না গান।'

'তা তো ঠিকই। কেবল বাসন মাজবে, না?'

'মন্দ কী?'

'না মন্দ আর কী! ''পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি''—বড়ো-বড়ো কালো চোখে নির্মল হেসেছে।

টুনি ভ্রূকুটি করেছে, 'পর আবার কে? বাবা? মা? তুমি?'

'নিজে ছাড়া সব পর। প্রথমে তুমি নিজে, তারপর তোমার গান, তারপর বাবা-মা। অবিশ্যি—' চোখ ভাসিয়ে মাথা নেড়েছে এখানে, 'সব চেয়ে আগে আমি, এই নির্মল নামক ভাগ্যবান যুবকটি।'

'কেন?'

'বা রে, আমিই তো তোমার আত্মা, মন, প্রাণ সব!'

লাল হ'য়ে উঠেছে টুনি, 'কী অসভ্য।' যাবার জন্য সে পা বাড়িয়েছে।

'শোনো, শোনো।' তৎক্ষণাৎ আঁচল টেনে ধরেছে নির্মল।

'কী?'

'কাকিমা তো কিছুতেই ওস্তাদ রাখতে দেবেন না।'

'তোমার সত্যি মাথা-খারাপ হয়েছে।'

'তা তো হয়েছে। টুনি, আমি আর পারছি না একা থাকতে।'

টুনিই কি পারছে? কিন্তু কী করবে সে? তার চোখে জল এসে গেছে, জবাব দেয় নি, শুধু দাঁড়িয়ে থেকেছে চুপচাপ।

'মা যে নেই এ-কথাটা একদণ্ডের জন্যও ভুলতে পারছি না আমি।'

টুনি চুপ।

'তুমি এলে আমি সব ভুলে যেতুম। জানো, রাত্তিরে ঐ একা বাড়িটায় আমার দু-চোখ ়ার বন্ধ হতে চায় না। কী যে আজেবাজে মনে হয়। ভয় করে, আর বুঝি আমি তোমাকে পলাম না।'

'চুপ করো।' অস্থির হয়ে উঠেছে টুনি।

নির্মল চুপ করেছে। তাকিয়ে থেকেছে দূরের দিকে।

'কিন্তু গ্রামোফোন তুমি এনো না।' টুনি অনুনয় করেছে চোখে চোখ রেখে।

নির্মল বলেছে, 'কেন?'

'কেন মানে? একটা গ্রামোফোন কেনা বুঝি সহজ? কেন কিনবে? টাকা কই?'

'মা রেখে গেছেন।'

'মা?'

'তাঁর ক্যাশ-বাক্সে ছিলো।'

'থাকুক।' টুনি একেবারে পাকা গিন্নি, 'টাকা কি ফেলে দেবার?'

'মোটেই না।'

'তবে?'

'তাই জন্যেই তো একেবারে তোমার গলায় গান করে ধরে রাখতে চাই। চিরজীবন ়াকবে।

'আমি কি চিরজীবন গানই গাইবো?'

'যার যা কাজ।'

'আর বুঝি কাজ নেই?'

'আমার ছোট্টো পাখি, বনের পাখি, টুনি পক্ষীর আর আবার কী কাজ?' টুনির লম্বা চুলের ়কটা গোছা টেনে এনে হাতে জড়িয়েছে সে। 'তুমি কি ভেবেছো আমার কাছে গিয়েও ়াঁধবে? মসলা করবে আর বাসন মাজবে? আমি এখন থেকেই একটা মেয়েকে ঠিক করে রেখেছি, সব করে দেবে সে।'

টুনি চোখ তুলে তাকিয়ে থেকেছে, কথা বলে নি।

তারপর সত্যি নির্মল একটা গ্রামোফোন কিনে এনে হাজির করলো একদিন। আঠারোখানা রেকর্ড সুদ্ধু। আর মা সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠলেন তেলে-বেগুনে। যতক্ষণ নির্মল রইলো গুম ়য়ে রইলেন, আর সে যেতেই ফেটে পড়লেন বোমার মতো, 'এ-সব কী? যা খুশি তা করলেই ়'লো?'

প্রিয়নাথবাবু বললেন, 'এর আবার একটা যা-খুশি তা কী? ভালোই তো করেছে। কী সুন্দর ়ানগুলো। আর গান মানুষের সুখে-দুঃখে!'

'টাকা কি গঙ্গার জলে ভেসে আসে যে খোলামকুচির মতো খরচ করলেও ফুরোবে না?'

'কী আশ্চর্য!' প্রিয়নাথবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ত্রীর কথার জবাব না-দিয়ে পারেন না, 'ওর ়াকায় ও যা-খুশি তাই করবে, তোমার কী?'

'আমার কী মানে? এই সংসারের পিণ্ডি তৈরি হবে কোথা থেকে ? একটা মড়া-পোড়া গ্রামোফোন, কতকগুলো ইস্‌কুরুপ বল্টুর স্তূপ, কার শ্রাদ্ধে লাগবে শুনি? কী হবে ওই আপদ দিয়ে?'

'সে তুমি বুঝবে না। বোঝবার মতো মন ভগবান দেন নি তোমাকে।'

'তা তো দেনই নি। যত দিয়েছেন তোমাকে আর তোমার মেয়েকে। সাধে কি বলি, মেয়ে মেয়েই। মেয়ের মতো শত্রু পৃথিবীতে আর কেউ না। ওই হাঁদাকান্ত মেয়ে যদি একটু বুঝেরই হবে, বাপ-মায়ের দরদই বুঝবে তাহ'লে কি এভাবে জলে যেতে দেয় টাকাগুলো? ও কী না পারে ইচ্ছে করলে? নির্মল ওর কোন কথা না-শোনে? সংসারের জন্য মায়া থাকলে টাকাগুলো ও বাঁচাতে পারতো না?'

সারাটা দিন মা একেবারে মাথা ফাটালেন। টুনি নিঃশব্দে কাজ করতে-করতে সব শুনলো. সেই রাত্রে ঘুমুতে পারলো না সে। আর তার জের মিটতে-না-মিটতেই এলো এক হারমনিয়ম ডবল রীডের মস্ত বাজনা। নির্মলের খুশির শেষ নেই, এটা দেখায়, সেটা দেখায়—টুনি কী করবে। টুনির বারণ শুনতে তার ব'য়ে গেছে।

দাও। দাও। আরো দাও। এর পর মা যেন মরীয়া হ'য়ে উঠলেন। যে-ছেলে হুপ ক'রে একটা গ্রামোফোন কিনে আনতে পারে, চক্ষের পলকে অত বড়ো একটা হারমনিয়ম এনে হাজির করতে পারে, তার হাতে যে বেশ ভালোরকম কিছু জুটেছে, শুধুমাত্র মাইনেটাই যে তার সম্বল নয়, এটা অনুমান ক'রে তাঁর আর লুব্ধতার সীমা রইলো না। এবার প্রিয়নাথবাবু শুয়ে-শুয়েই রাগারাগি করলেন, 'তুমি ভেবেছো কী? যা তোমার খুশি করলেই হলো?'

তাচ্ছিল্যভরে ননীবালা জবাব দিলেন, 'খুশিমতোই তো সারাজীবন সব পেলাম কিনা।'

'কী তুমি পাও নি? দিনরাত তোমার এতো কিসের আক্ষেপ? আমি কি কোনো শখ মেটাই নি তোমার? কোনোদিন কিছু উপার্জন করি নি?'

'সে-সব বলে লাভ কী।'

'লাভ এই যে নিজের অতীত ভেবে, ওদের কথা তুমি ভাবো। নিজেকে এতো ছোটো কোরো না, এতো হীন হোয়ো না। ওদের সুখী হতে দাও, স্বাধীন হতে দাও। তুমি মা, সন্তানকে সুখী করার দায়িত্ব আছে তোমার। এ-রকম আটকে রাখার কোনো অধিকার নেই।'

ননীবালা ফিরে তাকালেন। প্রিয়নাথবাবু আধখানা উঠে বসে যেন ছটফট করতে লাগলেন 'না, না, এ হ'তে পারে না। এ অন্যায়। ছুটোছুটি করতে-করতে ছেলেটা রোগা হয়ে গেছে এ-সব কী ধরনের স্বার্থপরতা? কেবল নিজের সুবিধেটুকুই সব! ছি! বিয়ে আমি দেবো, আমি নিজে বিয়ে দেবো, এ-মাসেই দেবো।'

এবার ননীবালা ছোট্টো একটি মন্তব্য ছাড়লেন, 'অসারের তর্জন গর্জন সার।'

জ্বলতে-জ্বলতে যেন দপ করে নিবে গেলো সব আগুন।

টুনি সেদিন মুখ খুলেছিলো মা'র উপর। ভারি বুকে, ভারি নিঃশ্বাসে, জলভরা চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, 'বাবাকে তুমি ও-রকম বললে? বলতে পারলে?'

'খুব লেগেছে, না?'

'তোমার লাগে না কেন?' টুনির ব্যথিত স্বর ছলছলে হয়ে উঠলো, 'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর বাবার কষ্ট তুমি বোঝো না।'

'তা তো ঠিকই।' হিংস্র আবেগে ঝংকার দিয়ে উঠলেন ননীবালা, 'তুমি খুব বোঝো, আর সেই বোঝার ঠেলায় কখন এ-বাড়ির দরজা ডিঙোবে তাই জন্যে পা বাড়িয়ে আছো।'

মূর্খ, মূঢ়, ভীরু টুনি। একটা কথা কি আর বলতে পারলো তারপর? কেন পারলো না কেন সে হতে দিলো এই অন্যায়, একটা মানুষের ওপর এই অবিচার? কেন সে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বাধা দিলো না মা'র সেই অন্যায়ে?

মানসী জানলা ছেড়ে দ্রুত পায়ে মা'র ঘর আর তার ঘরের মাঝের দরজাটায় এসে াড়ালো থমকে। কী জানি কেন। তারপর আবার ফিরে এলো জানালায়। রক্ত গরম হয়ে ঠেছে, হাত-পা জ্ব'লে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে কান আর মাথা। বাথরুমে এসে ভেজা মাথায় াবার জলের ঝাপটা দিলো জোরে-জোরে, হাত-মুখ আর গলা সব ভিজে গেলো, ব্লাউজটাও ্জলো পিঠের কাছে।

এই তো এমন দিনেই সে চলে গেলো তারপর। টুনির দু-চোখে আঁধার নামিয়ে, বুকের াঁজর খসিয়ে।

আর তারপর, আজ।

আজ?

আজ কী? সত্যিই সে? নির্মল? নির্মলকেই দেখেছে? না কি মনের ভুল? যদি নির্মলই হয় বে সে নামলো না কেন? না কি চিনতে পারে নি মানসীকে? খুঁজে পায় নি টুনিকে? কেমন ''রে পাবে? টুনি কই? টুনির অস্তিত্ব আর কোথায় আছে এই পৃথিবীতে? টুনি ক্ষ'য়ে গেছে, ছে গেছে। দুঃখের পাথারে ভাসতে-ভাসতে কোথায় তলিয়ে গেছে টুনি।

ভালো হয়েছিলো। খুব ভালো হয়েছিলো। অত দুঃখেও তখন মনে মনে বলেছিলো টুনি। া'র দু-চোখ ভরা জলের দিকে তাকিয়ে নিজের দুঃখ সার্থক মনে হয়েছিলো তার। নির্মল, ়মি খুব ভালো করেছিলে চলে গিয়ে, তুমি না-গেলে সেই সব দুঃসহ দুঃখভরা দিনের বীভৎস ্বি দেখে কেমন করে মা শিহরিত হতেন? কেমন করে ভাবতেন যে, যাকে তিনি একবিন্দু াান্তি দেন নি, সে-ই ছিল তাঁর শান্তির আধার।

পরের বছর ঠিক তেমনি দিনে মারা গেলেন প্রিয়নাথবাবু। মানসীর স্পষ্ট মনে আছে সেই াতটি। টুনিকে তিনি কাছে ডাকলেন, তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে, অস্পষ্ট গলায় কী যে ললেন তখন টুনি বোঝে নি, অনেক পরে মনে হয়েছে, নির্মলের নামই করেছিলেন শেষ ময়ে। আস্তে হাতখানা উঠিয়ে কোলের উপর রাখলেন, টুনির চোখের জলে ধুয়ে গেলো সেই হাত। ননীবালা পড়ে আছেন মাটিতে, অনাহারে অনিদ্রায় ধূলি-ধূসরিত ননীবালা। তার া। বাবা তাঁকে ডাকলেন না, যতক্ষণ পারলেন দু-চোখ ভ'রে টুনিকেই দেখলেন, তারপর ়ক সময়ে শ্বাস উঠলো তাঁর। চোখের পাতা দুটি বন্ধ ক'রে বুকের ওঠাপড়ায় অধীর হয়ে ঠলেন তিনি। টুনি হাত বুলিয়ে দিলো, মুখে মাথায় জল দিলো, তিনি ঠোঁট নাড়লেন বারে-ারে।

সন্ধ্যা থেকে টিপটিপ বৃষ্টি, রাত ঘন হ'তে-হ'তে মুষলধারে ঝরতে লাগলো, ঘরে জল ়ড়তে লাগলো টুনিদের ফুটো চালের কোণ চুঁইয়ে, দারুণ ঝড়ের বেগে মনে হলো বেড়াগুলো ্ঝি এখুনি উড়ে যাবে। প্রিয়নাথবাবু তারই মধ্যে শ্বাস টানছেন আর টুনি বসে-বসে দেখছে তল-তিল করে একটা জীবনের অবসান।

শোক নয়, তাপ নয়, ভয়-ডর কিছুই না, অদ্ভুত একটা বোবা ব্যথা আর মৃত্যুর মুখোমুখি ''সে দুরন্ত একটা কৌতূহল। কিসের কৌতূহল তা সে জানে না, তবু তাকিয়ে আছে একাগ্র ্য়ে, কেমন করে কোথা দিয়ে কে এসে এই এতোদিনকার মানুষটির প্রাণ ছিনিয়ে নেয় তা দেখবার জন্য।

তারপর রক্তজবা কাপড় পরে, পাথরের মতো শক্ত নিষ্ঠুর বুকের উপর বলিষ্ঠ দুইহাত জড়ো করে, সূর্যের মতো ঝলসানো এক মেঘের মূর্তি এসে দাঁড়ালো সামনে। তার অমানুষিক

আকৃতির দিকে তাকিয়ে টুনি সভয়ে বলে উঠলো, 'কে আপনি? কেন এসেছেন? কাকে চান?'

মৃদু হাস্যে সে বললো. 'তোমার বাবার এইমাত্র আয়ু শেষ হ'লো। তাঁকে তাই এখন বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

টুনি বললো, 'ও, তাহ'লে আপনিই দেবতা যম? কিন্তু আপনি কেন এই ঝড়ে জলে কষ্ট ক'রে এলেন, আপনার দূতেরাই তো আসতে পারতো।'

এ-কথায় যম খুশি হয়ে সহাস্যে বললো, 'তোমার বাবা যে পরম ধার্মিক, সেজন্যে আমি নিজেই এলাম।' এই বলামাত্রই বেঁচে থাকার সমস্ত চেষ্টা থেকে মুহূর্তে বিরত হলেন প্রিয়নাথবাবু। আর তিনি শ্বাস টানলেন না। টুনি দেখলো তাঁর দেহ থেকে তাঁরই বুড়ো-নখের সমান একজন মানুষকে টেনে বা'র করে নিয়ে এলেন যম, তারপর কোথায় মিলিয়ে গেলেন

চোখ মুছে ধড়মড় করে উঠে বসলো টুনি। তন্দ্রা ভেঙে উপলব্ধি করলো এতোক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলো ব'সে। আর বাবা? বাবা কেমন আছেন? কী আশ্চর্য! এতোক্ষণ তাঁর বুকের উপরে সে ঘুমোচ্ছিলো মাথা রেখে। 'বাবা। বাবা গো!' প্রিয়নাথবাবুর নিঃশ্বাসহীন মুখের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠলো সে।

সকাল হ'তে-হ'তে ঝড় থামলো, বৃষ্টি থামলো, কান্না থামলো, আকাশ জ্যোতির্ময় হ'য়ে দেখা দিলো।

আজ প্রায় চার মাস নির্মলের কোনো চিঠি নেই, টাকা নেই, খবরবার্তা কিচ্ছু নেই টায়েটুয়ে খেয়ে-না-খেয়ে কোনোরকমে দিন চলছিলো খঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। এখন একেবারে শূন্যের অঙ্কে ঠেকেছে। মৃতদেহও যে সৎকার হবে এমন একটি পয়সা পর্যন্ত হাতে নেই তাদের। ননীবালা চোখের জল মুছে ছুটলেন প্রতিবেশীদের ঘরে, টুনি ব'সে রইলো মড়া ছুঁয়ে কিন্তু কে আর শুনবে ননীবালার কথা? এতোদিন না ননীবালা বড়ো ধরাকে সরা জ্ঞান করেছেন, এখন আবার আমাদের কিসের দরকার?

গ্রামের লোক শত্রু হ'য়ে উঠেছে সুযোগ বুঝে। ভাবী জামাই নিয়ে বেলেল্লাগিরির শোধ তুলবে না এবার? ভেবেছিলো বুঝি এক মাঘেই শীত যাবে, না? বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রে জঙ্গলে বাস আর কুমিরের সঙ্গে লড়াই ক'রে জলে বাস আর ললিতবাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রে রাধানগরে বাস, এ তিনই সমান অসম্ভব।

মুখে চুনকালি মেখে ফিরে এলেন ননীবালা। কেউ এলো না মড়া পোড়াতে। কেন আসবে? অপদার্থ একটা ঠ্যাংভাঙা স্কুলমাস্টার, এক পয়সার যার মুরোদ নেই, সে কিনা শুয়ে-শুয়েই কালো বেড়ালের মতো বিশ্রী মেয়েটাকে দেখিয়ে তুক ক'রে ফেললো অমন একটা উপযুক্ত, গ্রামের সেরা ছেলেকে? আর তারা সব গোলাপি মেয়ে নিয়ে রুপোর তোড়া গলায় বেঁধেও গলদ্ঘর্ম হ'য়ে গেলেন বিয়ে দিতে ? ললিতবাবুর চিরদিনের রোখ এই নির্মল, তাকে পর্যন্ত হঠ খাইয়ে দিলো ওরা?

বেশ। এখন বুঝুক তার ফল। মেয়ের বিয়ে না-দিয়েই পায়ের উপর পা তুলে জামাইয়ের রোজগারে তো দিব্যি চলছিলো। মাসে-মাসে মনিঅর্ডারে সই চলছিলো চমৎকার। গেলো কোথায় সব? তখন তো কই আমাদের কথা মনে ছিলো না, এখন এসেছো কেন? জামাই-ই আসুক। উদ্ধার করুক কাজ।

আস্তে-আস্তে নরম রোদ ছড়িয়ে পড়লো উঠোনে, চালের ফাঁকে, ঘরের মেঝেতে। ভেজা টি শুকিয়ে গেলো, ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীতল হলো তপ্ত ধরণী। চারদিকের গাছপালা গ্ধ সবুজে মনোহর হয়ে উঠলো। বাবার মৃতদেহ ছেড়ে একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো টুনি, াবার ঘরে ফিরে গেলো।

ভাঙা তক্তপোশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন প্রিয়নাথ, চোখ দুটি বোজা। শান্ত, সমাহিত। তোদিনের সব গ্লানি নিঃশ্বেষে মুছে গেছে জীবন থেকে। গলা থেকে পা পর্যন্ত টুনি চাদর পা দিয়েছে একটা, মাথার বালিশটা ঠিক করে দিয়েছে, হাত দুটি টান-টান হয়ে পড়ে আছে -পাশে। মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ঢেউয়ের মতো কান্না গড়িয়ে এলো টুনির। হাত রাখলো পালে। ঠাণ্ডা। হিমের মতো ঠাণ্ডা। টান-হয়ে থাকা একটা হাত ঝুলে পড়েছিলো খাট থেকে, নটা তুলে দিতে গিয়ে যেন ছিটকে সরে এলো। কী শক্ত! মরলে মানুষ কি এই রকম শক্ত য়ে যায়? না কি এতোক্ষণ পড়ে আছে বলেই এ-রকম হয়ে উঠছে?

আর টিকতে পারলো না টুনি। দৌড়ে বেরিয়ে এলো, উঠোনে নামলো, উঠোন পেরিয়ে খোলা চুল হাতে জড়াতে-জড়াতে প্রতিবেশীদের সকলের দরজায় গিয়ে পা জড়িয়ে ধরলো, য়া করুন। দয়া করুন। বাবাকে আপনারা সৎকার করে দিন। তাঁর তো কোনো অপরাধ নেই। তনি তো কোনোদিন আপনাদের কোনো ক্ষতি করেন নি। আমাদের যে শাস্তি হয় দিন, কিন্তু মানুষটাকে দয়া করুন আপনারা।'

সব মুখ ফিরিয়ে চুপ।

বেলা দুই প্রহরে যখন সহস্র পিঁপড়ের দল প্রায় ছেয়ে ফেলেছে প্রিয়নাথকে, নীল মাছিরা রে বেড়াচ্ছে ইতস্তত, কোথা থেকে ছুটতে-ছুটতে, ঘামতে-ঘামতে সুশীলা-পিসি এসে াজির। সর্বঘটে তিনি নারায়ণ। হলুদের গুঁড়ো। সব সময়ে সকলের বিপদেই তিনি আছেন ক পেতে। অথচ তাঁর কোনো সামাজিক পরিচয় নেই, অতীত ইতিহাস তাঁর কলঙ্কিত। সাত ছর বয়সেই বিধবা হয়ে বাপের ঘরে বাস করছিলেন। রূপের জৌলুসে মধুর মোহে াজাপতির মতো সব ছেলেছোকরার দল ইটপাটকেল ছুঁড়তো তার শোবার ঘরের টিনের ালে, একবার ঘরের বেড়া কেটে কোন মহামান্য মাতব্বর নাকি ঢুকেও ছিলেন গভীর াত্তিরে। ঝোলানো রামদা নিয়ে এমন তাড়া করেছিলেন এই সুশীলা পিসি যে তখন আর াছাধন পালাতে পথ পান না। সেই থেকে আর-কেউ বড়ো এগুতো না কাছে। বুঝেছিলো যে ানুষটির রূপই শুধু জ্বলন্ত নয়, গুণেও সে জ্বালিয়ে ছাড়ে।

হঠাৎ এই মানুষই একদিন নুয়ে পড়লো, দুর্বল হৃদয় নিয়ে ছটফট করলো আপন মনে। লা নেই, কওয়া নেই কাশি চ'লে গেলো হঠাৎ। ঘরে-ঘরে কমিটি ব'সে গেলো কেচ্ছার, যত নাংরা কথার ছড়াছড়ি চলতে লাগলো মুখে-মুখে, যত কুশ্রীতার ঘোঁট। একঘরে হলেন শীলার বাবা, সুশীলার মা কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললেন। তারপর একদিন মাথা ড়িয়ে গলায় তুলসীর মালা দিয়ে আগুনের মতো সুশীলা আগুনের মতোই গনগনিয়ে এসে াড়ালো। কোমরে আঁচল জড়িয়ে, চোখে সূর্য হেনে উঠোনে দাঁড়িয়ে একুশ বছরের মেয়ে ৎকার ক'রে ডাকলো, 'আয়, কে আসবি আয়, আমি দেখে নিই তোদের। কোন সতী মায়ের াতী পুত আছিস এ-গাঁয়ে, একবার আয়, আমি দেখে নিই তোদের। উল্লুকের ঝাড় সব, য়োরের পাল। সব ঘরের খবর আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো। কার বুকের াটা আছে তার প্রতিবাদ করবি আয়।'

ব্যস। সব ঠাণ্ডা। সব চুপ।

আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে, সততায় মমতায় সকলের কাছেই সুশীলা পিসি সমান। তাঁ কাছে ছোটো নেই, বড়ো নেই, ধনী নেই, দুঃখী নেই, যেন দেবতার মতো বরাভয় নিয়ে দাঁড়ি আছেন তিনি গ্রামে। বুড়ো হয়ে গেলেন এই করতে করতে। গ্রাম থেকে একটু দূরে এ বিয়েবাড়ির রান্নার জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো তাঁকে, এইমাত্র ফিরে সব শুনে ছুটে এসেছে তাড়াতাড়ি।

এসেই তিনি একলা একশো হয়ে দাঁড়ালেন বুক পেতে। পুরুষের মতো বলিষ্ঠ হাতে ধরাধরি করে উঠোনে নিয়ে এলেন প্রিয়নাথের মৃতদেহ। চারপাশে কৌতূহলী জনতাকে এ দাবড়ায় কাঁপিয়ে দিয়ে মড়া ছুঁয়ে মেঘ-ছেঁড়া রোদের আলোয় ভরা উজ্জ্বল নীল আকাশে দিকে তাকিয়ে বুকের উপর দুটি নরম হাত যুক্ত করে উঁচু গলায় চিৎকার করলেন, 'হে গোবিন্দ! হে কৃষ্ণ! হে আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর! আকাশের চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তেত্রিশকোটি দেবতা। তোমরা সব সাক্ষী। আজ যারা এই মড়া সৎকার করলো না, বিপদে এগিয়ে এলো না এই রকম সময়েও শেয়াল-কুকুরের চেয়ে অধম ব্যবহার করলো, তাদের তোমরা দেখো। মটমট ক'রে সুশীলা-পিসি দুই হাতের দশ আঙুল ফোটালেন। তারপর আবার হাত জোড় করে বললেন, 'মরবে, মরবে। সবাই মরবে একদিন। টাকার গরমে আজ যতই চক্ষু গরম করুক সেখানে সবাই সমান। হে মুকুন্দ মুরারি, তখন যেন এর উপযুক্ত শাস্তি হয়।'

টুনি তাকিয়ে আছে মুগ্ধ চোখে; দেখছে, শুনছে। মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশের তলায় যুক্তকর মুদ্রিতচোখ সুশীলা-পিসিকে মনে হচ্ছে দেবীর মতো, মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতো। যিনি সব আপদে সব বিপদে সকল মানুষের শান্তি।

আর, আশ্চর্য! দেখতে-দেখতে পিলপিল ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সব কর্তার দল এগিয়ে এলো গুটিগুটি। নাকের ডগায় চশমা রেখে ঘোলাটে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলো তারা, 'এ-স কী ব্যাপার তোমার সুশীলা? মড়া ছুঁয়ে অপরাহ্ন বেলায় এ-সব শাপমুন্যি? কী! তুমি ভেবেছ কী?'

সুশীলা-পিসি যেন দেখলেনই না তাদের, ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন, 'ওরে আয়, আয়, টুনি আয়, মা কই তোর? চল তিনজনে ধরাধরি ক'রে হরিধ্বনি দিয়ে তোদের পুকুরঘাটে নিয়ে যাই। তুলসীর ঝোপ আছে সেখানে। প্রিয়নাথ নিজেই তো নারায়ণ, নারায়ণেই মিশে থাকুক আর কাঠকুটো যা লাগে আমি টোনা ডোমকে দিয়ে এখুনি জোগাড় করিয়ে আনছি। আর সেইসঙ্গে অনাথঠাকুরকেও নিয়ে আসবো'খন, আবার তো নিয়ম-কানুন আছে কিছু। দেখিস আমি যাওয়ামাত্রই যেন শকুনি-গৃধিনীগুলো এসে মড়া না ছোঁয়। চ্যালা-কাঠ নিয়ে ব'সে থাক

বাবার মাথার কাছে নিচু হলেন সুশীলা-পিসি, 'প্রিয়নাথ, তুমি আমার ভাইয়ের বাড় গ্রামের অনেকগুলো পশু-পক্ষীর মধ্যে একটা মানুষ, চলো, তোমার শেষ কাজ আজ আমি উদ্ধার করি।'

দুই চোখ ছাপিয়ে জল এলো টুনির। শোক নয়, তাপ নয়, একটা অপূর্ব পবিত্র দুঃখে অনুভূতিতেই যেন গলে গেলো সে। জ্বলন্ত তাপে শীতল চন্দনের মতো সুশীলা-পিসিকে সেদিন জড়িয়ে ধ'রে ঠাণ্ডা হয়েছিলো টুনি। ভালোবাসার আবেগে কাঁপছিলো বুকের ভেতরটা বাবার মৃত্যুর অত বড়ো দুঃখটাও সহনীয়, রমণীয় হ'য়ে উঠেছিল সেই মুহূর্তে।

। শেষ হ'য়ে গেল। হাতের শাঁখা ভেঙে, সিঁথির ফাঁকের কতকালের সিঁদুররেখাটি ঘ'ষে-য়ে তুলে দিয়ে থান প'রে ঘরে এলেন ননীবালা। টুনি তেমনি বসে রইলো মাথায় হাত দিয়ে ুরধারে। টলটলে জলের দিকে তাকিয়ে ডুবতে ইচ্ছে করলো তার।

কিন্তু সময় তো কাটলো তবু। টুনিও মরলো না, টুনির মা-ও মরলো না। সেই শূন্য বাড়ির ঙা ভিটে আঁকড়ে ধরে দিনের পর দিন খেয়ে, না-খেয়ে, অর্ধাশনে থেকে তবু তারা বেঁচে লো। নির্মলের আর কোনো খবর পাওয়া গেলো না, ভাবনায় চিন্তায় ভয়ে দুঃখে কত লোড়ন উঠলো বুকের ভেতর, মনে হলো বুঝি ফেটে যাবে, আশ্চর্য, তবু—তবু ম'রে লো না টুনিরা।

ননীবালা কপাল কুটলেন। কত চিঠি লিখলেন। কত কান্না, কত রাগ, কত অভিমান। চুপ। নর রাত ভেসে গেলো, দিন ভেসে গেলো, চোখের জলের ঝাপসা আলোয় জগৎ সংসার থ্যে হয়ে গেলো, তবু নির্মল চুপ। 'কেন? কী হলো? তোমার কী হলো? তুমি কেমন আছো? ধু সেইটুকু, সেইটুকু আমাকে জানতে দাও। তুমি আছো তো? না—কি—'

একটা সুদীর্ঘ হাহাকারে বুক চেপে ধরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে যায় টুনি, প'ড়ে থাকে য়ে বনতুলসীর ঝোপে, স্তম্ভিতের মতো শ্মশানের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টে যায়। এমন যে মুখরা ননীবাবা, সে-ও একটা কথা বলতে সাহস পায় না মেয়েকে। ন্তর্পণে চলে, ফেরে, ঘটিবাটি বন্ধক দেয়। অতি কষ্টের ছাড়িয়ে আনা গলার হারটা বিক্রি য় যায় অর্ধেক দামে। তামার পাতের চুড়িটাও কি আর থাকে? যায়। সব যায়। কেবলমাত্র ণ দুটি ছাড়া। ননীবালা সময়ে-অসময়ে কেঁদে ওঠেন গলা ছেড়ে, 'হায়, হায়। এ আমি কী রলাম। কী করলাম।' টুনি মা'র সেই ক্রন্দনরত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠাণ্ডা চোখে। ই বুক-ভাঙা অনুতাপের কান্না দেখতে ভীষণ ভালো লাগে তার।

তারপর কোনো এক দারুণ দুর্যোগের রাতে, মেঘের গর্জনে, মুষলধার বৃষ্টিতে, দ্যুৎচমকে সারা পৃথিবী যখন ভেসে যাচ্ছিলো, টুনিদের ভাঙা চাল দিয়ে অঝোরে জল ড়ছিলো, খ'সে-আসা-বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঝড়ের দাপট ক্রমাগত হুমকি ছাড়ছিলো উন্মত্ত ক্রমে, তখন ছেঁড়া মাদুরে, ছেঁড়া বালিশে, শতছিন্ন মলিন বসনে চুপচাপ ভিজে সারাটি রাত রা ঘরময় একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য, এ-কোণ থেকে ঐ কোণ, ছুটোছুটি করতে-করতে ান্ত টুনি একসময়ে স্থির হয়ে বসলো। বললো, 'মা, আর না। চল এবার চলে যাই আমরা।'

ননীবালা কেঁদে উঠলেন, 'কোথায় যাবি? কে আছে আমাদের?'

কে না ছিলো? একজনই তো সবজন হয়ে ঘিরে ছিলো জীবন। দু-হাতে বৃষ্টির ছাঁট সামলে য়ে সহজ গলায় টুনি বললো, 'কলকাতা যাবো। তোমার কোনো আত্মীয় নেই? চেনা নেই?'

'থাকলেই বা এমন কে আছে যার বাড়ি গিয়ে আমরা উঠতে পারি? তাছাড়া বোমা পড়ছে, দ্ধ লেগেছে।'

'যুদ্ধ!' টুনি ভেজা মুখে কেমন একরকম হাসল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'তোমার ক মামা ছিলেন না কালিঘাটে?'

'মামা?'

'একবার আমাদের এখানে এসেছিলেন বেড়াতে? বাবা ভালো ছিলেন তখন।'

কপালে করাঘাত হানলেন ননীবালা, 'হায় রে কপাল। তারা কি আজ চিনবে আমাদের। খের দিনে অমন মামা-মাসি অনেক থাকে?'

'মা।'

'উঁ।'

'সেখানেই চলো।'

'পাগল।'

'ঠিকানা জান?'

'তা জানবো না কেন? সে তো আমার মুখস্থ। কালিঘাটে সেবার পৌষকালি উৎসব হলে বরেনমামা নিজে এসে কত গরজ করে নিয়ে গেলেন। তোর বাবা পকুর থেকে দশ সে ওজনের এক বিরাট রুইমাছ ধরিয়ে দিলেন, তালপাটালি নিলাম পাঁচ সের, সে কত ধুম ধাড়াক্কা—'

'তবে আর কী। কলকাতায় আমরা সেখানে গিয়েই উঠবো।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'না, সে হয় না। বরেন মিত্তির আমার সম্পর্কের মামা নয় গ্রাম-সুবাদে—কেবল ডাকাডাকি।'

'তা হোক।' টুনি অস্থির বেগে নড়ে-চড়ে বসলো, 'আর আমি এখানে থাকতে পারছি ন মা।'

ননীবালা বিহ্বলের মতো তাকিয়ে বললেন, 'উপায় কী? সেখানেও তো এই দুঃখই। কী খাবে, কী পরবে।'

'দুঃখ কি কেবল খাওয়া-পরারই। তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি দুঃখ এখানে, এ-বাড়ি আমাকে দিনরাত চিবিয়ে খাচ্ছে। না মা, না, এখানে আর নয়। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরবো কলকাতে গিয়ে, লোকের বাড়িতে বাসন মাজবো। হয়তো বা কোনো-একদিন তার সঙ্গে—' চুপ করলে টুনি।

ননীবালাও চকিতে একবার মেয়ের মুখে চোখ বুলিয়ে চুপ করে রইলেন। নির্মলে শতস্মৃতি-জড়ানো এই গ্রাম, এই বাড়ি, এই বাড়ির আনাচ-কানাচ যে তাঁর মেয়ের কাছে ক অসহ্য তা তিনি ঠিক অতটা বুঝে উঠতে না-পারলেও কিছু বুঝলেন।

সব শুনে সুশীলা-পিসি বললেন, 'কেন যাবি? গাঁ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে? অমন একটা ন জানা না-চেনা শহরে এমন হুট করে কেউ যায়? আর তার মধ্যে সেখানে তো শুনছি সৈন্যদে ছাউনি পড়েছে, আকছার সেই গোরা পল্টনগুলো বেইজ্জত করছে মেয়েদের।

ননীবালা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এখানেই বা কী ইজ্জতে আছি ঠাকুরঝি? মান নেই সম্মান নেই, সমাজ নেই, খিদেয় ধুঁকে মরলেও খাবার নেই। আর মাথার চালখানা তে দেখছো।'

সুশীলা ব্যথিত গলায় বললেন, 'তবু তোরা যাসনে। আমি বলছি যাসনে। গেলে শে পস্তাবি। থাক না আর ক'টা দিন কষ্ট স'য়ে। দ্যাখ না কী হয়।'

'কোনো আশা নেই।' ননীবালা কপাল চাপড়ালেন, 'এতো বড়ো মেয়ে গলায়, দু-দিন পরে তো সেই অপরাধেই কর্তারা আমাদের তাড়িয়ে দেবে গ্রাম থেকে।'

'ঈশ্। দিলেই হলো। কেন, মাথার উপর কি ভগবান নেই নাকি ? তিনি দেখছেন না?'

'আর তিনি!'

তেলহীন রুক্ষ চুলে একটা থামের হেলানে এলিয়ে-ব'সে থাকা টুনির একটু হাসি ফুটলো কথা শুনে। তিনি তো সত্যিই দেখছেন। তা যদি না-ই দেখতেন তবে আর এই শাস্তি সের? ননীবালার কি আজ মনে হচ্ছে না সে-কথাটা?

সুশীলা-পিসি তাকে টেনে নিলেন কাছে, 'আয়, চুল বেঁধে দিই। এমন সুন্দর তোর চুল, ব যে উঠে যাবে অযত্নে। তখন নির্মল এসে বলবে কী?'

হঠাৎ ননীবালা ঠংঠং কপাল ঠুকতে লাগলেন বারান্দার থামে, 'ঠাকুরঝি, আমার দোষেই ই হলো।'

'তবে শোনো বলি,' সুশীলা-পিসি ফিসফিস করলেন, 'আমি জানি নির্মল তোমাদের ঠিকই ঠিপত্র লেখে, কিন্তু তোমরা পাও না।'

'অ্যাঁ?'

'এই যে গ্রামের কতকগুলো নরক আছে না, যেগুলোকে যমও নিয়ে যেতে ভয় পায় সগুলোই সব শলা-পরামর্শ করে ডাক আটকাচ্ছে। গাপ করছে চিঠিপত্র। টাকাকড়ি।'

'তুমি ঠিক জানো ঠাকুরঝি ?'

'জানবো না কেন? খুব জানি। তবে হাতে-নাতে কি আর ধরা যায়?'

'কে, কে সেই পাষণ্ড, আমি একবার যাবো তার কাছে, আমি দেখে নেবো তাকে—' চোখ আগুনের মতো জ্বললো, নাকের বাঁশি ফুলে-ফুলে উঠলো।

সুশীলা-পিসি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, 'অসম্ভব।'

'কেন অসম্ভব? এতো বড়ো অন্যায় করবে, তার কি কোনো প্রতিবিধান নেই?'

'কিছুই নেই সহ্য করা ছাড়া। তোদের হাতে কি কোনো প্রমাণ আছে? পিওন ব্যাটা ওদের , আর ঐ হারামজাদা রামসদয়টা, সেটা কি একটা সোজা ভেড়া? ওদের ভয়ে যেন কেবারে কাঁপে। আমি বলি, তুই ব্যাটা একটা পোস্টমাস্টার, তুই-ই যদি জেনেও না-জানি দিস, দেখেও না-দেখি ভাবে চোখ বুজে থাকিস, তবে যা না, গলায় কলসি বেঁধে ডুবে গিয়ে। নয়তো লাল-পাড় শাড়ি পরে হাতে চুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়া।'

'তার চেয়ে বড়ো কোনো জায়গা নেই ঠাকুরঝি, যেখানে নালিশ করলে এর সাজা হয়?'

'তা কি আর না আছে বোন। কিন্তু পরামর্শ দেবে কে? ছুটোছুটি করবে কে? দুটো য়েমানুষ তোরা, এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে এই গাঁয়ে বসে কী করতে পারিস?'

'তবু—তবুও তুমি আমাদের থাকতে বলো পিসি!' টুনি আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরলো শীলা-পিসিকে।

পিঠে হাত বুলিয়ে সুশীলা হাসলেন, 'তবু বলি মা, তবু বলি। মিথ্যা একদিন প্রকাশিত বেই, একদিন সে নিজেই আসবে। বুঝবে সব।'

ননীবালা বললেন, 'কিন্তু নির্মলই বা কেমন, ঠাকুরঝি ? এই যে ফেলে গেছে, একবার গ তার আসা উচিত।'

'আসবে।'

'আর আসবে! যুদ্ধে গেলে মানুষ মানুষ থাকে না। মায়া-মমতা ভুলে যায়। কিন্তু আমরাও গ কত চিঠি লিখি তা তো সে পায়?'

'তোমাদের চিঠিও যায় না ওর কাছে। ডাকবাক্স থেকেই নষ্ট হয়ে যায়। মাথা নাড়লে সুশীলা-পিসি, 'অনাদি কী বলে জানো? টুনির নামে নাকি যত জঘন্য-জঘন্য কথা লি পাঠাচ্ছে ওরা। টুনি কার সঙ্গে ভাব করেছে, কার সঙ্গে পালিয়ে গেছে, আবার কাকে বি করেছে। এই সব আর কী। কী আর বলবো, এমন একটা নরককুণ্ড গ্রাম আর কোনোখা নেই।'

স্তম্ভিতের মতো ব'সে রইলো টুনি আর টুনির মা। আর কোনো কথা ফুটলো না মুখে

হায় রে নির্মল! তুমি কি জানো তারপর কেমন ক'রে একদিন মা আর মেয়ে সন্ধ্যা অন্ধকারে গা ঢেকে, গ্রামের আল বেয়ে, ঢাল বেয়ে ঝোপঝাড় বনবাদাড় ডিঙিয়ে, লোকচক্ষু আড়ালে-আড়ালে পাঁচ মাইল রাস্তা ডিঙিয়ে স্টেশনে এসেছিলো। গাড়ির সময় জানে না তার কোন গাড়ি কোথায় যায় তাও কি তারা জানে? চাদরে মুখ ঢেকে টিকিট কিনে প্রত্যে মুহূর্তের ভয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে ম'রে গিয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল অনন্তকাল অপেক্ষা। নীর স্টেশনের কোনো-একটি নিভৃত কোণে লুকিয়ে থাকতে-থাকতে অপেক্ষাটা অনন্তকালই ম হয়েছিলো। কত সন্দিগ্ধ চক্ষু তখন পীড়িত করেছিলো দু'জন অসহায় মানুষের দেহকে তা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে। সঙ্গে পুরুষ নেই এটা কি সেই গ্রামের পক্ষে একটা কম কথা! কিন্তু ন কেউ জিগ্যেস করে নি কিছু, কোনো চেনা মুখ সেদিন ছিলো না সেই স্টেশনে।

ঘন রাতে যখন হাওড়া স্টেশনে এসে নামলাম, অনাহারে, অনিদ্রায়, ভয়ে, দুঃখে, লজ্জ কী মনে হলো তখন আমাদের? কলকাতা শহরের আমরা কী চিনি? কী জানি? গলা শুকি কাঠ হয়ে এসেছে। দু'জন দু'জনের হাত ধ'রে কাঁপা-কাঁপা পায়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বাই এলাম। টুপি-পরা সবা রহস্যময় ভয়-পাওয়ানো আলো, এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটা জনতা। মা অস্ফুটে ডাকলেন, 'টুনি'।

টুনি অস্ফুটে জবাব দিলো, 'মা।'

তারপর আবার চুপ।

সাদা পোশাক পরা, কালো ব্যাণ্ডের টুপি মাথায় কোনো সহৃদয় রেল-কর্মচারী যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। হয়তো বা অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন। তাকিয়ে থে জিগ্যেস করলেন, 'সঙ্গে আর-কেউ নেই? কোনো পুরুষ?'

মা ঘোমটা টেনে বললেন, 'না।'

'কোথায় যাবেন?'

'কালিঘাট।'

'কত নম্বর?'

'একচল্লিশের বি, বরেন মিত্তিরের বাড়ি। আপনি কি চেনেন সে-বাড়িটা?' মা'র গ ব্যাকুল শোনালো।

রেল-কর্মচারীটির মনে যদি বা তাদের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের কারণ ঘটে থাকে তাহ মা'র সেই আনাড়ি ব্যাকুল প্রশ্নেই হয়তো কেটে গেলো। মৃদু হেসে নরম গলায় বললেন, মা, সে-বাড়ি আর আমি কি করে চিনবো।'

'তবে কেমন ক'রে যাবো ব'লে দিতে পারেন?'

'এখান থেকে পাঁচ নম্বর বাসে চড়লেই আপনি কালিঘাটে গিয়ে নামতে পারবেন। ণ্ডাক্টরকে বলে দিলে সেই নামিয়ে দেবে ঠিক জায়গায়, তারপর নম্বর মিলিয়ে নেবেন। কিন্তু ।খন এই রাত বারোটায় তো আপনি যেতে পারবেন না।'

মা আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'কেন?'

'আপনারা কি জানেন না রাত দশটার পরে আজকাল সব বন্ধ হয়ে যায়। কেউ রাস্তায় বরোয় না। জাপানিরা যে রেঙ্গুন এসে গেছে। এই তো পরশু বোমা পড়লো।

মা চুপ।

'আপনারা কোথা থেকে আসছেন?'

'রাধানগর।'

'সঙ্গে তো বিশেষ কিছু নেই দেখছি।'

'না, বাবা।'

'নগদ টাকাকড়ি বা গয়না-পত্র?'

আমাদের আবার টাকাকড়ি আর গয়না-পত্র। সম্বলের মধ্যে তো সেই হারমনিয়ম আর গ্রামোফোন বিক্রির অবশিষ্ট বাহান্নটি টাকা।

তাও তুমি। তোমারই টাকা। নির্মল। তুমি ছাড়া আর আমার কী ছিলো তখন? মন, প্রাণ, অস্তিত্ব সবই তো তুমি। তোমাতেই জড়ানো। সেই তুমি দেখলে না, জানলে না, কোনোদিন ধারণাও করতে পারবে না তোমার সেই টুনিকে, সেই অনাদৃত লাঞ্ছিত প্রিয়নাথের ততোধিক নির্যাতিত মেয়ে রাধানগরের সেই সন্ধ্যামণি দত্তমল্লিককে জগৎ থেকে মুছে ফেলে আজকের দিনের এই মানসী দত্তে পৌঁছে দিতে আমাকে কত দীর্ঘ রাত্রি পার হ'তে হয়েছিলো। দুঃখের কী মরুভূমির উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে আকণ্ঠ জলের পিপাসার পরে এই জলের স্পর্শ।

মা মুখ তুলে বললেন, 'আমরা বড়ো গরিব। আমাদের সঙ্গে সে-সব কিছুই নেই।'

'ঠিক আছে। তাহ'লে আপনারা এক কাজ করুন। আমি ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং-রুমটা খুলে দিই আপনাদের, রাত্তিরটা সেখানেই থাকুন। তারপর কাল সকালে যেখানে যাবার যাবেন।'

বিশ্বাসে ভর করে গুটি গুটি এগুলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি শুধু ঘরে পৌঁছে দিয়েই কর্তব্য শেষ করলেন না। একটা কুলিকে ডেকে পাহারায় রাখলেন, খাবার আনিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'তবে আমি যাই?'

মা দুই চোখে কৃতজ্ঞতা নিয়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন। হয়তো বা বিস্ময়। মানুষ মানুষের শত্রু, এটাই তো বহুদিনের অভিজ্ঞতা তাঁর।

'কিন্তু সূর্য উঠলেই তো আর সকাল হয় না? টুনিদেরও সকাল হলো না। বাসে চড়ে কালিঘাটে নেমে, রাস্তার প্রত্যেকটি বাড়ির নম্বর দেখতে-দেখতে, রাস্তার প্রত্যেকটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে-করতে ভীত-চকিত দুটি মানুষ হয়রান হয়ে বরেন-মামার দরজায় এসে কড়া নাড়লো, দরজা খুলে দিয়ে প্রথমে মামার বড়ো মেয়ে দুটি অবাক হলো, তারপর মামী নিজে, আর তারপর আপিশ থেকে ফিরে মামা। মেয়ে দুটির অবাক হওয়ার সঙ্গে তাদের মা-বাবার অবাক হওয়ার অবিশ্যি কোন সম্বন্ধ ছিলো না। মেয়ে দুটি কখনো দ্যাখে নি তাদের, তাছাড়া তাদেরই সমবয়সী যে-মেয়েটি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো দরজা ধরে, তার বেশভূষা দেখেও

হয়তো অবাক হয়ে থাকবে। কেননা সেই অতি জীর্ণ, অতি দুঃখী টুনির সঙ্গে এদের মিল কোথায়?

কিন্তু মামা মামী অবাক হলেন তাদের অবিমৃষ্যকারিতায়। কতকালের মধ্যে দেখা নেই শোনা নেই, সত্যি বলতে যাদের সঙ্গে কোনো ছিটেফোঁটাও সম্পর্ক নেই, তারা যে এমন বেয়াকুবের মতো খেতে-পরতে এখানে এসে উঠতে পারে এ যেন তাঁরা ভাবতেই পারলেন না। শুধু থ হয়ে রইলেন। দোষই বা কী। একে তো কলকাতা শহরে নিজেদের থাকাই দায়, দু খানা ঘরের ফ্ল্যাটের মধ্যে ঠাসাঠাসি গুঁতোগুঁতি, তার উপরে এই সেদিন গুচ্ছের ক্ষতি করে বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে গ্রামে গিয়ে আটমাস থেকে কত কাণ্ড করে আবার কলকাতা এসেছে, আর তার উপরে এই?

ননীবালা একেবারে হাত জড়িয়ে ধরলেন মামীর। 'কয়েকটা দিন মামী, কয়েকটা দিন থাকতে দাও আমাদের। তার বদলে যা করতে বলবে তাই করবো।'

মামা চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'না, না, এসেছো যখন তখন থাকবেই তো, কিন্তু কথাটা হচ্ছে গিয়ে, মানে প্রিয়নাথ এমন অনাথ করে থুয়ে মরলো কেন?

তাই তো। কেন মরলো তার কৈফিয়ৎ কে দেবে।

কিন্তু তাদের নিয়ে তখন খুব কি অসুবিধে হয়েছিলো মামা মামীর? এখন ভাবলো মানসী ঠাকুর ছিলো না রান্নার, ননীবালার সাহায্যে সে অভাব তাদের খুব ভালো করেই পূরণ হয়েছিলো। সাত সন্তানের জননী বরেন-মামার স্ত্রী বাঁচলেন আগুনের উত্তাপ থেকে। আর টুনি? সে-ই কি কোনোদিন একদণ্ড বসতে পেরেছে সেখানে? বোমার সময়ে ঝিয়ের একজনও ছিলো না সেই শহরে। তবে? আর যে বাড়িতে একুশ থেকে এক বছরের পর্যন্ত বাচ্চার ভিড়, তাদের নাওয়াতে হয় নি? খাওয়াতে হয় নি? কাঁথা কাপড় কাচতে হয়নি? ঘুম পাড়াতে হয়নি? পড়াতে হয় নি অ আ, ক খ? বড়োদের রাশি-রাশি কাপড়-জামার স্তূপ বাথরুমে, মামীর শুচিবায়ুর দোষ, কেবল মোছো আর ঝাড়ো। কিন্তু লোক কই। এই তো টুনি এতগুলো লোকের সেলাই-ফোঁড়াই তা-ই বা করবে কে টুনি ছাড়া? সে বাড়ির বড়ো মেয়েরা তো সকালে পড়ে, দুপুরে স্কুলে থাকে, বিকেলে বেড়াতে যায়, আর সন্ধ্যায় গানের মাস্টার আসে সপ্তাহে তিনদিন করে। তাদের সময় কই?

আবার গান! এখানেও গান।

টুনি অস্থির বোধ করে আর ননীবাবা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন যখন গান শেখে মেয়েরা রান্না করতে করতে খুন্তি হাতে অন্যমনস্ক হয়ে যান। কী তাঁর মনে পড়ে কে জানে। হঠাৎ একদিন বললেন, 'মেয়েদের গান শেখাও কেন মামী? মেয়েমানুষ, গান দিয়ে হবে কী?'

মামী হেসে আকুল, 'শোনো কথা, গান কি একটা সোজা জিনিস আজকাল? জানো এই গান দিয়ে কত মেয়ে আজকাল কত রোজগার করছে? আর কী নাম, কী খাতির।'

টুনি পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে মা'র দিকে। বুকটা কি ধক করে উঠলো মা'র। ভাবে মনে-মনে। মা যে এই নিয়ে এ-কথাটা দু'বার শুনলেন সে-কথা কি মনে পড়লো তাঁর?

মেয়ে দুটির একটি বললো, 'আমার সব চেয়ে বড়ো অ্যামবিশন কী জানো, টুনি?'

বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে টুনি বলে, 'কী?'

'সিনেমায় প্লে-ব্যাক করা। কখনো তো দ্যাখো নি, তাতে যে গান হয়, আজকাল তো সব প্লে-ব্যাকই করে।'

'প্লে-ব্যাক?'

'অর্থাৎ আগে ছিলো যে পার্ট করতো তাকেই গান গাইতে হতো, এখন কিন্তু তা নয়। সে
খ নাড়ে, আর অন্য মেয়ে পেছন থেকে গেয়ে যায়।'

'তা-ই নাকি?'

'হ্যাঁ। একদিন তোমাকে দেখিয়ে আনবো তাহলেই বুঝবে। যদি ঈশ্বর আমাকে জিগ্যেস
রেন তুমি কী বর চাও, আমি বলবো—সুখ চাই না, শান্তি চাই না, টাকাকড়ি কিছু চাই না
াপু, একবার যেন কোনো সিনেমায় প্লে-ব্যাক করতে পারি।'

টুনি হাঁ করে চেয়ে-চেয়ে শোনে।

'তা-ই তো এতো খাটি এর পেছনে। এই যে আমাদের মাস্টার-মশাইকে দেখছো, ইনি তো
য়মিত গ্রামোফোনে গান দেন, রেডিওতে গান করেন—'

'ও।'

'ফুটকির কিছু হবে না, কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছেন, আমি চেষ্টা করলে খুব শিগগির
রডিও আর্টিস্ট হতে পারবো।

'ও।'

'তখন আর পায় কে? যেমন নাম, তেমন টাকা।'

'টাকাও দেয়?'

'দেয় না?'

'কী করে জানবে যে তুমি গাইতে পারো?'

'কী করে আবার? আমি যাবো, অডিশন দেবো—'

'অডিশন?'

'বোকাচন্দ্র, এ-ও বোঝো না?' হেসে গলে যায় মেয়েটি। 'তুমি যদি ওদের লেখো যে আমি
ান করবো ওখানে, অমনি ওরা তোমাকে অডিশনে ডাকবে অর্থাৎ পরীক্ষা নিয়ে দেখবে তুমি
ার যোগ্য কিনা। যদি যোগ্য হও তখন গানের তারিখ দেবে।'

'ও।'

এর পরে মেয়েটি তার নতুন-শেখা গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে চলে গেলো আঁচল
িরিয়ে। ভাবতে বসলো টুনি। হাতের কাজ হাতে রইলো, বাচ্চারা উদ্দাম সুখে তছনছ করতে
াগলো ঘরবাড়ি, খাবার জায়গা দিতে ভুল হয়ে গেলো, বকুনি খেলো সক্কলের, তবু সে
াবতে লাগলো।

সেই ভাবনা কি সেই মেয়েটির একবেলা দুবেলাতেই ফুরিয়ে গেলো? একদিন দু-দিনেই
িরিয়ে গেলো? হাঁটতে, চলতে, ঘর ঝাঁট দিতে, কাপড় কাচতে, বাচ্চাদের নোংরা ঘাঁটতে,
াস্তিতে, অপমানে, অসম্মানে ভাঙতে-ভাঙতে তিনটি মাস ধরে এই ভাবনা ভাবলে সে।

তারপর একদিন এসে মাস্টারমশায়ের মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'একটা কথা।'

মাস্টারমশায় অবাক, 'কী কথা, মা?'

তিনি তখন গান শিখিয়ে বাইরে ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছেন। টুনিকে তিনি দেখেছেন, নানা
াবেই দেখেছেন, মেয়েরা যখন গান শিখতে বসবে তখন শতরঞ্জি বিছোতে দেখেছেন,
ারমনিয়ম বের করে এনে দিতে দেখেছেন, বাঁয়া-তবলা ঠিকঠাক রাখতে দেখেছেন, দরকার
লে গান গাইতে-গাইতে মেয়েরা যখন হাঁক দিয়েছে 'এই টুনি কয়েকটা লবঙ্গ দিয়ে যাও

তো।' কিংবা, 'আদা দিয়ে বেশ কড়া এক কাপ চা করে আনো তো'—হুকুমমতো সেই সব মেয়েটিকে নত মুখে তালিম করতে দেখেছেন। অথবা তাদের দু-বছরের ভাই তিলু যখন ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে হারমনিয়মের উপর, সব রীডের উপর হাঁটু চেপে বেলো টেনেছে আর একটা বুকচাপা কাতর আর্তনাদ উঠেছে হারমনিয়মে (সেই শব্দটার সঙ্গে টুনি তখন কোথায় যেন নিজের মিল পেয়েছে মনে-মনে।) তখনও মাস্টারমশায় ধমক খেতে দেখেছেন টুনিকে, 'করিস কী সারাক্ষণ, ছেলেটাকেও সামলাতে পারিস না?' ভেতর থেকে ওদের মা চেঁচিয়ে উঠেছেন এই বলে, আর ভাইয়ের পিঠে চড় মারতে-মারতে মেয়েরা বলেছে, 'কী করো তুমি? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো? দেখতে পাও না? নিয়ে যেতে পারো না ওকে এখান থেকে?'

শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করে হাত-পা ছোঁড়া বাচ্চা ছেলেকে তুলে আনতে রীতিমতো পরিশ্রম হয়েছে টুনির। সেই সবই দেখেছেন মাস্টারমশায়। আজকে হঠাৎ এমন করে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সে যদি একটা জরুরি কথা বলতে চায় তাঁর সঙ্গে তাহলে তিনি তো অবাকই হবেন।

নিঃশব্দে নতমুখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টুনি বললো, 'আপনি তো কত ছেলেমেয়েকে গান শেখান, আমাকে কি একটা কাজ দিতে পারেন না?'

'তোমাকে! তোমাকে আমি কী কাজ দেবো?'

'গান শেখানোর। এই যারা ছোটো, যারা প্রথম শিখছে।'

'তুমি গান জানো?'

'অল্প-অল্প—'

'শিখেছিলে কখনো?'

'দেশে থাকতে একটু-একটু—'

'এখানে তো অল্প-অল্প, একটু-একটুতে কিছু হয় না মা, যাচিয়ে, বাজিয়ে, সব দেখে শুনে নেয় যে।'

মাস্টারমশায়ের কথা বড়ো মিষ্টি লেগেছিলো টুনির। ভারি নরম। যেন তার মধ্যে আশা আছে, আশ্বাস আছে। সাহস পেয়ে বললো, 'আর আপনার কাছেও তো শিখছি তিন মাস ধরে।'

'আমার কাছে?'

'ওদের শেখান, আমি তো শুনি?'

'তাইতেই কি শেখা হয়? এ বড়ো কঠিন কাজ।'

টুনি চুপ করে রইলো। কে জানে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাস্টারমশায়ের দুঃখ হলো কিনা। আস্তে বললেন, 'আচ্ছা, এক কাজ করো তুমি। আমার মেয়েকে শেখাও, মাইনে দেবো।

'আপনার মেয়েকে!' বুকটা কেঁপে ওঠে টুনির। 'আমি আপনার মেয়েকে শেখাবো?'

'সে খুব ছোটো, হাতে খড়ি দিয়ে দাও, শেষে একটু সুর এলে তখন আমি ধরবো কেমন?'

প্রায় পঞ্চাশ-প্রৌঢ় গায়ক তার মাথায় হাত ছোঁয়ালেন। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এলো টুনির।

সেই তো জীবনের শুরু। সেই মাস্টারমশায়। সেই রামেন্দু ভট্টাচার্য। তারপরে যেদিন এলেন তিনি, মেয়েদের গান-টান শিখিয়ে বললেন, 'কই, সেই মেয়েটি কোথায় তোমাদের? ডাকো দেখি।'

'কাকে। টুনিকে?'

পায়ে-পায়ে, ভয়ে-ভয়ে টুনি নিজেই ঘরে এসে দাঁড়ালো। মাস্টারমশায় সস্নেহে বললেন, 'এসো মা, এসো। একটা গান শুনবো তোমার আজ।'

মেয়ে দুটি বিনা ভূমিকায় হেসে উঠলো, 'ও মা, টুনি গাইবে কী। ও গান জানবে কোথা থেকে?'

'আহা। জানতেও তো পারে?' কাঁচা-পাকা মাথাটি আন্দোলিত হলো মাস্টারের, 'দেখি না।'

টুনি বসলো। পিঠের শিরদাঁড়া ভিজে গেলো ঘামে, ঘামলো কপাল, হাতের তেলো। কিন্তু দাঁড়াতে হলে এর চেয়ে সাহস চাই, শক্তি চাই। আস্তে টেনে নিলো হারমনিয়মটি।

মেয়েরা হাসছে মুখ টিপে। মাস্টারমশায় লক্ষ্য করে গম্ভীর হলেন। ততোক্ষণে ভিড় জমেছে ঘরে। ছোটো ছেলেমেয়েরা এসে ঠেলাঠেলি, ঠেসাঠেসি করছে, তাদের মা মোটা শরীরে হাঁপাচ্ছেন, এককোণে রান্না ফেলে ননীবালাও ময়লা কাপড় দরজার আড়ালে ঢেকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মনে-মনে টুনি তার দেবতাকে ডাকলো, যে-দেবতা তাকে চিরদিন সাহস জুগিয়েছে, শক্তি জুগিয়েছে, খরচ জুগিয়েছে, সকলের সব চোখ রাঙানি অবহেলা করে হারমনিয়ম কিনে দিয়েছে, এনে দিয়েছে আঠারো খানা রেকর্ড সুদ্ধু গ্রামোফোন। হঠাৎ মা'র দিকে তাকালো সে, করুণ বিধুর, দুঃস্থ বিধবা। বরেন মিত্তিরের রাঁধুনি। আর আশ্চর্য! মা'র চোখে তো সে সেই আলো দেখলো। যে-আলো নির্মলের। কোনো গাইয়েকে ডেকে এনে সে যখন টুনির গান শোনাতো, গান শেখাতে অনুরোধ জানাতো, গাইতে ব'সে টুনি তখন তাকাতো নির্মলের মুখের দিকে। ঠিক, ঠিক, এই ভাষা, এই আশা, এই আলো জ্বলে থাকতো তখন তার বড়ো-বড়ো চোখ দুটিতে।

মুহূর্তে ভয় ভাবনা লজ্জা দুঃখ সব ভুলে টুনি গেয়ে উঠলো গান। পাখির গান। বনের গান। বন্দনার গান। যে-গান অলৌকিক, যে-গানের স্পর্শে দুঃখ পবিত্র হয়, সুখ ভেসে ওঠে, শান্তি অবগাহন করায়। সেদিন টুনি হয়তো বা কয়েক মুহূর্তের জন্য ঈশ্বরকেও নামিয়ে নিয়ে এসেছিলো তার গানের কান্নায়। নির্মল! তুমিও কি সেই মুহূর্তে টুনির কথা ভেবেছিলে? টুনি তো সেই গানের কান্না দিয়ে তোমাকেই ডেকেছিলো, তোমাকেই খুঁজেছিলো। যত কান্না পাষাণ হয়ে চাপা ছিলো বুকেব মধ্যে, সব তো সে ঝরিয়ে দিয়েছিলো সেদিন। তার ভালো লেগেছিলো। ভীষণ। ভীষণ ভালো। শুধু কি ভালো? গান গাইতে পেয়ে সে যে সেদিন বেঁচেছিলো। একটার পর একটা, একটার পর একটা। এই তিন মাসের মাস্টারমশায়ের গানও বাদ দিলো না সে।

তারপর থামলো।

পার্থিব জগতে ফিরে এসে টুনি হারমনিয়মের উপর ভেঙে পড়লো মাথা রেখে।

আর তারপর?

তারপর তো এই।

রামেন্দু ভট্টাচার্য। ভারতবিখ্যাত প্রোফেসর আলম খাঁর যিনি প্রিয়তম শিষ্য। যাঁর জুড়ি ঠুংরি গায়ক বিরল। খেয়ালের আটঘাট যার নখদর্পণে। আধুনিক গানের জন্মদাতা বলে সবাই যাঁকে পুজো করে মনে-মনে। সেই তিনিই তারপর মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন তাকে। তাঁর সব ঢেলে দিলেন এই আঠারো বছরের মেয়েটির গলায়। টুনি পাখি হয়ে উড়লো, বাঁশি হয়ে বাজলো, তানপুরোর চারটে তার তার গলায় পোষা ময়না হয়ে ধরা দিলো। নির্মলের ভবিষ্যতের স্বপ্ন টুনি রাধানগরের সন্ধ্যামণি দত্তমল্লিক নাম বদলে সারা বাংলার কিন্নরীকণ্ঠী মানসী দত্ত হলো।

তিন

রাত ভারি হ'য়ে উঠেছে, আস্তে-আস্তে লেকের জলে অস্ত গেলো চাঁদ, ঘর অন্ধকার হয়ে উঠলো; দিগন্ত-জোড়া কালো আকাশে সোনার বুটি হয়ে ফুটে উঠলো অজস্র তারা। শেষ ফাল্গুনের এক ঝলক বাতাস মরমর করে পাতা ঝরিয়ে বয়ে গেলো হাহাকারের মতো। দূরে চিকচিক করে কেঁপে উঠলো লেকের জল, লাইটপোস্টের আলোগুলো শিহরিত হলো জলের তলায়।

কটা বাজলো? ভোর হয়ে এলো নাকি? পাখিরা তবে ডানা ঝাপটাচ্ছে কেন? মানসী জানালা ছেড়ে এসে দেয়ালের সুইচবোর্ডে হাত রাখলো, আলো জ্বলে উঠলো দপ করে পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত ঘর। ধবধবে বিছানার উপর ফরাসি নেটের মশারি। দুধের ফেনার মতো ফুলে-ফুলে উঠছে বাতাসে, দুটো-একটা মশা কালো বিন্দুর মতো লেপটে আছে রক্তের আশায়। মানসী দুই হাতের সংঘর্ষে পিষে ফেললো তাদের। আলপিনের মাথায় এক ফোঁটা লাল কালির মতো একটুখানি রক্ত লেপটে গেলো হাতের চেটোতে। পাৎলা মশারি ঢেউ হ'য়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে স্থির রইলো খানিকক্ষণের জন্য।

রাধানগরেও মশা ছিলো। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এলেই ভন্‌ন্‌ন্‌ন্ ক'রে পাক খেয়ে লাখ-লাখ মশা উঠে আসতো পুকুরঘাট থেকে, নাকে মুখে বসতো। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে দরজা জানালা বন্ধ করে ধূপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে দিতো টুনি। অতিষ্ঠ হয়ে প্রিয়নাথবাবু বলতেন, 'দম বন্ধ হয়ে গেলো যে, তার চেয়ে তুই আমাকে মশারিটা ফেলে দে, জানলা খোলা থাক।' চারদিকে চারটে পেরেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা তুলে রাখা মশারিটা টুনি পাখার বাতাস দিয়ে-দিয়ে ফেলে দিতো, লাভ হতো না কিছু। চৌখুপি চারখানার শতচ্ছিন্ন মশারির তলায় শুয়ে প্রিয়নাথবাবু মশার কামড়েও অতিষ্ঠ হতেন, গরমেও সেদ্ধ হতেন। টুনি কখনো-কখনো লণ্ঠন নিয়ে ভেতরে ঢুকে মশা মারতো, কখনো বা বিরক্ত হয়ে তুলে দিয়ে বলতো, 'তার চেয়ে আমি তোমাকে বাতাস করি বাবা, গরমও লাগবে না, মশাও কামড়াবে না।'

শুধু কি মশারি? প্রিয়নাথবাবুর পিঠের তলায় একটা আস্ত তোশকও ছিলো না শেষের দিকে, তুলোগুলো দলা বেঁধে গিয়েছিলো, উপরের কাপড়টা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছিলো সেগুলো। তারই উপরে একখানা পুরোনো শাড়ি দু-ভাঁজ করে পেতে সারাদিন শুয়ে থাকতেন

নিজের বিছানার আরামে গা ঢেলে দিতে গিয়েও উঠে বসলো মানসী, বসলো এসে চেয়ারে। কর্নার-শেল্‌ফে হৃৎপিণ্ডের মতো টিকটিক করছে দামি টাইমপীসটি, তার কালো-কালো ডানা দুটির দিকে তাকালো। সুন্দর জিনিসটি। মাস্টারমশায় দিয়েছিলেন। কালিঘাটের

বাড়ি ছেড়ে তেরো টাকা ভাড়ায়, সরকার গলির এক অন্ধকূপে, এক অন্ধকার ঘরের বাসিন্দা হয়ে মাকে নিয়ে যখন মানসী স্বাধীন হলো, তখন। নতুন সংসার পাতবার জন্য যেমন নতুন হাঁড়িকুড়ির দরকার হয়েছিলো, নতুন জীবনের প্রথম পদক্ষেপের জন্য তেমনি এই ঘড়িটি। মাস্টারমশায় বলেছিলেন, 'সারাদিন যত খুশি রাঁধো বাড়ো, খাও, বেড়াও, কিন্তু সকাল-সন্ধ্যায় এটির দিকে তাকিয়ে বসতে হবে তোমাকে। সেখানে ফাঁকি দিলে চলবে না।'

নতুন বাড়িতে আসবার দিন তিনেক পরে ছোট্টো একটি অনুষ্ঠানও হয়েছিলো। ভাড়া-করা তক্তপোশে শাদা চাদর পেতে, ঘটিতে জল ভরে ফুল সাজিয়ে মাঝখানে রেখে, ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরের মধ্যে একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছিলো। মাস্টারমশায় সেদিন ডোর বেঁধে দিলেন তার হাতে। মানসী মাস্টারমশায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো, গুরু গ্রহণ করলেন তাকে। ঈশ্বর সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করলো এই গুরুর প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবে সে, আগুন ছুঁয়ে বললো, গুরুর দান এই গান তার প্রাণ হবে, মন হবে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব-কিছু সে সমর্পণ করবে এই গানের পায়ে। গুরু বরণ করে মাস্টারমশায়কে প্রণাম করলো, মাস্টারমশায় সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন। আর তখুনি তিনি এই ঘড়িটি বের করলেন পকেট থেকে।

হারমনিয়ম ছিলো না, বাঁয়া-তবলাও না। হারমনিয়ম একটা মাস্টারমশায়-ই জোগাড় করে আনলেন কোথা থেকে, আর বাঁয়া-তবলার বদলে রইলো এই ঘড়ি। একটু অদ্ভুত ঘড়ি। এই ঘড়িটাই শব্দ করে তাল দিতো গানের সঙ্গে-সঙ্গে। একটা যন্ত্র ঘুরিয়ে দিলে প্রত্যেকটি টিকটিক আওয়াজ রীতিমতো জোরে তবলার বোলের মতো টকটক করে উঠতো। আর সেই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক লয়ে গান শিখতো টুনি। তারপর অবিশ্যি সব যন্ত্রই একদিন কিনতে পারলো। চারশো টাকা দামের ডবল রীডের নতুন ধরনের নরম স্বর হারমনিয়ম, তামার বাঁয়া-তবলা, দস্তার হাতুড়ি, তানপুরো, দরজি ডাকিয়ে সাটিনের জামা হলো সকলের, আরো কত প্রাচুর্য। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, 'সারাদিন তুই তবলচি কোথায় পাবি রেওয়াজ করতে ? তোর এই কলের তবলচিই সব চেয়ে নিরাপদ। এর মতো লয়দার বীটও আর তুই কিছুতে পাবিনে। এটা আমার গুরুদেব আমাকে দিয়েছিলেন, আমি তোকে দিলাম। যত্ন করে রাখিস।'

তা সত্যি। সময়ে-অসময়ে সব সময়ের সঙ্গী তো তার এই ঘড়িটিই। এই ঘড়ি না হলে তার চলে না। গেল বছর শীতকালে যখন মাস্টারমশায় মারা গেলেন, তখনও মানসী এই ঘড়ি হাতে নিয়ে তাঁর শিয়রে বসতো, তিনি গুনগুন করতেন, এই ঘড়ি টকটক করতো, মানসী তুলে নিতো নতুন সুর। শেষের দিকে মাস্টারমশায় গলা দিয়ে পারতেন না, হাতে বাতাতেন, নোটেশন লিখে দিতেন, তখনও কত সুর ছিলো তাঁর বুকের মধ্যে, দেবার মতো কত সম্পদ ছিলো। মাস্টারমশায় ছটফট করতেন, মানসী চোখ ভরা বেদনা নিয়ে তাকিয়ে বসে থাকতো। একটি সবুজ আলো জ্বলতো শিয়রে, নিঝুম হয়ে মাস্টারমশায় পড়ে থাকতেন বিছানায়, আস্তে-আস্তে গান করতো সে, মাস্টারমশায় শুনতেন। ঐটুকুতেই তাঁর যেন অনেক যন্ত্রণার অবসান হতো।

তারপর একদিন মারা গেলেন। নিঃশব্দে। নিঃসাড়ে। সারা শহর ভেঙে পড়লো। কত ছাত্র, কত ছাত্রী। কত ভক্তের দল। কত ফুল আর কত মালা। মাস্টারমশায়কে কে না ভালোবাসতো? তাঁর সান্নিধ্যে এসে কে না মুগ্ধ হয়েছে? কে না পেয়েছে? একেবারে কল্পনার চরিত্র। দু-হাতে উপার্জন করেছেন, খরচ করেছেন দশভুজা হয়ে। হাত পেতে কেউ ফিরে যায় নি, এমন মানুষ ছিলেন তিনি।

কিন্তু কী আশ্চর্য! যে-গলায় তাঁর সুরের মন্দাকিনী বয়ে যেতো, সে-গলায় তাঁর ক্যানসার হয়েছিলো। পুরো ছ'টি মাস এই গলার ঘায়ে ভুগে সর্বস্বান্ত হয়ে শেষে তিনি গেলেন। সেই সময়ে মানসীর দিন-রাত ছিলো না, আহার-নিদ্রা ছিলো না, যেন সুখ-দুঃখেরই বোধ ছিলো না কোনো। মাস্টারমশায়ের যোগ্য স্ত্রী, মাস্টারমশায়ের সব কাজের অনুরাগিণী, সমভাগিনী, ক্লান্ত অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকতেন তার আশায়। তার উপর নির্ভর করে আশা পেতেন তিনি, শান্তি পেতেন। মানসী কারো দিকে তাকাতো না, কোনো কিছু ভাবতো না, শুধু এই চিন্তাই তাকে অনুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতো, কেমন করে ভালো হবেন মাস্টারমশায়। কী করলে অন্তত আরো কয়েকটা দিন তাঁকে ধরে রাখা যায় এই পৃথিবীতে।

বিরক্ত হলেন ননীবালা। বিরক্ত তিনি অনেকদিন আগেই হয়েছিলেন। এইবার তার প্রকাশ আরম্ভ হলো। প্রথম দিন মেয়েকে আড়ে-ঠারে বললেন, দ্বিতীয় দিন শুনিয়ে-শুনিয়ে আপন মনেই গজগজ করলেন, তৃতীয় দিন ঝংকার দিলেন, 'লোকে বলতেই বলে উদরি বাঁদরি যক্ষ্মা, তিন হলে নেই রক্ষা। যমের অসাধ্য যে রোগ, তার জন্য এতো ঘটাপটার কোনো অর্থ হয়? এ কেবল খোদার উপর খোদকারি। আর ডাক্তারগুলোও তেমনি। যেন জঙ্গলের নেকড়ে। ওৎ পেতেই আছে অছিলা করে টাকা খাবার জন্য। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে এক ঘা, আর উকিলে ছুঁলে আঠারো ঘা; এখন দেখছি কলকাতার এই ডাক্তারগুলো বাঘকেও ফেল ফেলেছে, উকিলকেও ফেল ফেলেছে। ছিনে জোঁকের বাবা। রক্তশোষা বাদুড়। কেন রে বাপু, মিথ্যে আশা দিস। জানিসই তো বাঁচবে না, ঢং করে স্যুটবুট লটকে, গলায় নল ঝুলিয়ে স্তোক দিস কেন? সোজাসুজি বলতে পারিস না, করবার কিছু নেই?'

এক নিঃশ্বাসে এতো কথা বলে গেছেন ননীবালা, মানসীর কানে এক বর্ণও পৌঁছোয় নি। সে-সবে কান দেবার সময় তার ছিলো না। এক ডাক্তার ছেড়ে সে তখন অন্য ডাক্তার ধরেছে, এক পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতির শরণ নিয়েছে। ডীপ্ এক্স-রে করাবার পরামর্শ চলেছে মাথায়-মাথায়। যা লাগে, যত লাগে। এতো বড়ো একটা প্রাণের জন্য কী না ভাবতে পারে মানসী? কী না করতে পারে?

এর পরে ননীবালা রীতিমতো বিদ্রোহ আরম্ভ করলেন, মেয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন 'কেন, তুই-ই কি একা গান শিখেছিস নাকি যে তোরই এতো মাথাব্যথা? আর কেউ নেই? আর কেউ করতে পারে না?'

'সবাই করে মা—' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিয়েছে মানসী, 'যে-যা পারছে সে-ই তাই করছে।

'তোর উপরেও আরো কারো করবার দরকার হয় নাকি? তুই তো একাই একশো দেখছি আর এ-ও তো কম তাজ্জবের কথা নয় বাপু, নিজের টাকা এক পয়সা খরচ করবে না, পরের টাকায় দরদ নেই। টাকার তো আর অভাব নেই লোকটার? অন্যেরটা এমন নিচ্ছেই বা কেমন ক'রে? কাঁড়ি-কাঁড়ি রোজগার করেছে জীবন ভ'রে—'

বেরুবার জন্য প্রস্তুত হতে-হতে থেমে গেছে মানসী, ফিরে তাকিয়েছে, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছে, 'মাস্টারমশায়ের কিছু নেই।'

'নেই তো গেলো কোথায়? তার মানে উড়িয়েছে।'

'না উড়োলে আমাদের মতো দুঃস্থদের খাওয়াপরার ভাবনা চুকতো কিসে?'

'কী?' ফোঁস করে উঠেছেন ননীবালা, 'ও-রকম বলবিনে টুনি, গরিব থাকতে পারি, তাই বলে ভিক্ষুক ছিলাম না। লোকের কাছ থেকে এমন হাত পেতে নিই নি কোনোদিন।'

'নাওনি বুঝি ?' উদাস ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোণে একটু হেসে পায়ে জুতো গলিয়েছে মানসী।
র মেয়ের রকম-সকম দেখে ননীবালা আপাদমস্তক জ্বলে উঠেছেন, 'না, নিই নি। কক্ষনো
ই নি।'

'তাহলে ভুলে গেছো। যাক গে, দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমার ফিরতে দেরি হবে।'

ননীবালা দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসেছেন মুখের সামনে, 'ভেবো না তোমার এই ঠেস দিয়ে
থা বলার অর্থ আমি বুঝি না। কিন্তু তবু আমি এ-কথা বলবোই যে দিয়েছে সে সাধ করে
য়েছে, দিয়ে কিছু পেয়েছে বলেই দিয়েছে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে মানসী, অনেক কথা তার বেরিয়ে আসতে
য়েছে বুক ঠেলে, অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করেছে, কিন্তু তক্ষুনি সামলে নিয়েছে নিজেকে।
লাভ ?

'আর তুমিও এমন কিছু একটা নবাবজাদি নও—' ননীবালা শেষ করেছেন কথা,
তামারও কিছু অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই যে জলের মতো দু-হাতে যেমন খুশি ঢালতে পারো,
ফলতে পারো।'

'একে কি তুমি ঢালা বলো? ফেলা বলো?'

'হ্যাঁ, বলি। একশোবার বলি। তারপর তোমার কিছু হলে কেউ কানাকড়ি দিয়েও জিগ্যেস
রবে না।'

'হয়তো করবে। হয়তো আমার জন্যও কেউ ঢালবে, ফেলবে। এ-ভাবেই চলে।'

ননীবালা রুখে উঠেছেন, 'ভারি স্বাধীন হয়েছিস, না? মাকে আর গ্রাহ্যই নেই। টিটকিরি
য়ে কথা! গলা বেচে দুটো টাকা রোজগার করিস ব'লেই বুঝি ভাবিস, মস্ত দিগগজ
য়েছিস? আমার আর বলবার কিছু থাকতে পারে না?'

এবার মা'র মুখের উপর শীতল চোখে তাকিয়েছে মানসী। মেজাজ তার ঠাণ্ডা; বরফের
তো গলায় জবাব দিয়েছে, 'বলবার কথা তো সবই তোমার। আমার তো কোনোদিন কিছু
লো না, তোমার কথামতোই সারাজীবন চলে এসেছি, এখনো চলছি। তবু কি তোমার সাধ
টে না?'

'যদি তা-ই বলিস তাহলে আমার এ-কথাটাও তোকে রাখতে হবে।'

'কী?'

'নিত্য তিরিশ দিন ঐ ঘা-কোপের খরচ আর তুমি জোগাতে পারবে না। আর সারাদিন
মন মাখামাখি ঘেঁষাঘেঁষিও করতে পারবে না।'

'এই তোমার কথা?'

'হ্যাঁ। এই আমার কথা।'

এর পরে আর মানসী এক মুহূর্ত দেরি করে নি, একবার তাকায় নি, সিঁড়ি বেয়ে তরতর
রে নেমে এসেছে নিচে, রাস্তার খোলা হাওয়ায়, আকাশের তলায় এসে মা'র হয়ে মনে-মনে
শ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, চলতে-চলতে হঠাৎ নির্মলের মুখখানা ভেসে উঠেছে চোখে,
বিশ্রি নিমেষের জন্যই।

ধানগর থেকে কলকাতা আসবার প্রায় ন-দশ মাস পরে, যখন টুনি টুনিই ছিলো, যখন
। অন্য দুটি মেয়ের সঙ্গে তাকেও গানের সময় ডাকতেন, শেখাতে-শেখাতে একাগ্র

হয়ে উঠতেন, আর সেই কারণেই কালিঘাটের বরেন-মামার বাড়িতে বাস করা অসহ্য হ
উঠেছে, হঠাৎ একদিন বিকেলে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলো সুশীলা-পিসির সঙ্গে।

একখানা ঘর খুঁজতে বেরিয়েছিলো তারা। সে আর ননীবালা। এখানে গান শেখা অসম্ভব
মেয়ে দুটি হিংসেয় জ্বলে গিয়ে যে সব বিশ্রী কুশ্রী ভাষা প্রয়োগ করতো, শুনতে-শুনতে কা
কইয়ের মতো বুকের ভেতরটা যেন দাপাতে থাকতো টুনির। মাস্টারমশায়ের পক্ষপাতি
মামা-মামী আগুন হয়ে উঠেছেন, আর তার তাপ বড়ো কম নয়। মা মেয়ে সারাদিন চোর হ
আছে, চকিত হয়ে আছে। মন জোগাবার জন্য সারাক্ষণ ঘুরছে চরকির মতো, হাতের কা
কেড়ে নিচ্ছে, গোছানো ঘর আবার গুছিয়ে দিচ্ছে, কথা বলছে খোশামোদ করে, যদি সপ্তাহে
এই তিনটে দিনে, তিনটি ঘণ্টার জন্য তাঁরা ক্ষমা করেন টুনিকে। মেয়েদের গান শেখবার সম
একটুখানি বসতে দেন দয়া করে।

অসম্ভব। যে-মেয়ে আশ্রিত, অবনত, তার সঙ্গে একাসনে বসে গান শিখবে মামা
মেয়েরা, তাদের অসম্মান হয় না? অপমান হয় না? আভিজাত্যে আঘাত লাগে না? তাই নি
তাঁরা প্রকাশ্য ভাবেই রাগারাগি আরম্ভ করলেন, কোনো আড়াল-আবডাল ভদ্রতা
সৌজন্যের ধার ধারলেন না। মাস্টারমশায় বললেন, 'তাতে কী হয়েছে, সমানবয়সী তিন
মেয়ে, দু-জন তো শেখেই, বসুক না আর একজন, ক্ষতি কী? আর তার জন্য আমি তো কি
বেশি চাইছি না।'

তা না-ই বা চাইলেন, কিন্তু মামা তো তাঁর নিজের মেয়েদের জন্যই মাসের শে
অতগুলো টাকা মাস্টারের হাতে তুলে দিচ্ছেন? এতে কি সেটার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে? দু
মেয়ের জন্য যেটা দেন, সেখানে যদি আর একজন এসে ভাগ বসায়, ফাঁকতালে তার কাজ
হাসিল হতে পারে বটে, কিন্তু অন্য দু'জনের নিশ্চয়ই ক্ষতি হয়।

এ-কথারও প্রতিবাদ করলেন মাস্টারমশায়, হেসে বললেন, 'মেয়েটি তো শুনেই শি
ফেলে, কাছে বসে থাকলেই কি অন্যদের ক্ষতি হতে পারে? কখনো সম্ভব? গান-বাজ
ব্যাপারটাই তো বহু লোকের। গায় একজন, ঘিরে বসে দশজন। ওর যখন এ-বিষয়ে প্রতি
আছে, সেটাকে অবশ্যই—'

এইখানেই বাড়িসুদ্ধু সকলের ব্যথা, টুনির সম্পর্কে মাস্টারমশায়ের এই উক্তিই টুনি
সর্বনাশ। শেষে মাস্টারমশায় বললেন, 'বেশ, আপনারা যদি তা-ই মনে করেন তাহলে ওদে
সঙ্গে আর শেখাবো না। সপ্তাহে আরো একদিন আমি আসবো, তার জন্যে আমাকে আলা
মাইনে দিতে হবে না, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে ওর জন্য সময় চাইবো খানিকটা, অন্ত
ঘণ্টা খানেকের জন্য ওকে আপনারা কাজ থেকে ছুটি দেবেন।'

অপ্রসন্ন মুখে বরেন-মামা বললেন, 'ওর জন্য আপনারই বা এতো গরজ কিসের?'

মাস্টারমশায় বললেন, 'গরজ ওর গলা। আপনাদের তো অনেকবার বলেছি গানের শ
ওর অসামান্য। ঈশ্বরের দয়া পেয়েছে ও।'

'ইঃ। কী গলা!' ঠাট্টায় বেঁকে গেছেন মামা, 'দস্তুরমতো কর্কশ। এ-গলাকে আপনি ভা
বলেন?'

'আমার এই কারবার। কার ভেতরে কী রত্ন লুকোনো আছে তা আমরা পলকমাত্র শুনে
বুঝে ফেলি। আপনাকে আমি বলছি, যত্ন নিলে ওর তুল্য গাইয়ে বাংলা দেশে বিরল হবে।

এবার মামীমা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার পাশে, 'দেখুন মাস্টারবাবু, মনে আপনার ঘ

রেছে. নুন-লবণ জ্ঞান করতে পারছেন না। তাই কান শুনতে ধান শোনেন, কাকের ডাকে কাকিল দেখেন। কিন্তু সে-কথা যাক, আপনাকে বলাই ভালো, মেয়েদের জন্য আর আমরা াপনাকে রাখবো না।'

অসম্মানে লাল হয়ে উঠেছেন মাস্টারমশায়। থমকে গেছেন অনেকক্ষণের জন্য। শুধু তো সম্মানই নয়, হাজার হোক, পঞ্চাশটা টাকা মাইনে; এই তো তাঁর পেশা। এই করেই তিনি ান। সাধারণত অন্যান্য গাইয়েদের আয়ের যে-সব পন্থা তা তিনি নানারকম অসুস্থতাবশত হণ করতে পারেন নি। সারাটা বর্ষা হাঁপানিতে ভুগতেন, গলার ব্যবহার একেবারে বন্ধ াখতে হতো সেই সময়ে, আর ভালো হবার পরেও গলা সেরে উঠতে আরো অনেকটা সময় াতো। একটুও ভাঙা নয় এরকম মাজা-ঘষা গলা বছরের মধ্যে দু-মাস থাকতো কিনা সন্দেহ। ল্পবয়সে অবিশ্যি এ-রকম ছিলো না, সংসারক্ষেত্রে নেমে যখন উপার্জনের প্রয়োজন বেড়ে গলো, বয়স বাড়লো তখুনি গলা তাঁকে নানারকম কষ্ট দিতে আরম্ভ করলো। সব চেয়ে বেশি াকা পেতেন সিনেমার প্লে-ব্যাকে, সেটা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো, রেডিওর প্রোগ্রামও য়মিত নিতে পারতেন না, কত সময় গ্রামোফোন স্টুডিওতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে ঠাৎ গলা ধরে যাবার দরুন। এই টিউশনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবিকা। নিজের বাড়িতেও ক্লাশ াতেন, এসেও শেখাতেন। আর ভালো ছাত্র-ছাত্রী পেলে টাকার কথা ভুলে যেতেন।

মামীর কথায় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'সে তো বেশ থা, মা। আমিও ছাড়বো-ছাড়বোই ভাবছিলাম। আমারও মন লাগছিলো না ঠিক।'

'তা লাগবে কেন? বুড়ো বয়সে মাস্টারমশায়ের যে ভীমরতি ধরেছে।' পাশের ঘরে ফসফিস করে ঠেলাঠেলি করেছে মেয়েরা।

সারা শরীরে গরম হয়ে উঠেছে টুনি।

মাস্টারমশায় বেরিয়ে গেলেন তখুনি, একেবারে সোজা রাস্তায়। মাসের আটাশ তারিখে, ায় একমাসের মাইনে তেমনি বাকি পড়ে রইলো। বরেন-মামারও যেমন দিতে হলো না বলে াচলেন, ঐ নোংরা হাত পেতে নিতে হলো না বলে মাস্টারমশায়ও বোধহয় কম লাঘব হলেন া।

দ্রুতপায়ে টুনি এসে দাঁড়ালো কাছে, তার চোখ জলে ভরে উঠেছে, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে ঠেছে। কী বলতে চাইলো, বলতে পারলো না, শুধু থরথর করে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো। খের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত রেখে হাসলেন মাস্টারমশায়, 'কী রে পাগলি? কী হলো?'

'আমি—আমি—' টুনি তার অসহায় করুণ মুখ তুলে তাকালো।

মাস্টারমশায় সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বললেন, 'ভেতরে যা, ক'টা দিন থাক কষ্ট করে, তারপর বস্থা করে দেবো।'

'ব্যবস্থা?'

'ব্যবস্থা মানে একটা ঘর খোঁজা আর কি।'

'ঘর!'

'আলাদা থাকবি। এখানে থাকলে এই করেই জীবন কাটবে। অমন সুন্দর গান অমনিই রে যাবে।'

'আমাদের যে কিছুই সম্বল নেই।'

'সম্বল নেই, হবে। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই চিঠি লিখে খবর জানাবো তোকে।'

'মাস্টারমশায়!' হাত চেপে ধরেছে টুনি। মাস্টারমশায়ের হাত নয়, তার বাবার হাত প্রিয়নাথবাবুর হাত। মাস্টারমশায়কে ছুঁয়ে সে প্রিয়নাথবাবুর স্পর্শ অনুভব করেছে। আশ্চর্য সেই সঙ্গে নির্মলকেও যেন অনুভব করেছে বুকের মধ্যে, মনে হয়েছে সে আছে। আছে। এমনি করেই ছড়িয়ে আছে আত্মায়-আত্মায়।

ননীবালা কেমন করে জানবেন তার সেইসব অনুভূতিময় মুহূর্তের কথা। কেমন করে বুঝবেন মাস্টারমশায়ের মধ্যে সে কী পেয়েছিলো, কী দেখেছিলো। মাস্টারমশায়ের জীবনের কত মূল্য তার কাছে। টুনি কেঁদে ফেলেছিলো সেদিন।

ব্যস্ত হয়ে মাস্টারমশায় বললেন, 'তাহলে এই কথা রইলো। একটা শস্তা ঘরটর কোথাও খুঁজে বের করি, আর তোর জন্যে সত্যিই এবার দু-একটা টিউশনি জোগাড় করি।' তারপর হাসলেন, 'রাম না জন্মাতেই রামায়ণ, কী বলিস? নিজেই শিখলিনে, আবার শিক্ষক।' প্রশান্ত হাস্যে টুনির হৃদয় উদ্ভাসিত করে চলে গেলেন তিনি, সেদিকে তাকিয়ে দুঃখের আঘাতে টুনির নুয়ে-পড়া ভেঙে-যাওয়া নড়বড়ে মনটা হঠাৎ যেন সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

প্রায় দু-সপ্তাহ পরে একটা চিঠি এলো। মাস্টারমশায় লিখেছেন, ঘর তিনি দেখেছেন একটা, মন্দ নয়। একটু কষ্ট হয়তো হবে ওরকম বাড়িতে থাকতে, কিন্তু উপায় কী? একটি বাচ্চা মেয়েকে গান শেখানোর কাজও ঠিক করেছেন, তাছাড়া রেডিওতে অডিশনের ব্যবস্থা করেছেন, তিনি নিজেই নিয়ে যাবেন নির্দিষ্ট তারিখে। আরো-একটি সুখবর, সম্ভবত একটি সিনেমার গানে, কোরাসে গলা দেবার জন্য শিগগিরই তার ডাক পড়বে, পরীক্ষায় উৎরোতে পারলে বেশ কিছু উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।

জরুরি কথায় ঠাসা মাত্রই কয়েক লাইনের চিঠি। কিন্তু পড়তে অনেকটা সময় লাগলো টুনির। ননীবালাও চোখে-মুখে অদম্য উত্তেজনা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের নত দৃষ্টির দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মানুষ নয়, দেবতা। দেবতা। ভগবান যদি কোনোদিন মুখ তুলে তাকান, বুঝবো এঁর জন্যেই তিনি দয়া করেছেন। গোবিন্দ। গোবিন্দ।' তিনবার কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন কী জানি কার উদ্দেশে। তারপর গলা খাটো করে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'কাউকে বলিস নি যেন, কাকপক্ষীটি যেন জানতে না পারে। এরা যা লোক, বাবা। আমার হাতে চিঠিটা দেখে থেকে কেবল বলছে, "কার চিঠি, কার চিঠি?" আমি কি আর বলি সে-কথা? বললাম, "গাঁয়ের এক জ্ঞাতি দেওরের।" বলে, "কী লিখেছে, যেতে লিখেছে নাকি?" আরে বাপু, যদি সত্যি আজ কেউ যেতে লেখে তোরা কি ছাড়বি আমাদের! এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে দু-মুঠো ভাত দিয়ে দুটো ঝি— পাবি কোথায়? তোদের রাবণের সংসার চলবে কেমন করে?'

তবু কিন্তু টুনি বাড়ি দেখতে যাবার আগে ভেবেছিলো। বলেছিলো, 'এটা কি ঠিক হবে মা? শেষে যদি সব ভার মাস্টারমশায়ের ঘাড়েই পড়ে, সে ভারি লজ্জার। তার চেয়ে বরং—

এতো বড়ো সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে-ঠেলতে হাড় কালি হয়ে উঠেছে ননীবালার। ছিন্নবস্ত্র জীর্ণ দেহে তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠেছেন মেয়ের উপর, 'তোর আবার সবটাতেই বেশি চিন্তা। মাস্টারমশায় নিজে বলছেন, তিনি কি না-বুঝেই বলেছেন। আর এ-ভাবে তুই গান শিখবি কী করে?'

বিছানার অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে এই গানের জন্যে ননীবালার গরজ দেখে আবছা হেসেছে া, তারপর ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে দীর্ঘশ্বাসে ভ'রে উঠেছে বুক।

সুশীলা-পিসি একেবারে জড়িয়ে ধরলেন পথের মধ্যে, 'ও মা, টুনি! তোর এই চেহারা য়েছে? আহা, অমন সুস্থ মেয়েটা।'

টুনি নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিলো তাঁর। ননীবালা বললেন, 'হবে না? কী সুখে আছি মরা তা তো জানো না?'

'আর তোমারই বা কি হাল হয়েছে বউ? অমন রং পুড়ে একেবারে কালি।'

'দাসীবৃত্তি করছি, ঠাকুরঝি।' প্রায় গলা ভেঙে এসেছে মা'র। সুশীলা-পিসি মাথা নাড়লেন, ার ইদিকে গ্রামে কী কাণ্ড!'

'কী, পিসিমা?' চোখ তুলেছে টুনি।

'আর কী? কত বললাম একটু রয়ে-সয়ে থাক দুটো দিন, তা তো তোদের সইলো না।'

টুনির বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। ননীবালা সাগ্রহে বললেন, 'কেন?'

'আর কেন? সেই ছেলে ফিরে এসে একেবাবে খুনোখুনি।'

'অ্যাঁ?'

'চিঠি-ফিটি না পেয়ে, যত সব উদ্ভট খবর শুনে ছুটে এসেছে পাগল হয়ে।'

'এসেছিলো?'

'আসবে না? না-হয় খালি মন্ত্রই পড়ে নি। কিন্তু প্রাণ মন তো তার এখানেই?'

ননীবালা বিমনা হলেন। টুনি দূরে কোথায় ভাসিয়ে দিলো চোখ।

'আর তোরাই বা কী রে? বললি না, কইলি না, হুট করে চলে এলি চুপে-চুপে?'

'তুমি তো তখন ছিলে না ঠাকুরঝি। সাতগাঁয়ে গিয়েছিলে।'

'আহা, আমি কি চিরতরে গিয়েছিলাম? আমার ফেরা পর্যন্ত অন্তত তোমরা অপেক্ষা রতে পারতে।'

'কী অবস্থা হয়েছিলো আমাদের—সে তো তুমি দ্যাখো নি।'

'তা তো ঠিকই।'

টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে বুকের কাপড় চুপসে গেলো টুনির, কেউ লক্ষ্য রলো না। টুনি মুছে ফেললো তাড়াতাড়ি। কিন্তু আবার দুই চোখ ঝাউপাতার মতো ঝাপসা।

অর্ধোদয়-যোগে সুশীলা-পিসি গঙ্গাস্নানে এসেছেন, তিনদিন থেকেই চলে যাবেন। কী ভাগ্য তারই মধ্যে কেমন দেখা হয়ে গেলো। তবু তো খবর পাওয়া গেলো, তবু তো টুনি জানলো আছে, তারই জন্যে আছে।

ননীবালা স্তিমিত গলায় বললেন, 'ছুটি নিয়ে এসেছিলো বুঝি?'

হয়তো তা-ই হবে।'

'ক'দিন ছিলো?'

'ক'দিন আর! আরে বাবা, তারই মধ্যে কী রেষারেষি, হুলুস্থূল। এদের রকম-সকম দেখলে াবো, না কাঁদবো ভেবে পাই না।'

'কেন?'

'কেন আবার? ভালোবাসাবাসির ঘটা? এ টানে, সে টানে। খাতির কত ? চৌধুরী-বাড়ি বসন্ত বলে, আমার এখানে থাকো, বোসদের সেই কুঁজোটা, বজ্জাতের ধাড়ি, সেটা আব বল্লে, চিরদিন আমি তোমাকে নিজের ছেলে জ্ঞান করে এসেছি, তোমার তো আমার এখানে থাকা উচিত। ঘোষের বাড়ি, দাসের বাড়ি, ললিত বুড়োটার কথা আর বলবো কী! য বাড়িতেই মেয়ে আছে তার বাড়িতেই টানাটানি। অবিশ্যি যাদের নেই তাদেরও বড়ো ব গরজ নয়।'

'হঠাৎ এতো আদর কিসের? আগে তো কেউ দু-চক্ষে দেখতে পারতো না।'

'ও মা, বলো কী গো? তার যে তখন দু-হাত ভর্তি টাকা। খোলাম-কুচির মতো ছড়াচ্ছে ছিটোচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে। কী পোশাক, কী চেহারা। সাহেবদের মতো একেবারে টকটক করে দেখলে বাপু সত্যি ভক্তি হয়।'

ননীবালা ডুবে যেতে-যেতে বললেন, 'তারপর?'

'থানে-থানে সব কত কাপড় এনেছিলো, কত সাবান, টিনে-টিনে কত খাবার, কত ফ যুদ্ধের টাকা আর যুদ্ধের খাবার, তার কি অন্ত আছে?'

'এনেছিলো?'

'আরো কত কী কে জানে, কে দেখেছে। অনাদি বলে, ও নাকি মস্ত কী একটা হয়ে ম মাইনে পাচ্ছিলো। সৈন্যদের তো ও-ই কর্তা ছিলো।'

এর পরে ননীবালা একটি প্রকাণ্ড নিশ্বাস ছাড়লেন।

সুশীলা-পিসি কপাল চাপড়ালেন, 'যেমনি বরাত তেমনি তো হবে? নইলে অমন ছেলে জামাই পেয়ে তুমি হারাও?'

'তাই তো। পরের বাড়ির দাসীপনা করে-করে এই হাঁড়ির হাল না-হলে মা-মেয়ের দিন বা কাটবে কেন, বস্তির মধ্যে সব অজাত কুজাতের মধ্যেই বা ঘর খুঁজে বেড়াবো কেন? ক'দিন ছিলো?'

'ক'দিন আর। সব মিলিয়ে বোধহয় দিন সাতেক। থাকবেই বা আর কিসের টানে বলে তোমাদের না দেখে না-পেয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালো কেবল। শেষে একদিন সব ফে ছড়িয়ে কবে যেন চলে গেলো, জানতেও পেলুম না।'

'চলে গেলো?' এতোক্ষণ পরে এই প্রশ্নটা কান্না হয়ে বেরুলো টুনির গলায়।

ননীবালা বললেন, 'কোথায় গেলো?'

'তা কী আর বলে গেছে বোন? যাবার সময় কি সে দেখা করেছে কারো সঙ্গে?'

সেই রাত্রে ভাগ্যের এই বিড়ম্বনায়, অদৃষ্টের এই অদ্ভুত পরিহাসে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করেছিলো টুনির। কালিঘাটের বাড়ির সেই সরু দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় লাফি পড়তে ইচ্ছে হয়েছিলো। সারারাত জেগে থাকতে-থাকতে অন্ধকারে চিৎকার করে উঠ ইচ্ছে হয়েছিলো। ননীবালা পাশাপাশি শুয়ে অনেক পরে হাহাকার করে বলেছিলেন, 'তুই অপয়া। তোর কপালে কিছুই জোড়া লাগে না।'

হয়তো। চোখের জলে বালিশ ভাসিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলো টুনি। ঘরটায় কো জানালা ছিলো না, ওদের কাপড় ছাড়বার ঘর। ট্রাঙ্ক বাক্সে ঠাসা দেওয়ালগুলোর দি তাকিয়ে-তাকিয়েই কেটে গেলো সেই রাতটা।

শুধু সেই রাতই নয়, অমন নির্ঘুম আরো অনেক রাত কাটালো টুনি, আগুনের মতো জ্বলন্ত আরো অনেক দিন। শেষে কবে একদিন নিবে গেলো সেই তাপ, জ্বালা জুড়োলো, বাড়ি বদলে কালিঘাটেরই অন্য কোনো পাড়ায়, কোনো বস্তির ছোট্টো একটি ঘরে এসে গানকে পেলো সে। গানের মধ্যে ডুবিয়ে দিলো নিজেকে। দিনে রাত্রে একমন, এক চিত্ত হয়ে শুধু গান আর গান। গভীর ক্ষত পুরন্ত হয়ে এলো, তারপর কালের ভীষণ প্রলেপে নির্মল নামক তরুণ যুবকটি কী জানি কখন হারিয়ে গেলো মনের অহরহ ছবি থেকে। কড়া পড়ে গেলো সেখানে। আর তারপর আবার ভরে উঠলো সব। বস্তি ছেড়ে পাকাঘর, পাকা ঘর ছেড়ে ফ্ল্যাট বাড়ি, কালিঘাট ছেড়ে বড়ো রাস্তা, বড়ো রাস্তা ছেড়ে লেকের ধার। টুনি ধাপে ধাপে উঠলো না, লাফ দিয়ে উঠলো। কোরাসে গলা দিতে গিয়ে নজরে পড়ে গেলো মিউজিক ডিরেক্টরের, তিনি গুণী লোক, কানের পর্দা দুরস্ত, এ-আর্টিস্টকে তিনি ছাড়তে পারেন না। একই সঙ্গে আরো একখানা ছবিতে একা গাইবার সুযোগ দিলেন তাকে, নামে ফেটে গেলো শহর।

রামেন্দু ভট্টাচার্য খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন ঘন-ঘন, তালিম দিতে দিতে বলে উঠলেন, 'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।' ননীবালা মুঠো ভরে টাকা তুললেন বাক্সে, আড়ালে বসে ছুঁলেন, ছানলেন, গুণলেন, সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন পাঁচখানা একশো টাকার নোটের দিকে। দেখতে পাঁচখানা নোট দশখানা হলো, দশখানা কুড়িতে পৌঁছলো, কুড়িখানা চল্লিশে—ঝড়ের বেগে এই আট বছরের মধ্যে রাধানগরের প্রিয়নাথ মাস্টারের মেয়ে, ছিন্নবস্ত্র টুনি, সন্ধ্যামনি নাম বদলে মানসী দত্তমল্লিক হয়ে বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ননীবালা খালি গায়ে শেমিজ তুললেন, শেমিজের উপর ব্লাউজ ধরলেন, পায়ে দেবার জুতো কিনলেন। আরো পরে মিল ছেড়ে তাঁতের ধুতি, সুতি ছেড়ে সিল্কের ব্লাউজ, চামড়া ছেড়ে সুয়েডের জুতো, শূন্য গলাটা ভরে নিলেন মোটা ঘষা গোট-হারে, হাতেও সরু অথচ বেশি সোনার দু-গাছি জলতরঙ্গ চুড়ি গড়িয়ে নিলেন। বিধবা মানুষ, আর কী সাধই বা মেটোতে পারেন। লেকের ধারের আড়াই শো টাকার প্রশস্ত ফ্ল্যাটে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচলেন। মেয়ের রোজগারের বড়ো অংশটা একদম লুকিয়ে ফেলে তাঁর নিজস্ব পুরোনো একটি স্টিল ট্রাঙ্কে লিনেনের ঢাকনা পরিয়ে এনে রাখলেন খাটের তলায়। খাটের পায়ার সঙ্গে লোহার মোটা শেকলে তালা দিয়ে আটকে দিলেন, টুনি লক্ষ্য করেও উপেক্ষা করলো।

মেয়ে মেয়েই। কোনদিন তার কী মর্জি হবে, কাকে না কাকে বিয়ে করে মাকে ফেলে উধাও হবে, ঠিক আছে কিছু? সময় থাকতে তাই গুছিয়ে নেওয়া ভালো। নিশ্চয়ই এই সব ভেবেই এই সাবধানতা ননীবালার, বুঝেছিলো টুনি। অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত কপালে যে তাঁর রাজার শাশুড়ি হওয়া লেখা আছে তা কি তিনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন? হয়তো অতদূর যায়নি তাঁর ভাবনা। অবিশ্যি এ-পর্যন্ত যা হলো কোনটাই বা তিনি ভাবতে পেরেছিলেন। টুনিই কি পেরেছিলো? টুনির মরা ডালও যে কচিপাতার কলরোলে ভরে উঠবে, কুঁড়ি দেখা দেবে, ফুল ফুটবে—

ফুল ফুটবে? না না, ফুল নয়। ফুল আর ফুটবে না। ফুল তো কবেই ঝরে গেছে জীবন থেকে। কিন্তু ফুল ছাড়া একে আর কী বলে মানসী?

সকাল হলেই সে আসবে। সোমেশ্বর বাগচি। তোমার ভাবী স্বামী। তোমার বিয়ের ফুল তবু ফুটলো না?

তাই তো উচিত। তুমি তো কবেই ভুলে গিয়েছ তাকে। তোমার পুরোনো জীবনের অ
কী অবশিষ্ট আছে এখানে? কাল যদি হঠাৎ তাকে তুমি না দেখতে, (সত্যিই কি সে?)
আজ সে কোথায় থাকতো? একবারও কি ভাবতে তার কথা? শেষ কবে ভেবেছো তাই
তোমার মনে আছে? ও-সব আর থাক। আর তুমি তাকে ভেবে নিজেকে উদ্‌ভ্রান্ত কোরো
সে নেই, সে মুছে গেছে, ধুয়ে গেছে, তুমি নতুন করে নতুন জীবনে বেঁচে ওঠো,
তোমার একমাত্র প্রার্থনা হোক।

ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। সকালের কচি রং দুপুরের ছোঁয়ায় প্রায় কড়া হয়ে
রোদের কমলা রং শিকের ফাঁকে লম্বা-লম্বা রেখা টেনেছে। খাটের কার্নিশে, বিছানার বালি
মানসীর পায়ের উপরকার ধূসর-রং রেশমি চাদরে তার আলো। গয়লার দুধ দোয়া
লেকের প্রাতঃভ্রমণকারীরাও ফিরে গেছে যে যার ঘরে, এখন রাস্তাটা আবার নিঝুম।

'কী রে, উঠবিনে?' চৌকাঠে পা রেখে পর্দা সরিয়ে মুখ বের করলেন ননীবালা।

মানসী চারদিকে তাকালো, বালিশের রোদ থেকে সরিয়ে নিলো মাথাটা। গলাটা
উঠেছে।

'ব্যাপারটা কী বল দেখি?' ননীবালা ঘরে ঢুকলেন, 'রাত্তিরে ঘুমুস নি নাকি, সকাল
অত বড়ো একশো পাওয়ারের আলোটা জ্বলছিলো?'

'আলো জ্বলছিলো?'

'খানিক আগে আমি এসে নিবিয়ে দিলাম। কেন? রাত জেগে কী করছিলি?'

আড়মোড়া ভাঙলো মানসী। মৃদু হেসে মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'রাধান
কথা মনে পড়ছিলো, ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি—'

'রাধানগর!' ঠোঁটের কোণে যেন বিদ্বেষ জমা হলো ননীবালার, 'কেন?' চোখ
করলেন তিনি, 'হঠাৎ আবার রাধানগরের কথা কেন?'

'মনে পড়ে না? কতকাল সেখানে ছিলাম, কত সুখ, কত দুঃখ—'

'সুখও? ঈশ্বর করুন আর যেন কোনোদিন অমন সুখের আর অমন দেশের মুখ
না হয়।'

মানসীর মাথা টিপটিপ করছে, ভার লাগছে শরীরটা, আলস্যে মাখামাখি। দু-হাত উপ
তুলে বাঁকিয়ে চুরিয়ে এলোমেলো হাই তুললো সে। বিছানা থেকে নেমে, ড্রেসিং টেবি
দেরাজ থেকে টুথব্রাশ বের করে তার মাথায় পেস্ট লাগাতে-লাগাতে বললো, 'সেখানে
তোমার সবই দুঃখের স্মৃতি? কোনোদিনের কোনো সুখ কি তোমার মনে পড়ছে না?'

'জঘন্য। নরককুণ্ড। লোকেরা বলে শ্বশুরের ভিটে, স্বামীর ভিটে। ও-সব মেয়েমানু
ঢঙের কথা। আমার জন্মেও সেখানে ভালো লাগে নি।'

'নতুন বিয়ের পরেও না?'

মেয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন ননীবালা। দূর থেকে শে
গানের কলির মতো পাতলা ফর্শা ছিপছিপে একটি বি. এ. পাশ যুবক স্মৃতির সমুদ্র বেয়ে
সহসা ভেসে এলো কাছে। লাজুক মানুষ, গুরুজনদের ভয়ে তটস্থ, আর তারই
অবনতমুখী বুক-ঘোমটা এক তরুণীর সঙ্গে লুকিয়ে-চুরিয়ে দিনে অন্তত দশবার চোখোচো
ননীবালার মুখে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই কেমন একটি নরম স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে পড়লো।
করে থেকে বললেন, 'যত সব বাজে চিন্তা। নে, চল, চা খাবি। ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।'

পশ্চিমের বারান্দায় এলো মানসী। বারান্দাটি চৌকো, তিনদিকে ঢাকা, একদিকে সবুজ-রং চিকের ব্যবস্থা। তার একপাশে রান্নাঘর, ওপাশে বসবার ঘর। এটি মানসীর খাবার ঘর। মাঝখানে মেহগনি-রং নতুন কেনা আয়না-পালিশ নতুন খাবার টেবিল, চারদিকে চারখানা চেয়ার। কোণে সাইডবোর্ডে কাচের বাসন সাজানো। এ-বাড়িতে এসেই এই সব ব্যবস্থা হয়েছে, তার আগে পর্যন্তও ননীবালা ননীবালার ধারণা মতোই ঘরদোর সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতেন, মানসী মনোযোগ দিতো না। কিন্তু এখন অর্থ, সামর্থ্য, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, বন্ধুতা, সব-কিছুর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন বেড়েছে, মনের গতিও বদলে গেছে বৈকি।

এ-সব সাহেব-সাহেব খেলাতে মনে-মনে খুশিই হয়েছিলেন ননীবালা। মেয়ের সঙ্গে কত জায়গায় যান, কত কিছু দেখেন, ফিরে এসে নিজের বাড়ির হালচাল আর ভালো লাগে না তাঁর। কিন্তু অমনোযোগী মেয়ের কাছে কিছু বলতে কোথায় যেন আটকায়, হয়তো বা লজ্জাও করে। এ-বাড়িটাতে আগে কোনো এক হাকিম বাস করে গেছেন সাত বছর। তিনিই যাবার সময় ফ্ল্যাটটি দিয়ে গেছেন মানসীকে। মানসীর গানের ভক্ত। নয়তো এমন বাড়ি আজকাল পাঁচশো টাকা ভাড়া দিলেও কি লোকে পায়? বাড়িটাতে এসেই মানসীর মন বদলে গেলো, রুচি বদলে গেলো। শেষ রেকর্ডের দুরন্ত বিক্রির একটা মোটা অংশই সে ফস করে খরচ করে ফেললো এই বাড়ি সাজানোতে, আর বাড়ি সাজিয়েই দুটো কনট্রাক্ট পেয়ে গেলো মস্ত।

এই টেবিলে খেতে প্রথম দিকে একটু-একটু আপত্তি তুলেছিলেন ননীবালা, বিধবা মানুষ কেমন করে এ-সব ম্লেচ্ছ ব্যাপারে মত দেন। কিন্তু তাই নিয়ে বেশি সাধতে হয় নি মানসীকে, একদিন শুধু বলেছিলো, 'কলকাতায় ও-সব কেউ মানে না।'

'সে তো ঠিকই। সে তো ঠিকই।' অমনি ননীবালা প্রতিধ্বনি করে উঠলেন। 'যখন যে-রকম, যে-দেশে যে-রকম সে-রকম না-চললেই লোকে গেঁয়ো বলে।'

মানসী মুখ নিচু করে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে-মাখতে বললো, 'সে তো ঠিকই।'

অতএব তিনিও তাঁর নিরিমিষ থালাটি নিয়ে টেবিলে বসলেন। আগে একজন পরিচারিকাতেই তাদের মা-মেয়ের সংসারের কাজ অকাতরে চলে যেতো, এখানে এসে মানসী আরো একজন মহিলা রাখলো, ঝাঁড়পোঁচ করবার জন্য, একটা ছোট্টো ছোকরা রইলো ফুট-ফরমাশের জন্য। ননীবালার বয়স হয়েছে, আরাম দরকার, আর মানসীর কাছে প্রত্যহ কত ধরনের লোক আসে, স্বচ্ছন্দ লোকজন হাতের কাছে না-থাকলে অসুবিধে হয়।

পরিচারিকা ফিটফাট কাপড়ে, ঝকঝকে পেয়ালায় মা-মেয়ের চা পরিবেশন করলো। ননীবালা টোস্ট মাখন আর দুধের হালুয়া খান, মানসীর একটা হাফবয়েলড্ ডিম। খিদে তার ভারি কম। পোষা বেড়ালটা লাফ দিয়ে উঠে এলো কোলে, ল্যাজ দুলিয়ে ম্যাঁও-ম্যাঁও করতে লাগল মুখের দিকে তাকিয়ে। নন্দর মা অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে দুধ দিয়ে ডাকলো, 'আয়, আর নালিশ করতে হবে না।' মানসী হাত বুলিয়ে দিলো নরম পিঠে।

'আমি সোমেশ্বরকে গোটা নয়েকের সময় আসতে বলেছি।' চামচে দিয়ে চা নাড়তে-নাড়তে ননীবালা বললেন।

মানসী একবার তাকালো, জবাব দিলো না।

'একদিনের মধ্যে সব তো করে উঠতে হবে? ব্যাঙ্ক থেকে টাকাকড়ি তুলতে হয় কিছু, কী বলিস?'

'আমি আর কী বলবো।'

'তোর এবারকার ছবির গানের চুক্তির সব টাকাটাই তো জমা আছে, না?'

'সে তো তুমিই ভালো জানো।'

'কী জানি বাপু, টাকাকড়ির কথা অত আমার মনে থাকে না। পার্টিটা আমাদের লনেই করবো। ভেবেছি, খরচা একটু বেশি পড়বে অবিশ্যি। সোমেশ্বর আবার আর-এক তুলেছে—' সস্নেহে ননীবালা হাসলেন।

মানসী তাকিয়ে থেকে বললো, 'খরচাটা উনি দেবেন, না?'

'তবে তোকেও বলেছে? ঐ দ্যাখ, আমার কাছে সায় না-পেয়ে আবার তোকে গিয়ে ধরেছে। তা, তুই কী বললি?'

'আমি?' গলার স্বর গম্ভীর হ'লো মানসীর, 'আমি বললাম এ-সব আমার ভালো লাগে না।'

'কী ভালো লাগে না?' হাতের হালুয়া মুখে উঠতে-উঠতে থেমে গেলো ননীবালার

'যা তুমি আরম্ভ করেছো—কিছু ব'লে ফেলেছো নাকি?'

ননীবালা গোঁজ হলেন, 'জানতাম না এ-বাড়িতে আমাকে তোমার হুকুমের অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

'হুকুমের কথা নয়, সমস্ত মিলিয়ে ব্যাপারটাই অত্যন্ত বিশ্রী লাগছে আমার।'

'আমি যা-ই করি তাই তো তোর বিশ্রী লাগে।'

মানসী আর জবাব দিলো না। অস্থির হয়ে নন্দর মা বললো, 'তক্ক রেখে, খেয়ে নাও তো তোমরা।'

'আমি আর খাবো না।' চেয়ার ঠেলে মানসী উঠে দাঁড়ালো।

'ও মা, সে কী গো, চায়েও তো ভালো করে চুমুক দিলে না।'

'গা গুলোচ্ছে।'

'ওদিকে কাল রাত্তিরেও বসলে আর উঠলে। শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

'নে নে, আদিখ্যেতা না দেখিয়ে তুই যা তোর কাজে। বেলা আটটা বাজতে চললো, এখনো ঘর ক'খানা পুঁছে উঠতে পারলিনে।' ননীবালা এক ধমকে সরিয়ে দিলেন নন্দর মাকে। উঠে এসে হাতের উল্টো পিঠটা তিনি মেয়ের বুকের কাছে ছোঁয়ালেন, 'ও মা, গা দেখি ছ্যাঁকছ্যাঁক চোখমুখ ছলছলে। আবার জ্বর-টর বাধালি নাকি?'

'না, জ্বর হবে কেন।'

'গলায় মাফলারটা জড়া দেখি।' গলার জন্যেই ননীবালার সব চেয়ে বেশি ভয়, 'এ-সব ঋতু পরিবর্তনের দিনে আজ ঠাণ্ডা, কাল গরম, সাবধানে থাকতে হয়।'

একটু হাসলো মানসী, 'একটা অসুখ-বিসুখ হলে নেহাৎ মন্দ কী? কয়েকটা দিন চুপচাপ শুতে পারি।'

'অমন অলক্ষুনে কথা মুখেও এনো না বাপু। সবাইকে ডেকেছি, শেষে কি—'

ননীবালার কথার শেষটুকু না-শুনেই মানসী ঘরের চৌকাঠ পেরুলো, নিজের ঘরে এসে আবার শুয়ে পড়লো হাত-পা ছড়িয়ে। সত্যিই শরীরটা আজ ভালো লাগছে না তার।

সোমেশ্বর এলো একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ন'টাতেই। খাঁ-খাঁ রোদে ছেয়ে গেছে চারদিক আপিশের ভিড় লেগেছে রাস্তায়। মানসীদের আসমানি ম্যানশনেও তারই ব্যস্ততা। একতলা

াতলা, তেতলার মুখোমুখি সব বর্মাটিকের লম্বা-লম্বা দরজার পাল্লাগুলো খুলে যাচ্ছে টাফট, চিকচিক করে উঠছে ব্রাসো-মাজা পেতলের নেমপ্লেটগুলো, পোর্ট-ফোলিও হাতে ছাটোসাহেব, বড়োসাহেব, মেজোসাহেবরা সব বেরুচ্ছেন একে-একে। দু-একটি চেনা মুখকে ভিবাদন জানিয়ে, অচেনাকে পাশ কাটিয়ে, সোমেশ্বর এসে টোকা দিল দরজায়।

খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন ননীবালা, 'এসো, তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। মেয়ে তো াবার জ্বর ক'রে বসেছে।'

'জ্বর! কই, কাল তো ছিলো না।' সোমেশ্বরের চেহারায় রীতিমতো উদ্বেগ ফুটলো।

'তেমন কিছু নয়।' ননীবালা মৃদু হেসে সান্ত্বনা দিলেন, 'ব্যস্ততার কিছু নেই। কাল আবার াড়িতে একটা ব্যাপার, তাই—' একটু গলা খাটো করে, 'রেজিস্টারির বিষয়টা কি কিছু স্থির ?'

'হ্যাঁ। ঠিক করেই আসছি। তাই ভাবছিলাম আবার অসুখ-বিসুখ—'

'আটকাবে না। তুমি যাও না ওর ঘরে।' ননীবালা একেবারে গদ্‌গদ হলেন।

'শুয়ে আছে বুঝি ?'

'আর বলো কেন, সকালে চা খেলো না, কাল রাত্তিরেও নামে মাত্র বসলো—এসো।' ঘর-ওঘর ডিঙিয়ে সোমেশ্বরকে মেয়ের ঘরের দরজায় পৌঁছে দিলেন তিনি।

একটু ইতস্তত করলো সোমেশ্বর, না-বলে না-কয়ে পর্দার ও-পিঠে একজনের শোবার ঘরে ট করে ঢুকে পড়তে হয়তো তার শোভনতায় আটকাচ্ছিলো। এক পা থমকে বললো, 'বরং কটা খবর দিলে হয় না?'

'ও মা, খবর আবার কী। তুমি যাবে তাও খবর দিয়ে?'

সোমেশ্বর এবার মৃদু হেসে ছটফটিয়ে ঢুকে পড়লো ঘরে। 'কই, কী হলো আবার?'

মানসীর অনিদ্রাক্লান্ত চোখে একটু তন্দ্রা নেমেছিলো, কপালের উপর থেকে হাত সরিয়ে াড়ো-বড়ো করে তাকালো।

'শেষে একটা অসুখ বাধালে তো? কী কাণ্ড ! ডক্টর পাকড়াশিকে খবর দিই একটা?'

মানসী এবার উঠে বসলো, অবাক হয়ে বললো, 'আপনি! এ ঘরে?'

ঈষৎ অপ্রস্তুত বোধ করলেও সহজভাবে হাসলো সোমেশ্বর, 'কী করবো, বলো? তোমার অসুখ আর আমি শান্ত হয়ে বাইরের মানুষের মতো বাইরের ঘরে অপেক্ষায় থাকবো, তা ারবো না।'

মানসী পায়ের উপর বেডকভারটা টেনে দিয়ে বললো, 'বসুন।'

খুশি হলো সোমেশ্বর। সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে ঘরের চারদিকে তাকালো। এ-র সে নতুন দেখছে। মোটা শরীরে এ-ভাবে এই মেয়েলি অপরিসর চেয়ারটিতে বসতে তার ীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো। হালকা কচুরিফুল-রং এইমাত্র-ভেঙে-পরে আসা রেয়নের পাৎলুনে াজ পড়লো। দেহের স্ফীতিতে ফাটো-ফাটো করতে লাগলো ওপরের পা দুটো, নাইলনের চ্ছ শার্ট ভিজে উঠলো ঘামে। বুকের বোতামটা খুলে দিতে দিতে বললো, 'কখন থেকে লো?'

'কী?'

'জ্বর।'

'কই, জ্বর না তো।'

'তোমার মা বললেন যে।'

'তিনিই বোধহয় আপনাকে এ-ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'তোমার ঘরে আমি আসবো তার জন্য কি আর কারো পারমিশন লাগে?' হা-হা ক
হাসলো সোমেশ্বর। তারপর বললো, 'ঠিকই ধরেছো। উনিই বললেন, "স্ত্রীর কাছে তার
যাবে, এজন্যে আবার অত ফর্মালিটির কী দরকার?" কেন, রাগ করলে নাকি?'

'চলুন; বসবার ঘরে যাই।'

'না, না, রেস্ট নিচ্ছিলে, তাই নাও। মাথা-টাথা ধরে নি তো?'

'সামান্য।'

'মাথা ধরেছে?' সোমেশ্বর বসে-বসেই চেয়ারটা ঘষটে এগিয়ে নিয়ে এলো সামনে, 'শ
তো, শুয়ে পড়ো তো।'

'কেন?'

'এখুনি আমি সারিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনিই সারবে।' খোলা চুল হাতে জড়ালো মানসী, 'আপনার বোধহয় এখানে বস
অসুবিধে হচ্ছে।'

'মোটেও না, নট অ্যাটল। বরং এই নিরিবিলি নির্জন ঘরটিতে, জানালা-বন্ধ পর্দা-যে
ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু তুমি আর আমি—দ্যাখো মণি, এখানে এসে থেকেই আমার কী মনে হ
জানো?'

মানসী পায়ের ধাক্কায় বেডকভারটা সরিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলুন।'

'কোথায়?' সব উচ্ছ্বাস এক নিমেষে যেন থমকে দিলো মানসী।

'বসবার ঘরে।'

'কেন? এখানে তো বেশ। আমার সত্যি কোনো কষ্ট হচ্ছে না বসতে।'

'আমার হচ্ছে।'

'অ্যাঁ,' অপ্রতিভ হলো সোমেশ্বর, 'আমার জন্যে?'

'না না, তা কেন?' মানসী ভদ্রভাবে হাসলো, 'বিছানায় থাকলেই ভারি অসুখ-অসুখ
হয় কিনা।'

'ও,' সোমেশ্বর আশ্বস্ত হলো, 'তাহলে চলো। কিন্তু একটা কথা।'

'বলুন।' পর্দা সরিয়ে ঘরের বাইরে পা দিলো মানসী।

সোমেশ্বর তাকে অনুসরণ করতে-করতে বললো, 'একটু বেরুতে হবে আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'সে তুমি তখুনি জানবে।'

'আজ আমার বেরুনো হবে না।'

'আজ থাক।' নিজে থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মানসীর।

সোমেশ্বর পেছন থেকে আস্তে তার পিঠে হাত ছোঁয়ালো, 'আজই যে যেতে হবে।'

'এমন কি জরুরি কাজ?'

'ভীষণ জরুরি।' চোখ টিপে হাসলো সে, 'কালকে আমরা যে-জীবনে প্রবেশ করতে যা
আজকের এই যুগলযাত্রা হবে তারই একটি বিশেষ অংশ।'

মানসী মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থাকলো, তারপর বললো, 'আমার ভালো লাগছে না।'

'কী ভালো লাগছে না?'

'কিছুই না।'

'কবে তোমার ভালো লাগবে বলতে পারো?' সোমেশ্বরের গলা এবার ভারি শোনালো।

মানসীর ঠোঁটে ছোট্টো হাসি ফুটলো, 'লাগবেই একদিন।'

'আসল কথা, আমার সঙ্গে কোথাও একা বেরুতেই তোমার আপত্তি। সত্যি কিনা বলো।'

'তা কেন। একা কি কখনো বেরুই নি? আর তাছাড়া আমার আবার দু'জন কে আছে?'

'মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ কী, সবই আমি বুঝি।' বসবার ঘরে এসে বড়ো সোফাটার উপর নিজেকে ন্যস্ত করলো সোমেশ্বর, 'শুধু এটুকুই বুঝতে পারছি না তোমার বিরাগভাজন হবার মতো এই রাতটুকুর মধ্যেই আমি আবার কী অপরাধ করলাম।'

মানসী ব্যস্ত হলো একটু, গলার স্বর যথাসম্ভব কোমল করে বললো, আপনি তো দেখছেন, আমার শরীর আজ ভালো না, তাই বলছিলাম—'

'তা অবিশ্যি বলতে পারো, কিন্তু আমি তো তোমাকে আর এখুনি যেতে বলছি না।'

'বেশ তো, বিকেলে না-হয় যাবো।'

এবার সোমেশ্বর রাগ ভুলে একটু হাসলো, 'আজ একটা সারপ্রাইজ দেবো তোমাকে।'

'তা তো আপনি রোজই দিচ্ছেন।'

'রোজের কথা জানিনে, কিন্তু এটা আন্দাজ করো তো।'

'আমার বুদ্ধি ততো প্রখর নয়। আপনিই বলুন না।' ম্লানমুখে হাসলো মানসী।

রহস্য করেও আর দেরি করতে পারলো না সোমেশ্বর, তাড়াতাড়ি বললো, 'কাল সকালে আমাদের রেজিস্ট্রি হচ্ছে।'

'রেজিস্ট্রি! কাল সকালে!'

হাসলো সোমেশ্বর, 'এ তো বরাবরই ঠিক। কেবল সুখের দিনগুলোকে আর একটু এগিয়ে আনা গেলো, এই যা।' একটু থেমে : 'ভালোই হ'লো, কী বলো? কাল তো এমনিতেই আয়োজন হচ্ছিলো, তার সঙ্গে এই উৎসবটিও জুড়ে দেওয়া গেলো।' সোমেশ্বরের মোটা গালে গভীর গর্ত হলো হাসতে গিয়ে। পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাতে-ধরাতে বললো, 'আসলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, বুঝলে? রেজিস্ট্রার শিশির আচার্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছেন মাসখানেকের জন্য, কাল দিন ভালো, রেজিস্ট্রিটা সেরে যেতে চান আর কি। তোমার মা জানেন। এবার তোমার মুখের কথাটি খসুক, অভাগা ধন্য হোক।'

মানসীর গলা অনেক দূর থেকে ভেসে এলো, 'কাল!'

'সকালে রেজিস্ট্রিটা হয়ে যাক, বিকেলে যেমন একটা নিমন্ত্রণের ব্যাপার ছিলো তেমনি থাক। তোমার মা তো তোমার জন্মদিনটাকে উপলক্ষ করে আসলে আমাদের বিয়ের খবরটাই জানাচ্ছিলেন সকলকে।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো সোমেশ্বর, 'আর দু'জন রিপোর্টারকেও খবর দিয়েছি, ফোটোগ্রাফারকে বলেছি, আর—'

'কাল! কালই?'

'আহা, কাল না হোক পরশু, তবশু কি তার পরের দিন, এ-মাসের মধ্যেই তো হতো? সেটা রেজিস্ট্রারের দয়ায় কালই হয়ে গেলো। বাস্তবিক শিশিরবাবুকে সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

'না, না,' মানসীর বেদনা যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

অবাক হলো সোমেশ্বর। ভুরু কুঁচকে বললো, 'কেন?'

'আমাকে তো বলেন নি আগে।'

'কী আশ্চর্য! এ তো তুমি জানোই।'

মানসী অবোধের মতো বললো, 'কী জানি?'

'কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের রেজিস্ট্রি হবে তা তুমি জানো না?'

'জানি।'

'তবে?'

'কিন্তু কাল বলে তো জানি না।'

'নাই বা জানলে, তাতে কী হয়েছে?'

'আমার যে বম্বে যাবার কথা আছে।'

'বেশ তো। বিয়ের পরে যাবে।'

'বিয়ের পরে?'

'ওটা আমাদের হানিমূন হবে।'

একটু চুপ করে থেকে সহসা মানসী অনুনয়ে ভেঙে পড়লো, 'আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিন।'

এবার জমিদারি মেজাজ চিড় খেলো সোমেশ্বরের। আত্মদমন করতে থুৎনি আর গলার মাঝখানকার নরম মাংসগুলো মোটা হয়ে ঝুলে পড়লো। অনেকক্ষণ শব্দ বের করতে পারলো না মুখ দিয়ে। কিন্তু এই মেয়েকে পেতে হলে তার যে আরো খানিক ধৈর্য্যের প্রয়োজন, সে-কথাটাই মনে মনে আরো অনেকবারের মতো এবারেও মেনে নিতে হলো তাকে। বললো. 'আরো ভাববে? এক বছরেও ভাবনা তোমার শেষ হলো না?'

অস্থির মানসী নড়ে-চড়ে উঠলো, 'না, না, ভাবনা-টাবনা কিছু নয়, সব ঠিক। কেবল আর কয়েকদিন সময় দিন দয়া করে।'

সোমেশ্বর স্থির হয়ে বসে রইলো। ঘরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত কোনো শব্দ রইলো না মাথার উপরকার ফ্ল্যাটে অসময়ে কয়লা ভাঙার আওয়াজটা বড়ো হয়ে কানে লাগলো, খাবার ঘর থেকে নন্দর মা'র গলা স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো, রান্নাঘর থেকে নবলক্ষ্মীর হাতা-খুন্তির ছ্যাঁকছ্যাঁক অসহ্য মনো হলো। ছোকরা চাকর ঘরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেলো কী আনতে জানালার ফাঁকে শিক গলে রুল-টানা রোদ ডোরা কাটলো লাল-সবুজ কার্পেটের উপর মানসীর বেড়ালটা পর্দার তলা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে চুপ করে দাঁড়ালো একটু, নীল চোখ তুলে তাকালো এদিক-ওদিক, তারপর আলস্যে এলানো সেই ডোরা-কাটা রোদে নরম করে গা ঢেলে দিয়ে থাবা চাটতে লাগলো নিঃশব্দে।

'ঠিক করে বলতে পারো, মানসী,' সোমেশ্বর সেদিকে তাকিয়ে ভারি গলায় বললো, 'সতি তোমার সময় কখনোই হবে কিনা।'

'আমি—আমি তো—'

'কোনো কৈফিয়ৎ শুনতে চাই না, শুধু দয়া করে বলো—'

ননীবালা ঘরে ঢুকলেন। বেরুবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। দামি পাড়হীন গরদের শাড়িতে, সোনালি রং মুগার ব্লাউজে, বাছুরের চামড়ার সাদা জুতোতে, হাতের সাদ

বটুয়াতে সহসা তাঁকে নিজের মা বলেই চিনতে পারলো না মানসী। মাথার কাঁচাপাকা ল সুন্দর ফোলানো ফাঁপানো। মুখে পাৎলা পাউডারের প্রলেপ। নরম গলায় বললেন, তাহলে আমি তোমার গাড়িটা নিয়ে বেরুই একটু।'

'নিশ্চয়ই।' সোমেশ্বর তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সোফা থেকে। মানসী লক্ষ্য করলো, মা আজকে সোমেশ্বরকে 'তুমি' বলছেন।

'সময় তো নেই, যা বলা-কওয়া জোগাড়-যন্ত্র এটুকু সময়ের মধ্যেই তো—' মাথা নাড়লেন ননীবালা।

'সে তো ঠিকই। গাম্ভীর্য ছেড়ে মুহূর্তে সোমেশ্বর গদ্‌গদহাস্যে ঘাড় কাৎ করলো।

'তাহলে তোমরা দু'জনে মিলে কালকে সকালের ব্যাপারটা ঠিক করে নাও।'

'হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। আপনি তো বোধহয় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবেন।'

'আর কত। কেন, অসুবিধে হবে তোমার?'

'না, না, অসুবিধে কী! একে নিয়ে একটু বেরুবো ভাবছিলাম, তা এর তো শরীর ভালো না—'

'বেরুনো কি জরুরি দরকার?'

'এই কিছু কিনবো-টিনবো আর কি। মেয়েদের জিনিস, মেয়েরা সঙ্গে থাকলে ভালো।'

'তা যাবে'খন। শরীর কি আর সারাদিন খারাপ থাকবে। বিকেলে গেলেই হবে। আচ্ছা, আসি—' কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেলেন ননীবালা।

মানসী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। দরজার ভারি পর্দাটা একটু নড়েই স্থির হয়ে গেলো। একটু সময় বয়ে যেতে দিয়ে সোমেশ্বর বললো, 'আমার কথার জবাব দাও।'

'কী?'

'তুমি কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছো এতোদিন ধ'রে?'

'কৌতুক?!'

'তবে একে কী বলে? এতোদিন সব ঠিক, হঠাৎ আজ তোমার মতি বদলালে তাকে আর এ-ছাড়া কী ভাবতে পারি।'

মানসী জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

'কিছু বলছো না কেন?'

'কি বলবো?'

'তোমার ইচ্ছেটা কী?' সহসা সোমেশ্বর তার অত বড়ো শরীরটা নিয়ে, আঁটো স্যুট নিয়ে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো মানসীর পায়ের কাছে, 'দয়া করে বলো, বলো, কী তোমার ইচ্ছে, কী তুমি চাও।'

বুকের ভেতরটা কেমন করলো মানসীর। সোমেশ্বরের ব্যাকুলতা দেখে, না কি নিজেরই মনের কোনো গহন বেদনায়, কে জানে। দুটি চোখ তার আপনা থেকেই বুজে গেলো। মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার ঝাপটানি চললো খানিকক্ষণ, তারপর যন্ত্রণার মতো অধীর গলায় বললো, 'কিছুই চাই না, আমার আর কিছুই নেই চাইবার, কেবল আর একটু সময়—'

'ক'দিন?'

'যে-ক'দিন পারেন।'

'তোমাকে তো বললাম শিশিরবাবু চলে যাবেন পরশু রাত্রে। কাল বাদ দিলেও পরশু তো বাদ দেওয়া যাবে না।'

'পরশু?'

'পরশু সকালে হোক।'

'পরশু সকালে?'

'তখনো কি আপত্তি করবে তুমি?'

'আপত্তি। না, আপত্তি কী।' মানসীর ছটফটানি যেন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলো। যেন ঝাঁ দিলো জলে, 'তবে তাই হোক। কালই হোক।'

'কাল। বলছো তুমি? তাহ'লে ঠিক করি সব?' উঠে বসলো সোমেশ্বর।

দূরে দৃষ্টি ভাসিয়ে মানসী বললো, 'যদি এই মুহূর্তে সম্ভব হতো তাতেও আমার আপ ছিলো না, মিস্টার বাগচি।'

'উঁ। তাই বলো। এতোক্ষণ তবে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছিলো!'

মানসী এবার একটু হাসলো।

'ও মাই প্রেশাস্, মাই ডার্লিং,' আবেগে অস্থির হয়ে সোমেশ্বর নিজের পরিপুষ্ট মোটা নর হাতে জড়িয়ে ধরলো মানসীর দুই হাত, 'এতোদিনে তবে আমার প্রতীক্ষার সত্যি অবস হলো?'

ক্লান্ত দুর্বল ভঙ্গিতে মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিয়ে মানসী প্রায় ধুঁকতে-ধুঁকতে বললো, 'এই অসহ্য অবস্থা আমারও অবসান হোক।'

'কী?' সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকোলো সোমেশ্বর।

মানসী বললো, 'আমারও প্রতীক্ষার অবসান হলো।'

এর পরে সোমেশ্বরের ভালোবাসা আর বাঁধ মানলো না। আরো আপন হয়ে, নিবিড় হয়ে সে কাছে এলো, মুখ নিচু করলো মুখের উপর। আতঙ্কিত হয়ে সরে যাচ্ছিলো মানসী, কিন্তু মৃদু হেসে সোমেশ্বর তাকে জোর করে টেনে নিলো, বললো, 'অনেক দিন তো কষ্ট দিয়েছো এখনো কি দূরেই থাকবে?'

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ফিরে এলেন ননীবালা।

ভাবী জামাইয়ের গাড়িতে চ'ড়ে কয়েকটা জরুরি দরকারের সঙ্গে-সঙ্গে মানসীর দু-চারজন বড়োলোক বন্ধুর বাড়িতেও সুখবরটা জানিয়ে এলেন। অহংকার তৃপ্ত হলো, শত্রুরা আহত হলো। তবু সেই ভরাসুখের মধ্যেও বুকটা যেন হঠাৎ-হঠাৎ কেঁপে উঠতে লাগলো তাঁর যতবার মানসীর আজ সকালবেলাকার মুখটা ভাবলেন ততোবার একটা ভয় ঘিরে ধরলো তাঁকে। মেয়ে তাঁর, মেয়ের মনের ছবি তাঁর নখদর্পণে। এই মুখের চেহারা তো অচেনা নয় তিন বছর আগেও তিনি অহোরাত্র এই চেহারাতেই দেখেছেন মানসীকে। মান, সম্মান, অর্থ খ্যাতি, কিছুতেই যেন কিছু এসে যেতো না। একটা শুকনো, নিষ্প্রাণ, নীরস যন্ত্র মাত্র। যখন যে যেখানে গাইতে বলছে, গাইছে, টাকা দিলে নিচ্ছে, না-দিলে তাকিয়ে দেখছে না, আজ গ্রামোফোন, কাল রেডিও, পরশু সিনেমার প্লে-ব্যাক, দিনরাত তার রিহার্সেল, দিনরাত তার হৈ-হল্লা হট্টগোল, দিনরাত ঐ একটি গলা দিয়ে সব। ছুটোছুটি করেছে, প্র্যাক্টিস করেছে অন্যের বাড়িতে টিউশনিতে গেছে, নিজের বাড়িতে ক্লাস নিয়েছে, নিজে শিখেছে,—এক মুহূর্ত বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, যেন এই-ই চেয়েছে সারাদিন, আর সারাদিনের পরে একা হওয়া মাত্রই নিবে গেছে আলো, মরে গেছে মানুষটা, সদ্য শোকে আচ্ছন্ন বিধবার যন্ত্রণা নিয়ে নিঝুম হয়ে থেকেছে।

একমাত্র মানুষ মাস্টারমশায়। শুধু মাস্টারমশায়কে দেখলেই হাসি ফুটেছে মুখে, কথা রিয়েছে ঠোঁট ফাঁক হয়ে। আদিখ্যেতার অন্ত দেখেন নি ননীবালা। সমস্ত মনপ্রাণ যেন সমর্পণ র দিয়েছে মাস্টারমশায়ের কাছে। মাস্টারমশায়ের কথাই কথা, মাস্টারমশায়ের ইচ্ছাই হা। এক-এক সময় ননীবালা রীতিমতো সন্দেহই করেছেন, রীতিমতো খারাপ লেগেছে। না- মাস্টারমশায়ের সাহায্য সে পেয়েইছিলো একদিন। গুণ ছিলো বলেই তো পেয়েছিলো? এ া আর ছাঁটকাটের জিনিস নয় যে মাস্টারমশায় তৈরি করে দিয়েছেন, এ হচ্ছে ভগবানের া। গলা না-থাকলে তো আর মাস্টারমশায়ের চেষ্টায় এতো লোক এমন মুগ্ধ হতো না। মোফোনের রেকর্ডই বলো, রেডিওর গানই বলো, আর সিনেমার প্লে-ব্যাকই বলো, এ-সব কে যে এতো টাকা উপার্জন করেছে আর করছে, তা তো ওর নিজের যোগ্যতাতেই? তাই য়ে মাস্টারের সঙ্গে এতো বাড়াবাড়ি করবার কী ছিলো ভেবে পান নি তিনি। আর মরবার গে কী ভোগান্তিটাই না ভুগিয়ে গেলো লোকটা, কী অর্থদণ্ডই না হলো।

কিন্তু ব্যাধি তো সেরেছিলো এতোদিনে, দিব্যি তো হাসিখুশি হয়ে উঠেছিলো, রাধানগরের স্বপ্নের দিনগুলো ভুলে গিয়ে গানে-গল্পে একটা স্বাভাবিক মানুষের মতোই তো বাস ছিলো, কিন্তু সত্যিই কি নির্মলকে ভুলতে পেরেছে টুনি? মনের কোথায় যেন কামড় ড়লো একটু, ব্যথার মতো চমকে উঠলো স্মৃতি। নির্মলকে মনে করে আজ একটু আনমনা লন ননীবালা। নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নেওয়া ছাড়া তখন আর কোনো কারণেই তো এই লেকে ভাবেন নি, কিন্তু আজ তো কোনো স্বার্থ নেই, আজ নির্মলকে তিনি ভালোবেসেই বলেন, সন্তানের মতো করেই ভাবলেন। স্বভাবের সংকীর্ণতা ডিঙিয়ে নির্মল আজ তাঁর দয়ের দরজায় আঘাত করলো।

কিন্তু বাজে চিন্তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না তাঁকে, যে-চিন্তা আজ তিনি সারা কাল বহন করেছেন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, গাড়িতে ঘুরতে-ঘুরতে কালকের উৎসবের ায়োজন করতে-করতে যে-ভাবনা তাঁকে আতঙ্কিত করেছে, সেই ভাবনাতেই জর্জরিত লেন আবার।

কে জানে, মেয়ের মত হলো কি না, না কি বেঁকে বসলো? না জিগ্যেস করে হয়তো তোটা অগ্রসর হওয়া উচিত হলো না—এখানে আহত দর্পে ঘা লাগলো ননীবালার। নিজের থার নিজেই জবাব দিলেন : জিগ্যেস আবার কী? আমি ওর মা, ওর গুরুজন, পেটে তো ামিই ধরেছিলাম, দশমাস দশদিন গর্ভযন্ত্রণা তো আমিই ভোগ করেছিলাম, আর আমারই ানো অধিকার থাকবে না কিছু করবার? না, সেটা হবে না। যতদিন বেঁচে আছি, মানতেই ব আমার কথা, না-মানলে আমিই বা ছাড়বো কেন? আর তাছাড়া তাঁর সপক্ষে আছে ামেশ্বর। সোমেশ্বরের শক্তিকে তিনি সত্যিই তারিফ করেন। এই ক'বছরের নতুন জীবনে, তুন জগতের খবর কিছু তো কম পেলেন না। আরো কত লোক এলো, গেলো, দু-দিন দিন এগুলো পিছোলো, তারপরেই ফুস্। কিন্তু লেগে রইলো এই সোমেশ্বরই শুধু। নীবালার ভাগ্যেই রইলো, ননীবালা যা চেয়েছিলেন, যতখানি চেয়েছিলেন ঠিক ততোখানি রণ করবার জন্যই এই সোমেশ্বরকে এতো ধৈর্য্য দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ঈশ্বর। সোমেশ্বর ছাড়া ামেশ্বরের জুড়ি কি আর একটা পাত্রও আছে এই বাংলাদেশে, যাকে জামাই করতে ননীবালা তোখানি উদ্যোগী হয়ে উঠতে পারতেন?

ধীর মন্থর গতিতে সিঁড়িতে পা ফেলে-ফেলে তিনি ঘরে ঢুকলেন, আর ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। সোমেশ্বর একা বসে আছে, একটা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছে বসে-বসে।

একা কেন? একা হবার যে সুযোগ তিনি দিয়ে গেলেন তা কি একজনের একা হওয়া?

'টুনি—মানে মানসী—মানসী কোথায়?'

ননীবালা যে কখন ঘরে ঢুকেছেন খেয়াল করে নি সোমেশ্বর, তাড়াতাড়ি এলানো থেকে সোজা হয়ে বসলো, উৎসাহভরে বললো, 'হলো, কিছু কাজ কি এগুলো?'

'তা এগুলো, কিন্তু তুমি যে একা বসে রয়েছো?'

'ও একটু মুখ হাত ধুতে গেছে, বলছিলো বড্ডো মাথা ঘুরছে, তাই—'

'ও,' আশ্বস্ত হলেন ননীবালা, 'কথাবার্তা সব হলো তোমাদের?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে কালকের মধ্যেই হয়ে যেতে পারবে সব?'

'নিশ্চয়ই।'

ননীবালা উপচে পড়লেন খুশিতে। এতোদিনে তবে সত্যি তাঁর সব সাধ পূর্ণ হলো? জাতে উঠলেন। সমাজের একেবারে উঁচুস্তরে। একেবারে রাজার ঘরে ঠাঁই মিললো? আনন্দের আবেগে যেন থইথই করলেন নিজের মধ্যে, নিজের ঘরের মসৃণ মেঝের সাদা সিমেন্টে দাঁড়িয়ে।

এই ফাল্গুন মাসেই কী গরম পড়েছে কলকাতা শহরে। বাব্বা! পাখার স্পীডটা শাঁ করে বাড়িয়ে দিলেন। এদিকের দরজায় এসে খামকাই একটা ধমক দিলেন নন্দর মাকে, ছোকরা চাকরটাকে ডেকে অকারণে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, বেড়ালটাকে ম্যাঁও-ম্যাঁও করতে শুনে পা দিয়ে ঠেলে ছিটকে দিলেন ও-পিঠে, জানালার মাথায় বসে যে-কাকটা ধূর্ত চোখে তাকিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে-দেখতে গান ধরেছিলো, হুস্ হুস্ করে মুহূর্তে তাড়িয়ে দিলেন তাকে, একবার রান্নাঘরে এলেন, খাবার ঘরের টেবিলের চাদরটা টান করতে লাগলেন—হাতে-পায়ে যেন বেগ নেমেছে একটা, ভেবে পাচ্ছেন না কী করবেন। শেষে অনেক পরে, অনেক চেষ্টায় শান্ত হয়ে এ-ঘরে এসে বসলেন। শাশুড়িসুলভ সস্নেহ গাম্ভীর্যে বললেন, 'তাহলে আজ রাত্রেই একটা ঘরোয় পার্টি করি, দু-চারজন আসুক, একটু খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা হোক, তোমার আশীর্বাদটাও সেই সঙ্গে হয়ে যাক।' হাসলেন একটু, 'অবিশ্যি তোমাকে আশীর্বাদ করতে আমার তোমার বাড়িতেই যাওয়া উচিত, কিন্তু আমার কী ততো ক্ষমতা আছে? তোমার মতো যোগ্য জামাইকে উপযুক্তভাবে বরণ করতে যাবো, এমন শক্তি আমার নেই।'

'কী আশ্চর্য! বিগলিত সোমেশ্বর বিনীত হাস্যে নড়ে-চড়ে বসলো, 'আমার বাড়ি আপনার বাড়িতে কি আজ আর কোনো তফাৎ আছে? যখন খুশি যাবেন, যেমন করে খুশি যাবেন। কিন্তু আমি তো জানেন, লক্ষ্মীছাড়া গোবিন্দ। বাড়ি আমার শূন্য। একমাত্র বিবিই আমার সঙ্গী।'

বিবি হচ্ছে সোমেশ্বরের অ্যালসেশিয়ান কুকুরের নাম। কুকুর ননীবালার চক্ষুশূল, কিন্তু তাই বলে কি এই কুকুর? বিবির উপর সোমেশ্বরের টান তো তিনি জানেন। কতদিন নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে, দেখে হাত-পা হিম হয়ে এসেছে, তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন তিনি, চেষ্টা করেছেন গায়ে হাত দিতে, তারপর বাথরুমে গিয়ে হুস্‌হুস্ করে স্নান করেছেন।

এ-কথা শুনে একগাল হেসে বললেন, 'তোমার বিবিকে এবার আমিই এনে রাখবো। আমার মেয়ে তোমার বাড়ি যাবে আর তোমার মেয়ে আমার বাড়ি আসবে, কী বলো?'

উচ্চকণ্ঠে হাসলো সোমেশ্বর, ননীবালাও গলা মিলোলেন।

'তাহলে তা-ই ঠিক করি, কী বলো?'

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে সোমেশ্বর বললো, 'এ-বিষয়ে আর আমার কী বলবার থাকতে ব? আপনি যা ঠিক করবেন তা-ই হবে। তবে আশীর্বাদ তো আপনার সারাদিনই পাচ্ছি, জন্যে আবার আলাদা—'

'তা তো পাচ্ছোই—' ননীবালার দুই চোখে আদর ঝরে পড়লো, 'তবু তো আমার একটা আছে?'

'বেশ তো।'

'তারপর কাল সকালে যেমন রেজিস্ট্রি হবার হোক, বিকেলে যাকে যেমন নিমন্ত্রণ করেছি, ই থাক —'

'বেশ তো।'

'আর-একটা কথাও ভাবছি—'

'বলুন।'

'সেই সঙ্গে একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠানও করি।'

'অনুষ্ঠান!'

'মানে, একটুখানি শালগ্রাম-শিলা সাক্ষী করে, পুরুৎ ডেকে, হিন্দুমতে বিয়ে আর কি। তেই তো পারো, আমরা সব সেকেলে মানুষ, বিয়ে বলতে তা-ই জানি, তা-ই দেখেছি, ও-না-হলে মনটা কেবল খুঁতখুঁত করে, তৃপ্তি হয় না।'

সোমেশ্বরের হাসি বিস্তৃত হলো, 'আপনার যাতে তৃপ্তি তাই করুন, এ নিয়ে আর এতো বলি কিসের?'

'তোমরা আজকালকার ছেলে, হয়তো সে-সব মানো না, ভালো লাগে না, কিন্তু শুভদৃষ্টি হলে, মালা বদল না হলে যেন বিয়েই মনে হয় না।'

'না না, ও-সব অনুষ্ঠান আমার খুব ভালো লাগে। ওতে আমি বিশ্বাসও করি।

'এই তো, কথার মতো কথা। তুমিই বলো তো বাবা, কনে যদি লাল শাড়ি না পরে, ঘোমটা দেয়, স্বামীর হাতের উপর হাত রেখে মন্ত্র পাঠ না করে, তাহলে কি একটা গাম্ভীর্য আসে য়তে?'

'তা তো ঠিকই। কিন্তু আমি বলছিলাম যে এ-সব হিন্দু বিয়ের ব্যাপারে তো অনেক নাটি, ঠাকুর পুরুৎ লাগে, লগ্ন তারিখের দরকার হয়, আর তাছাড়া—'

'সে-সব তুমি ভেবো না। কাল আটই ফাল্গুন বিয়ের তারিখ আছে, লগ্নও খুব সুন্দর সময়ে, ক্বারে সন্ধ্যা সাতটা। তাহলে সেই মতেই সব করি, কী বলো?'

'নিশ্চয়ই। আমাকে কী করতে হবে সেটা বলুন।'

'তোমার দিকে তো কোনো হাঙ্গামা নেই। আত্মীয়-পরিজনেরা একটু চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ন দেবেন, বিয়েতে আসবেন, খাবেন-দাবেন, ফুর্তি করবেন—'

'তাহলে যত ঝামেলা বুঝি মেয়ের পক্ষই পোহাবে?'

'তা পোহাবে না? আর ঝামেলাই বা বলছো কেন? আপন জিনিস পরকে উৎসর্গ করার টা আয়োজন তো নিশ্চয়ই থাকবে? জীবনে কি এ একটা সোজা ঘটনা।'

'তা তো ঠিকই।'

'আর তোমারাও তো বউভাত করবে। সে তুমি যত জাঁকজমক করেই করো না আপাদমস্তক হিরে-জহরত দিয়ে মুড়ে দাও না কেন, সেটা হলো তোমাদের মান-স ব্যাপার।' এখানে সোমেশ্বরকে একটা ইঙ্গিত দিলেন ননীবালা।

সোমেশ্বর খুশি হলো। জাঁকজমকের কথাটা ভালো লাগলো তার। আর তখুনি তার জাঁকজমকের তালিকা রচনায় ব্যাপৃত হয়ে উঠলো।

'কিন্তু বাবা, একটা কথা—'

'বলুন।'

'একটু সাহায্য করতে হবে আমাকে।'

'কী সাহায্য?'

'এ সব ব্যাপারে জনবল চাই, তুমি যদি সেটার ভার নাও—'

'সে তো অতি সহজ কথা।'

'আর গাড়িটাও চাই একবেলার জন্য।'

'আপনি এখুনি রেখে দিন না—'

'আর তুমি?'

'আমার লাগবে কিসে? এখন একটা ট্যাক্সি করে চলে যাবো, আর গিয়ে পড়লে গাড়ির অভাব হবে না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেরই তো গাড়ি আছে। দরকার নিয়ে নিলেই চলবে।'

'তাহ'লে তো খুবই ভালো কথা। মেয়েটাকে এই যে কতবার বলি একটা গাড়ি কেন, সে কানে তোলে না! কত সুখে মানুষ করেছি। বাপ বেঁচে থাকতে তো আদরের অভাব না। না-হয় শহরে না-ই থাকতুম, গ্রামে আমরা মানে-সম্মানেই ছিলুম। সেখানে দত্তমল্লিক প্রতিপত্তি তো বড়ো কম ছিল না। বংশমর্যাদায়ও খাটো নয়। ওর বাপ মারা গেলেন পরে গান-গান করেই আমাদের কলকাতা আসা। গ্রামে কি সে-সব হয়? না কি গ্রামের সঙ্গে কোনো শিক্ষিত লোক থাকতে পারে?'

'তা তো ঠিকই।'

'আর এলাম বলেই না তোমার মতো দেবতুল্য মানুষের হাতে আজ মেয়েটিকে তুলে দি পারছি।'

'কী যে বলেন! আপনার মেয়েকে পেয়েই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

'অবিশ্যি এ-কথাও আমি তোমাকে বলবো, মেয়ে আমার বড়ো সাদা-সিধে, ব ভালোমানুষ, এ-রকমটি তুমি সচরাচর পাবে না।'

সোমেশ্বর শব্দ করে হাসলো, 'সে কথা আমি জানি না? জানি বলেই তো হাত পে আছি এতোদিন ধরে। যাক গে, আপনি আমাকে যদি একটা ট্যাক্সি আনিয়ে দেন খুব ভা হয়। গাড়িটা থাক, ওটা আপনি যেমন খুশি ব্যবহার করুন, ও তো আপনার মেয়েরই।' সল কুণ্ঠায় সে যুবকোচিত ভঙ্গি করলো। হাতের প্ল্যাটিনামের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে সহসা ব্য সমস্ত হয়ে বললো, 'এখুনি আমার যাওয়া দরকার, ওদিকেও কিছু ব্যবস্থা আছে।'

'তুমি এক কাজ করো—' আপন হয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন ননীবালা, 'গাড়িটা এখন ব তুমি নিয়েই যাও, আমি ততোক্ষণে এদিকে একটু গুছিয়ে নিই, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে ফি এলে তখন আমি অন্য কাজে বেরুবো।'

'বেশ।'

'আর সেই সঙ্গে তোমার দু-একজন বয়-বেয়ারা, আর সেই ছেলেটি, যে তোমার নখাপড়ার কাজ করে দেয়, তাদের যদি একটু পাঠিয়ে দাও—'

'ঠিক আছে।'

'কিছু মনে করছো না তো? জন বলতে তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার এখানে।'

'আশ্চর্য! এ নিয়ে আপনি অত ভাবছেন কেন? আর কী করতে হবে তাই বলুন।'

'আচ্ছা, একদিনের মধ্যে কিছু কার্ড ছাপানো কি সম্ভব?'

'কেন নয়? ডবল চার্জ দিয়ে করিয়ে নিলেই হবে। বিয়ের নিমন্ত্রণ তো?'

'হ্যাঁ। একটু সুন্দর-টুন্দর করে, এখানকার ফ্যাশানে—'

'কাল দুপুরের মধ্যে পেলে চলবে?'

'দুপুরের মধ্যে পেলেই চলবে। তক্ষুনি গাড়ি করে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কেউ গিয়ে দিয়ে াসবে। বড়ো নিমন্ত্রণগুলো আমি আজই মুখে-মুখে সেরে আসবো। চিঠি দেওয়া বিয়ের একটা রাচরিত রীতি, এই আর কি।'

'আপনার নামেই ছাপা হবে তো?'

ননীবালা মিষ্টি করে হাসলেন।

সোমেশ্বর চলে গেলে আকাশে পাখা মুড়ে ভেসে-থাকা পাখির মতো কতক্ষণ ঝিম ধরে ইলেন ননীবালা। যেন কিছু ভাববার রইলো না, করবার রইলো না, কেবল সুখ, সুখ, আর খ।

দেখতে-দেখতে বেলা বেড়ে উঠছে; দেয়ালের বড়ো ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা াজলো। আজ ননীবালার একাদশী, তাড়াতাড়ি স্নান করে তাড়াতাড়ি বড়ো বাটির একবাটি ধ গরম করে খেয়ে নিলেন, কলা খেলেন, মীটসেফ থেকে দু'খানা সন্দেশ বের করে খেলেন, ান কয়েক বিস্কুটও খেলেন সেই সঙ্গে। তারপর গোটা কয়েক কমলা ব্যাগের মধ্যে ভরে য়ে প্রস্তুত হলেন বেরুবার জন্য। আজ তিনি ভাত খান না, দুপরে তাঁর জন্যে ঘি-মাখানো াতলা আটার রুটি তৈরি হয়েছে, লাউ পাতার ঝোল, ছানার ডালনা, ডাল-পাতুরি, এ-সবও য়েছে। কিন্তু এখন বসে সে-সব খাওয়ার সময় কই? আর খেলেই শুতে ইচ্ছে করে, দুটো াড়াইটের মধ্যে ফিরে এসে তখন ধীরে-ধীরে হবে'খন সে-সব।

নবলক্ষ্মী খেয়ে যেতে বলেছিলো বলেই এ-সব বললেন। বললেন, 'আজ একাদশী হয়ে ামার বরং সুবিধেই হলো, বুঝলি না? আজ তো আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নেই, দিব্যি লকা হয়ে ঘোরাঘুরি করতে পারবো।'

নবলক্ষ্মী মুখ নিচু করে মাথা নাড়লো।

'একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো বড়ো কম কথা নয়? আর এমন হুট করে "ওঠ ছুঁড়ি তার বিয়ে।" অবিশ্যি গয়নাগাঁটি সব আমি আগেই বানিয়ে রেখেছিলাম, কাপড়-চোপড়, তা- ও কিছু কম নেই। আর আমার দেবার আছেই বা কী? আমি হলাম নেহাৎ একটা ইয়ে মানুষ, াজ-রাজড়ার ঘরে মেয়ে দিলে নিজের দেবার কিছু থাকে কি ? দ্যাখ গিয়ে, এদিক থেকে এই য আমি এতো সোনা-দানা দিচ্ছি, ও তো সমুদ্রে শিশিরবিন্দু মাত্র। ওরা দেবে মন-মন সোনা,

আর সেখানে আমি দিচ্ছি কয়েক ভরি মাত্র। অবিশ্যি এ-কথা বলতে পারিস, আমার মতে ক'জন বাপ মা-ই বা এতো দিতে পারে, আর পারলেও প্রাণে ধরে দেয় সেটা সত্যি কথা কিন্তু কী করবো বল? মন তো মানে না। একটা মাত্র মেয়ে, যথাসর্বস্ব দিয়েও যেন আশ মেটে না। এই তো চলেছি বেনারসি কিনতে, তারপর জামাইয়ের জন্যও লাগবে কিছু, কত টাকা নিয়েছি দ্যাখ—' মস্ত ব্যাগ থেকে ননীবালা টাকার বাণ্ডিল বার করে দেখালেন, 'এই সব তো ঢেলে আসবো? অথচ এও তো জানি, আমি একশো টাকা খরচ করে যে বেনারসি কিনবো, সে বেনারসি ওদের বাড়ির বেনারসির কাছে একটা ন্যাকড়ার মতো দেখাবে বউভাতে দেবে তো ওরা। দেখবি তো সবই। সাচ্চা সোনার সুতো দিয়ে তৈরি হবে সে কাপড়। সূর্যের আলো পড়লে তাকানো যাবে না, গালালে না-হোক সেরটাক সোনাও কি বেরোবে।'

সোমেশ্বরকে এলগিন রোডে পৌঁছে দিয়ে গাড়িটা আবার তখুনি ফিরে এসেছে বালিগঞ্জে ননীবালা আর দেরি করলেন না। যেতে-যেতে মেয়ের ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন একবার। শুয়ে আছে মানসী, মুখটা ওদিকে ফেরানো, এদিকে বালিশ-ছাওয়া খোলা চুল।

'কী রে, শরীর কি খুব খারাপ লাগছে নাকি।'

জবাব শোনা গেলো না।

'আমি বেরুচ্ছি, বুঝলি? ফিরতে দেরি হবে অনেক, তুই খেয়ে নিস। ঘর পেরিয়ে ফ্ল্যাটে দরজায় এসে গলা চড়ালেন, 'নবলক্ষ্মী আর নন্দর মা-ও যেন খেয়ে নেয়।' তারপর তরতরিয়ে নেমে গেলেন নিচে।

গাড়িতে আরাম করে এলিয়ে বসে প্রথম কোনদিকে যাবেন, কী করবেন সেটাই চিন্তা করলেন। কালকে যারা আসবে, সে-নিমন্ত্রণ তো আগেই করেছেন, কিন্তু আজকের আশীর্বাদের সময়েও তো ডাকতে হবে বাছা-বাছা কয়েকজনকে? তাদের নামগুলো আর মুখগুলোই মনে করতে তিনি চেষ্টা করলেন।

এখন, এই মুহূর্তে অবিশ্যি কেনাকাটার ব্যাপারটাই তাঁর কাছে প্রধান। আর সময় নেই এই বেলাটুকুর মধ্যেই যা করবার করে নিতে হবে। নিমন্ত্রণের কাজ অন্যাকে দিয়ে করালে চলতে পারে, ফোন করে দিলেও হতে পারে, কিন্তু কেনাকাটার কাজে কাউকে দিয়ে তাঁর ভরসা নেই। ভরসা করবার যোগ্য লোকজনই কি আছে নাকি সংসারে। প্রত্যেকটা লোক আজকাল অবিশ্বাসী, ধড়িবাজ, মিথ্যে কথা বলে। আর এতো টাকার কেনাকাটা! ননীবালা শূন্যে ভ্রূকুটি হানলেন।

কিন্তু তবুও দু-একটা বাড়িতে আজ নিজেই যাবেন তিনি। যাওয়া দরকার। ব্যাপার নেহাত ছোটো নয়, সে-ভাবে সারবেনও না, শত্রুরা ঘিরে আছে চারদিক। সকলকে তিনি চকিত করবেন, ব্যথিত করবেন, দাগা দেবেন প্রাণে। অনেক ভেবে নিমন্ত্রণের লিস্ট করেছেন অনেক ভেবে আড়ম্বরের ব্যবস্থা করেছেন। টাকা খরচ হবে। তা হোক। ঘরে ঘরে যা-ই করুন মুঠো হাত খুলুন বা না-খুলুন কিছু এসে যায় না, আপন ঐশ্বর্য আপনি দেখে সুখ কী? পরকে দেখাতে পারলে তবে না তার মূল্য। আর দেখাবার সুযোগ এর চেয়ে আর বেশি কবে আসবে তাঁর জীবনে? কখনোই না। প্রায় ছ'মাস যাবৎ তিনি তিল-তিল করে তাঁর ভাবনাধারা

ম্পূর্ণ রূপ দিয়েছেন, ভেবে-চিন্তে তিন মাস ধরে বিয়ের তারিখ পাকা করবার ফন্দি এঁটেছেন, ক মাস আগে থেকে এই তারিখটিকে লক্ষ্য করে বিয়ের ফর্দ তৈরি করেছেন। মানসী না ানুক, তিনি জানতেন মানসীর নিয়তি মানসীকে এই লক্ষ্যেই টেনে নিয়ে আসছে সজোরে, পাঁছতে যে আর বিলম্ব নেই তাও ভালো করেই জানতেন। আর কাজ এগিয়ে এসেছে ানেও তিনি চুপ করে বসে থাকবেন ততোটা শৈথিল্য তাঁর মনে বা দেহে কোনোখানে নেই।

অবিশ্যি চুপ করে কোনোদিন বা কখনোই তিনি ছিলেন না। থাকলে এই সৌভাগ্য এমন রে হাতে এসে ধরা দিতো না। তার জন্যে ভাবতে হয়েছে, চেষ্টা করতে হয়েছে, সীতাহরণের ন্য রাবণের যেমন সোনার হরিণ তৈরি করবার দরকার হয়েছিলো, ঠিক তেমনি নীবালাকেও সেই কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। রাবণ সীতাকে পেতে চান, কিন্তু তাঁর চ্ছেটাই যেমন সব নয়, তেমনি সোমেশ্বরের ইচ্ছেটাও তাঁর মেয়ের মনের কাছে সব ছিলো ়। সব কেন, কিছুই ছিলো না। সেখানে মায়ামৃগের পার্টটা ননীবালাকেই নিতে হয়েছিলো। -দিক থেকে দু'জনকেই ছলনা করতে হয়েছে তাঁকে। নিজের বিচিত্র সুচিত্র ছলনার রূপ দেখে াজেই কতবার মুগ্ধ হয়েছেন। সোমেশ্বরের কাছে তিনি কি তিনি থাকতেন? ননীবালার ানার বিম্বই দেখেছে সে, দেখেছে আর অভিভূত হয়েছে। মানসীকে পাবার জন্য না-জেনে ামেশ্বর তাঁর পিছে-পিছেই হেঁটেছে, মানসীর কঠিন ব্যবহারে সে যতবার যতদূরে ছিটকে গছে, ততোবার ততোদূর থেকে তিনিই তাকে সাপটে নিয়ে এসেছেন।

ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দূর
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ার প্রচুর।

রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড মনে পড়ে গেলো ননীবালার। রাবণরাজার মতো দুই চোখে আলো ালিয়ে ননীবালাও আপন সাফল্যে আপনিই উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। চুনোপুঁটি তো য় সোমেশ্বর, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে, অনেক দেখে চুল লালচে হয়ে এসেছে, অনেক াতাপ খাটিয়েছে অনেক স্ত্রীলোকের উপর, জীবন ভরে এটাই জেনেছে এই জগৎসংসারের কিল লোকজন তারই অধীন, তারই দাস, পাবার জন্যই সে এসেছে, আর এরা এসেছে দেবার ান্য। পেতে গেলে যে কষ্টও করতে হয় এই বোধ সোমেশ্বরের জ্ঞানের এলাকার বাইরে। ানসীর বিমুখ মন, অনিচ্ছুক প্রেম আর সংযত ব্যবহার প্রথম থেকেই ধাক্কা দিয়েছে তাকে। ই ধাক্কায় জেদ বেড়েছে, ইচ্ছে বেড়েছে, ক্ষুধা বেড়েছে, আর জমিদারনন্দনের সেই সব রিপুর াগুনে ননীবালা ঘৃতাহুতি দিয়ে তাকে প্রজ্বলিত করেছেন। কোন যজ্ঞের কী বিধি তা যে তাঁর াতো নখদর্পণে ছিলো, নিজেই কি জানতেন?

জানতেন। জানতেন। সব জানতেন। প্রথম যেদিন সোমেশ্বর তাঁদের বাড়িতে এসেছিলো, চেহারা নিয়ে রাজার ভঙ্গিতে রাজা হয়ে বসেছিলো সোফায় হেলান দিয়ে, মানসীর শুনেছিলো, মুগ্ধ আবেশে চোখ বুজেছিলো, তারিফ করেছিলো, গদ্‌গদ্ ভাষায় আলাপ ছিলো, সেদিন থেকেই প্রত্যক্ষে না হোক পরোক্ষে তিনি তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চৈতন্য বুদ্ধি দিয়ে জেনে ফেলেছিলেন সব কথা। মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে ছিলো মানসী, থাবার্তা জমাতে পারে নি সোমেশ্বর। তাতে কী। ননীবালা তো ছিলেন সেখানে। তাঁর মুখের স্নেহ হাসিটি তো মলিন ছিলো না, যত্নে তো কোনো ত্রুটি ছিলো না, আগ্রহেও ভাটা ছিলো । অপুত্রক বর্ষীয়সী মহিলার পুত্রস্নেহের ব্যাকুল বাসনার ভানকেও শৈশবে মাতৃহীন পুরুষ ার্থ করতে লোলুপ হয়। ননীবালা কি জানেন না পুরুষমানুষ যত বড়োই দিগ্বিজয়ী পুরুষ

হোক না, গৃহে তারা শিশু, অসহায়। মায়ের ক্ষুধা তাদের চিরকালের। স্ত্রীর মধ্যেও তারা মারে আবার পেতে চায়। মায়ের যত্নই খোঁজে। মায়ের পার্টে কি ননীবালার একতিলও খুঁত ছিে সেদিন?

এসেছিলো সুপ্রিয়া চ্যাটার্জির সঙ্গে। ব্যারিস্টার এ. এন. চ্যাটার্জির মেয়ে, রাফে ভট্টাচার্যের আর-একজন কৃতী ছাত্রী। ননীবালা লক্ষ্য করেছিলেন সোমেশ্বরের সঙ্গে মেয়েটি বন্ধুতা বা আলাপের গতিটা ততো সরল নয়। রং ধরেছে। বুকটা কড়কড় করে উঠেছিলে সেই সঙ্গে বিদ্যুতের মতো একটা ক্ষণিক আলোও তিনি দেখেছিলেন, আশাও পেয়েছিলে অতৃপ্ত সোমেশ্বরের তৃপ্তি যে সুপ্রিয়াতেও আবদ্ধ থাকবে না, সেটা তৎক্ষণাৎ ধা ফেলেছিলেন তিনি। আর ধরে ফেলা মাত্রই মায়ামৃগ ঝলমল করে উঠলো তাঁর সোনার অ নিয়ে। আর তারপর আস্তে-আস্তে খেলিয়ে-খেলিয়ে এইখানে তো নিয়ে এলেন। মেয়েট বোকা! কিসে ওর ভালো, কিসে ওর মন্দ বোঝে কখনো? না কি ভাবে সে-কথা? না কি এ যে ননীবালা আপ্রাণ চেষ্টায় এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটিয়ে দিলেন তার জন্য কোনে কৃতজ্ঞতা আছে? কিচ্ছু নেই। নেই তো নেই। চুপচাপ থাকলেই পারিস। নিজেকে সমর্প করলেই পারিস। ভাবলেই পারিস আমার যখন মাথা নেই, মা'র বুদ্ধিতেই চলি না, তা নয় মুখের দিকে তাকানো যাবে না। থমথম করবে মেঘ, কিন্তু ফাটবেও না, ঝরবেও না। কেবল অন্ধকার করে দেবে চারদিক। একটা গুমোট চলবে কয়েকদিন। কথা বললে তার জবাব তৈরি আছে, কিন্তু একটা অবুঝ, হাবা বোবা মেয়ের নিঃশব্দ রাগের সঙ্গে কী অস্ত্র নিয়ে লড়াই করবেন ননীবালা। তখন মনে হয় ঠিক আগের মতো চুলির মুঠি ধরে পিঠের উপর গুমগুম কয়েকটা লাগাতে পারলে ঠিক হয়. ঝাল মেনে মনের, কিন্তু সে-সাহস আজ আর নেই ননীবালার। মনে-মনে রাধানগরের দত্তমল্লিক গোষ্ঠীকেই দায়ী করেন, বাপের স্বভাব পেয়ে বলে একলা ঘরে মাথা খোঁড়েন।

তবু যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যে ঢং ধরে তীরের কাছে এসেও তরী ডুবিয়ে দেয়নি মে তার জন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। নৈলে সব আকাঙ্ক্ষায় আজ তাঁর জলাঞ্জলি হতো। জীবনে য কিছু চেয়েছেন, যত কিছু পেয়েছেন, এই পাওয়াটাই কি তার মধ্যে চরম পাওয়া নয়?

সুপ্রিয়ার সঙ্গে সোমেশ্বর সেদিন মানসীকে তার বাড়ির এক গানের জলসায় নিমন্ত্র করতে এসেছিলো। বাগচি লজে বসবে সেই আসর। অনেক গাইয়ে এসেছে বাইরে থেকে বাংলার গায়ক-গায়িকাদেরও বাদ দিচ্ছে না সে। সোমেশ্বরের ধারণা গাঁয়ে যোগী ভিখ পায় তাই, নইলে গানে আজকাল বাঙালিরাও পিছিয়ে নেই। তার মনে সেদিন এক প্রতিযোগিতার ভাবই ছিলো। বাইরে থেকে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে লড়াইতে বসাে চেয়েছিলো কলকাতার গাইয়েদের। মানসীকেও সে সেই সম্মান দিতে চায় বলেই নিমন্ত্র করতে এসেছিলো, মানসী আর সুপ্রিয়া ঠুংরি গাইবে। সোমেশ্বর মনে করে এ-দেশের এ-দু মেয়ে গানের জগতে অনন্যসাধারণ।

শীতকাল। কলকাতা জমজমাট। এখানে একজিবিশন, সেখানে সার্কাস, ওখানে কুস্তি, নি মার্কেট সেজেগুজে ফুলবাবু। ফ্লাওয়ার শো, ডগ শো, আরো যে কত কী অন্ত নেই। তার মে প্রধান হলো গানের কনফারেন্স। একমাস ধরে চলেছে সেই গান। বড়ো-বড়ো ওস্তাদরা হাজা হাজার টাকা মুজরো নিয়ে কত দূর-দূর দেশ থেকে বাংলা মুলুকে চলে এসেছে গলার কসর

দখাতে, বাহবা নিতে। তারা জেনেছে কলকাতা শহরে টাকার গাছ আছে, হাত বাড়ালেই মলে। কলকাতা শহরে ফুর্তি আছে, চাইলেই পাওয়া যায়, কলকাতা আলাদিনের আশ্চর্য দীপ। সেখানকার লোকেরা টাকা ছড়াতে তো জানেই, সমঝদারও বটে। তা নৈলে হাজার-হাজার টাকার টিকিট এমন অনায়াসে বিক্রি হচ্ছে কেমন করে। লোকেরা রাতের পর রাত মন পাগল হয়ে গান শুনছে কেমন করে, যারা টিকিট কাটতে পারছে না, তারা আছে ফুটপাতে। বসে আছে সারারাত, শুনছে, মোহিত হচ্ছে, অপার্থিব আনন্দের নেশায় ভুলে গেছে দেহের সুখদুঃখ। কাগজে ছবি উঠছে এই সব গুণগ্রাহীদের।

ননীবালাও সেই গুণগ্রাহীদের একজন হয়েছেন দু-একদিন। মেয়ের দৌলতে বেশি দামের সামনের আসনে বসে হাঁ করে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছেন এদের কাণ্ডকারখানা। বাঈজিদের দেখেছেন, ওস্তাদদের দেখেছেন, আলো দেখেছেন, ফুল দেখেছেন, লোকে লোকারণ্য প্যাণ্ডেলের অগুনতি কালো-কালো মাথা দেখেছেন, গণ্ডগোল শুনেছেন, পরিচিত মানুষ দেখলে যারা চেনার যোগ্য তাদের চিনে গল্প করেছেন, যারা অযোগ্য তাদের করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধন্য করেছেন। তারপর ভেবেছেন কত টাকার টিকিট বিক্রি হলো এক রাত্রে, ক'টা লোক ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়লো, ক'জন মানুষ সসম্মান নিমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে তাঁর মতো। বাইরে থেকে হাসাহাসির শব্দ এসেছে, ফুর্তির উদ্দামতা। এসেছে পাঁপর ভাজার গন্ধ, ভেতরে ঠোঙা-ঠোঙা পেঁয়াজি এসেছে। লোকেরা চাকুম-চুকুম খাচ্ছে, তন্দ্রায় ঢুলে পড়ছে, চেয়ারের হেলানে ঘুমুচ্ছে গোঁ-গোঁ নাক ডাকিয়ে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ঢুলে-ঢুলে পড়ছে, ননীবালাও ঢুলতে-ঢুলতে বারে-বারে খুরি ভর্তি গরম চা আনিয়ে খেয়েছেন, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে এক ঘুমে রাত কাবার।

গান তিনি শোনেন নি। গান শুনতে যানও নি! আর এ-কথাও তিনি জানেন, খবরের কাগজ আলো করে গানের শ্রোতাদের যে-সব ভিড়ের ছবি বেরোয়, তারা বেশির ভাগই তাঁর মতো শ্রোতা। তারা আসে ভিড় বাড়াতে, দল বেঁধে রাত জাগতে, সিগারেট টানতে, নেশা করতে, চা পেঁয়াজি খেয়ে জিবে শান দিতে। ছেলেরা মেয়ে দেখে। মেয়েরা সাজগোজ দেখায়। নিত্যি তিরিশদিনের নিয়মভাঙার আনন্দে মেতে উঠতে আসে সব। তা মন্দই বা কী। এমন সব উত্তেজক রাত কি জীবনে রোজ আসে? তা নৈলে গান! ঐ সব গানে শোনবার আছেটা কী! তিনি তো ভেবে পান না। কেবল মাথা-কোটাকুটি আর কুকুরের ঘেউ-ঘেউ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, শরীরটাকে ভেঙেচুরে সারাটা রাত ধরে লোকগুলো কলজে ফাটিয়ে কী চিৎকারই না করে। পারেও। আর তাই শুনে মূর্ছা যান তাঁর মেয়ে। প্রত্যেক রাত্রে নির্ঘুম চোখে ঠায় বসে থাকে সেখানে, মোহের মতো তাকিয়ে থাকে, পাগলের মতো অস্থির হয়ে ওঠে শুনতে-শুনতে, ডাকলে সাড়া নেই—যেন জ্ঞান নেই কোনো।

শুধু এই গানই নয়, কোনো গানই ভালোবাসেন না ননীবালা। তাঁর মনের মধ্যে এই সুকুমার বৃত্তিটি নেই, সুরের কোনো জাদু নেই তাঁর জীবনে। নেহাৎই মেয়ে একটা মস্ত গাইয়ে, এই গানই তাঁর লক্ষ্মী, গান দিয়েই এইখানে তিনি সমাসীন, মান-সম্মান প্রতিপত্তি এই গানের হাত ধরেই এসেছে তাঁর দরজায়, তাই ঝালাপালা হয়েও সহ্য করেন। তা নৈলে কোনোখানে গান শোনার নিমন্ত্রণ হলে তিনি তৎক্ষণাৎ অরাজি। চায়ের নিমন্ত্রণে যান, কিছু দেখবার নিমন্ত্রণ হলে যান, ছবির মহরতে যান, এমন কি মেয়ে যখন গ্রামোফোনে গান দিতে যায় তখনও সঙ্গে

-সঙ্গে দমদম চলে যান গাড়ি চ'ড়ে বেড়িয়ে আসবার জন্য, কিন্তু কোনো জলসার নিম: কিছুতেই যান না। তবু কনফারেন্সগুলোতে অনেক আমোদ আছে, কিন্তু ঘরে জলসাগুলোতে তো কেবল দাঁতমুখ বুজে চুপ করে বসে চোয়াল ব্যথা করা। খেয়ে-দেয়ে ব কর্ম নেই নাকি তাঁর?

কিন্তু সোমেশ্বর যখন বললো, 'আপনিও কিন্তু যাবেন।' স্মিতহাস্যে ঘাড় হেলিয়ে মু রাজি হলেন ননীবালা, 'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। গানের ব্যাপারে নিমন্ত্রণ না-করলেও আমি গিয়ে থাকতে পারি না।'

মানসী মুখ তুলে তাকিয়েছিলো, ননীবালা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'গান আ নেশা। কে-কে গাইবে?'

'সবাই। কলকাতার খ্যাতনামা গাইয়েরা তো নিশ্চয়ই, আর কনফারেন্সে যাঁরা এসে তাঁদেরও প্রায় সবাইকেই পেয়েছি। আমি ভাবছি—' মনের কথাটা বললো সোমে 'ডালরুটির সঙ্গে মাছভাতের একটা ঠোক্কর লাগুক। একই ঠাটের গান পাশাপাশি দু' গাইবে, একজন বাঙালি একজন অবাঙালি। দেখবো, এক বাংলাদেশ থেকেই যত টাকা প্রত্যেক বছর লুটে নিয়ে যায়, সত্যিই তার যোগ্য কিনা। আমার তো মনে হয় এই যে এ নাম আসমানী বাইরের, তার চেয়ে এঁরা—' এখানে সোমেশ্বর মানসীর দিকে এক তাকালো, 'কিছুমাত্র কম যান না। বরং আমি বলবো এঁদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওদেরই কে তুলনা হয় না। গাঁজা-খাওয়া ফাটা গলা—এই পাখির স্বর পাবে কোথায়।'

ননীবালা খুশি হলেন। ন্যাকামি করে বললেন, 'আমার মেয়ের গান তাহলে আপ শোনবার অযোগ্য নয়।'

'তাহলে কি আর খুঁজে-খুঁজে আলাপ করতে আসি?'

'আপনাদের প্রশংসার মূল্য তো জানি। গানের জগতের মানুষ আপনারা—' এইখ থামলেন, শুনেছিলেন কোথাকার রাজারা যেন দারুণ গানের ভক্ত, ঠিক এরাই কিনা : করতে পারলেন না। সোমেশ্বরই তাঁকে রক্ষা করলো সেই সংশয় থেকে, 'তা বলতে পারে এ আমাদের রক্তের ধারা, পুরুষানুক্রমে আমরা গানের ভক্ত। এখন আর কিছুই হয় না, ব এক-আধবার এক-আধটা জলসা মাত্র, তা নৈলে আমাদের বাগচি লজ-এর গোলঘর বারোমাস ওস্তাদেই ঠাসা থাকতো।'

বিজ্ঞের মতো ননীবালা মাথা নাড়লেন—'তা আর জানি না।' এখানেও মানসী মা'র : চোখ তুলেছিলো।

সোমেশ্বরের চোখে অতীতের ছায়া ভাসলো। অর্ধমনস্ক হয়ে বললো, 'প্রায় ছ' ফুট গ করে, বারো ফুট চওড়া গোল একটা পরিখা কেটে চারদিক ঘিরে দেওয়া হয়েছিল (গোলঘরের। ইটালি থেকে মার্বেল আনিয়ে তীর বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, পাশে-প গোলাপের ঝাড়। একটা লোহার ঝোলানো ব্রিজের উপর দিয়ে সেই পরিখা ডিঙিয়ে গোল যেতেন কর্তাবাবুরা, নিচতলাটাতে বিশাল একটা হল, ঠিক মাঝখানে একহাত উঁচু প্রশস্ত বে সেখানে ওস্তাদরা বসতেন তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে, আর শ্রোতারা নিচে গোল হয়ে ি বসতেন যাঁর যাঁর আসনে। উপরতলার গোল বারান্দা ঘিরে খান বারো ঘর ছিলো, ে একান্তভাবেই সেই গাইয়ে বাজিয়েদের বাসস্থান।' সোমেশ্বর সুপ্রিয়ার দিকে তাকা 'তোমাকে তো দেখালাম সেদিন, কী হয়ে পড়ে আছে দেখলে তো। ঐ পরিখায় এক সময়ে সুন্দর টলটলে জল ছিলো, কত পদ্ম যে ফুটে থাকতো—'

চোখ বড়ো করে, থুৎনি গলায় ঠেকিয়ে ঢং করলো সুপ্রিয়া—'ভীষণ অন্যায়। এ-ভাবে একটা সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার কিন্তু আপনার নেই।'

সোমেশ্বর হাসলো। 'সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, ও-সব মেইনটেইন করবে কে? জানো, এখনো বাড়ি পরিষ্কার রাখবার জন্য আমাকে পাঁচটা মালির মাইনে দিতে হয়?'

ননীবালা হাঁ হ'য়ে শুনেছেন, ঢোঁক গিলে বললেন, 'গান-বাজনার ব্যাপারটা তাহ'লে সে-বাড়িতেই হবে?'

'হ্যাঁ, ঐ গোলঘরেই। ওখানে প্রায় সাত-আট শো লোক বসতে পারে।'

'এত বড়ো!'

বিনীত হাস্যে যুক্তকর হলো সোমেশ্বর। 'ও-রকম জলসাঘর একমাত্র রায়গড়ের রাজাদেরই আছে, মিসেস দত্তমল্লিক, অহংকার করে বলছি না, আমার পিতামহদের শুধু শখই ছিলো না, রুচিবোধেও তাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

এ-কথার পরে ননীবালা শুধু বিহ্বল হ'য়ে তাকিয়েছিলেন সোমেশ্বরের মুখের দিকে। একটা সত্যিকার রাজপুত্রকে কিংবা রাজাকে সমস্ত চৈতন্য দিয়ে দেখছিলেন বোধহয়। তিনি কি আর কখনো কোনো ধনী ব্যক্তিকে দেখেন নি? দেখেছেন বৈকি! জজ দেখেছেন, ম্যাজিস্ট্রেট দেখেছেন, ব্যারিস্টার দেখেছেন, দেখেছেন কোটিপতি মারোয়াড়ি প্রযোজক, লক্ষপতি ব্যবসায়ী, আরো কত লোক দেখেছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ কোনো রাজা খেতাবধারী মানুষের সাক্ষাৎ তো আর পান নি। এমন পরিখা-ঘেরা গোলঘরের খবরও শোনেন নি। যে-বাড়ির কোনো একটা অংশে, কোনো একটা ঘরেই সাত-আট শো লোক বসতে পারে, সে-বাড়ির সমস্তটা যে কত বড়ো সেটাই মনে-মনে ধারণা করতে চেষ্টা কররেন তিনি।

একটু পরে বললেন, 'আপনি তো সে-বাড়িতেই থাকেন?'

সোমেশ্বর হাসলো, 'তা থাকতেই হয়, কিন্তু শিগগিরই ছাড়ছি।'

'কেন?'

'ও-সব পুরোনো জিনিস আঁকড়ে থাকা আমার পোষায় না। একলা মানুষ, দিব্যি আরামে একটা ভালো পাড়ায়, ভালো ফ্ল্যাটে থাকবো, অত বড়ো বাড়ি দিয়ে আমার হবে কী? ও-বাড়ির ক'টা মহল জানেন? আমার ঠাকুমা বলেন ছেলেবেলায় আমি নাকি একবার আমাদের বাড়ির মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছিলাম।' সোমেশ্বর হেসে উঠলো।

ননীবালা জিব দিয়ে ঠোঁট চাটলেন, ইতস্তত ক'রে বললেন, 'দয়া ক'রে আমাদের এখানে আসবেন তো মাঝে মাঝে?'

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। অনধিকার অনুরোধ। সোমেশ্বর এই প্রথম দিন এসেছে তাঁর বাড়িতে, বেড়াতেও আসে নি, প্রয়োজনেই এসেছে। যেমন আরো কত কেউ কত জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ করতে আসে, এও তেমনি। সুপ্রিয়া পরিচিত ব'লে, সুপ্রিয়ার সঙ্গে এসেছে এইটুকু যা তফাৎ। এর মধ্যে আবার আসবার মতো প্রশ্ন ওঠে কোথায়? মানসী বিরক্ত হয়েছিলো। ননীবালা জানেন বিরক্ত তাঁর মেয়ে অনেকক্ষণ থেকেই হচ্ছিলো, কিন্তু এবার সেটা চরম হ'লো। হঠাৎ হারমনিয়মটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা, আজ তাহলে—'

বিদায় দেবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সোমেশ্বর, গা ঘেঁষে সুপ্রিয়াও উঠে দাঁড়ালো কিন্তু ননীবালা বসে রইলেন, বসে-বসেই সনির্বন্ধ হলেন, 'দয়া করে এসেছেন, শুধু মুখে যেতে দেবো না। একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। মানসী, যা তো, একটু দেখে আয় তো চা-টা হলো কিনা।' লোকের সামনে মেয়েকে তিনি টুনি বলেন না।

সোমেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বললো, 'না, না, ও-সব কিছু করতে যাবেন না, তাছাড়া এই অসময়ে—'

'অতিথি নারায়ণ—' মিষ্টি করে হাসলেন ননীবালা, 'তার উপরে এমন অতিথি, এর কি কোনো অসময় থাকতে পারে?' মেয়ের উদাস গম্ভীর মুখের উপর পলকপাত করলেন তিনি, তারপর নিজেই উঠলেন, 'আমিই দেখে আসছি, তুই ওদের কাছে বোস।' যেতে-যেতে ফিরে তাকালেন, 'সুপ্রিয়া, শোনো।'

'কি, মাসিমা?' সুপ্রিয়া কৌতূহলী হয়ে কাছে যেতেই ননীবালা তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বাধ্য হয়ে বসলো সোমেশ্বর। বাধ্য হয়ে মানসীও আলাপে প্রবৃত্ত হলো। কিন্তু ননীবালার চালটা কি কেউ ধরতে পেরেছিলো সেদিন? সুপ্রিযাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অজেবাজে কথায় আটকে রাখতে রাখতে সোমেশ্বরের সঙ্গে তার পরিচয়ের কতখানি গভীরতা সে খবরটা সংগ্রহ করতে-করতে তিনি যে মেয়ের কতখানি উপকার করছিলেন তা-ই কি বুঝেছিলো তাঁর বোকা মেয়েটা? সিল্কের মস্ত রুমালটা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে-খেতে আজ তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাবলেন সে-সব কথা। তারপর নিজেকে তারিফ করে হাসলেন আপন মনে।

ভাগ্য। ভাগ্য। সবই ভাগ্য। নৈলে মানসীর কী যোগ্যতা ছিলো সোমেশ্বরের স্ত্রী হবার? কী আছে তার? রূপ গুণ অর্থ বিত্ত শিক্ষা দীক্ষা সব দিকেই সে ছোটো। শুধু গান। গানের কি এতোই মোহিনী শক্তি ? না, তা নয়। ভাগ্যও নয় শুধু। ভাগ্যের চাকা ধরে ঝুলে থাকবার অসীম ধৈর্য্যেরই এই উপহার। ভাগ্যকে গ্রহণ করবার শক্তি কি সকলেরই থাকে, না আছে? ননীবালা না-থাকলে এই ভাগ্য কি আজ মানসীকে ধরা দিতো? কখনোই না।

টুকটুক তুড়ি মেরে হাই তুলে গাড়ির জানালা দিয়ে তিনি নির্দিষ্ট পথের আশায় উৎসুক দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকালেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভবানীপুরের কোনো এক সরু গলির মুখে এসে গাড়ি থামলো। ননীবালাই থামালেন। কানাই ঠাকুর থাকেন এখানে। বরেন-মামার বাড়িতে যখন ছিলেন, এই ঠাকুরই তাঁদের পুজো-আর্চা করে দিয়ে আসতো। সেই থেকে ননীবালার সঙ্গে চেনা। ননীবালার কাজে-কর্মেও দু-একবার ডাক পড়েছে কানাই ঠাকুরের। বছরে দু'বার ঘটা করে নারায়ণসেবা করেন তিনি, এখনো দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে তাঁর। অন্তত তাঁর নিজের তা-ই ধারণা। ঘোরালো প্যাঁচালো রাস্তা বেয়ে একতলার ছোট্ট দু'খানা ঘরে এই পুরুৎ মশায়ের আস্তানা। মাঝখানে উঠোন আছে একটি। সেখানে দাঁড়িয়েই ননীবালা হাঁকলেন, 'ঠাকুরমশাই কই গো?'

প্রথমে একটি বিধবা মেয়ে বেরিয়ে এলো, ননীবালা চেনেন তাকে। ঠাকুরমশায়ের মেয়ে। তারপর এলেন ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী, তারপর ঠাকুরমশায় নিজে। বোঝা গেলো বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। টিকিতে ফুলটি পর্যন্ত বাঁধা হয়ে গেছে। নামাবলিটি কাঁধে। ননীবালা একগাল হেসে বললেন, 'মেয়ের বিয়ে।'

'তাই নাকি ? খুব ভালো, খুব ভালো। কোথায় বিয়ে দিচ্ছেন?'

ননীবালার সবিস্তারে বলবারই ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু সময় কম, তবু তারই মধ্যে যতটা পারেন বলে নিলেন।

ঠাকুরমশায় খুশি হলেন শুনে। আশীর্বাদ করে বললেন, 'কবে?'

'কবে আবার, একেবারে ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে যে। রাজা বাহাদুর আর একদিনও দেরি করতে চাইছেন না, কালকের তারিখেই সারতে হবে। লগ্ন তাড়াতাড়ি আছে। প্রায় গোধূলি লগ্নই বলা যায়। সকালে আটটার সময় রেজিস্ট্রি হবে, সন্ধ্যা সাতটার সময় বিয়ে। আপনি যা হয় করে-কম্মে দেবেন—'

'নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। কিন্তু চুক্তি করবেন, না নিজেই সব—'

'চুক্তি মানে?' ননীবালা অবাক না-হয়ে পারলেন না।

'চুক্তি মানে চুক্তি।' ননীবালার অজ্ঞানতায় ঠাকুরমশায়ও একটু অবাক হলেন। 'অর্থাৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন আপনারা করবেন, না আমি করবো এই আর কি। যেমন শ্রাদ্ধ। আজকাল সবাই চুক্তিতে করে। তারপর ধরুন উপনয়ন, অন্নপ্রাশন—সব তো আমরা আজকাল চুক্তিতে নিই। বিয়েটাই এতোদিন ছিলো না, এখন সেটারও চলন হয়েছে।'

'ও।'

'একটা হিন্দু বিবাহের খুঁটিনাটি তো কম নয়। সব আমরা নিয়ে যাই। যেমন কুলো, পিঁড়ি, শাঁখ, সরা, গাছকৌটো, কোষাকুষি—দশকর্ম ভাণ্ডারের সমস্ত জিনিস আমরা ভাড়া করে নিয়ে যাই, বিয়ে শেষ হওয়া মাত্র ফেরৎ দিয়ে দিই। চেলি পর্যন্ত ভাড়া পাওয়া যায়।'

'তাই নাকি?'

'তা নৈলে অত সব করবেন কখন। একদিনে ঐ অণুকোটি চৌষট্টি আয়োজন সম্ভব? আপনি টাকা ধরে দিন, আমি কাল সন্ধ্যাবেলা সব সুদ্ধু গিয়ে হাজির হবো। বর-কনে যে বসবে তার নতুন পার্টিটা পর্যন্ত নিয়ে যাবো। কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।'

'তাহলে তো খুব ভালো হয়। আমি আরো ভাবছিলাম, এতো অল্প সময়ে কী করি। আপনাকে নিয়ে বাজার করবো বলেই এসেছিলাম। যা-যা লাগবে ফর্দ করে দেবেন, কিনে দেবো। এ-ভার যদি আপনি নিজেই নেন তাহলে তো আমি বাঁচি। আর খরচও তো বোধহয় কম লাগবে'

'লাগবে না! একটা জিনিস কেনা আর ভাড়া করা, তফাৎ আছে না? তাছাড়া সব তো একদিনের জন্য, কিনেও তো লাভ নেই কোনো।'

'তাই তো।'

'আপনার আদ্ধেক টাকা বেঁচে যাবে।'

'তাহলে চুক্তিতে কত লাগবে বলুন।'

'আসুন, ঘরে বসবেন আসুন, সব বলে দিই আপনাকে।'

ঘরে এসে বসলেন ননীবালা। পাঁচমিনিটের মধ্যে ঠিক হয়ে গেলো সব। আগাম টাকা দিয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। ঠাকুরমশায় সঙ্গে এলেন, কাছেই কোথাও যাবেন তিনি, ননীবালা ঐটুকু রাস্তা দয়া করে তাঁকে পৌঁছে দেবেন। অবিশ্যি আরো একটু উদ্দেশ্য আছে সঙ্গে আনবার। দু'জন ঠিকে ঠাকুর ঠিক করতে চান তিনি কালকের জন্য, ঠাকুরমশায় জানেন এ-সব খবর। তাদের আটঘাট তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু ঠাকুরমশায় সে-কথা শুনে বললেন, 'তার দরকার কী? তার চেয়ে হোটেলে অর্ডার দিন না।'

'সে কি হয়?'

'কত লোক হবে আপনার?'

'কত আর! কাকে বা চিনি এখানে। হতো যদি আমাদের গ্রামে দেখতেন পিলপিল করে পাঁচশো লোক এসে হাজির হতো।'

'তার মানে পাঁচশো লোকও হবে না?'

'না না, পাঁচশো কোথা থেকে হবে। দু'শো হলে ঢের।'

'ও, তাহলে তো কোনো অসুবিধেই নেই। আর তাছাড়া ও-সব বাঙালি ব্যাপার আপনি করবেনই বা কেন? রাজাউজিরের সঙ্গে কাজ করছেন, হালেচালে সেই মর্যাদা রাখতে হবে তো। নিশ্চয়ই অনেক বড়ো-বড়ো লোকও আসবে, যারা সাহেবসুবোর মতো খানা খায়।'

'হ্যাঁ, তা অনেক আসবে।'

'তবে? সেখানে কি তকমা-আঁটা বয়-বেয়ারা না-হলে মানায়?'

'সে-রকম পাওয়া যায়?'

'যায় না? টাকার কাছে সব বিকোয়। বাঘের দুধ পাওয়া যায় আর ভাড়াটে বেয়ারা পাওয়া যায় না?

'তাহলে আমাকে তাই ঠিক করে দিন।'

'বেশ।'

ঠাকুরমশায় ওস্তাদ লোক। মস্ত এক হোটেলে নিয়ে এলেন ননীবালাকে। বললেন, 'এবার বলুন কী কী আপনি চান।'

হোটেলের চারদিকে তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গিয়েছেন ননীবালা। ভালো-মন্দ খাবারের গন্ধ এসে ঝাপটা দিচ্ছে নাকের মধ্যে। কলকাতা বসবাসের এই কয়েক বছরের মধ্যে কম তো দেখলেন না, সোমেশ্বরের জলসার গান শুনতে গিয়ে তাদের গোলঘরও দেখে এসেছেন, হারিয়ে যাবার মতো তিনতলা তিনমহলা মার্বেল পাথরের বাড়ির আনাচ-কানাচও ঘুরে দেখে এসেছেন। কত পার্টি দেখেছেন, সম্মিলনী দেখেছেন, বড়ো লোকদের সাহেব-সাহেব খেলা দেখেছেন, কিন্তু এতো বড়ো হোটেলে কোনোদিন ঢোকেন নি। কানাই ঠাকুরের উপর রীতিমতো শ্রদ্ধা হলো তাঁর। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'আজকে বিকেলে জন পঁচিশেক খাবে, তার জন্য—'

'বলুন, কী ব্যবস্থা করবো।' হোটেলের ম্যানেজার বোধহয়, কাগজ পেনসিল নিয়ে অর্ডার নিতে এলো। একটু চুপ করে থেকে ননীবালা বললেন, 'যা-যা বলবো সব দিতে পারবেন?

'নিশ্চয়ই।'

'পরিবেশন করবার লোকও দিতে পারবেন? বেশ পোশাক-টোশাক পরে যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারবেন তো?'

'পারবো না? এই তো আমাদের কাজ। আপনি কী করবেন? স্ট্যান্ড-আপ সাপার? না একেবারে বসিয়ে ডিনার?'

স্ট্যান্ড-আপ সাপার শব্দটা জানা ছিলো না ননীবালার, কিন্তু বসিয়ে ডিনারের অর্থটা বুঝলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'ঐ বসিয়ে ডিনারই খাওয়াবো।'

'ঠিক আছে। পঁচিশজন বসবার মতো চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা আছে তো?'

'চেয়ার-টেবিল?'

'চেয়ার-টেবিল না-হলে ডিনার হবে কী করে?'

'ও।'

'যদি মেঝেতে বসিয়ে খাবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে আমাদের লোক পরিবেশন করতে র না, চেয়ার-টেবিল হলে, আমরা তার উপযুক্ত সব ব্যবস্থাই করে দিতে পারবো। জলের , খাবার প্লেট, ন্যাপকিন, কাঁটা চামচে—এ-সবও তো চাই।'

'ও।'

'অবিশ্যি ভাববার কিছু নেই। চুক্তি দিলে আমরাই করে দেবো সব। পাঁচটার সময় কজন গিয়ে টেবিল লাগিয়ে আসবে, কাঁটায়-কাঁটায় আটটার সময় ডিনার নিয়ে চলে যাবে ারারা, একেবারে খাইয়ে-দাইয়ে সব নিয়ে চলে আসবে। দশটার মধ্যে সারা।'

'এও চুক্তিতে হয়?'

'হয় না? বাঃ। আজ দশ বছর আমরা করছি কী?'

ননীবালা চমৎকৃত হলেন। 'তবে কালকের ব্যাপারটাও চুক্তি করে নিন।'

'কাল কী হবে বলুন। আর উপলক্ষ কী তা-ও বলুন।'

'আমার মেয়ের বিয়ে।'

'ও, বিয়ে! তাহলে তো একটু হাঙ্গামার ব্যাপার। খাবার ব্যবস্থা কোথায় হবে, ছাদে?'

'না, লনে।'

'লনে! বাঃ, তাহলে তো ভালোই। শামিয়ানা খাটবে?'

'না। অমনি খোলা থাকবে। বৃষ্টি-বাদলের দিন যখন নয়—'

'তাই তো। তাছাড়া লনে খোলা পার্টিই ভালো হয়। বেশ গ্রুপ করে করে চেয়ার-টেবিল জিয়ে ফুলদানি রেখে—এই রকম চান তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঐ রকম।'

'ঠিক আছে। কতজন লোক হবে?'

'ধরুন দেড়শো থেকে দু'শো—'

ম্যানেজার মাথা নেড়ে খাতার উপর পেনসিল ঠুকতে লাগলো। একটু পরে বললো, 'আর ওয়ার লিস্ট কী হবে?'

'কী হলে ভালো হয় বলুন তো?'

'আপনি যদি ফুল ডিনার চান সে একরকম হবে, আর যদি অন্য সব বিয়ের মতো লাও, মাংস, মাছের কালিয়া, চপ, চাটনি এ-সব চান সে আর একরকম হবে। যেটা পনার পছন্দ।'

উত্তর দিতে একটু চিন্তা করতে হলো ননীবালাকে। নিমন্ত্রিতদের কার কী রকম পছন্দ, কী ম পদমর্যাদা এক লহমায় যেন সব ভেবে নিতে চেষ্টা করে বললেন, 'এক কাজ করুন, দু- ম ব্যবস্থাই দিন, আদ্ধেক-আদ্ধেক।'

'বেশ। আর আজকেরটা?'

'আজ জন তিরিশেকের মতো মাংস পোলাওয়ের ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ।'

'কত খরচ হবে?'

'তা কিছু বেশিই তো হবে। ডেকরেটরের ব্যবস্থাও তো আমাদেরই করতে হবে। আজকে চ প্রস্থ, আবার কালকে এক প্রস্থ। গেট সাজাতে হবে কি? আলো? আলোও তো লাগবে।'

'গেট সাজাবেন? তাহলে তো খুব ভালো হয়। এ তো আর সাধারণের ব্যাপার না রায়গড়ের রাজা আসছেন বিয়ে করতে, গেট তো সাজানোই উচিত।'

'নিশ্চয়ই।' ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়লো। 'তাহলে আপনার কিছু বেশিই পড়ে যাবে।'

'তা পড়ুক। আমার এই একটিই মেয়ে, আর টাকারও আমার অভাব নেই—'

'তা তো ঠিকই। আচ্ছা আপনি বসুন, আমি হিসেব কষে দিচ্ছি।'

বসলেন ননীবালা। এতো সহজে, এতো অল্প সময়ে, সম্পূর্ণ অন্যের ঘাড়ে ভার দিয়ে যে কাজটি সমাধা হতে যাচ্ছে এটা ভেবে হালকা লাগলো খুব। মনে-মনে তিনিও হিসেব কষতে লাগলেন, খরচটা কতদূর গড়াতে পারে, আর তিনি কতদূর পর্যন্ত উঠতে পারেন। খাওয়ার খরচটা সোমেশ্বর দিতে চেয়েছে; অবিশ্যি সেটা চেয়েছিলো জন্মদিনের পার্টি হিসেবে, এখন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বিয়ের পার্টি। তা হোক, বলেছে যখন, তখন সে দেবেই, অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে, ননীবালাও তা নেবেন; কাজেই সেখানে খানিকটা বাঁচোয়া। আর যা বাকি থাকবে তা-ও নেহাৎ কমে হবে বলে মনে হচ্ছে না, তা না হোক। রাজি হবেন ননীবালা। এমন সাজানোসুজোনো সন্দর ব্যবস্থা তিনি কি কখনোই করে উঠতে পারতেন? তিনি জানেন কী? জীবন ভোর তো কুশাসন কলাপাতাই দেখে এসেছেন। তার উপর লোকবল নেই, জি বেরিয়ে যাবে না এতোখানি? আর এই কেমন ছিমছাম, ফিটফাট, পরিষ্কার। বাড়িতে রান্না হাঙ্গামা নেই, লোক লাগিয়ে খাটাবার ঝকমারি নেই, সাজো গোজো আর ফোঁপরদালালি করে বেড়াও। ব্যস্। খরচের বড়ো একটি অঙ্কের জন্য মনকে তিনি প্রস্তুত করতে লাগলেন।

দর কষাকষি অবশ্য হলো অনেকক্ষণ। তবুও শেষ পর্যন্ত মোটামুটি বেশ ভালো ব্যব করেই হোটেল থেকে বেরুলেন ননীবালা। এর পরে শাড়ির দোকান আর গয়নার দোকান শাড়ি অনেক আছে মানসীর, আর পাবেও নিশ্চয়ই অনেক। ঠাকুরমশায় তার নির্দিষ্ট জায়গা নেমে গেলে, মস্ত ব্যাগ থেকে একটা ফর্দ বার করে তিনি চোখের সামনে মেলে ধরলেন বেনারসি একখানা, মুর্শিদাবাদ সিল্ক একখানা, একখানা গোদাবরী কটকি, একখানা মান্দ্রাজি মোট চারখানা শাড়ি। সেই সঙ্গে মানিয়ে ব্লাউজ পছন্দ করে কেনাও তো দায়। মানসীর কো বন্ধু-বান্ধব, অল্পবয়সী মেয়েকে সঙ্গে আনলে ভালো হতো। ওদিকে জামাইয়ের জন্য গরদে জোড়, পাঞ্জাবির মুগা, এ-সবও তো কিনতে হবে। তার উপরে সোনার জিনিসও আছে কিছু একটা নেকলেস আর হাতের একজোড়া বালা। এ-দুটোই মানসীর নেই, নৈলে ধীরে-ধী গয়না তিনি প্রায় সবই গড়িয়ে রেখেছেন। সোমেশ্বরকে একটি দামি আংটি দিতে হবে। আ মিনে-করা সোনার বোতাম। তাই দিয়ে আশীর্বাদ করবেন আজ, পাঁচজনে দেখবে।

ননীবালা মার্কেটে এসে নামলেন।

কলকাতা শহর। সত্যি আজব দেশ। টাকা থাকলে সব আছে। তা নৈলে একটা বিয়ে ব্যবস্থা! সোজা? যার জন্য এক মাস ধরে কত মানুষের কত পরিশ্রম, কত খাটুনি, ক আয়োজন। সেই ছেলেবেলায় চপি-পিসির বিয়েতে লক্ষ্মীর মা-টা তো খাটতে-খাটতে মরে গেলো। আর ননীবালা কিনা একখানা চার চাকার গাড়িতে বসে হাওয়া খেতে-খেতে ঘণ্টাতেই সব সেরে ফেললেন? কী আশ্চর্য! পায়ের উপর পা রেখে নরম করে নাচা লাগলেন তিনি।

বাড়ি-বাড়ি নেমে নিমন্ত্রণ করতে কিন্তু একটু কষ্ট হলো শেষে। বারে-বারে ওঠা আর নামা, প-মেপে হাসা আর বলা, একটুখানি বসতেও হয় আবার। সবশেষে ফেরবার রাস্তায় লঘাটে বরেন-মামার বাড়িতেও নামলেন নিমন্ত্রণ করতে।

ততোক্ষণে বেলা ঢ'লে এসেছে, পড়ন্ত রোদের অসহ্য উত্তাপে গা ভিজে যাচ্ছে ঘামে। বিড় করে উঠছে মাথার ভেতরটা। অথচ ফাল্গুন মাস। এতো গরম হওয়া কি উচিত ? কাতার সবই অদ্ভুত। রাধানগরে পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীত বাঘের পায়, ৎ ফাগুনের শীত আগুনের গায়। এখানে মোষ বাঘ আগুন সব সমান। শীতই নেই মোটে। লা-ভালো গরম জামাগুলো বাক্সেই পচে। এই তো গেল-বছর কত দাম দিয়ে কী সুন্দর শ্মীরী শালখানা কিনলেন, নিয়মমতো শীত থাকলে আজ কি পারতেন না সেখানা পিঠে লে বেরুতে ? আর পৌষ মাঘ মাসেই বা কী ? কতটুকু শীত নামে? ঐ বড়োদিনের সময় দু-চারদিন।

বরেন-মামার বাড়িতে নামবার আগে ড্রাইভারকে বলে অনেকবার হর্ন দেওয়ালেন বালা, কিন্তু কেউ এসে দোতলার চিলতে বারান্দাটাতে দাঁড়ালো না, একটা বাড়ির একটা নালাও এতোটুকু ফাঁক হলো না। আশা করেছিলেন কত মুখ কত দিক থেকে উঁকিঝুঁকি বে, নতুন ঝকঝকে গাড়িটা দেখতে-দেখতে ভাববে, 'কে এলো, কে এলো?' বেয়ারাটা ন তার রাজকীয় পোশাক নিয়ে নেমে হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দেবে, চোখগুলো বড়ো-গ করে অপেক্ষা করবে গাড়ির আরোহীটিকে দেখবার জন্য। সাদা ধবধবে দুধ-গরদ পরে ন ধীরে ধীরে নেমে আসবেন ননীবালা। কিন্তু হতাশ হলেন। ঠোঁট বেঁকিয়ে মনে-মনে লেন, নিষ্কম্মা মেয়েমানুষগুলো ঘুমুচ্ছে এখনো।

সদর দরজা খোলাই ছিলো। তিনটে বেজে গেছে, ঠিকে-ঝিয়েরা এসে গেছে বাসন তে। একতলার উঠোনে সরকারি কলতলাটা রমরম করছে তাদের কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠের লাপে আর বাসনমাজার পটু হাতের ঘষঘষানিতে। পচা ভাত তরকারি, জল আর ছাইয়ের ন্বয়ে একটা ভ্যাপসা বিশ্রী গন্ধ উঠছে জায়গাটাতে, চলাফেরার রাস্তাটা জলে জলাকার। বালা পাশ কাটিয়ে নাকে রুমাল চেপে কোনোরকমে উঠে গেলেন দোতলায়, কতকাল পরে ধরনের একটা বাড়িতে পা দিয়ে গা ঘিনঘিন করলো তার। এ-বাড়ি ছেড়ে সেই যে তিনি য়কে নিয়ে তেরো টাকার ঘরে গিয়ে উঠেছিলেন তারপরে এই এলেন। যাবার আগে এঁদের দ একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গিয়েছিলো। মাস্টারমশায়ের পক্ষপাতিত্বে এমনিতে আগুন ছিলো সবাই, ঘর ভাড়া নিয়ে হঠাৎ এ-ভাবে উঠে যাবার চক্রান্তে সে-আগুন শতগুণ হয়ে ল উঠলো। ঝি নেই, চাকর নেই, বিনা নোটিশে এরকম চলে গেলেই হলো? আগুনটা বঁশ্যি মামীই উদগার করেছিলেন বেশি, কেননা অসুবিধেটা তাঁকেই ভোগ করতে হবে। পিসের ভাত, স্কুলের ভাত, মসলা পেষা, মাছ কোটা, ছেলে রাখা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাড়া, মোছা, সবই তো এক হাতে ঠেলতে হবে তাঁকে। মেয়ে দুটো তো সাজের লাঠি ! কোনো জ এগুবে নাকি ? গান করবে, বাজনা বাজাবে, ফুটুক-ফুটুক ছুটুক-ছুটুক এ-জানালায় ও-নালায় দাঁড়িয়ে ফস্টিনষ্টি করবে উল্টোদিকের রাইবাবুর ফাজিল ছেলেটার সঙ্গে—মাথায়-ায় দুটোকে ঠুকে দিলেও হুঁশ হবে না।

সেদিন ননীবালাও গর্জে উঠেছিলেন সমানে-সমানে। কেন? ভয় কিসের? আর কি তিনি দের আশ্রয়ে থাকছেন? ভাসতে-ভাসতে কুটোটা ধরেছিলেন বলে নাকানি-চোবানি তো কম ওয়ান নি এঁরা, অনেক সয়েছেন, অনেক মুখ বুজে থেকেছেন, কিন্তু আর না। আজ তিনি

পায়ের তলায় মাটি পেয়েছেন, সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ তিনি জন্মের শোধ জবাব দি যাবেন, দুটো ভালো-মন্দ কথা খুব ভালো করে শুনিয়ে দিয়ে যাবেন, জানিয়ে যাবেন বলতে কইতে শুধু তাঁরাই পারেন না. বিধাতা তাঁকেও একখানা মুখ দিয়েছেন, আর সে-মুখের ধা বড়ো সহজ নয়। কোমরে কাপড় বেঁধে ডিঙি মেরে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি, 'কী, কী বললে আমরা ধড়িবাজ? আমার মেয়ের স্বভাব খারাপ! আর তোমরা? তোমরা কী? তোমাদের জা না? তোমাদের চিনি না? মুখ তোমাদের খসে যাবে, পুড়ে যাবে, কুরুকুষ্ঠি হবে।' কুণ্ঠিত টু দুই হাতের সজোর আকর্ষণে মাকে টেনে নিতে-নিতে বলেছিলো, 'ছি, ছি, এ-সব তুমি ক বলছো মা? কী করছো?' মেয়েকে এক ঝটকায় উল্টে ফেলে দিয়ে ননীবালা আবার মামী মুখেব কাছে এসে দাঁড়ালেন। একবার যখন শুরু করেছেন, এখুনি সেটা সাঙ্গ করবেন তেম পাত্রই নন তিনি। কয়েক মিনিটের মধ্যে কলহটি এমন অবস্থায় দাঁড়ালো যে প্রায় হাতাহা হবার উপক্রম। বরেন-মামা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলেন, ছেলেমেয়েরাও খানিকক্ষণ প ঘরে গিয়ে ঢুকলো, মামীও থমকালেন, কিন্তু ননীবালা থামলেন না। দুটি ঘণ্টার মধ্যে ছা দেয়ালে, কলতলার আবর্জনার স্তূপে, রেলিঙে, কোথাও একটি কাক চিল বসতে পারলো ন অন্য ভাড়াটেরা ভিড় করে মজা দেখতে লাগলো, আশে-পাশের বাড়ির বাসিন্দারা চকি হলো। ছোটো ছেলেরা কাঁদতে লাগলো, তবু নিবৃত্তি নেই। ননীবালা গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়ের ব যতদিন বউকাল গেছে, গেছে, তারপরই তো স্বাধীন। চিরদিন প্রিয়নাথবাবুকে দাপ রেখেছেন, অনেক যুঝে-বুঝে সংসার করেছেন, কারণে-অকারণে পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে গ লুটিয়ে ঝগড়া করেছেন, নিন্দে করেছেন, স্তুতি করেছেন—অনেক লড়াইয়ে জিতে এ-বিষ রীতিমতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়েছেন তিনি। কলকাতা আসবার পরেই না-হয় অবস্থ বিপর্যয়ে ইঁদুর হয়ে গর্তে ঢুকেছিলেন, কিন্তু সেদিন, অতদিন পরে মুখ ছুটিয়ে বেশ ভালো রক জমজমাট কলহ করতে পেরে ভালোই লেগেছিল, দম-বন্ধ করা দুঃখের নৌকোয় খো বাতাসের পাল উঠেছিলো, মনটা হালকা হয়েছিলো। বরং শেষ পর্যন্ত সব চুপ হয়ে যাওয় হতাশই হলেন একটু। মনে-মনে ধিক্কার দিলেন। এই? এইটুকু শক্তি নিয়ে এতো বিক্রম?

পথে বেরিয়ে টুনি বলেছিলো, 'তুমি অন্যায় করেছো।'

'কেন, অন্যায় কেন?' কথা শুনে গা জ্বালা করেছিলো ননীবালার, ঠাস করে একটা চ মারতে ইচ্ছে করেছিলো মেয়ের গালে। অন্যদিকে তাকিয়ে টুনি বলেছিলো, 'হাজার হো ওঁরাই আমাদের দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাড়িয়ে দেন নি, শত্রুতা করেন নি, ব্যবহার এমন কিছু—'

মেয়ের অস্ফুট গলার ধর্মকথা ননীবালা তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রবল কণ্ঠের গর্জনে সমুদ্রের ম এক টুকরো নুড়ির মতো ডুবিয়ে দিয়ে বললেন, 'আহা রে আমার ভালো ব্যবহার, আম সাতকালের দরদী বন্ধু, দিন-রাত বিনি পয়সার দাসী খাটিয়ে কী উপকারই না করেছে ছোটোলোক। ইতর। দু-বেলা দুটো খেতে দিয়ে তো দুটো কুত্তা পুষেছে, তার আবার লম্বা চও কথা। দেহে-গতরে খাটিয়ে-খাটিয়ে একেবারে ফোঁপরা করে ছেড়েছে শয়তানের বাচ্চা তাঁদের সঙ্গে আবার ইয়ে। ন্যায় আর অন্যায়।

একদণ্ডে টুনি ঠাণ্ডা।

সেই ঝগড়ার রেশ এখন অবিশ্যি মুছে গেছে। মনে রাখেন নি ননীবালা, বরদাত্রীর মা প্রসন্ন হাস্যে সব তিনি ক্ষমা করেছেন। এমন কি লেকের ধারে জুতো পায়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়ি

ড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ একদিন বরেন মামাকে দেখে বেশ খুশিই হয়েছিলেন। খুশি মনেই কথা লছিলেন। প্রত্যেকটি কথার ফাঁকে-ফাঁকে বরেন-মামার মুখের পেশীতে যে-সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোড়ন উঠতে দেখেছিলেন তাতে প্রায় চেঁচিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করেছিলো তাঁর।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় এসে ঘরের সামনে ননীবালা থমকে দাঁড়ালেন। মামীমা মাদুরে গচ্ছিলেন, কচি বাচ্চাগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুমুচ্ছে মায়ের সঙ্গে, ছোট্টো টা যেন থিক্ থিক করছে মানুষের ছানায়। ননীবালা হাতের সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছলেন, য়ের জুতোটা খুলবেন কি খুলবেন না ঠিক করতে পারলেন না।

চোখ খুলে হাঁ হয়ে গেলেন বরেন-মামী। ননীবালার সুসজ্জিত দেহ ঘিরে অনেকক্ষণ ধরে মে রইল তাঁর বিস্মিত চোখ, তারপর অসংবৃত আঁচলে গা মাথা ঢেকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে লেন, 'ও মা, ভাগ্নি নাকি? আমি তো চিনতেই পারি নি। এসো, এসো। বোসো। মামীকে র মনে পড়লো এতোদিনে?' সম্ভ্রম আর খুশি ফুটে উঠলো সেই অভ্যর্থনার সুরে; হাত দিয়ে ংরা বালিশটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে, একটা বাচ্চাকে সরিয়ে তিনি বসবার জায়গা করে লেন ভাগ্নিকে।

ননীবালা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মুখে নরম হাসি ছড়ালেন, 'মনে পড়বে না কেন? তোমরা কি মার পর? না কি কোনোদিন দেখেছি সেই চোখে?'

'না, তা তুমি সত্যি দ্যাখো নি।' সব ভুলে গলে গেলেন মামী।

'কই, ছুটকি ফুটকি কই?'

'ফুটকির তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সে শ্বশুরবাড়ি।'

'ও মা, তাই নাকি? কেমন বিয়ে হলো? বর কী করে?'

'হলো একরকম মন্দ না। এখন তো ছুটকির জন্যই ভাবনা। তোমার মামা তো একেবারে রান হয়ে গেলেন, জুটছে কই? আর জুটবেই বা কী বলো? টাকাকড়িরও জোর নেই, হারারও জৌলুস নেই।'

'গান-টান করছিলো তো—'

'আর গান—মাথা নেই তার মাথাব্যথা। তা তোমার খবর কী? বোসো না, দাঁড়িয়ে রইলে ন?'

ননীবালা সন্তর্পণে বসলেন; কিন্তু বললেন, 'না ভাই, আর বসবো না, বেলা গেছে।'

'এলেই তো বেলা ফুরিয়ে, বেলার আর দোষ কী বলো? তোমার মামা আসুন, চা খাবার করি, তারপর তো যাওয়ার কথা—'

'ওরে বাবা, চায়ের কথা আর ভাবতেই পারছি না খালি পেটে—বাড়ি গিয়ে চান করে যা ক কিছু দাঁতে কেটে একটু বসতে পারলে এখন বাঁচি।'

'সে কি! এই অবেলায়, এখনো নাও নি খাও নি নাকি?'

'সময় আর পেলাম কই, একলা মানুষ, সব দিক তো সামলাতে হচ্ছে।'

'এতো ব্যস্ততা কিসের? আর কোথাও গিয়েছিলে?'

'সারাদিনই তো ঘুরছি, কেনাকাটা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ—অবিশ্যি চাকর-বাকরের অভাব নেই, তাই বলে তোমাদের নিমন্ত্রণ তো আর আমি লোক পাঠিয়ে করতে পারি না। তাছাড়া তদিন দেখি না—'

'নিমন্ত্রণ! কিসের নিমন্ত্রণ?'

'টুনির বিয়ে।'

'টুনির বিয়ে? তাই বলো। খুব ভালো কথা। খুব সুখের কথা। কী মেয়েই তুমি পে ধরেছিলে ভাগ্নি। একেবারে রত্নগর্ভা। কত নাম, কত যশ, টাকাকড়িও নিশ্চয়ই যথেষ্ট রোজগা করে?' মামীর একেবারে কৃতার্থ গলা।

ননীবালা চোখ টান করলেন, 'তা তো একটু করেই। এই ধরো না গিয়ে মা বাড়িভাড়াটাই তো দি তিনশো টাকা (পঞ্চাশ টাকা বাড়ালেন), তারপর ধরো গিয়ে ঝি-চাক মিলে জনা চারেক খাটে (একজন বাড়ালেন), তাদের মাইনেও কি সোজা নাকি? চার জনে ওরা সত্তর টাকা (আসলে চল্লিশ) টানে। তার উপরে ধরো গিয়ে আলোটা, পাখাটা, পা সম্মেলন, জন্মদিনের উপহার, পজিসন মতো পোশাক-আশাক—তা থাক গে সে-সব। কা রাত্তিরে তোমরা সবাই যাবে। খাবে-দাবে বিয়ে দেখবে, একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে আর কি মামাকে বোলো। নিমন্ত্রণ-চিঠিটা আনতে আবার ভুলে গেছি, সে না হয় কাল পাঠানো যাবে কিন্তু নিজে বলে গেলাম, মনে থাকে যেন।'

'নিশ্চয়ই থাকবে। তুমি যে মেয়ের বিয়েতে ভোলো নি, তাতে আমি কত খুশি হলাম

'খুশি আর কী, এ তো আমার কর্তব্য।'

'সেই কর্তব্যই বা ক'জন মনে রাখে বলো? তা বিয়ে কোথায় ঠিক হ'লো?'

ননীবালা হাসলেন, 'রায়গড়ের রাজবাড়িতে। ঐ যে গো, শ্যামবাজারে মস্ত গম্বুজও বাড়ি, সবাই তো চেনে, বাগচি-লজ। অত বড়ো বাড়ি ঐ তল্লাটে আর নেই। থাকবে রাজরাজড়ার কাণ্ডই অন্য রকম! তাদের সঙ্গে আর কে পাল্লা দেবে বলো।'

'রাজা!' মামী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

'একদিন গিয়েছিলাম বাড়িটার ভেতরে, বাব্বা, কী বিশাল। রাজবাড়িই বটে। আমার রীতিমতো ইয়ে লাগছিলো। মহলের পর মহল পার হয়ে যখন একেবারে অন্দরে গি পৌঁছলাম, বলবো কি তোমাকে, হাঁটতে-হাঁটতে আমার ঘাম ছুটে গেছে। অত বড়ো বাড়ি ' একদিনে দেখে ওঠা যায়? হাতিশাল, ঘোড়াশাল, পক্ষীশালা, রন্ধনশালা, অতিথিশাল জাদুঘর—কত যে আছে বাড়িটার মধ্যে—তারপর গিয়ে তোমার জলসাঘর, পরিখা, বাগা ফোয়ারা—'

বরেন-মামীর গলায় কফ আটকালো, দু-বার কেসে নিয়ে বললেন, 'সেই বাড়িতে বিয়ে

পাশের ঘর থেকে ফট করে তাঁর মেজো মেয়ে বেরিয়ে এলো, 'আপনি বাগচি-লজ'-এ কথা বলছেন? সোমেশ্বর বাগচিদের আদিবাড়ি?'

'ঐ দ্যাখো, মেয়ে তোমার সব জানে। ও মা, কত বড়ো হয়েছিস রে মাথায়? চিনিস সোমেশ্বরকে?' ননীবালা হেসে খুন।

ভুরু কুঁচকে এতোখানি ঘাড় নাড়লো ছুটকি, 'হ্যাঁ-অ্যা। আমাদের স্কুলের বাৎসরিক উৎস এসেছিলেন যে। প্রাইজ দিলেন।' তার চোখে-মুখে দস্তুরমতো শ্রদ্ধা ফুটলো, 'ঠিক বাঘের মতো একটা মস্ত কুকুর আছে, ওঁর সঙ্গে গাড়ি চড়ে বেড়ায়। এখন তো উনি পার্কে থাকেন, লাল টকটকে চেহারা। ওঁদের মহারাজা খেতাব, জানেন?'

'আর না-জেনে কী করি বল? কুটুম্ব হচ্ছে যখন।'

'ওদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে এ-পাড়ায়, তাদেরও অনেককে আমি চিনি। আম সঙ্গেই তো দুটি মেয়ে পড়ে, তারপর এই সামনের হরিশবাবুর বড়ো ছেলেও ওদে জ্ঞাতিভাই—'

'ঐ জ্ঞাতি ফ্যাতি দিয়ে কী হবে,' ঠোঁট বাঁকালেন ননীবালা, 'ঐ সোমেশ্বরই তো আমার জামাই হচ্ছে। না বাপু, উঠি এবার, গাড়িটা আবার দাঁড়িয়ে রয়েছে—'

'সোমেশ্বর! সোমেশ্বর বাগচি!'

'তাই তোমার বোনঝির মন ওঠে না। হাতে পায়ে ধরে কত সাধ্য-সাধনায় তবে না সোমেশ্বর মন পেয়েছে মেয়ের।'

'সোমেশ্বর বাগচির সঙ্গে টুনির বিয়ে হচ্ছে?'

'কী বলবো, নিজের মেয়ে, লজ্জাও করে, টুনি হেঁটে গেলে সোমেশ্বর বুক পেতে দেয়, মুখভার হলে দুনিয়া অন্ধকার দেখে, ঐ মেয়ের জন্য সে জলে ঝাঁপ দিতে পারে, আগুনে পুড়তে পারে, এমন ভালোবাসা দেখি নি কোনোদিন, আর আমার মেয়ের কিনা মন ওঠে না।'

বরেন-মামী এ-সব নাম-ধাম কিছুই জানতেন না, তবুও ব্যাপারটা যে কিছু সহজ নয় সেটা বুঝলেন। কেমন অর্থহীনভাবে একবার মেয়ের দিকে আর একবার ননীবালার দিকে তাকাতে লাগলেন। অনেক পরে বললেন, 'তাহলে মেয়ে তোমার রানী হচ্ছে?'

ননীবালা শরীরের মেদে, শাড়ির ভাঁজে তরঙ্গ তুলে উঠে দাঁড়ালেন, জুতোটা পায়ে ঢুকোতে-ঢুকোতে বললেন, 'তা হচ্ছে।' এক পা এগিয়ে দরজা ধরে, 'তাহলে কাল তোমরা যেয়ো!'

মামীও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে, অস্ফুটে কী বললেন শোনা গেলো না। ননীবালা ছুটকির দিকে তাকালেন, 'যাস রে। মাসি মানুষ বোনঝির বিয়েতে গিয়ে খাবি-দাবি, আমোদ-আহ্লাদ, সর্দারি এ-সব করবি তবে তো? শোনো মামী, বিয়ে কিন্তু একেবারে সন্ধ্যার লগ্নেই, দেরি কোরো না যেতে। ঐ দ্যাখো ভুলে গেলাম। চল তো ফুটকি, এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে আসবি গাড়ি থেকে।'

হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেছে ননীবালার। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মা-মেয়ের মুখের দিকে তিনি পলকপাত করলেন। মেয়েটি নড়লো না। শিথিল গলায় বললো, 'মিষ্টি দিয়ে কী হবে?'

মামীমা ঝংকার দিলেন, 'আহা, এতো বড়ো দিদি বলছে, মেয়ের যেন একটা মানামাননা নেই।' বলে নিজেই নামতে লাগলেন ননীবালার পিছে-পিছে।

নিচে নেমে এসে গাড়ির দরজাটা সবখানি খুলে ধরলেন ননীবালা, আকণ্ঠ জিনিসপত্রে ঠাসা। মিষ্টির হাঁড়িগুলো সামনেই ছিলো, তবু তিনি এটা হাৎড়ালেন, ওটা হাৎড়ালেন, বেনারসির বাক্সটা অযথা ফেলে দিলেন হাতের ঠেলায়, তারপর ঠিক আছে কিনা, নোংরা লাগলো কিনা দেখবার জন্য বাক্সটা খুলে একশো দশ টাকা দামের শাড়িটা মামীর চোখের সামনে নাড়াচাড়া করলেন। এ-পাশে সরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'বাহাদুর সিং।'

'জী।' ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা পোশাক-আঁটা নেপালি বয় ত্রস্তে ছুটে এলো কাছে, এসে সেলাম করলো।'

ননীবালা সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে আদেশ দিলেন, 'একঠো মিঠাইকা হাড্ডি বাহার কর দাও তো।'

নেপালি বয় পরিষ্কার বাংলা শিখেছে। ননীবালা জানেন সে-কথা। হিন্দি বলতে যে তিনি পটু নন সে-কথাও জানেন। আর এও জানেন বাড়িতে তিনি বাহাদুরের সঙ্গে বাংলায়ই কথা বলবেন। কিন্তু তাই বলে লোকের সামনে তো চাকর-বাকরের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে বলতে পারেন না। আড়চোখে মামীর মুখের দিকে তাকালেন একবার। বাহাদুর তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করলো।

এবার ননীবালা মিষ্টি হেসে গাড়িতে উঠে বসলেন। 'তাহলে যাই, মামী?'

মামী মিষ্টির হাঁড়িটা বুকে চেপে ধরে শুধু ঘাড় নাড়লেন। আর গাড়ি ছেড়ে দেবার পর যে তিনি অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে, পিছনের কাচ দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে সে দৃশ্যও দেখলেন ননীবালা। গভীর তৃপ্তিতে শরীরটা যেন অবশ হয়ে এলো।

বাড়ি এসে প্রথমেই মেয়ের ঘরে উঁকি দিলেন। চুপচাপ পাশ ফিরে শুয়ে আছে বিছানায় বুঝতে পারলেন না জেগে আছে, না ঘুমুচ্ছে। একবার ডাকলেন, সাড়া পেলেন না। ইচ্ছে ছিলো জিনিসগুলো দেখান। হলো না। বাড়িটা নিঝুম। যদিও উচিত নয়, চারটে প্রায় বাজে আজ শুয়ে-বসে কাটাবার দিন নয়। কত লোক আসবে, তার জন্য প্রস্তুতি আছে। ঘর-বাড়ি গুছোনোই কি একটা সহজ কথা নাকি? সোমেশ্বরকে আসতে বলেছেন সাতটার সময়ে সাতটা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আশীর্বাদের সময়। অতিথিরা আসবেন আরো খানিক পরে রাত্তিরের নিমন্ত্রণ তাঁদের। আর হোটেলের লোকেরা তো চেয়ার টেবিল সাজাতে এলো বলে ভাগ্যিস সব ব্যবস্থা চুক্তিতে সেরে এসেছেন, নৈলে কী হতো ভাবতেই এখন ভয় করছে অবিশ্যি এটা তিনি আগাগোড়াই ভেবেছিলেন যে মাংস আর চপ-কাটলেট কোনো রেস্তোরাঁ থেকেই কিনে আনবেন, এর আগেও একবার এনেছিলেন। টুনির এক ভক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। কিন্তু ভাত মাছ ডাল সব-কিছুর ভারই যে নিতে পারবে তারা তা ভাবেন নি। বাঁ সুবিধেই না হলো। তা নৈলে এই সব অকম্মা ঝি-চাকর দিয়ে কিছু করতে হলেই হয়েছিলো আর কি। আর মেয়ের কথা না-হয় না-ই তুললেন। ভূতে ধরেছে আবার। এখন ভগবানের ইচ্ছায় কোনোরকমে বিয়েটা দিতে পারলে তিনি বাঁচেন।

ঝি দু'জনকে বকতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ডাকবার আগেই বিশ্রাম ত্যাগ করে কাজে লেগে গেলো তারা। একজন ব্যস্ত হয়ে গ্যাস জ্বালিয়ে ননীবালার খাবার গরম করতে বসলো একজন কাপড়চোপড় পাট করতে এলো। ছোকরা চাকরটাও ঘর ঝাঁট দিতে লেগে গেলো ননীবালা চোখ দিয়ে পরখ করতে লাগলেন কোথায় কী ভাবে এতো লোকের বসবার এবং খাবার একটা সুব্যবস্থা করা যায়। ড্রয়িংরুমটা খুব বড়োই আছে, পাশে-পাশে সোফা কৌচগুলো ঠেলে সারা ঘর জুড়ে যদি দামি কার্পেট আর চাদর বিছিয়ে দেন, দেখাবেও সুন্দর ভালো করে বসতেও পারবে। আশীর্বাদও এ-ঘরেই হবে। আর খাওয়ার ব্যাপারটা ছাদে করলে কেমন হয়। সেখানে আলো-টালো সবই আছে। আজ ছাদে, কাল লনে, সেও একটা বেশ নতুনত্ব হবে। আবার এদিকে ঘর-বাড়ি ওলোটপালোট হবে না, জিনিসপত্র টানাটানি হবে না তাই ভালো। নিশ্চিন্ত হলেন মনে মনে। এর পরে কয়েকটা ফোন করলেন তিনি, যাদের করলেন তারা সবাই (ননীবালার মতে) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, ঈর্ষুক, আজকের এই সৌভাগ্যে তাদের বুক ব্যথা করবে, রাত্তিরে ঘুম হবে না।

এই সব সেরে স্নান করে দুটি মুখে দিয়ে ডেক-চেয়ারটিতে বসলেন এসে। আজ আর ভালো করে শোবার সময় কই? কেবল মিনিট কয়েক শরীরটাকে একটু শিথিল করা, ছেড়ে দেওয়া। চারজন ঝি-চাকর বেয়ারা, আর একজন অধীনস্থ অবনত ভদ্রলোকের দুঃস্থ ছেলেকে (সোমেশ্বরের সেই ছেলেটি) ক্রমাগত একটার পর একটা ফরমাশে ব্যাকুল করে রাখতে রাখতে ভাবলেন : 'একটা দিন না-হয় না-ই ঘুমোলাম, না-ই বিশ্রাম করলাম। গাধাগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে না-চালালে এগুলো কি চলবে? মাথা তো সব গোবরে ঠাসা।'

বেলা গড়ালো। রঙিন বিকেল আবির ছড়ালো চারদিকে। লেকের তীরে ধীরে-ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যা। সুন্দর সময়। দিন বড়ো হয়েছে আজকাল, দুপুর লম্বা হয়েছে। যাই-যাই করেও সূর্য দেরি করে অস্ত যেতে, চুপ করে দাঁড়িয়ে নিজের লাল আর গোল আর প্রকাণ্ড ছায়াটি দেখে জলের আয়নায়। তারপর কখন যেন টুপ করে ডুবে যায়। মানসীর দক্ষিণ-পশ্চিম-খোলা ঘরের মস্ত জানালা দিয়ে তার ম্যাজেন্টা আভা অনেকক্ষণ ছড়িয়ে থাকে ঘরে। অন্য দিন সেই সময়ের মধ্যে মানসীর গা-হাত-পা ধোয়া সারা হয়ে যায়, সুগন্ধি সাবানের মৃদু সৌরভে ঘরের বাতাস আলোড়িত করতে-করতে সে চিরুনি চালায় লম্বা চুলে। গুনগুন করে সুরের আগুন ছড়ায়। সন্ধ্যাগুলো সুন্দর কাটে। যেন জলের স্রোতের মতো বয়ে যায় গান-বাজনা আর আলাপে উৎসবে।

কিন্তু আজ কী হলো তার? এমন শুভদিনে?

চুপচাপ সে বসে থাকলো জানালার তাকে ছবি হয়ে। সূর্যাস্ত দেখলো, দেখলো সন্ধ্যা আর রাত্রির সংগম। যখন অন্ধকার হয়ে গেলো তখনও নড়লো না। নড়বার কথা মনে হলো না তার। আর ওদিকে ননীবালা সব কাজকর্ম সেরে কাপড়-চোপড় বদলে প্রস্তুত হয়ে নিলেন অতিথিদের জন্য। এতোক্ষণ ছাতেই ছিলেন। মস্ত বাড়ির মস্ত ছাত, সুন্দর দেখাচ্ছিলো খোলা ছাদে খাবার টেবিল সাজিয়ে। লোকগুলোর পছন্দ আছে, মাঝে মাঝে ফুলদানিতে ফুল রেখেছে আবার। রেখেছে প্লেট আর কাঁটা-চামচে। ননীবালা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না এটা তাঁরই ব্যবস্থা, তাঁর বাড়িরই ঘটনা। ঘড়ির কাঁটা ছ'টায় পৌঁছতে-পৌঁছতেই সব ফিটফাট। তিনিও নেমে এলেন ছোকরা চাকরটাকে পাহারা বসিয়ে।

খাবার ঘরের পাশের চৌবাচ্চাওলা বাথরুমটাতে স্নান করেন তিনি। যদিও এই খানিক আগে স্নান করেছেন, তবুও আবার ঢুকলেন। হাতে-কলমে না-হয় কিছু না-ই করেছেন, তাই বলে পরিশ্রম তো কিছু কম হয় নি? কালিঝুলিও কম লাগে নি শরীরে। কোথায় কী করা হবে, কী সরানো হবে, কী সংযোগ হবে, কী ধরনে সাজালে সুন্দর হবে সবই তো তাঁকেই দেখিয়ে দিতে হয়েছে। সেই একটু ডেক-চেয়ারে বসেছিলেন কখন, তারপর থেকেই তো পায়ের তলায় সর্ষে, ঘুরছেন তো ঘুরছেনই। এই আসছে ডেকরেটররা, এই আসছে হোটেলওলারা, এই আসছে ফুল, আসছে শুভেচ্ছা, ঝি ডাকছে, চাকর ডাকছে, বেয়ারা ডাকছে, একেবারে হন্তদন্ত। সাতটা বেজেছে, বেশি পাওয়ারের আলো জ্বালা হয়েছে বসবার ঘরে, ঝকঝক করছে ঘরখানা। এখনো সোমেশ্বর এসে পৌঁছয় নি, এলো বলে। তাই ননীবালা তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে, সেজে নিলেন। এই ব্যস্ততার মধ্যে মেয়ের কথা বেশি ভাববার সময় পান নি তিনি। চকিতে দু-একবার মনে হয়েই মিলিয়ে গেছে। এইবার পর্দা সরিয়ে ঘরের দরজায় এসে অন্ধকার দেখে থমকে দাঁড়ালেন। একবার মনে হলো বোধহয় স্নান করতে ঢুকেছে বাথরুমে, তাই ঘরের আলো নেবানো। পরমুহূর্তেই বুঝলেন তা নয়। বাথরুমে যাবার সময় ঘরের আলো নিবিয়ে যাবে এতো হিসেবি নয় তাঁর মেয়ে, তাছাড়া বাথরুমের দরজাটিও আধো-ভেজানো। অন্ধকার। জানালার লম্বা ছায়াটি আধো-অন্ধকারে নড়ে উঠলো, সেদিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত শক্ত থেকে আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো তাঁর। কঠিন গলায় ডাকলেন, 'টুনি।'

'অ্যাঁ!' চমকে মুখ ফেরালো মানসী।

'অন্ধকার কেন ঘর?

'ও।'

'আলো জালতেই মনে নেই দেখছি।' নিজেই এগিয়ে এসে দেয়ালে হাত বাড়ালেন। আলোকিত ঘরে মেয়ের বিস্রস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখনো চান করিস নি তুই? চুল বাঁধিস নি?'

'এই যাই।' কুণ্ঠিত মানসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'যাই মানে? এতোক্ষণ করলি কী তবে?'

'বসেছিলাম।'

'বসেছিলি?'

'যাচ্ছি স্নান করতে। দেরি হবে না।'

'তোর হয়েছে কী শুনি?'

'কী হবে!'

'তা আমার জানবার কথা নয়।'

আলনা থেকে তোয়ালে জামা টেনে নিলো মানসী।

'আমি কাল থেকেই লক্ষ্য করছি,' রোষে প্রায় ফুঁশতে-ফুঁশতে ননীবালা উচ্চারণ করলেন, 'আবার রোগে ধরেছে তোমাকে। কেন, হয়েছে কী জানতে পারি সেটা?'

এবারও জবাব দিলো না মানসী। ননীবালা বললেন, 'বাড়িতে একটা কাজ, সারাদিনে একবার ঘর থেকে বেরুতে দেখলুম না, একবার নড়লি না, একগাছা কুটো নাড়লি না। বাড়াবাড়ির একটা সীমা থাকা দরকার।'

মুখ তুললো মানসী, 'বাড়াবাড়ির কথা উঠছে কিসে? তুমি তো জানো, আমার শরীর ভালো না।'

'শরীর তোমার ঠিকই আছে, আসলে বলো মন ভালো না।'

'তা কী করবো।' মানসী বাথরুমের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো, 'মন থাকলেই তার ভালো লাগা মন্দ লাগা থাকে।'

মেয়ের দিকে ননীবালা তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন, 'আমাদের আর মন নেই, মন কেবল একলা তোমাকেই দিয়েছেন বিধাতা।'

'হয়তো।'

'তার মানে তুই বলতে চাস এ-সব ব্যাপারে তোর কোনো মন বা ইচ্ছে বা গরজ, কিছুই নেই। সবই আমার আয়োজন। সোমেশ্বরকে তুই নিজের মুখে কথা দিস নি?'

'ও-সব কথা উঠছে কিসে?'

'কিসে নয়? বিয়ে করবি তুই, ঠিকও করেছিস তুই, আর এখন দোহাই দিচ্ছিস আমার।'

'তোমার?'

'তাছাড়া আবার কী? মনের কথা বুঝতে কি মুখের কথার দরকার হয়?'

'তর্ক করতে ভালো লাগে না মা।'

'তা কেন লাগবে? সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতেই তোমার ভালো লাগে। অলক্ষ্মীতে পেলে এই হয়। ভগবান যা দিয়েছেন, তা তোর সইবে কেন? রাধানগরের ভাঙা বাড়ি আর ছেঁড়া কাঁথা চাই যে। তারই যোগ্য তুই।'

মানসী বাথরুমের দরজা ধরে চুপ। অভ্যাসবিরুদ্ধভাবে অনেকক্ষণ প্রতিবাদ করে সে ক্লান্ত

ননীবালার গলা কর্কশ হয়ে উঠলো, 'খেতে পেতিস না, পরতে পেতিস না, শেয়াল-কুকুরের মতো ঘুরঘুর করতিস দাওয়ায়-দাওয়ায়, আর মনে-মনে ভাবতিস কেউ এসে রাজা

রে দেবে বুঝি, একটা বিশ্বাসঘাতক, ছোটোলোকের জন্য সারাদিন গলা উঁচিয়ে থাকা—'

'মা!'

'শোন টুনি,' ননীবালা দু-পা এগিয়ে এসে মুখের সামনে আঙুল নাড়লেন, 'সাপের ভঙ্গি ন বেদের অজানা নয়, তেমনি তুই কী ভাবছিস, কী মনে করে মড়ার মতো সারাদিন তিয়ে আছিস ঘরের কোণে তা-ও আমি জানি। আমার চোখে তুমি ধুলো দিতে পারবে না।'

মানসী নিঃসাড়।

'কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও জেনো, আজ যদি হঠাৎ কোথাও তাকে দেখতে পাও, তুমি দেখবে প্ন তোমার স্বপ্নই। তোমার সঙ্গে আজ আর তার কোনো মিল নেই। রাধানগরের ঝাড়ে-ঙ্গলে অশিক্ষা-কুশিক্ষায় যে ছিলো শেয়াল-রাজা, কলকাতার এই আড়াই শো টাকার ফ্ল্যাটের সিন্দা মানসী দত্তমল্লিকের দরজায় সে ছুঁচো।'

মানসী চুপ।

'আর এও জেনো, যদি কোনো কারণে আবার তোমাকে ফিরে যেতে হয় সেই অবস্থায় কদণ্ডও টিকতে পারবে না তুমি। সেই মানুষ তোমার কল্পনায় যতই রঙিন ফানুস ওড়াক, স্তবে সে অসম্ভব।

'মা, চুপ করো, চুপ করো!' মানসী হাতের ভাঁজে মুখ লুকোলো।

'চুপ করবো কেন? যা ঠিক তা আমি বলবোই। যা নেই, যা থাকতে পারে না, তা খুঁচিয়ে-চিয়ে এই বানানো কান্না আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না। আজকের মতো একটা ভদিনে—'

দুই হাতের সবল ঠেলায় বাথরুমের দরজাটা খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে মানসী যেন 'র কথার জবাবেই ঠাস করে বন্ধ করে দিলো ছিটকিনিটা। তারপর দেয়াল ধরে ধুঁকতে াগলো পরিশ্রমে। কপালটা ভরে গেলো বিন্দু-বিন্দু ঘামে।

কিন্তু দরজা বন্ধ করলেই কি আজ এই বাবনা থেকে রেহাই পাবে মানসী? মা'র কথার তীক্ষ্ণ ফলাগুলো উপড়ে ফেলতে পারবে? যে-মাটির নির্যাস টেনে-টেনে চারাগাছ আকাশে মুখ লেছিলো, বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছিলো, সূর্যস্নানে অভিষিক্ত হয়ে দেহের মধ্যে প্রাণের স্পর্শে হরিত হয়ে চিনে নিয়েছিলো নিজেকে, সে-মাটি ছাড়িয়ে যে আজকের মহীরুহ অনেক দূর স্তৃত হয়েছে, সে-কথা কি মানসী নিজেই জানে না? জানে। মা না বলে দিলেও জানে, কপলক যে-মানুষটিকে দেখে আজ তার মর্মমূল পর্যন্ত এমন করে কেঁপে উঠেছে, সেটা তার তীতেরই একটা অভ্যাস মাত্র। একটা চেনা গানের ভেসে-আসা সুরের যন্ত্রণা। আসলে সে য একদিন ছিলো, যাকে ঘিরে টুনি নামে কোনো একটি অল্পবয়সী মেয়ের জীবন কোনো কদিন পল্লবিত হয়ে উঠেছিলো, যে টুনি আজ বিখ্যাত মানসী দত্তমল্লিকের বুকের মধ্যে জমে াথর হয়ে গেছে এ শুধু তারই একটা অসার মৃত স্মৃতি। তা নৈলে এতোদিন কোথায় ছিলো স মানুষ? মানসী কবে তার কথা ভেবে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়েছে? শেষ কবে ভেবেছে া পর্যন্ত মনে নেই। নিজের কত শত অপরিমিত আনন্দে, উৎসবে, প্রাচুর্যে একদিনও তো এই র্মলকে মনে করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে নি। তবে?

তবে কেন বুকের মধ্যে এই আলোড়ন বিলোড়ন? পরিচ্ছন্ন মোজেইক করা প্রশস্ত াথরুমের ছোট্রো টুলটার উপর বসে পড়ে শ্রান্ত মানসী নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো। াগ্যের শত্রুতায় যে অন্তরতম মানুষকে একদিন বাধ্য হয়েই তোমাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো,

প্রায় দশ বছরের অদর্শনে, জীবনের আশ্চর্য উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে-মানুষ সত্যিই কি আজ তোমার হৃদয় থেকে নির্বাসিত হয়েছে? যার বিরহে তোমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গিয়েছিলো আজ কি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে সত্যি নিবে গেছে সে আগুন?

একটা কান্নার স্রোত গড়িয়ে গেলো গলা বেয়ে বুক বেয়ে আরো কোথায়। ছটফট করে উঠলো সে, মনে পড়লো বাইশ বছরের প্রথম সূর্যের মতো একমুঠো উত্তপ্ত আগুন, যার সঙ্গে আজকের দিনের ঐ রড ধরে ঝুলে-পড়া ক্ষণিক দেখা মানুষটির তামাটে অপরাহ্ণের সঙ্গে বুঝি বা আর কোনো সম্বন্ধ নেই। একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় দু-হাতে বুকটা সে চেপে ধরলো।

তবে থাক, থাক। এই প্রবঞ্চনা থাক। থাক এই ভালোবাসার প্রহসন। মৃত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরার অন্তিম প্রয়াস। হে প্রিয়তম। অন্তরতম। আমাকে ক্ষমা করো তুমি, দয়া করো। নিজের অজান্তেই মানসী উঠে দাঁড়িয়ে যেন জ্বলতে-জ্বলতে শীতল হবার আশায় ঝরনার তলায় পেতে দিলো দেহ।

পার্টিটা সেদিন ভালোই জমলো। আলোতে, ফুলেতে, আনন্দে, সুগন্ধে, গ্রামোফোন রেকর্ডের সানাইতে, গাইয়েদের আধুনিক গানেব বিহ্বল প্রেমেতে, একেবারে জমজমাট হয়ে উঠলো সব। মেনে নেবার ক্ষমতা মানসীর সহজাত। নিজের উদ্বেলিত হৃদয়কে পোষা কুকুরের মতো এক ধমকে সে ঠাণ্ডা করে দিলো। ড্রয়িংরুমের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়েই সকলকে অভ্যর্থনা করলো সে, অন্যেরা যখন হাসলো সেও হাসলো, যখন সবাই ঠাট্টা করলো লজ্জা পেতেও দেরি হলো না তার, এমন কি সময় সুযোগ খুঁজে পিছনের বারান্দায় ডেকে এনে সোমেশ্বর যখন আদর করলো, তখনও আঙুলটুকু নাড়লো না।

সময় সুযোগ খুঁজে ননীবালাও একবার দেখা করলেন ভাবী জামাইয়ের সঙ্গে। আঁচলের কোণে চোখ মুছে বললেন, 'আমার সর্বস্ব আজ তোমার হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, জানি না এর পরে কেমন করে দিন কাটাবো। ওকে বিদায় দিয়ে কোন প্রাণে বেঁচে থাকবো।'

সোমেশ্বর বললো, 'বিদায় মানে? আপনি কি ওকে ছাড়া আলাদা থাকবেন নাকি ? না কি আপনি চাইলেই আমরা তা দেবো?'

ননীবালা একটি করুণ হাসি ভাসিয়ে দিলেন মুখের উপর, 'বিয়ে দিলেই মেয়ে পর। তারপর যদি দয়া করে মাকে তোমরা মনে রাখো, তবেই আমার অনেক।'

'ছি ছি, এ-রকম আপনি বলবেন না।' সোমেশ্বরের গলা রীতিমতো আবদেরে শোনালো।

ননীবালা ধীরে মাথা নেড়ে হাসলেন, 'না-বললেও, যা সত্য তা তো সত্যই?'

'আপনি তো আমাদের সঙ্গেই থাকবেন, কিংবা আপনার সঙ্গে আমরা। এই ফ্ল্যাট এ-মাসেই ছেড়ে দেবো। ওখানে আমার মস্ত বাড়ি—'

'তোমার বাড়ি আরো মস্ত হোক, তোমার ঐশ্বর্য আরো বাড়ুক—' প্রায় সমবয়সী প্রৌঢ় জামাইয়ের মাথায় তিন হাত ছোঁয়ালেন, 'কিন্তু অমন কথা বোলো না। মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে গিয়ে যেন আমাকে আপদ হতে না হয়। আমাকে দয়া করে আলাদা ব্যবস্থাই করে দিয়ো।'

'বেশ তো।' সোমেশ্বর শরীর কাঁপিয়ে হাসলো, 'তা-ই যদি চান তা-ই হবে।'

'আচ্ছা, তোমার যে লেকের ধারে খানিকটা জমি আছে,' কথাটা যেন হঠাৎ মনে পড়লো ননীবালার, 'সেটার বিষয়ে কিছু ভেবেছো কি?'

'ভাবছি তো বাড়ি তুলবো একটা—'

'জমি তো বোধহয় বেশ খানিকটা—'

'বেশ আর কি।'

'তুমি আমাকে তা থেকেই খানিকটা জমি দাও বাবা, যেমন করে হোক একটা কুঁড়েঘর তুলে নিয়ে না-হয় বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিই—'

'ঠিক আছে। তা নিয়ে আপনাকে অত ভাবতে হবে না। আপনি যেমন আমাকে আশীর্বাদ করলেন আমারও তো তেমনি একটা প্রণামী আছে। যদি চান আমি এক মাসের মধ্যেই আপনাকে বাড়ি তুলে দেবো।'

'না, না, অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই—' সুখের আবেগে ননীবালার গলা বন্ধ হয়ে এলো, 'তোমার মতো এমন দেবতুল্য মানুষকে যে আমি জামাই করে পেলাম এই তো আমার সব চেয়ে বড়ো ভাগ্য।' এবার সত্যি-সত্যিই চোখে জল এলো তাঁর।

শাশুড়ির সঙ্গে পাকা কথা বলে এ-ঘরে চলে এলো সোমেশ্বর। চোখে চোখে মানসীকে খুঁজলো। আজ আর একদণ্ড তাকে কাছে না-পেয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এতো ভিড়ে নিভৃত হবার আশা কই? এতো দিন দূরে-দূরে ছিলো, বরং সে-ই ছিলো ভালো। একরকম নিষ্পত্তি ছিলো মনের সঙ্গে। কিন্তু বাঘের রক্তের আস্বাদ পাওয়ার মতো মানসীর নরম স্নিগ্ধ দেহের এতোটুকু স্পর্শেই আর আজ মন মানছে না সোমেশ্বরের। শুধু আজ নয়, কালকে রাত পর্যন্তও এই সুদীর্ঘ অপেক্ষা। কিন্তু তারপর। ভাবতেই শরীর রোমাঞ্চিত হলো সোমেশ্বরের।

তারপর এই মেয়ে তার হাতের মুঠোয়। এই মেয়ের এই দেহ তারই, একমাত্র তারই অধিকারভুক্ত। প্রণয়িনীর ভূমিকায় মানসী এ-পর্যন্ত তাকে যত শুচিবায়ু দেখিয়েছে স্ত্রীর ভূমিকায় স্বামীর বলাৎকারের কাছে তার একটা জবাবদিহি আছে বৈকি। আর সেটাই তো পুরুষের যোগ্য। তাছাড়া অনর্গল দৈহিক বাসনার চরিতার্থতা একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কিসেই বা সম্ভব?

বেয়াল্লিশ বছর বয়সের সোমেশ্বর অন্যমনস্ক হয়ে বসে বসে আজ এ-সব কথাই ভাবলো। না-ভেবে পারলো না। যেদিন এক মেয়েতে আবদ্ধ থেকে নিজেকে খাঁচার চিড়িয়া বানিয়ে দিতে তার আপত্তির সীমা ছিলো না, আজ আর সেদিন নেই। স্বেচ্ছাচারিতার ঘোড়ায় চড়ে দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়িয়ে দম ফুরিয়ে এখন ঘরের কথা মনে পড়েছে। এখন শুধু শরীরের একরকম চাহিদাই নয়, তার আরো অনেক প্রয়োজনের কথা টের পেয়েছে সোমেশ্বর। সেবা চাই, সঙ্গ চাই, গৃহস্থালি চাই। আর এই ঠাণ্ডা শীতল চন্দনের মতো পবিত্র মেয়েটিই তো একমাত্র মেয়ে, যে তার জীবনে কেবল সুদূর হয়ে থেকেই তাকে এমনি প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে পারলো, পাখির মতো গলা গানের হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে তাকে পাগল করে দিলো।

আড্ডা ভাঙতে-ভাঙতে মন্দ রাত হলো না। সুন্দর হাওয়া দিলো বাইরে, ফুটফুটে চাঁদ উঠলো আকাশে, অতিথিদের বিদায় দিতে নিচে নেমে এলো মানসী, আর ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত দাঁড়িয়েই ননীবালা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এলেন সব তুলে-টুলে রাখতে, নিরাসারা করতে। আজকের গোলমালে অনেকক্ষণ ভাঁড়ারের চাবি খোলা ছিলো, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সে-সবের মধ্যেও উঁকি মারলেন হুঁশিয়ার হয়ে, আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন ঠিকই আছে, না খোয়া গেছে কিছু। ঝি-চাকরদের তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করেন না। টুনি আবার বলে,

'তুমি এ-রকম করো কেন ওদের সঙ্গে?' মেয়ের ঢং দেখে শরীর জ্বলে তখন। ভারি ইয়ে হয়েছেন। বড়োমানুষি! বলতেই বলে 'দাকে আছাড়, কোদালকে খিল, বাঁদিকে লাথি, আর গোলামকে কিল।'

এদের সব সময় হাতে রাখতে হয় কেবল বকে মেরে। নইলেই লাইকুত্তার পাতে ভোজন।

ঝি-চাকরদের খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও এই জন্যে তিনি ঢিলে নন। তবু তো তেমন শাসনে রাখতে পারেন না মেয়ের যন্ত্রণায়। সমানে মাছ দিতে হবে তাদের, দামি-দামি তরকারির খোসাগুলো ফেলে দেবে তবু ঝিয়েদের জন্য একটা আলাদা তরকারি হতে দেবে না। সকালে বিকেলে আবার জলখাবারের ঘটা কত। এইজন্যেই তো দিন-দিন এগুলো নিষ্কর্মা হয়ে যাচ্ছে। এর শোধ তোলবার সুযোগ অবিশ্যি প্রায়ই জুটে যায় তাঁর। মাসের মধ্যে অনেক দিনই মানসী বাড়িতে খায় না।

নানা জায়গায় পার্টি থাকে, জলসা থাকে, সান্ধ্য নিমন্ত্রণ বা ডিনার থাকে। সে-সব দিন ননীবালা ডাল আর রুটি ছাড়া তৃণটুকুও দেন না। যদিও তাঁর নিজের জন্য মাছ ছাড়া আর সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো না, বয়েস হয়েছে, ভালো খাওয়া-দাওয়া না করলে শরীরই বা টিকবে কেন? খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের খান চোদ্দ লুচির সঙ্গে রাত্তিরে তিনি বেগুনভাজা, আলুভাজা, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, একবাটি ক্ষীর, মিষ্টি এই সব খান। আর টম্যাটো তাঁর রোজই চাই। তাতে নাকি ভিটামিন আছে। (কলকাতা এসে কত ইংরিজিই শিখলেন তিনি!) যখন পা ভেঙে গিয়েছিলো তখন বলেছিলো ডাক্তার। যথেষ্ট ভিটামিন দিতে হবে শরীরকে। মাছ, মাংস যদি নেহাৎ না-ই খান তবে এদিকে দুধ, ঘি, ফল, মিষ্টি, আর ওদিকে তরকারির মধ্যে আলু, গাজর, বীট, বীন, স্কোয়াশ এ-সবের স্যুপ। টম্যাটোটা যথেষ্ট পরিমাণে। স্যুপ তো খাবেনই,—সরবৎ করেও গ্লাস দুই খাবেন চিনি দিয়ে।

কী করেন ননীবালা! সেই থেকে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে ঐ স্যুপটি তাঁর একবাটি চুমুকে চাই-ই চাই। টম্যাটোর সরবৎটাও রেখেছেন। তাতে শরীরটা সত্যি ঠাণ্ডা থাকে। আর রংটাও পরিষ্কার হয়।

রাধানগরে থাকতে এ-সবের নামও জানতেন না। কী জঘন্য দেশ রে বাবা!

ঝি দুটো ভারি মুখে গনগন করে রুটি খায় মটরের ডাল দিয়ে আর বলে, 'এমন খাবার দিলে বাপু থাকবো না আমরা।'

'থাকবি না তো যা না কোন চুলোয় যাবি? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব?' পরিপাটি করে খেয়ে উঠে আঁচাতে-আঁচাতে তিনি ভাবেন।

তা কি যাবে নাকি ? এমন হাবা মনিব কি রোজ-রোজ জুটবে? বড়ো একটা কনট্রাক্ট হলো কি অমনি বকশিশ। নিজে কিছু কিনলো কি অমনি ওদের। পুজোর সময় শাড়ি চাই, দোলের সময় ব্লাউজ চাই, বায়না কত। আর ঢংও জানে মাগি দুটো। 'দিদিমণি! দিদিমণি!' একেবারে মিছিরির পানা।

আজ কিন্তু ঝিয়েদের কিছু বললেন না। বরং গলায় মধু ঢাললেন, 'নে বাপু, ভালো করে খা। পান্তুয়া আর-একটা নিতেই হবে। না খেলে খাটবি কেমন করে শুনি? ঝপাঝপ খাবার জিনিস তিনি পাতে ফেলে দিলেন। গাল ভরে হেসে বললেন, 'আরো কত খাবি, কত পাবি। রাজবাড়িতে যাচ্ছে দিদিমণি, তোরাই কি কম সম্মান পাবি? হাজার হোক রানীর ঘরের খাস দাসী তো? জামাই আমার সাধারণ মানুষের মতো কাপড়-জামা পরে আসেন বলেই ভাবিস না

াদের মতোই একজন। বুঝলি? তা নয়। সোনা-দানায় বাড়ি ঠাসা, আজ একটা হাজার টাকা মের হীরের আংটি দিয়েছে, আবার কাল সকালেই তো একলক্ষ টাকার হীরের কণ্ঠি দিয়ে কো আশীর্বাদ করতে আসবে বাড়ির দেওয়ান। সোনার পোশাক পর্যন্ত আছে এদের। আর থায় যখন মুকুট পরবে দেখবি।

বাড়তি খাবার মীটসেফে তুলে রাখতে-রাখতে উল্লসিত হয়ে জামাইয়ের অগাধ ঐশ্বর্যের হিনী তিনি উদঘাটিত করতে লাগলেন নন্দর মা আর নবলক্ষ্মীর কাছে। ছোকরাটাও ঘুমে ল বড়ো-বড়ো গরসে ভাত মুখে তুলতে-তুলতে চোখ বড়ো করে শুনলো।

যাবার মুখে সোমেশ্বর বললো, 'বাই দি ওয়ে, একটা কথা, আমি আজ ফোন করেছিলাম ন্সপোর্টকে, মানে ট্রান্সপোর্ট আপিসে।'

'ট্রান্সপোর্ট আপিসে?' অবাক হলো মানসী।

'ঐ তোমার কালকের ব্যাপারটা। সেই কণ্ডাক্টর।'

'কে?'

'আরে তোমার জন্য যে-লোকটা কাল বাস থেকে ঝুলে পড়ে প্রায় আত্মহত্যায় উদ্যত য়েছিলো।'

'কন্ডাক্টর!'

'দ্যাখো নি? সেই দোতলায় টিকিট নেওয়া থেকেই তো আরম্ভ। ইডিয়ট। দিলাম একটা মপ্লেইন্ট করে।'

'কণ্ডাক্টর?'

'খোদকর্তাকেই পেলাম ফোনে, যা-তা বললাম। এমন ইতর লোকজন সব, আর সরকারও া তেমনি, তুমি কি ভেবেছো কোনো স্টেপ নেবে?'

মানসী চুপ।

'এজন্যেই আমি মেয়েদের বাসে-ট্রামে চড়ার এতো বিরোধী। আচ্ছা, আজ তবে বিদায়, ণী।'

সোমেশ্বর গাড়িতে উঠলো।

মানসী দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে। কে যেন তাকে গেঁথে দিলো মাটির সঙ্গে।

এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেলো কিচিরমিচির ডাক ছেড়ে। চাঁদ দেখলে এমন ওরা যায় কের জলে ছায়া ফেলে-ফেলে, তার মানে রাত বেড়েছে।

দোতলার ফ্ল্যাটের আলোটি বন্ধ হলো টিপ করে। একটা ছোটো বাচ্চা কেঁদে উঠলো অন্য াটে। একটা গরু তখন থেকে জাবর কাটছিলো আপন মনে, এবার ধীরে-ধীরে কোথায় হেঁটে লো। বড়ো রাস্তা থেকে ছোট্টো একটি কোলাহল উঠেই আবার নিবে গেলো, একটা ইভেট গাড়ি তীর বেগে ছুটে গেলো লেকের দিকে, ভেতর থেকে কোরাস গানের ক্ষণিক র। চাঁদনি রাতের ফুর্তি।

নির্জন রাস্তার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখ তুলে ওদের দেখলো মানসী। শিরশিরে ঠাণ্ডায় াড়ির আঁচলটা কাঁপলো। মিষ্টি একটা চেনা গন্ধ ভেসে এলো বাতাসে। কিসের গন্ধ। কী ফুল? ত্র কয়েকটি বড়ো-বড়ো বাড়ি বুকে নিয়ে এ-পাড়ায় মাঠ-ঘাটের অন্ত নেই। নিজে-নিজেই ত বুনো ফুল ফুটে থাকে যেখানে-সেখানে। কী সুন্দর লতা গাছ বড়ো বড়ো গাছের দেহ

জড়িয়ে বেড়ে ওঠে। অন্ধকার রাত্রে জোনাকি জ্বলে। ভারি ভালো লাগে মানসীর। তখন
পিছন ফিরে তাকায় জোনাকজ্বলা আরো কোনো ভুলে-যাওয়া রাত্রির দিকে। ভুলে-যাওয়া
না, ভুলে থাকা? ভুলে কি যাওয়া যায়? কেউ কি ভোলে? ভুলতে পারে? ভোলা কি এ
সহজ? শুধু ভুলে থাকে। ভুলতেই হয় বলে ভুলে থাকে। না-ভুললে মানুষ বাঁচতে পারে
তাই ভুলতেই হয়। ঠিক এমনিই দুধসাদা চাঁদের রাতে এমনি বাতাসে-ভেসে-আসা গন্ধভ
মাধবীলতার ঝোপে দাঁড়িয়ে গাঢ় ঘন নিবিড় গলার ছোট্টো একটি ডাক, 'টুনি। আমার
পাখি।'

টুনি! টুনিপাখি!

হঠাৎ ছটফট করে উঠলো মানসী। ভুলি নি, ভুলি নি, আমি তো ভুলি নি! ভুল
পারি না। জ্বরের ঘোরে প্রলাপরত রোগীর মতো অস্থিরভাবে এপাশে-ওপাশে মাথা নাড়তে
নাড়তে সে বিড়বিড় করলো। তারপর অদ্ভুত একটা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাস্তায় নেমে
লাগলো মোহের মতো।

কলকাতা শহরের সেই প্রথম একমাত্র নীল দোতলা বাস, ঘড়ি ধরে যার আসা-যাওয়া, যে-বা
চল্লিশ মিনিটে বালিগঞ্জ-শ্যামবাজার করে, যে-বাসে চড়বার জন্য সারা শহর চঞ্চল, যে-বা
করে কাল রাত দশটায় মানসী সোমেশ্বরের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছিলো, সেই বাস, এখন বালিগ
স্টেশন থেকে শেষ ট্রিপ সেরে ফিরে যাচ্ছে ডিপোতে। রাস্তা জনবিরল হয়ে এসেছে, যতদূ
চোখ চলে প্রায় ফাঁকা, এতোক্ষণে গাড়ির চালক একটু অসাবধান হতে পেরেছে, মনের ম
বেগ দিতেপেরেছে এঞ্জিনে। সারাদিনের সঙ্গে এই রাত এগারোটার কলকাত
কোনো মিল নেই। একটা দুরন্ত দানব যেন সারা পৃথিবী লণ্ডভণ্ড করে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে দার
দাপাদাপির শেষে হঠাৎ শ্রান্ত শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। নীলাম্বরী শাড়ি
আঁচল বিছিয়ে স্নিগ্ধ রাতের শান্তি নেমেছে শহরে। যাত্রীবিরল বাসের অন্তরে নির্মল আর ত
সঙ্গী, দু-জন কর্মচারীই এখন আলস্যে ক্লান্ত। সঙ্গীটি একটু অবসর পেয়ে বসেছে গিয়ে সামনে
দিকে, হাতের ভাঁজে মাথা রেখে। হয়তো বা তন্দ্রা এসেছে তার। সারা বাসটাই ঝিমুচ্ছে ঘুমে
ঘোরে। নির্মলও আর পারছে না, পা ধরে এসেছে, গা এলিয়ে রডের উপরেই ছেড়ে রেখে
নিজেকে। কেউ উঠছে না, কেউ নামছে না, দুরন্ত বেগে চক্ষের পলকে রাস্তা-ঘাট সব পিছ
ফেলে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে লাফিয়ে উঠে থেমে গেলো সামনে
স্টপ ছাড়িয়ে, কে যেন ছুটতে-ছুটতে, পড়তে-পড়তে প্রাণপণ বেগে এগিয়ে এসে প্রায় হুম
খেয়ে পড়লো বাসের মধ্যে। মুহূর্তে চকিত হয়ে পড়ন্ত মানুষটিকে ধরবার জন্য হ
বাড়িয়েছিলো নির্মল, তারপরেই থমকে নিজেকে নিয়ে আড়াল হয়ে সরে দাঁড়ালো এক কো
আর তারই ক্লান্ত, অবনত, ব্যর্থতার ভারে নিপীড়িত কম্পিত বুকের তলা দিয়ে হাঁপাতে
হাঁপাতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলো মানসী।

সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে মনে মনে উচ্চারণ কর
নির্মল। যে ভদ্রলোক আজ সকালে তাদের নামে নালিশ করেছেন ট্রান্সপোর্ট আপিশে। য
সুন্দরী সুবেশী স্ত্রীর দিকে কাল রাত দশটা-সতেরো মিনিটে সে বা তার সঙ্গী, অর্থাৎ যে-দু'জ
সেই সময়ে ডিউটিতে ছিলো, তাদের মধ্যে কোনো একজন অসভ্যের মতো তাকিয়েছি

লালুপ দৃষ্টিতে। আচরণে যাদের শোভনতার একান্ত অভাব ছিলো, যে-দুটো ইতর এবং ছোটোলোকের বাচ্চা এবং কণ্ডাক্টর নামক নিকৃষ্ট জীব এই ধরনের বেয়াদবি করতে সাহস পয়েছিলো, সরকারের উচিত, সে-দুটোকে অবিলম্বে ডেকে এনে চাবুক মারা, এবং কাজ থকে বরখাস্ত করা। ফোন করে এই সব কথা বলেছেন এই ভদ্রমহিলার স্বামীটি। কিন্তু যাঁর গছে নালিশ এসেছে সেই মানুষটি খোদ কর্তা হলেও মানুষই। বয়স হয়েছে, বিভিন্ন চরিত্রের লাক দেখে অভ্যস্ত। এই নালিশকে ততো গুরুত্ব দেন নি, একজন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামীর প্রলাপ মনে করে তাদের ডেকে একটু ধমকেই ছেড়ে দিয়েছেন। ভদ্র বলতে হবে বৈকি। আপিসের জরুরি ডাকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে এই শাসনটুকু হজম করতে-করতে তার সঙ্গীটির কী মনে হচ্ছিলো জানে না নির্মল। তার নিজের মনটা শূন্য ছিলো। যন্ত্রণারও তো একটা সীমা আছে, যার পরে যন্ত্রণাও আর যন্ত্রণা দিতে পারে না। নির্মল তখন তাকিয়ে-তাকিয়ে বাগানের ফুলগুলো দেখছিলো, দেখছিলো সকালবেলাকার প্রথম রোদ, রোদে কাঁপা প্রজাপতির রঙিন পাখা। মনটা কোথায় উধাও হয়ে গেলো কে জানে। শরীরটাও হালকা থেকে আরো হালকা হয়ে তুলোর আঁশের মতো ভাসতে লাগলো বাতাসে, যার কোনো স্থিতি নেই, বেগ নেই, চাপ নেই, পতনও নেই। ভালোই হলো। মনস্থির করা সহজ হলো। এই কলকাতার মোহ মিটলো তার। তা নৈলে শুধু কি কণ্ডাক্টর হয়েই ক্ষান্ত দিতো সে? এই চাকরি গেলে, এ-দেশের ফুটপাথ কামড়ে পড়ে থাকতো, শেষ পর্যন্ত আশার ছলনা তাকে কোন কুহকের দেশে টেনে নিয়ে যেতো কে জানে। পদত্যাগপত্রখানা আজকের মতো এমন সতেজ বিনয়ের সঙ্গে পেশ করে আসা কোনোদিনই সম্ভব হতো না। এতো বছর সে এতো গৌরবের সঙ্গে কাজ করে এসেছে সৈন্যবিভাগে, কলকাতা ছাড়তে পারলে এর চেয়ে ভালো কাজ এর চেয়ে অনেক আগেই তার জুটতো। সে যায় নি, যেতে পারে নি। এতোদিনে সত্যিই মুক্তি পেলো, ছুটি পেলো। ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ ভদ্রলোকটিকে, এই ভদ্রমহিলার ভদ্রলোক স্বামীটিকে।

শরীরটাকে সোজা করে সিঁড়ির মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবলো নির্মল। আর ভাবতে-ভাবতে শিথিল পায়ে কখন এক সময়ে ধীরে-ধীরে উঠে এলো দোতলায়। টিকিট নিতে হবে যে। নেওয়া তার কর্তব্য। যতক্ষণ সে বহাল আছে এই চাকরিতে ততোক্ষণ সে অবিশ্বাসী হতে পারে না। কেন হবে? কার জন্য হবে? ঐ ভদ্রমহিলা তার কে? কিসের কুণ্ঠা, কিসের লজ্জা? কেন এই অভিমান? এই ভীরুতা? ছি! এক ধমকে নিজেকে এনে সে ঠিক অচেনা মানুষের মতোই নিঃশব্দে দাঁড় করালো মানসীর পিছনে। আত্মসংযম করতে সময় লাগলো একটু, তারপর সহজ গলাতেই বললো, 'টিকিট।'

মানসী সামনের দিকে তাকিয়েছিলো, চমকে মুখ ফেরালো। আর সেই মুখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত নিঃশ্বাস নিতে পারলো না নির্মল। এতোক্ষণ ধরে জড়ো-করা সকল শক্তি তার মুহূর্তে ভেসে গেলো। ঢোক গিলে চোখ নামিয়ে জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে আধখানা ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের অজান্তেই কখন একখানা হাত উঠে এলো নিজের না-কামানো দাড়ি-ভরা গালে, খাকির প্যান্টটা এই চাকরিতে এসে এই প্রথম বড়ো বেশি নোংরা মনে হলো। গায়ের বুশশার্টটা আরো অকথ্য। সহসা একটা অদ্ভুত আত্মগ্লানিতে মনটা ভরে উঠলো। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করলো। বিধাতার নিষ্ঠুরতায় অবাক হবার সুযোগ সে অনেকবার পেয়েছে জীবনে, কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার যেন কোনো তুলনা পেলো না।

মানসীর আকাশের মতো নীল নতুন-কেনা দামি ফরাসী সিল্কের কোমল শাড়ি বাতাসের ছোঁয়ায় ততোক্ষণে ঢেউ তুললো একটি, বাসি বকুলের মতো একটা অস্পষ্ট শিথিল সুগন্ধ

এখানে-ওখানে মাকড়সার জালের মতো ভাসতে লাগলো হাওয়ায়, হাতের পাঁচভরি সোনার নতুন গড়ানো মোটা বালাটার আশ্চর্য পালিশ থেকে সূর্যের জ্যোতি ঠিকরোলো, সযত্নে প্রসাধিত গালের একটা পাশ কানের টুকটুকে লাল প্রবালে রঙিন দেখালো। পিঠের উপর এলিয়ে-পড়া কালো খোঁপা, খোঁপার উপর ছড়ানো-ছিটোনো রুপোর তারাফুল, ব্রোকেডের ব্লাউজে আঁটো পিঠের রুপোলি রং, ঠিক মাঝখানে লম্বা হয়ে বেয়ে নেমে-আসা পাথরের মালার কুচকুচে কালো সিল্কের ফিতে, সব মিলিয়ে কোনো কিছুর সঙ্গেই আর নিজেকে একাত্ম বোধ করতে লজ্জা পেলো নির্মল। কেবল হাঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে-তাকানো আর ঈষৎ তুলে-ধরা মুখের ভঙ্গিটিতে পলকের জন্য রাধানগরের টুনিকে মনে পড়ে মোচড় দিয়ে উঠলো বুকটা।

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মানসীও নামিয়ে নিলো মুখ। কপাল থেকে উড়ে-পড়া ছোটো-ছোটো চুলগুলো সাপটে সরিয়ে দিলো পিছনের দিকে। নিজের কিউটেক্স মাখা আঙুলের দিকে তাকিয়ে হাতখানা টেনে নিলো আঁচলের তলায়। হাঁটু বুক বেয়ে পেঁচিয়ে ওঠা আকাশ-নীল শাড়ির সাচ্চা রুপোলি বর্ডার যেন একটু উগ্র হয়ে চোখে পড়লো। শস্তা ময়লা বুশশার্টের আড়ালে নির্মলের দৃঢ় দীর্ঘ সুঠাম দেহ, অনিদ্রাক্লান্ত বড়ো-বড়ো চোখের গাঢ় দৃষ্টি, না-কামানো পুরুষ-গালের কর্কশ লাবণ্য, সব-কিছুই তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করলো সেই মুহূর্তে। তবে কি সকালবেলাকার প্রথম সূর্যের চাইতে মধ্যাহ্নসূর্যের জ্যোতির প্রখরতাও কিছু কম আকর্ষণযোগ্য নয়? না কি বাইশ বছরের টলোমলো তারুণ্যের কাছে উত্তরতিরিশের স্থির যৌবনই অনেক বেশি মনোরম? বুকের ভেতরটা মানসীর কতকাল পরে আবার তেমনি জোরে-জোরে কেঁপে উঠলো ছেলেবেলাকার মতো।

মনকে কিন্তু প্রশ্রয় দিলো না নির্মল। তার পৌরুষ তাকে ধিক্কার দিলো। কাল সারারাত যে যার জন্য একবিন্দু ঘুমোতে পারে নি, আজ সারা সকাল যার জন্য অপমানের বৃশ্চিকদংশনে সে জ্বলেছে, সারাদিন যার কথা ভাবতে-ভাবতে একটা মূর্ছার মতো কেটে গেছে সময়, এখন এই মুহূর্তে যার দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেকে সে অসম্মানিত হতে দিচ্ছে, বলতে গেলে সারাটা জীবনই সে যার জন্য জ্বললো, পুড়লো, ক্ষয় হলো, দেরাদুনের অত ভালো চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এসে ঘুরে বেড়ালো কলকাতার পথে-পথে পকেটের পয়সা ফুরিয়ে গেলে সামান্য ম্যাট্রিক পাশের যোগ্যতা নিয়ে আর কোনো কাজ না পেয়ে বিনা দ্বিধায় এই কাজ নিয়ে আজ এইখানে এসে পৌঁছলো, তার জন্য কিসের বেদনা কিসের অভিমান? তাছাড়া অন্য একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সুসজ্জিত, সুশ্রী স্ত্রীর কাছে এই অবস্থায় তার প্রাক্তন প্রণয়ীর পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার মতো লজ্জা আর আছে নাকি কিছু? এই আট-দশ বছরের যুদ্ধের চাকরিতে সে অনেক দেখেছে, শুনেছে, সয়েছে। মন নিয়ে যেমন জ্বলেছে, তেমনি প্রাণ নিয়েও বিধাতা কম খেলা খেলেন নি। বেশ তো। যুদ্ধের অবসানে এই তার শেষ খেলা হোক। শেষ শক্তির পরিচয়। নিজের দুর্বল হৃদয়কে প্রায় চাবুক মেরে স্থির করলো নির্মল। এই ঠাণ্ডায়ও বিন্দু-বিন্দু ঘামে তার কপাল ছেয়ে গেলো, বুক-পিঠ ভিজে উঠলো, অসহ্য ময়লা রুমালটা পকেট থেকে বের করে ঘাড় গলা মুছে, দৃঢ় কণ্ঠে আবার বললো, 'আপনার টিকিট?'

টিকিট। টিকিট কেন? মানসী তো পয়সা নিয়ে আসে নি। এখানে যে আসবে তা কি সে জানতো? তবে কখন এলো? কেমন করে এলো? কী ভাবতে-ভাবতে এমন শূন্য হাতে চলে

এলো সে? কই কিছুই তো মনে করতে পারছে না। এই তো সে দাঁড়িয়ে ছিলো কম্পাউন্ডের ফটকে, দু-পাশে বেল-কামিনীর ঝাড়। অতিথিদের বিদায় দিতে নেমে এসেছিলো। প্রথমে বিদায় নিলেন 'নবীনার নিয়তি'র বিখ্যাত ডিরেক্টার অনন্তমাধব বটব্যাল। কালো রং, টানা চোখ, বাঁকা ঠোঁটে হাসেন। তাঁর সঙ্গে ফুল্লরা সেন গিয়ে ঢুকলো গাড়ির অন্ধকারে, 'প্লী-ই-ই-জ, মিঃ বটব্যাল', গলে গেলো সারা শরীরে, 'চলুন না লেকটা চক্কর দি একবার।' তারপর সেই নতুন ছবিটার প্রডিউসার বদ্রিপ্রসাদ আগরওয়ালা, তারপর সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি আর তার মস্ত হাউণ্ড, আর সব শেষে সোমেশ্বর। তার ভাবী স্বামী, যার সঙ্গে এই কয়েক মুহূর্ত আগে সে সকলের সামনে এনগেজড্ হয়েছে, যে তাকে একটা মস্ত মার্বেলের গুরির মতো মস্ত হীরের দুর্মূল্য আংটি পরিয়ে দিয়েছে আঙুলে, যে হীরের দিকে তাকিয়ে ননীবালা আর চোখ ফেরাতে পারেন নি, যে-হীরে এখন শাড়ির তলায় ঢেকে রাখা সত্ত্বেও লাল নীল সবুজ বেগুনি আলোর ঝিলিক তুলছে প্রত্যেক মুহূর্তে। তারপর? তারপর কী?

বাসের চারদিকে তাকালো সে। অত বড়ো বিশাল দোতলার গহ্বরে অতগুলো আসনের মধ্যে একলা আরোহী নিজেকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলো। একটু দূরে একটা অনমনীয় নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সোজা দাঁড়িয়ে আছে নির্মল। তার কঠিন চেহারায় এমন একটি রেখা ফুটে নেই, যাতে ভুলক্রমেও মনে হতে পারে মানসীকে সে চিনতে পেরেছে। মানসী উতলা বোধ করলো, তার পলকপাত দ্রুত হলো, নিঃশ্বাস ঘন হলো। আরক্ত হয়ে বললো, 'টিকিট ? কিন্তু আমি—আমি তো পয়সা আনি নি।'

নির্মলের দৃষ্টি জানালার বাইরে। পলকের জন্য চোখটা ফেরালো কি ফেরালো না। অস্ফুটে বললো, 'তবে?'

তবে? তাই তো, তবে কী? মানসীর ব্যাকুল দৃষ্টি স্থির হলো নির্মলের মুখের উপর। নির্বিকার নির্মল শরীরটাকে এক পায়ের ভর থেকে আরেক পায়ে দাঁড় করালো, মাথার উড়ন্ত চুলগুলোকে আঙুল ডুবিয়ে ঠেলে দিলো পিছন দিকে, নিরাসক্ত গলায় বললো, 'বেঁধে দেবো?'

ভাগ্যের পরিহাসে হাসি পেলো মানসীর। উপযুক্ত জবাব বটে। নির্মল আজ টুনিকে পয়সার অভাবে নামিয়ে দিচ্ছে বাস থেকে। শেষ পাওনাটা এতোদিন বাকি ছিলো তাহলে? নির্মলের তূণে এমন একটি কঠিন বাণ এখনো অবশিষ্ট ছিলো মানসীর জন্য? হাতের মুঠো শক্ত করে স্তব্ধ থেকে নিজেকে সামলে নিলো সে। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে রুদ্ধ স্বরে বললো, 'তাছাড়া উপায় কী?'

'এখানেই বাঁধবো?' নামতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালো নির্মল।

'গন্তব্যে পৌঁছনো যখন সম্ভব নয়,' ছাব্বিশ বছরের পোড়-খাওয়া কৃতবিদ্য মানসী কঠিন হয়ে উঠেছে সেই সময়টুকুর মধ্যে, 'তখন যেখানেই হোক ক্ষতি কী?'

'কদ্দূর যাবেন?'

'সেটা অবিশ্যি নির্দিষ্ট নেই। যা-ই হোক, এই ভুলের জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।'

'ভুলচুক সকলেরই হয়।'

'হয়। কিন্তু এমন মারাত্মক ভুল হবে সেটা ভাবি নি।'

'ভুল মাত্রই মারাত্মক। যে করে সেই ভোগে।'

'চারটে পয়সা পাঠিয়ে দেবো আপনাদের সরকারের দপ্তরে। ভুল করতে পারি, ঠকাতে তো পারিনে।'

'সে কী কথা? আপনি কখনো ঠকাতে পারেন?'

থমকালো মানসী। একটু চুপ করে থেকে বললো, 'তাহলে আর টিকিট চাইছেন কেন?'

'সরকারের নিয়ম।'

'শুধু সরকারের নিয়ম বলেই?'

'আজ্ঞে আমরা তো ভৃত্য মাত্র।'

'কার বলুন তো।'

'সরকারের তো বটেই। আপনাদেরও।'

'আমাদেরও?'

'যাত্রীর মনোরঞ্জন করাও আমাদের কাজের একটা অঙ্গ।'

'তাই জন্যেই বুঝি রাত এগারোটার এই অনিশ্চিত রাস্তায় একজন বিপন্ন মেয়েকে এ-রকম করে পথে নামিয়ে দিচ্ছেন?'

'বিপন্ন?'

'নিশ্চয়ই! গলায় জোর দিলো মানসী, 'সঙ্গে পয়সা নেই, সঙ্গী নেই—'

নির্মল সনির্বন্ধ হলো।—'ক্ষমা করবেন, এই চাকরিতে বিপদভঞ্জনের নির্দেশ নেই কোনো।'

'চাকরিতে না থাক, মনে তো আছে?'

'সে বালাই আমরা চুকিয়ে দিয়েই এ-সব কাজে আসি।'

'বিবেক?'

'আমি একজন সামান্য বাস-কণ্ডাক্টর, আর আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা-যাত্রী, আপনার সঙ্গে আমার বিবেকের সম্বন্ধ কী?'

'তাহলে মনুষ্যত্ব? সেটা তো থাকা উচিত?'

'আমরা আবার মানুষ!' দুই চোখে অজস্র বিদ্রূপ নিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ালো নির্মল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি ডিউটিতে আছি, এটা আমার কাজের জায়গা, আলাপ করার—'

'জায়গা নয়,' মানসী মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো, 'বেশ তো, সে-জায়গার ঠিকানাটাই বলুন।'

নির্মলের অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা দৃষ্টির পলকে ছোট্টো একটি কম্পন উঠলো। 'কিছু দরকার আছে কি?'

'একটু আছে বৈকি।'

'আশ্চর্য! আমার মতো মানুষের সঙ্গে আপনার—'

'খুব অবাক হবার মতো ঘটনা বলে মনে হচ্ছে, না?'

'তা তো একটু হচ্ছেই।'

'মিথ্যে কথা বলাটাও কি আপনার চাকরির একটা অঙ্গ নাকি?'

'মিথ্যে কথা?'

'নয়?'

চুপ করে রইলো নির্মল।

মানসী বললো, 'অস্বীকার করতে চান করুন, মিথ্যার ছদ্মবেশ কেন? আত্মবিশ্বাস নেই?'

নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় নিলো নির্মল, ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'সুখে আছেন, সুখে থাকুন। ও-সব কথা থাক।'

'আমার সুখের জন্য খুব ব্যস্ত, না?'

'মন্দ কী।'

'বছরের পর বছর তারই প্রমাণ দিয়েছেন বোধ হয়।'

নির্মল স্তব্ধ রইলো একটু। পাৎলা লম্বা একটা নিঃশ্বাস নরম বাতাসের মতো আস্তে বয়ে যেতে দিলো বুকের মধ্যে। বললো, 'আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই কি তার প্রমাণ নয়?'

'তাই নাকি?' মানসী ভুরু বাঁকালো, 'বলে না-দিলে জানবার উপায় ছিলো না।'

নির্মল ব্যথিত হয়ে বললো, 'কৌতুক আপনাকেই মানায়।'

'আপনাকে নয়?'

'আমাকে! আমাব কৌতুক করবার অবসর কোথায়?'

'এর জন্যে অবসরের দরকার হয় না।'

'হয়। আপনার মতো পদস্থ মহিলাদের সঙ্গে কৌতুক করতে হলে অবসরটাই তার মধ্যে মুখ্য।' ঈষৎ ঝাঁঝ ফুটলো এবার নির্মলের গলায়।

'ও, পদস্থ হওয়াটা'তেই দেখছি আপনার আসল আপত্তি।' মানসীর গলায়ও কম জ্বালা নেই।

'আপত্তি! আপত্তি কিসের?'

'ভেবেছিলেন না-খেয়ে, না-পরে, শুকিয়ে মরে আপনার মতো একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের আশায়ই বুঝি চিরদিন রাধানগরের অন্ধকারে পড়ে থাকবো।' কিসে থেকে কী। আসলে কোথায় একটা সন্দেহের কুটিল কামড় অনুভব করছে মানসী। একটা দুরন্ত ঈর্ষার দহন। কল্পনায় যেন কোনো একটি নিভৃত নির্জন গৃহকোণের ছবি দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে একটি মেয়ের দুটি প্রতীক্ষারত চোখ, যে-চোখের মায়ায় নির্মল আজ পরিপূর্ণ, পরিতৃপ্ত। যে-দুটি চোখের কথা ভেবে নির্মল আজ একবার, এক মুহূর্তের জন্য তাকাতে পারছে না তার । নিশ্চয়ই। তা নৈলে কেন এই ছলনা? এড়িয়ে যাবার এই অসার্থক চাতুরী। আপনি-াজ্ঞে বলে দূরে সরিয়ে রাখার ঘটা। ওর মন বলে কি পদার্থ নেই কোনো? কে নিলো সেই ?

মাথা নিচু করলো নির্মল। নিঃশব্দে হজম করলো এই নিষ্ঠুর তিরস্কার। আস্তে বললো, আমি কিছুই ভাবি নি।'

'জানি। তাও জানি। আমিও কারো ভাববার অপেক্ষায় বসে থাকি নি।' মানসী উত্তেজিত ভাবে উঠতে গিয়ে বসে পড়লো চলন্ত বাসের টানে।

নির্মল হাতের ঘড়ি দেখলো, বাইরের দিকে তাকালো; বললো, 'নামবেন?'

'হ্যাঁ।'

'এইখানেই?'

'হ্যাঁ।'

'এটা কালিঘাট।'

'আমি পথ-ঘাট চিনি।'

'জানি। তার জন্যে নয়।'

'তবে কিসের জন্যে?'

'বলছিলাম, এখানেই কি আপনার স্টপ?'

'জেনে কিছু দরকার আছে?'

'ঠিক স্টপে নামাই কি ভালো নয়?'

'পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।' মানসী আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো, কিন্তু এমন জোরে বাস চলেছে যে না-থামলে চলা দায়।

নির্মল বললো, 'রাত হয়েছে, একটা যে-কোনো জায়গায় নেমে পড়া কি উচিত হবে?'

'ভাবনা হচ্ছে?'

'না। আমাব ভাবনা কী?' ঢোঁক গিললো নির্মল। ভেবে পেলো না কখন থেকে সত্যি এই মেয়ের জন্য মনে-মনে রীতিমতো একটা উদ্বেগ বোধ করছে সে। হলোই বা অন্যের স্ত্রী, তবু তো ও টুনি। টুনিই তো।

মানসী চোখ তুললো না, চাপা গলায় বললো, 'কোনো ভাবনা নেই, না?'

অস্বস্তি বোধ করলো নির্মল। বুঝতে পারলো না, টুনি আজ কী চায় তার কাছে। কী তার উদ্দেশ্য। গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় বললো, 'না।'

'কিন্তু একদিন তো ছিলো।'

'একদিনের কথা থাক।'

'তা তো থাকবেই।' জ্বলে উঠলো মানসী, 'আমিও সেই একদিনের কথা আজ আর মনে করে বসে নেই। কাউকে মনে করিয়েও দিতে আসি নি।'

'জানি।'

'নেহাৎ কৌতূহলবশতই এসেছিলাম।'

'সেটাই স্বাভাবিক।'

'আর তার চেয়েও যেটা স্বাভাবিক, সেটা হচ্ছে মনে-মনে যদি কেউ কোনোদিন এতোটুকু করুণা করে থাকে, সেই অহংকারের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া।'

'জানি।' তেমনি শীতল গলা নির্মলের।

'তা-ও জানেন? বাঃ, জ্ঞানের কোথাও কমতি নেই দেখছি।'

'সেটাই আসল যন্ত্রণা।' এক পলক তাকিয়ে নির্মল আবছা হাসলো।

হয়তো হাওয়ায় ধুলো ঢুকলো মানসীর চোখে, সিল্কের আঁচলে ঘষে নিলো চোখটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন করে বললো, 'আরো একটা কারণে এসেছি—'

'বলুন—'

'আপনার কাছে কিছু ঋণ ছিলো আমার।'

'ঋণ?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো মানসী, 'হ্যাঁ।'

'ও।' এতোক্ষণে বোঝা গেলো ব্যাপারটা। কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলো নির্মল। তারপরেই দুই চোখে যেন হাসির ফোয়ারা ছড়ালো, 'ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেটা বোধহয় শোধ দেবার মতো—'

'হ্যাঁ। সেটা আমি শোধ করেই দিতে চাই।'

'হিসেবটা কি মনে আছে?'

'আছে।'

'সব কি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'সব?'

'সব।'

'মনে পড়বে কি?'

'পড়বে। পড়বে।' সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এলো মানসী, 'সব মনে পড়বে আমার। কড়ায় স্তিতে সে-হিসেব শোধ করে দেবার জন্যই এতো রাত করে এমন রিক্ত হাতে পাগলের চা আমি ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু কোথায় সে? সে নেই।'

নির্মল হাতের পাঁচ আঙুলে মানসীর এইমাত্র পরিত্যক্ত আসনের পিঠটা সমস্ত শক্তিতে প ধরে বললো, 'কী?'

'কিছু না।' দু-সিঁড়ি নামলো মানসী, আর তারপরেই ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেলো নির্মলের থ থেকে।

নির্মল হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর কী ভাবলো কে জানে। অধীর । নিচে নেমে এসে আধো-ঘুমন্ত সহকর্মীটির গলায় নিজের ব্যাগটা ঝুলিয়ে দিয়ে বললো, ক মিনিট, আসছি।'

ায় নেমে ঝোঁকের মাথায় খানিকটা হেঁটে, দাঁড়িয়ে পড়লো মানসী। নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়া ; এখনো স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসে নি, হয়তো বা দম নিতেই দাঁড়ালো। কিন্তু সবটাই নয়। বাসটা তাকে কদ্দূর এনে ছেড়ে দিয়েছে সে-জায়গাটা আন্দাজ করবার জন্যও থামতে া। কালকের মতো আজকেও ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, বড়ো-বড়ো গাছগুলো ভৌতিক ছায়া লেছে ফুটপাথের উপর। ঘুমন্ত ভিখিরির দল, সেই ছায়া জড়িয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে শুয়ে আছে ামেলো রাস্তা জুড়ে, কয়েকটা কুকুরও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে সেখানে। সামনেই একটা টবিন, গন্ধ উঠছে থেকে-থেকে। দুটো গরু বিশাল শরীর নিয়ে তারই মধ্যে মুখ ডুবিয়ে কী । বার করছে টেনে-টেনে। মানসী সরে এলো এ-পাশে। বোঝা গেলো জায়গাটা জগুবাবুর ারের কাছাকাছি।

এতো দূর! এতো দূর তো ভাবে নি সে। ভেবেছিলো পাড়ার মধ্যেই দু-চার স্টপ এদিক- ক। একটা রিক্‌শ নিয়েই ফিরে যেতে পারবে, বাড়ি গিয়ে ভাড়া দিয়ে দেবে। কিন্তু এই র্তে, এই পরিবেশে, ভবানীপুরের প্রায় শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গা ছমছম করলো তার। সাড়ে- টা বাজতেই যে-শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, দশটা বাজতেই সে-শহর ঝিমিয়ে সে। আর তার মধ্যে রাত এগারোটার রাস্তা তো মরে গেছে বলতে হবে। যেটুকু স্পন্দন সে লাইটপোস্টের তলায় অবসরান্তে ভৃত্যদের গোল হয়ে বসে তাদের আড্ডা, নয়তো াচরদের পানের দোকানে ভিড়। একা-একা বুক পেতে শুয়ে থাকা ইস্পাতের ট্রাম লাইনটার গর দেহের দিকে তাকিয়ে মানসীর বুকের ভেতরটা যে কেমন করলো, ইচ্ছে করলো খানেই বসে বড়ে, ইচ্ছে করলো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, ইচ্ছে করলো যেদিকে দু-চোখ । চলে যায় সেদিকে, গঙ্গার জলে ডুবতেও ইচ্ছে করলো বৈকি। আরো যে কত কিছু ইচ্ছে লো অন্ত রইলো না কোনো। কিন্তু মানুষ ইচ্ছার অধীন নয়, দুঃখের অধীন নয়, বুদ্ধিরই ন। সেই বুদ্ধি দিয়েই মানসী ভাবতে লাগলো এখন কী উপায়ে বাড়ি ফিরতে পারে। ভাঙা পালছেঁড়া ফুটো নৌকোর মতো উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে যতদূর চোখ চলে ততোদূর একবার রে একবার দক্ষিণে তাকাতে লাগলো বিহ্বল চোখে, কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারলো না। পক্ষা করলে হয়তো বা দু-একটা ফিরতি ট্রাম বাস ধরা যেতো, উপায় নেই। পয়সা নেই ত। একা ট্যাক্সি করে যাবার মতোও সাহস নেই। রিকশই বা কই? আর এতোদূর রাস্তা করে? ভয়ে-ভয়ে পা ফেলতে লাগলো সামনের দিকে। একজন পথচারী চলে গেলো

পাশ ঘেঁষে, একটা লরি চলে গেলো প্রায় চাপা দিতে-দিতে। ঘুমিয়ে থাকা কুকুরগুলোর এ
সহসা জেগে উঠে দারুণ চ্যাঁচাতে লাগলো, ঘুম ভেঙে বাবরি-চুলো লোক উঠে বসে দুই থা
ঠাণ্ডা করলো তাকে। আবার সুমসাম। আর তারপরেই ঠিক পিছনে একটা মানুষের নিঃ
পদক্ষেপ অনুভব করে পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠলো। 'কে! কে!' ভ
কম্পিত গলার চাপা-চাপা আওয়াজ ভেসে গেলো বাতাসে। পিছনের অনুসরণকারী লো
সামনে এসে দাঁড়ালো মাথা নিচু করে, 'ভয় পেয়েছেন?' জনহীন নীরব রাস্তা তার নরম গ
গলার আওয়াজে যেন গুমগুম করে উঠলো। শিহরিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো মানসী,
নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে উঠলো, তাকালো বড়ো-বড়ো চোখে। পরমুহূর্তেই তীব্র ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁ
বললো, 'আপনি! আপনি এসেছেন কেন?'

'দোষ হয়েছে?'

'আমাকে অসম্মান করবার কোনো অধিকার নেই আপনার।'

'কোনো অধিকারের দাবি নিয়ে আমি আসি নি।'

'তবে কী চান?'

'আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো।'

'না।'

'কেন?'

'আমি নিজেই যেতে পারবো।'

'পারবেন না।'

'পারবো, পারবো! আপনি যান।'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'হোক।'

'পথ নির্জন হয়ে গেছে।'

'জানি।'

'সঙ্গে পয়সা নেই।'

'তাতে আপনার কী?'

'আমার!' দুটি সজল চোখ নির্মল আকাশে তুললো, 'না, আমার আর কী।'

'তবে যান।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো নির্মল। এক মুহূর্ত দু-জনেই চুপ। একটা খালি ট্যাক্সি যেতে-
মন্থর হলো তাদের দেখে। মানসীর অনুমতি না-নিয়ে সেটাকে হাত বাড়িয়ে থামালো নি
ক্লান্ত গলায় বললো, 'উঠুন।'

'না।'

'বলুন, কোথায় যেতে হবে।'

'না।'

'গাড়িটা থামালাম—'

'আমি বলি নি।'

'আপনি বলবেন, সে ভাগ্য নিয়ে আমিই কি এসেছি সংসারে?'

'ভাগ্য!' ঘাড় হেলিয়ে বাঁকা চোখে ঠিক টুনির মতো করেই তাকালো মানসী, 'দয়া
ভাগ্যের দোহাই দেবেন না। ওটা পুরুষের লক্ষণ নয়।'

হয়তো তা-ই।'
হয়তো নয়। সেটাই সত্যি।'
তর্ক থাক।' মাথার চুলে নির্মল আঙুল ডোবালো, 'মিছমিছি দেরি হচ্ছে।'
আপনি যান না।'
আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাবো।'
আপনার সঙ্গে আমি যাবো না।'
'কেন?'
'সে কৈফিয়ৎ আপনাকে আমি দেবো না।'
'আমার সঙ্গে একা যেতে কি আজ আপনার ভয় করছে?'
'ভয়!'
'লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না চেহারা দেখে?'
'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথাই ওঠে না।'
'আত্মসম্মানে আঘাত লাগছে?'
'আঘাত লাগবে কেন?'
'একটা খাকি প্যান্ট-পরা বাস কণ্ডাক্টর—বাড়িতে বলবে কী, না?'
'নিজেকে ছোটো করতে লজ্জা হয় না?'
'লজ্জা! লজ্জা থাকলে কি আর এখানে এসে দাঁড়াই?'
'এখানে এসে দাঁড়ানোটাতেই আসল লজ্জা, আসল দুঃখ, না?'
'বাজে কথা থাক। আমি বড়ো ক্লান্ত, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে যাই।'
কে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তো আপনার নয়।'
'আর কোনো দায়িত্ব না থাক, আমি পুরুষ, সে-হিসেবে এই দায়িত্বটা নিশ্চয়ই আছে।'
'ও, সেই হিসেবে। নারীরক্ষা-সমিতি খুলেছেন বুঝি ?'
'যা মনে করেন।'
'মনে করবো কেন। যা সত্য, তা-ই।'
অদূরে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো নির্মল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ।, 'তাহলে আমার দরকার নেই কোনো?' বেদনায় ভারি হয়ে উঠলো তার গলা।
মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধস্বরে মানসী বললো, 'না।'
তবু কী জানি কেন দাঁড়িয়ে রইলো নির্মল। কয়েক মুহূর্ত যেন পৃথিবীতে একটা দপতনের শব্দও শুনতে পেলো না সে। মাথার উপর অনন্ত আকাশের অজস্র তারায় নিজের অস্তিত্বটা মুছে দিতে চেষ্টা করলো ভবানীপুরের এই লম্বা রাস্তাটা থেকে। পরে প্রায় দীনের আকৃতি নিয়ে বললো, 'একটা কথা ছিলো।'
'কী কথা? আমার সঙ্গে আর আপনার কী কথা থাকতে পারে?' মানসীর গলা থরোথরো নালো।
'পারে না, না? ঠিক বলেছেন।' একটু থেমে, 'এতো বছর ধরে নিজের স্ত্রীকে যত কথা বার জন্য সাজিয়ে রেখেছিলাম—'
'কী! কী বললে—'
'সে-সব আজ পরের স্ত্রীকে বলি কী করে? তার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও যে অনেক লা।'
'পরের স্ত্রী!'

'কিন্তু টুনি—' অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামটা কেমন করে উচ্চারণ করে ফেললো নির্মল। সেই ডাক শুনে বুকটা থরথর করে উঠলো মানসীর। রাগ অভিমান সব ভুলে ব্যাকুল ' বললো,, 'টুনি! এতোক্ষণে নামটা মনে পড়লো তোমার?'

দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে নির্মল মৃদু হেসে বললো, 'বরং জিগ্যেস করতে পারো এ ছাড়া এতগুলো বছর আর আমার কী মনে পড়েছে।'

অভিমানে বুক গলা ভারি হয়ে গেলো মানসীর, 'থাক, সে-খবর আমি জানতে চাই

'তাও আমি জানি।' নির্মলের গলাও ভারি শোনালো, 'আজ সকালে তোমার স্বামী ত বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি এনেছেন—'

'আমার স্বামী!'

'হয়তো তোমারও ভালো লাগে নি আমার কাল রাত্তিরের বিচলিত ব্যবহার, কিন্তু জেনো, তোমার সুখের সংসারে আমি কোনোদিন, কখনো এতোটুকু বাধা হবো না।'

সহসা শিশিরের উপর রোদের ঝলকের মতো মানসীর ঝাপসা চোখে এক ফোঁটা টলটল করে উঠলো। মেঘ সরে গিয়ে মস্ত দিগন্তজোড়া নীলাকাশ এক মুহূর্তে উদ্ভাসিত গেলো তার কাছে। মৃদু হেসে চুপ করে তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে।

রাস্তা থেকে ফুটপাথে পা দিলো নির্মল, 'তাহলে বিদায় দাও, যাই।'

দ্রুত পায়ে তাকে অনুসরণ করলো মানসী, 'আর আমি?'

'তুমি! তুমি কী?'

'আমি কী করবো বলে দাও।'

নির্মল অপলকে মানসীর মুখের দিকে তাকালো এবার। তাকিয়েই রইলো। সহসা দুরন্ত ভালোবাসার আবেগে তার পুরুষ-বুক যেন ভেঙে যেতে চাইলো। কিন্তু ঢেউটা স বয়ে যেতে দিলো সে। অবসন্ন গলায় বললো, 'তবু তোমাকে দেখলাম। দেখতে প বোঝাপড়া হয়ে গেলো একটা।'

'বোঝাপড়া! এতো বছরের দেনা-পাওনার হিসেব কি এতোই সহজ?' মানসীর (গলা ঠিক টুনির মতোই সলজ্জ শোনালো।

'সহজ আর কোথায়।' নিঃশ্বাস নিলো নির্মল, 'কী কঠিন মূল্য যে আজ আমি তে দিলাম তা তুমি কোনোদিন বুঝবে না।'

মানসী ট্যাক্সির দরজা খুলে ভেতরে উঠে এলো, বুকের অন্ত্রীতন্ত্রী যেন ছিঁড়ে নির্মলের। চকিত হয়ে প্রায় আর্তস্বরে বললো, 'যাচ্ছো?'

'যাবো না?'

'ট্যাক্সি নিয়ে?'

'হেঁটে যাবো।'

'একা!'

'এই ফাল্গুনের রাত্তিরে রাস্তার হিমে দাঁড়িয়ে অত কথা আমি বলতে পারবো না, গ এসো।'

'আমি?'

'তবে আর কে আছে এখানে?'

'ও।'

'আর পৌঁছে দেবার মতো আপাতত হাতের কাছে যখন আছেই একজন, তখন আর করে একাই বা যাই কেন?'

কী জানি কী মর্জি। কিছু না বলে ধীরে-ধীরে উঠে এলো নির্মল। হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি তার ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু অন্ধকার গাড়ির স্তব্ধতায় পাশাপাশি বসে আবার স্মৃতির পিঁপড়েরা তাকে দংশন করতে লাগলো। আবার পানাভরা পুকুরের টলোমলো জল, তীরের আম, জাম, জামরুলের ঘন ছায়া, বন-তুলসীর ঝোপ, দুপুরের রোদ, বিকেলের গোধূলি, কত শত মেঘের দিনের লুকোচুরির লীলা।

'কিছু বলছো না—' কখন যেন মানসী শরীরের সমস্ত উত্তাপ নিয়ে সরে এসেছে কাছে। তার নরম গলা বুকের মধ্যে ছুঁলো। নির্মল জানালা দিয়ে চলন্ত রাস্তা দেখলো, জবাব দিলো না।

'বলো।' মানসী প্রায় ফিসফিস করলো।

'কী বলবো?'

'কোনো কথা নেই?'

'না।'

'কেন?'

'বলেছি তো—'

'কী বলেছো?'

'অন্যের স্ত্রীর কানে বলবার মতো কথা আমার জানা নেই।'

'কিন্তু অন্যের স্ত্রী-ই যদি রাদ দুপরে বেরিয়ে আসতে পারে সে-কথা শোনবার জন্য, তাহলে তোমার বলতে বাধা কী?'

'সেটাই আসল বাধা।'

'সত্যি কথা বলো যে আমার জন্য আর তোমার মনে কিছু নেই।'

মুখ ফেরালো নির্মল, 'আর যা-ই হই, আমি লোভী নই টুনি।'

'এখানে লোভের প্রশ্ন কোথায়?'

'বোঝো না?'

'না।'

'এই ক্ষণিক বুদ্‌বুদে আমার কিসের সুখ। শুধু এই মুহূর্তটুকুতে আমার অনন্ত ক্ষুধার কতটুকু তৃপ্তি?'

চোখে বিদ্যুৎ হানলো মানসী, 'ক্ষণিক কেন? ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তটুকুকেই তো তুমি অনন্তকালে পরিণত করতে পারো।'

'পারি নাকি?'

'এই গাড়ি তুমি তোমার বাড়ির দিকে ফেরাতে পারো না?'

'ছি!'

'ছি কিসের?'

'শেষে আমি চুরি করবো? তোমাকে!'

'দোষ কী।'

'একজন ভদ্রলোক হয়ে আর-একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে পালাবো?'

'সে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে—'

'তাহলেও না।'

'তাহলেও না?'

'না।'

'কেন?'

'মানুষের বুকের তলায় একটা হৃদয় থাকে টুনি, মানুষ শরীরসর্বস্ব নয়।'

'যুক্তিটা ঠিক হলো না। ভালোবেসে ছিনিয়ে নেওয়াই পুরুষের কাজ।'

'স্বীকার করছি সে-পৌরুষ আমার নেই।'

'যোগ্যতাও নেই।'

'না, তাও আমার নেই। তোমার শরীর ঘিরে আজ যে-আরাম, যে-স্বাচ্ছন্দ্য আর যে-তৃপ্তি ছড়িয়ে রেখেছেন তোমার স্বামী, নির্মল কণ্ডাক্টরের সাধ্য কী তা তোমাকে দিতে পারে?'

'তুমি ভীরু।'

'হয়তো।'

'কাপুরুষ।'

'হয়তো।'

'আসলে এ-সব সুনীতি তোমার আমাকে এড়াবার যুক্তি।'

হাসলো নির্মল, 'তাহলে তো আজকের এই অসহ্য সময়গুলোর হাত থেকে অন্তত রক্ষা পেতে পারতাম। কিন্তু আর কতদূর তোমার বাড়ি। আমি আর পারছি না।'

'তবে তুমি এলে কেন আমার সঙ্গে?'

'তুমি ভুল করে পয়সা নিয়ে আসো নি।'

'না-ই বা এনেছিলাম।'

'কত রাত হয়ে গেছে, একা-একা—'

'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমন তো কত রাত, কত দিন আমার শূন্য হাতে একা পথে কেটেছে নির্মল, তুমি কোথায় ছিলে?'

'ছিলাম। তোমার সঙ্গেই ছিলাম।' নির্মলের পুরুষ-গলা হাহাকারে ভরে উঠলো, 'তোমাকেই পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম দেশ থেকে দেশান্তরে, পথে ঘাটে ফুটপাথে।'

'আমাকে?'

'তোমাকে। শুধু তোমাকে।'

'আমাকে তবে তুমি ভুলে যাও নি?'

'ভুলবো!'

সহসা মানসী নির্মলের সারাদিনের খাটুনিক্লান্ত ধূলিধূসরিত দু-খানা হাত টেনে নিলো নিজের নরম স্নিগ্ধ হাতের মুঠোয়, 'আর এতোদিনে দেখা হলো?'

'এতোদিনে।'

'আর তারপর?'

'তারপর!' জলভরা চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো নির্মল, 'তারপর আশাটুকুও গেলো। এতোদিনে আমি সব রকমে কাঙাল হলাম, টুনি।'

এ-কথা শুনে বুক ভরা কত দুঃখের পাষাণ আজ গলে গেলো টুনির। অসহ্য কান্নার বেগে কোলের উপর ভেঙে পড়ে বললো, 'দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো, সব আশা সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি আজও তোমার পথ চেয়ে বসে আছি কিনা।'

এলো খোঁপা খুলে গেলো মানসীর,—ঘন কালো চুল ছড়িয়ে গেলো চারপাশে। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো নির্মল। তারপর সেই চুলের অরণ্যে মুখ ডুবিয়ে কখন যেন ডেকে উঠলো, 'টুনি। আমার টুনি! টুনি পাখি আমার।'

মনোলীনা

লাময়ীর ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু বিকাশবাবু বর্মা-চুরুটে টান দিতে-দিতে আধশোয়া অবস্থায় ালেন, 'সে কি হয়?'

'কেন হবে না—' লীলাময়ী একদিকের ভুরু বাঁকালেন।

'নাও—তক্ক কোরো না, যা উচিত তাই এখন করো গিয়ে।'—এই বলে বিকাশবাবু পাশ রে শুলেন। লীলাময়ী একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'বেলা বাজলো পাঁচটা, এখনও মুড়ি য় পড়ে থাকবে নাকি? গেলে তো আর একা-একা আমিই যাবো না—তুমিও তো যাবে?'

মুহূর্তে তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমি! আমি যাবো কেন?'

'তোমারি তো ব্যাপার।'

'দ্যাখো—সপ্তাহে একটা দিন ছুটি পাই—সে-দিনটা প্যানপ্যান করে মাটি করে দিয়ো —শুয়ে থাকবো যতক্ষণ খুশি। আর আমি যাবো না বলেই তো তোমাকে যেতে বলছি।'

'তবে আমিও যাবো না', লীলাময়ী নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে বসলেন একটা চেয়ারে।

হঠাৎ বিকাশবাবু লাফ দিয়ে উঠে বসে উত্তেজিত ভাবে চোখ কুঁচকে বললেন, 'যাবে না নে? আমি বলছি যাবে—নিশ্চয়ই যাবে।'

স্বামীর এই কর্তৃত্বের সুরে লীলাময়ীর চোখে দপ্ করে যেন আগুন জ্বলে উঠলো, নিকক্ষণ সেই উদ্ধত অভদ্র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তীব্র দৃষ্টিতে, তারপর উঠে গেলেন খান থেকে।

বিয়ে হচ্ছে তাঁর স্বামীর অধীনস্থ এক যুবক কর্মচারীর। ছেলেটিকে তিনিও দেখেছেন বার—সুন্দর চেহারা, কথাবার্তায় একটা নম্র ভদ্র ভঙ্গি, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ। কিন্তু এ-স্ত সামাজিক ব্যাপার তাঁর ভালো লাগে না! অথচ যতই তিনি এড়িয়ে চলতে চান স্বামী তই জবরদস্তি শুরু করেন। এই সুদীর্ঘ বারো বছর ধরে কী করে যে তিনি তবুও ওঁর চ্ছমতো চলাফেরা করছেন সেটা এক পরম আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী, বহুমূল্য বসন-ষণ আছে—এ-কথা প্রচার করাই যেন বিকাশবাবুর উদ্দেশ্য—তিনি যে স্ত্রীকে অতিশয় ালোবেসে সব জায়গায় নিয়ে যান—তাঁর মনের আসল কথা সেটা নয়—স্ত্রীকে তিনি একটা ল্যবান সামগ্রী মনে করেন এবং সেটা পাঁচজনকে না দেখালে কি চলে? লীলাময়ীর কোনো চ্ছাই সেখানে খাটে না।

বশেষে সেজেগুজে (স্বামীর পছন্দমতো শাড়ি গয়না পরে) তাঁকে যেতেই হ'লো সেই লেটির বিয়েতে। তিনি গিয়ে পৌঁছতেই অভ্যর্থনার আতিশয্যে বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ যেন অধীর য় উঠলো। বিকাশ আপিসের বড়োকর্তা, অতএব সেই সম্মান তো লীলাময়ীরও প্রাপ্য। কজন বয়স্ক ভদ্রলোক রীতিমতো খোসামুদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে, বড়োবাবুর স্ত্রী সেছেন—ডাক্-ডাক্—সুনীলকে ডাক্।' বেচারা মাত্রই দুদিন যাবৎ বিয়ে করেছে, নিশ্চয়ই

এতক্ষণ স্ত্রীর আশেপাশেই ঘুরঘুর করছিলো, 'বড়োবাবুর স্ত্রী এসেছেন' এ ডাক কানে ে
সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাইরে—কৃতজ্ঞতা জানালো কষ্ট করে আসবার জন্য
বিকাশ আসেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করতে-করতে সে তাঁকে নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

প্রকাণ্ড হলঘরের মাঝখানে নতুন বধূ বসে আছে। চারপাশে স্ত্রীলোকের ভিড়। লী
একটু অস্বস্তি বোধ করে থমকে দাঁড়াতেই ছিপছিপে এক বিধবা ভদ্রমহিলা এগিয়ে
কাছে, মৃদুস্বরে বললেন, 'আসুন এখানে—সুনীলের বৌ তো আপনাদেরই বৌ—'

সহাস্যে লীলাময়ী বললেন, 'সে তো বটেই, আপনিই বোধহয় সুনীলের মা?'

ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন।

'চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য।'

'তা তো হবেই—আমারি তো ছেলে—কিন্তু আমার বৌমাও যে ঠিক আপনার
দেখতে।—আপনাকে দেখে আমার অবাক্ লাগছে—মনে হয় যেন মা আর মেয়ে।'

লীলাময়ী ক্ষণকাল তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বৌ'র কাছে এগিয়ে গেলেন।

লাল-টুকটুকে বেনারসি আবৃত বধূ ওড়নার তলা থেকে মুখ তুলে তাকালো লীল
দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে স্তব্ধ বিস্ময়ে লীলাময়ী পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন সেখানে। এ মু
ভোলবার? কেউ ভুলতে পারে? এর স্পর্শ, এর সৌরভ এখনো তো সারা দে
মাখামাখি। মাত্র বারো বছরের ব্যবধানে এর স্মৃতি কতটুকু ফিকে হয়েছে লীলাময়ীর জী
সেই শূন্য কোল, শূন্য বুক তো আজও হাহাকারে ভরে আছে এই মুখখানারই জন্য। লীল
চোখে আর সব মুছে গিয়ে ঐ একটি মানুষই তার সমস্ত সত্তা নিয়ে ভেসে রইলো সে
অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ দিয়ে—স্বপ্নাবিষ্টের মতো তি
ভেঙে বসলেন বধূর সামনে, তারপর নিজের গলা থেকে বহুমূল্য হীরের কণ্ঠি খুলে
দিলেন ওর গলায়—মাথাটা যথাসম্ভব কাছে টেনে এনে অস্ফুটে আশীর্বাদ উচ্চারণ
নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সমবেত স্ত্রীলোকেরা অবাক্ হয়ে তাঁর গতিবিধি দেখলেন, তারপর ফিসফাস করে
মনোনিবেশ করলেন। নতুন বধূর মনে হতে লাগলো, এ মুখ সে আরো দেখেছে—এ
যেন তার চিরকালের চেনা। ....

অনেকদিন আগে—সত্যশরণের যখন বিয়ে ঠিক হলো তখন তার একমাত্র অভি
মাসিমা বললেন, 'বড়োমানুষের মেয়ে ঘরে আনবি, সতু, তার পা রাখবার যোগ্যও ে
এ-বাড়ি।'

সত্যশরণ হেসে বললো, 'তুমি বলো কী, মাসিমা—পা তার পড়ুকই এ-ঘরে—
নন্দন-কানন হয়ে যাবে দেখো।'

'তা আর হয়েছে!'

'আগে থেকেই তোমরা সব জেনে রাখো, না?'—সত্যশরণ দুঃখিত হয়ে ব
'বড়োমানুষের মেয়ে যেমন, তেমনি মহৎ মানুষেরও তো মেয়ে—'

মাসিমা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব আঁচ করে বললেন, 'হ্যাঁ, সে তে
কথাই—তবে হাজার হোক, অভ্যেস বলে একটা জিনিস আছে তো?'

সত্যশরণ বললো, 'আমার বাবা তো বড়োমানুষ ছিলেন না, আমার মা তো অত বড়ো জমিদারের মেয়ে ছিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যও মা বাবাকে অসুখী করেন নি।'

'সে তো ঠিকই'—মাসিমা অন্য কাজে লিপ্ত হলেন!

সত্যশরণের শ্বশুর আনন্দবাবুকে রীতিমতো ধনী বলা যায়। হঠাৎ কেন যে তিনি সত্যশরণের মতো অমন দরিদ্রকে কন্যার পতিরূপে বরণ করলেন সে-কথা ভাববার বিষয় বটে। তিনি বললেন, 'অনেক দেশ ঘুরলাম, অনেক লোক দেখলাম, কিন্তু সত্যশরণের মতো সব দিক্ দিয়ে এমন উজ্জ্বল ছেলে আর দেখলাম না। আমার টাকা আছে তা আমি প্রচুর দিতে পারবো মেয়েকে, কিন্তু একটা মানুষকে তো আর আমি মনুষ্যত্ব দিতে পারবো না। মানুষ যখন পেলাম, তখন তাকে গ্রহণ করবো না—এত নির্বোধ আমি নই।'

সত্যশরণের শ্বশুরবাড়ির আর সকলেই আপত্তি জানালো। শাশুড়ী বললেন, 'এ তোমার কোন্-দিশি খেয়াল, সামান্য একটা মাস্টারের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দেবে! ওর ঘরে নেই খাবার, মাথায় নেই চাল, একেবারে হাড়হাভাতে বলতে যা বোঝায়—'

আনন্দবাবু বললেন, 'দ্যাখো বৌ, অমন কথা বোলো না। এইটুকু বয়স থেকে সে নিজের পায়েই চলে বেড়াচ্ছে, তার পা শক্ত। নিজের যোগ্যতায় সে একদিন বড়ো হবেই। ধনী হিসেবে না হোক, মানুষ হিসেবে সে এখনো সাধারণের অনেক উঁচুতে।'

'মানলুম, কিন্তু পেট ভরা না থাকলে তো আর উঁচু মানুষ দেখে দিন যাবে না?'

'কেন? আমি আছি কী করতে? আর সেও তো অসমর্থ নয়, মাসের শেষে তো সে উপার্জন করছেই।'

শাশুড়ী মুখ ভার করে বললেন, 'যা খুশি করো গিয়ে। আমি বলে দিলুম এ তুমি ভুল করছো।'

আনন্দবাবু আপন মনে তামাকে টান দিতে লাগলেন, স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য করলেন না।

একটু চুপ করে থেকে শাশুড়ী বললেন, 'তা ছেলেটিকে একবার আমাকে দেখাবে তো, না সেটুকু অধিকারও আমার নেই?' কথাটা তিনি অত্যন্ত অভিমানভরেই বললেন।

আনন্দবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'ছেলেবেলাকার অভ্যেসটা এখনো আছে দেখছি।'

'ঠাট্টা কী, তোমার যেমন রকম সকম দেখছি—'

আনন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন, অস্থির হচ্ছো কেন? সামনের রোববার ও আসবে লিখেছে, লীলাকে দেখে যাবে।'

এদিকে সত্যশরণের মাসিমাও খুঁতখুঁত করতে লাগলেন : 'কী রে, মেয়েটিকে আমাকে দেখাবি তো, না সেও তুই নিজেই ঠিক করবি!'

সত্যশরণ হেসে বললো, 'ঠিক তো আমি নিজেই করবো, মাসিমা, কিন্তু তোমার অমতে অপছন্দে তা হবে না।'

'তুই দেখেছিস নাকি মেয়ে?'

'দেখেছি।'

'কোথায় দেখলি?'

'রবিদের বাড়ি।'

'রবি!'

'রবিকে তোমার মনে নেই?—আমার সঙ্গে পড়তো, কত তো এসেছে আমাদের বাড়ি।'

'ও, রবি মিত্তিরের কথা? মনে আছে বইকি। মস্ত মোটরে চড়ে আসতো ছেলেটি। ওদের আত্মীয় নাকি ওরা?'

সত্যশরণ মাথা নাড়লো, একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আনন্দবাবু রবির কেমন কাকা হন। ওখানে প্রায়ই ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখাশোনা হয়েছে, ওঁর মেয়েও আসতেন মাঝে-মাঝে, আমি তাঁকে দেখেছি কিন্তু তিনি আমাকে দেখেননি বোধ হয়।'

'কিন্তু সে-দেখা তো দেখা নয়? একদিন তো পাকা দেখতে হবে? আর বড়োমানুষের মেয়ে, একটু-আধটু সোনাদানাও হাতে নিয়ে যেতে হবে।'

'সোনা? কেন? সোনা পাবো কোথায়?' সত্যশরণ আকাশ থেকে পড়লো।

'সে কী কথা। পাকা দেখা নাকি শুধু হাতে হয়?'

'পাকা কথা আমি দিয়েই দিয়েছি রবিকে। পাকা দেখার আবার দরকার কী। আনন্দবাবু রোববার যেতে লিখেছেন তোমাকে নিয়ে। যাবো। ও-সব পাকা-ফাকা হবে না।'

মাসিমা ছেলের নির্বুদ্ধিতায় না-হেসে পারলেন না। বললেন, 'নে তোর আর বুদ্ধি ফলাতে হবে না। স্কুলে যাবার পথে নবীন স্যাকরাকে একবার পাঠিয়ে যাস।'

'ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না', সত্যশরণ বেলার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো।'

'হবে-টবে না' সে বললো বটে, কিন্তু স্কুলে যাবার পথে ঠিক স্যাকরাকে যাবার জন্য তাড়া দিয়ে গেলো। তারপর পথ চলতে-চলতে কী কথা মনে হয়ে কর্ণমূল তার লাল হয়ে উঠলো।

লীলাকে প্রথম দিন দেখেই সত্যশরণ মুগ্ধ হয়েছিলো। কেন হয়েছিলো তার কি কোনো নির্দিষ্ট কারণ আছে? সৌন্দর্যের প্রতি তার কোনো আসক্তি আছে এ-কথা সে কোনোদিন স্বীকার করে না। কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব যখনই বিয়ে করতে উদ্যত হতো তখনই তারা সুন্দর মেয়ের খোঁজ করতো। আর এই ব্যাপারটা তার মনকে এমন আহত করতো যে, সে বন্ধুদের এ নিয়ে কত সময় কত রূঢ় কথা পর্যন্ত বলেছে। একজন মানুষ কি কেবল নাক-মুখ-চোখ আর রং দিয়েই সুন্দর হবে নাকি? সৌন্দর্যের কি আর-কোনো সংজ্ঞা নেই? অথচ তার যুবক-চিত্তকে প্রথম যে মেয়ে অমন সজোরে নাড়া দিলো, সে মেয়ে সত্যিই সুন্দর। কিন্তু এতে তার কোনো হাত ছিলো না।

এম. এ. পাস করবার পরে কলকাতার কাছাকাছিই একটা ছোটো শহরে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ সে পেয়েছিলো। মাসিমার একান্ত অনিচ্ছা ছিলো। তিনি বললেন, 'এত ভালো পাস করলি, একটু দেরি করলে নিশ্চয়ই এখানেই কোনো কলেজে চাকরি পেতিস।'

'পেলেই বা কী লাভ হতো, মাসিমা', সত্যশরণ মাসিকে বোঝালো। 'কলেজের মাইনেই কি আর এর চেয়ে বেশি হতো!'

'নাই বা হতো—তবু তো একটা সম্মান! একটা স্কুলের মাস্টারি, আর একটা কলেজের প্রোফেসারি!'

উচ্চকণ্ঠে সত্যশরণ হেসে উঠলো, মাসিকে আদর করে বললো, 'মাসিমা গো—তোমার তো অত আমার লোক-দেখানো সম্মানের বাসনা নেই। আর তা ছাড়া এই অল্প টাকায় লকাতায় আমরা থাকবোই বা কেমন করে। মফস্বলেই আমাদের ভালো—কেমন সহজ, চ্ছল—'

মাসিমা এবার টিপ্পনী কাটলেন, 'কিন্তু তোমার সব প্রাণের বন্ধুরা? তাদের নইলে তো ামার একবেলা কাটে না—'

'কী আর করা—' নিরুপায় কণ্ঠে সত্যশরণ বললো, 'রোজকার দৈন্যের চেয়ে তো লো?'

তারপর চাকরি নিয়ে মফস্বলে সে এলো বটে, কিন্তু শনি-রোববার কলকাতা না এসে কতে পারতো না। কলকাতা থাকতে আগের আড্ডাটা জমতো তার বাড়িতেই, এখন আড্ডার ন্দ্রটা হলো রবির বাড়ি। এইরকম এক শনিবারের বিকেলেই সে রবিদের বাড়িতে লাময়ীকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। উপরের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলছিলো কার ঙ্গে; তার সেই ভঙ্গিতে কী ছিলো কে জানে, সত্যশরণের হঠাৎ যেন কেমন করে উঠলো কের মধ্যে। কিন্তু ব্যাপারটা চুকে যেতো এখানেই, যদি না ঠিক সেদিনই আনন্দবাবুর সঙ্গে র আলাপ হতো। এর পরে আরো দুতিনবার তার দেখা হলো আনন্দবাবুর সঙ্গে এবং রবির খে সে শুনলো আনন্দবাবু বলেছেন—এমন সচ্চরিত্র বুদ্ধিমান ছেলেকে যদি তিনি জামাই রতে পারেন তাহলে এক্ষুণি, এই মুহূর্তে রাজী আছেন।

সত্যশরণ কথাটা শুনে চকিতে রবির দিকে তাকালো, তারপর চোখ নিচু করে বললো, র চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কী হতে পারে—'

রবি ঠাট্টা করলো, 'ওরে বাবা, তুমি দেখছি হাত বাড়িয়েই আছো!'

সত্যশরণ লজ্জিত হলো এবং এতক্ষণে তার মনে হলো এটা রবির একটা কৌতুক।

রবি আবার বললো, 'তুমি লীলাকে দেখেছো?'

জবাবটা কিন্তু নিতান্তই সহজ, তবুও সত্যশরণ থতমত খেয়ে গেলো।

'দেখেছিলাম। কিন্তু সে তো নেহাতই দৈবাৎ।'

'ও, তাই বলো।' রবি দেশলাইর উপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বললো, 'তা নইলে এমন াটের উপর এসে থাকে জবাব! ভালো, বলবো কাকাকে।'

সত্যশরণ এবার রবির দু'হাত চেপে ধরলো। চোখে-মুখে তার কাতরতা ফুটে উঠলো, াকুতি করে বললো, 'কী-সব বাজে বকছো—কক্ষনো বোলো না—বলো বলবে —বলো—'

রবি হেসে বললো, 'না-বললে চলবে কেমন করে—কাকা যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন া একটা জবাব দিতেই হবে—'

'জিজ্ঞেস করবেন? না ভাই, সত্যি করে বলো—'

'আঃ, কী যন্ত্রণা! সত্য, তুমি এবার সত্যই প্রেমে পড়েছো। নইলে এতো বোকা হয়ে যাও? ালিকে বলতে হবে, সে একটি জিনীয়স; তোমার মতো একটি গ্রন্থকীটকেও সে এমন চঞ্চল রেছে, সে তো বড়ো সোজা কথা নয়—

এই গেলো বিবাহের ভূমিকা।

বিয়ে-টিয়ে চুকিয়ে যখন সত্যশরণ বৌ নিয়ে নিজের বাড়িতে এলো—তখন সে বুঝলো যে এখানে বিয়ে করাটা তার সতিাই ভুল হয়েছে। লীলার চেহারার সঙ্গে তার চরিত্রের কোনো সাদৃশ্য ছিলো না। সে নিষ্ঠুর ছিলো, জেদী ছিলো, স্বামীর ঘরবাড়ি দেখে সে বীতশ্রদ্ধ হলো আর তাই নিয়ে স্বামীর মনে ব্যথা দিতেও সে কার্পণ্য করলো না। অন্তরের মধ্যে ভারি একটা বেদনাবোধ আকুল করে তুললো সত্যশরণকে। কোনো এক সময় নিভৃতে স্ত্রীর ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে সভয়ে বললো, 'লীলা, আমার উপর তুমি অবিচার করছো, আমি তো আমার দারিদ্র্য কখনও গোপন করিনি—'

লীলা জবাব দিলো না। সত্যশরণ আরো একটু কাছে সরে এলো, সাগ্রহে কম্পিত হাতে সে লীলার হাত স্পর্শ করে বললো, 'আমি বুঝেছি এখানকার কিছুই তোমার ভালো লাগছে না, কিন্তু আমার কী দোষ! আমি যদি জানতাম গরিবকে তুমি ঘৃণা করো, আমি কক্ষনো বিয়েতে মত দিতুম না।'

লীলা আস্তে-আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেলো। সত্যশরণ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তৈরি হতে গেলো স্কুলের জন্য। গিয়েও মনটা এমন ভার হয়ে রইলো যে ভালো করে পড়াতে পারলো না এবং ছুটি হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ পরে বাড়ি ফিরলো। বাড়ি ফিরে সে চা খেলো, কিন্তু খাবার-টাবার যেমন তেমনই পড়ে রইলো। মাসিমা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'এ কী, কিছুই খেলিনে যে?' মলিন হেসে সত্যশরণ বললো, 'না, মাসিমা, একদম খিদে নেই।'

'কেন, কী হয়েছে? সেই সাত-সকালে কী দু'টি মুখে দিয়ে গিয়েছিস, আর এই এতক্ষণে এলি, এখনো তোর খিদে পেলো না?' মাসিমা চিন্তিত মুখে সেখান থেকে উঠে গিয়ে লীলাকে পাঠিয়ে দিলেন।

লীলাকে দেখে সত্যশরণ অবাক্ হয়ে গেলো। বাড়িতেও যে মেয়েরা এরকম সেজে থাকে এ-ধারণা তার ছিলো না। দামী শাড়ি সে ঘুরিয়ে পরেছে, মুখে পাউডারের গাঢ় প্রলেপ, পায়ে লাল-টুকটুকে জরির কাজ করা চটি। সে কাছে আসতেই সত্যশরণ মুখ নিচু করলো।

পরিষ্কার গলায় লীলা বললো, 'খেলে না যে?'

'খিদে নেই—'

'না, খিদে নেই, এ কখনো হয়? সেই দশটার সময় খেয়ে গেছো আর এখনো তোমার খিদে নেই?'

হঠাৎ সত্যশরণের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। লীলার গলায়ও তাহলে মাসিমার কোমলতা আছে? মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'তুমি বলছো খেতে?'

লীলা হেসে ফেললো, 'কী মুশকিল, বলছি না তো কি ঠাট্টা করছি নাকি? নাও—খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সব।'

'তুমি খেয়েছো?'

'খেয়েছি।'

'কী খেয়েছো?'

'কী আবার খাবো, তুমি যা খাচ্ছো তাই খেয়েছি।'

'তা হোক, আমার সঙ্গে আবার খাও।'

'পাগল!'

তা নইলে আমি খাবো না।'
য়ৌবনের একটা ধর্ম আছে। এই দারিদ্র্যের জন্য লীলা সত্যশরণকেই দায়ী করে বটে এবং শরণকে সে প্রতারক মনে করে ক্ষুব্ধ হয় তাও সত্য, কিন্তু সত্যশরণের স্নেহভরা অভিমান উপেক্ষা করতে পারলো না। সকালবেলার রূঢ়তার জন্যে তার মন এমনিতেই কোমল হয়ে া, এবার সে তা শোধ করলো। নিমকি থেকে ছোট্ট এককণা ভেঙে মুখে দিয়ে বাকি টা সে সত্যশরণের মুখের কাছে তুলে ধরে বললো, 'এক্ষুণি মাসিমা আসবেন,—খাও—'
সত্যশরণ খাবে কী, তার গলা বন্ধ হয়ে গেলো, বুক যেন ভেঙে যেতে চাইলো সুখের ।
এর পর সমস্ত সন্ধ্যেটা সত্যশরণের মন লঘুপক্ষে ভর করে কোথায় কোন স্বর্গরাজ্যে াণ করে বেড়াতে লাগলো। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে এ-কথা ও-কথার পরে লীলা বললো, ছা, এই পাড়াগাঁয়েই কি আমরা পড়ে থাকবো নাকি?'
চেষ্টা তো করছি কলকাতা যেতে, কিন্তু তুমি তো জানো না, লীলা, চাকরি কী দুরূহ ার-
চাকরির জন্যে তোমার এত ভাবনা কী, বাবাই তো আছেন। কদ্দিন না-হয় ও-বাড়িতেই লে, আর মা তোমাকে সে-কথা বলেওছিলেন।'
সে কি হয়?'
লীলা ফোঁস করে উঠলো, 'কেন হয় না? তোমার মতো পাঁচ শো মানুষ বাবা পুষতে ান।'
তা পারেন হয় তো,' অত্যন্ত আহত কণ্ঠে সত্যশরণ বললো, 'তাহলেও আমি গিয়ে ওখানে তে পারি না।'
কেন পারবে না, খুব পারো। আসলে অসম্ভব দাম্ভিক তুমি, তাই।'
হয়তো। গরিবদের তো ঐটুকুই সম্বল।' আধো অন্ধকারে আবছা হাসলো সত্যশরণ।
'সে কথাই বলো। সবটাতেই মান যায় তোমার। তা নইলে বাবা তো তোমাকে কলকাতায় ও তুলে দিতে চেয়েছিলেন, নিলে কই? তাহলে তো আর আমাকে এই অন্ধকূপে পড়ে হতো না।'—গড়গড় করে লীলা বলে গেলো।
সত্যশরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার অনুভব করলো বিবাহ করে ভুল করেছে সে। লীলা ইষ্ণু হয়ে বললো, 'কী? জবাব দিচ্ছো না যে?'
'কী বলবো, তুমি অত্যন্ত ছেলেমানুষ!'
'ছেলেমানুষ আমি মোটেও নই। কিচ্ছু না-নিয়ে বড়োমানুষি দেখালে কেন তা কি বুঝি না? করলে লোকে ভাববে তোমারই যথেষ্ট আছে—'
এ-কথার পরে সত্যশরণের মেজাজ খারাপ হওয়া স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু স্বভাব তার অন্য া। কেবল অশান্তিতে সমস্ত মন ছেয়ে গেলো। বিছানার উপর উঠে বসে বললো, 'লীলা, াকে কতবার বলবো যে আমি নিজেকে কখনো লুকোইনি, কেন এরকম রূঢ় কথা বলে াকে কষ্ট দাও?'
'না, আমি কিছুতেই থাকবো না এখানে—' উদ্ধত ভঙ্গিতে লীলাও উঠে বসলো বিছানায়, । স্বপ্নেও ভেবো না তোমার দারিদ্র্যের অংশ আমিও গ্রহণ করে এখানে এই পাড়াগাঁয়ে লরিয়ার ডিপোতে বসে থাকবো। কক্ষনো না। কক্ষনো না।'

সত্যশরণ ওর আচরণে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, কথা বলতে পারলো না। একটু প
আস্তে-আস্তে সে বিছানা ছেড়ে উঠে এলো বাইরে, বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করে-ক
মনকে শান্ত করে অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকলো। লীলা অঘোরে ঘুমুচ্ছে,—লণ্ঠনের মৃদু আলো
নির্নিমেষে তাকিয়ে তাকে দেখলো অনেকক্ষণ, তারপর আবার নিঃশব্দে বিছানায় উঠে শু
পড়লো।

শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক হবে এমন একটা হাস্যকর কথা ভাবতেই পারে না সত্যশর
এমন তো নয় যে সে খেতে পাচ্ছে না। আর শ্বশুর যে তাকে মেয়ে দিলেন তার চেয়ে যে
দান কি আর-কিছু আছে? লীলা যে এ-কথাটাই কেন বোঝে না, আশ্চর্য!

দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে, আসক্তি-বিরক্তিতে মিলিয়ে দিনের পর দিন ঠিক একই ভাবে কাটতে লাগ
কিন্তু লীলা কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না সত্যশরণের এই দারিদ্র্যকে। তার আক্রো
আরো বেশী হলো এই ভেবে যে লীলাকে জব্দ করবার জন্যই এরা মাসি-বোনপো ইচ্ছে ক
পড়ে থাকছে এই পাড়াগাঁয়ে। সত্যশরণকে এ নিয়ে নিষ্ঠুরের মতো সে আঘাত করতো, নিে
জেদ বা ইচ্ছার উপর কারো কথাই সে মান্য করতো না। সংসারে একেবারে স্বতন্ত্র, একেব
আলাদা মানুষ হয়ে রইলো সে। আর সত্যশরণ ব্যর্থ হয়ে শান্ত-সমাহিত চিত্তে অদৃষ্টের ক
মাথা নত করলো। একটু অভিযোগ করলো না, একটু রাগ জানালো না, রাশি রাশি বই
দুরূহ অতলে নিঃশব্দে ডুব দিলো মহত্তর শান্তির আশায়।

কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে লীলা তাকে ভালোবাসলো না, তার মনের গহনে কী কথার ে
তা তো আর চোখে দেখা যায় না, সে নিজেও বুঝলো না সেখানে কী আছে, কিন্তু বাই
মনটা রইলো শক্ত হয়ে। আসলে এটাই ছিলো তার শিক্ষার দোষ, এমন একটা গর্ববো
উচ্চ-শৃঙ্গে সে বড়ো হয়েছিলো যে তার জীবন-দর্শন ছিলো একান্তই আলাদা। অজস্র আ
আর অপরিমিত প্রশ্রয়ে তার মনে কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ছিলো না। অপ
বিলাসিতার মধ্যে এক স্বতন্ত্র জগতে তাকে তার মা মানুষ করেছিলেন। আনন্দবাবু নিশ
ছিলেন স্ত্রীর উপর ভার দিয়ে।

বিনয় বলে যে একটা পদার্থ সকল মানুষের চরিত্রেই থাকতে পারে, এমন আজব
তার মনেই এলো না। বিনয় করবে গরিবেরা, চাকরেরা—যাদের বিনয় না দেখালে,
জোড় করে না-থাকলে চাকরি খোয়া যায়। আলাদা ঘর, আলাদা আয়া—আলাদা
একমাত্র তার জন্যই আনন্দবাবুর মাসে দু'তিন শ' টাকা বেরিয়ে যেতো। সেই মেয়েকে
এখন দেড় শ' টাকা আয়ে সমস্ত সংসার নির্বাহ করতে হয়, তবে মেজাজ যে একটু বিগড়
এতে অবাক হবার কিছু নেই। অন্যায়টা হলো আসলে আনন্দবাবুর। মেয়েকে যখন এভা
তিনি শিক্ষা দিলেন, সে অনুযায়ীই একটি পাত্র নির্বাচন করা উচিত ছিলো তাঁর। বস্তুত
তিনি তাঁর মেয়েকে চিনতেন না। তাঁর ধারণা ছিলো মেয়ের শিক্ষাটা সত্যিই উচ্চ শিক্ষা হ
আর তাঁর নিজের টাকা যে মেয়ের টাকা নয় এ-কথা তিনি মেয়ের বিয়ের পরেই
উপলব্ধি করে থমকে গেলেন। এটা সত্যশরণ শ্বশুরকে স্পষ্ট বুঝতে দিলো যে অে
উপার্জনে লালিত হতে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বিয়ের মধ্যেই একদিন আনন্দ

স্তাব করেছিলেন, সত্যশরণ এখন মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় অন্য ভালো কাজের চেষ্টা রুক এবং লীলাকে নিয়ে তাঁর বাড়িতেই থাকুক।

সত্যশরণের কর্ণমূল লাল হয়ে উঠলো, মৃদু গলায় সে বললো, 'আমার মাসিমার কথা বোধ য় আপনার মনে নেই—'

আনন্দবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সত্যিই তো— সত্যিই তো—কিন্তু তাহলে এক কাজ রো না—টালিগঞ্জে আমার যে জমিটা পড়ে আছে তাতে আমি বাড়ি তুলে দিই' তোমাদের াকবার জন্যে, আর যতদিন সেটা না হয় ততদিন একটা বাড়ি বরং কাছাকাছি ভাড়া রে দিই?'

সত্যশরণ বিমর্ষ মুখে বললো, 'চাকরি না-থাকলে কলকাতায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমি াকবো কেমন করে?'

আনন্দবাবু হেসে সস্নেহে সত্যশরণের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আমি আছি কী রতে—'

সত্যশরণের নত দৃষ্টি আর একটু আনত হলো। একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আপনি ন্যাদান করে আমাকে যথেষ্ট দয়া করেছেন। এর চেয়ে বেশি দান আমি আর মাথা পেতে তে পারবো না। আপনাকে তো আমি বলেছি, ছেলেবেলা থেকে আমি অনেক দুঃখে কষ্টে জে-নিজেই বড়ো হয়েছি, এখন তো তীর পেয়েছি কিন্তু এমন দিনও গেছে যখন হাবুডুবু তে-খেতে দম আমার বন্ধ হয়ে এসেছে, সেই সময়ও আমি কারও দয়া গ্রহণ করতে পারিনি। াপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

আনন্দবাবু প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন জামাইয়ের দিকে। নিঃশব্দে মাথায় হাত লিয়ে দিলেন কেবল।

কিন্তু লীলা তো তার বাবার ছায়ায় মানুষ নয়; বাবার রুচিজ্ঞানে তার আস্থা নেই। বাবা ক জাতের মানুষ, সে আরেক জাতের। তাঁর ভালোমন্দ, সুখদুঃখের ধারণার সঙ্গে তার রণার কোনো মিল নেই। এখানেই হলো আসল ব্যবধান। উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করেছেন বা। জামাই কী? মস্ত বিদ্বান। কেমন? অতিশয় সচ্চরিত্র। ব্যস্! এর বেশি আর দেখবার কার নেই? অভিমানে লীলার চোখে জল আসে। সত্যশরণেরই দোষ। বাবার মন ভোলানো া আর কঠিন কাজ নয় এবং সেই শঠতাই সত্যশরণ করেছে তাকে বিয়ে করবার জন্য। ন-মনে অত্যন্ত জোর দিয়ে লীলা এ-কথা চিন্তা করে, কিন্তু যতটা জোর দিতে তার ইচ্ছে হয় টা জোর সে পায় না মনের মধ্যে। এমন অদ্ভুত একটা শান্ত ভদ্র চেহারা লোকটার, আশ্চর্য! লা মনে মনে ভাবে, কিছুতেই কি লোকটাকে খারাপ ভাবা যাবে না? অথচ নষ্টের মূল তো তাই সে। কোনো-কোনো দিন লীলার ভিতরকার ভালোমানুষটিও সাড়া দিয়ে ওঠে, শরণকে একটা কঠিন কথা বললে মনের মধ্যে যেন কেমন একটা কান্নার মতো অনুভূতি , সত্যশরণের করুণ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করে ক্ষমা চায়; মনে হয় কী হবে কা দিয়ে, সমস্ত অহংকার পুড়ে যাক, সব গ্লানি ধুয়ে যাক—এই তো সুখ, এই তো শান্তি! ন্তু পরমুহূর্তেই কোথায় কোন অহংবোধ চাড়া দিয়ে ওঠে অন্তরের মধ্যে, সমস্ত সুবুদ্ধি শেষে মিলিয়ে যায় মন থেকে।

এই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই কাটলো একবছর। দ্বিতীয় বছরে তাদের একটি
হলো। সত্যশরণ এবার একটা উপায় পেলো তার অন্তরকে বিকশিত করবার, একটা অবল
মেয়েকে নিয়ে সে বিভোর হয়ে গেলো। হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ স্নেহ একটা গতি পেলো
আর সবচেয়ে ভালো লাগলো যা সেটা এই যে, মেয়ে হলো তার মায়ের প্রতিমূর্তি। মে
ভালোবাসতে-বাসতে এটাই সে বার-বার অনুভব করতে লাগলো যে লীলাকেই
আংশিকভাবে সে পাচ্ছে একেবারে তার বুকের মধ্যে।

এদিকে সন্তানের শুভ জন্মে লীলার অশান্তিতে একটুও ভাঁটা পড়লো না, বরং এটাই
মনের মধ্যে আরো একটা প্রচণ্ড ক্ষোভের কারণ হলো যে তার মেয়ে হয়েও আর পাঁ
শিশুর মতোই এ-মেয়ে মানুষ হবে। এ-দুঃখ সে রাখবে কোথায়? মেয়েকে আটমাসের
সে পিত্রালয় থেকে ফিরেছিলো, একবছরের হতেই সে প্রস্তাব করলো, 'এবার থেকে
মা'র কাছে রাখবো, উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা—'

সত্যশরণ মেয়েকে আদর করতে-করতে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'মেয়ে নিয়ে খেলা চ
না।' কথাটা একটু রূঢ় হয়েই বেরুলো তার গলা দিয়ে। এমনিতে অত তো সহিষ্ণু মানুষ
মেয়ের বিষয় কিছু বলতে গেলেই সে অন্য মানুষের মতো কথা বলে।

লীলা তক্ষুণি জবাব দিলো, 'খেলা চলা না-চলার কথা হচ্ছে না— খেতে দিতে পারবে
পরতে দিতে পারবে না, একটা আয়া পর্যন্ত নেই। সারাদিন ঝিয়ের মতো এই আমাকেই
ট্যাঁকে নিয়ে ঘুরতে হবে, অথচ মুখের আদরে কিস্তিমাত করবে এ তুমি স্বপ্নেও মনে বে
না!'

গম্ভীর মুখে সত্যশরণ বললো, 'খেতে যদি না দিতে পারি খাবে না, পরতে না দিতে
পরবে না, কিন্তু তাই বলে নিজের বাপ ছেড়ে অন্যের বাপের অন্নে আমার মেয়ে মানুষ
এ-কথাও তুমি মনে ঠাঁই দিয়ো না।'

'আমার বাবা ওর পর হলো?' লীলার গলা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এলো।

সত্যশরণ সেদিকে কান না দিয়ে বললো, 'অনেক দিন থেকেই মনে হচ্ছে তোমার
পড়াশুনো করা দরকার, মেয়ে বড়ো হয়ে যেন তোমাকে কখনো ছোটো না ভাবে। কাল
তোমাকে কিছু বই এনে দেবো—পড়বে।' কথার ভঙ্গিতে এমন জোর ছিলো যে লীলা প্রতি
করবার সাহস পেলো না।

একটু চুপচাপ থেকে সত্যশরণ বললো, 'আচ্ছা লীলা, তোমার মন কি কখনো শান্তি
না? কী অভাববোধ তোমাকে রাতদিন এমন পাগল করে বেড়ায় বলতে পারো?'

গভীর অভিমানভরে লীলা মুখ ফিরিয়ে বসেই রইলো, কোনো কথা বললো না।

সত্যশরণ কাছে গিয়ে সস্নেহে ওর মাথায় হাত রাখলো; বললো, 'লেখাপড়ার মতো
আর কিছুতেই নেই, টাকা কি মানুষকে আনন্দ দেয়? পাগলি, টাকা আনে স্বাচ্ছন্দ্য, টাকা
প্রয়োজন, কিন্তু গভীর আনন্দের উৎস কোথায় জানো? মানুষে-মানুষে হৃদয়ের বিনিময়ে
বইয়ের পাতায় পোরা জ্ঞানিগুণীর সাধনায়।'

লীলার চোখ ছলছল করতে লাগলো, কী বলতে গিয়েও সে বলতে পারলো না। সত্য
যখন তাকে আদর করে, সমস্ত প্রাণমন তার ভরে যায়, কিন্তু কিসের কাঁটা তার বুকের
কেন রচনা করে এই ব্যবধান, কিছুতেই সে পারে না আত্মসমর্পণ করতে—দেহের আব
মনের দম্ভের কাছে এইটুকু হয়ে ফিরে যায়! কষ্ট পায়, কিন্তু হার মানে না।

পরের দিন স্কুল থেকে সত্যশরণ এত বই নিয়ে বাড়ি ফিরলো—আগ্রহভরে লীলা ঃগুলো নাড়াচাড়া করে বললো, 'পড়তে আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু গল্পের বই না হলে ালো লাগে না।'

সত্যশরণ ওর আগ্রহে উৎসাহ বোধ করে বললো, 'গল্পের বই? বেশ তো। কালকে আমি কেন্সের বই আনব'খন। ডিকেন্স পড়েছো কিছু?'

মাসিমা ঘরের মধ্যে এলেন।—'তোর একটা চিঠি আছে, সত্য।'

সত্যশরণ হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলো। মাসিমা চিঠিটা দিয়েই ঘর থেকে ল গিয়েছিলেন। সত্যশরণ হাসিমুখে ডাকলো, 'মাসিমা, সুখবর আছে—'

'কী খবর?' লীলা উৎসুক হয়ে তাকালো, মাসিমাও ঘরে এলেন।

সত্যশরণ বললো, 'আমি একটা ভালো কাজ পেয়েছি, মাসিমা, লীলারই জয় হলো খছি।' হাসিমুখে সে তাকালো লীলার দিকে।

মাসিমা বললেন, 'দুর্গা দুর্গা, আগেই তড়পাস্‌নি সত্য, খুলে বল, কোথায়, কী কাজ—'

লীলার দিকে তাকিয়ে সত্য বললো, 'বলো তো কোথায়?'

লীলা চোখ বড়ো করে কৃত্রিম শাসন জানিয়ে বললো, 'ফাজলেমি, না?'

'আচ্ছা, কোথায় হলে তুমি সুখী হও?'

'আমি এখানেই সুখে আছি!'

'বেশ! বারণ করে লিখে দিই তাহলে।'

লীলা স্বভাবসুলভ ছেলেমানুষিতে অধীর হয়ে উঠলো, রাগ করে সে ঘর ছেড়ে যাবার াগাড় করতেই সত্যশরণ তার আঁচল টেনে ধরে বললো, 'দেখেছো, মাসিমা, কী রকম রাগ?'

মাসিমা লীলার পক্ষ নিয়ে বললেন, 'রাগ করবে না? তুই এখন দুষ্টুমি রেখে বল—'

কাজটা আমাদের লীলার পিত্রালয়ের দেশে, আর কাজ হলো, গলাবাজি অর্থাৎ কলকাতার কটি কলেজে আমি—'

ঠোঁট উল্টিয়ে লীলা বললো, 'ও!'

এই শব্দটুকুর মধ্যেও যে আরেকজনের কত দুঃখ নিহিত থাকতে পারে তা সত্যশরণের া দেখলে বোঝা যেতো। লীলার এই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে সত্যশরণের মুখ থেকে দপ্ করে সমস্ত আলো নিবে গেলো। মাসিমা লক্ষ্য করে আহত হয়ে রুষ্টস্বরে বললেন, 'বৌমার মন উঠলো না কথাটায়? যোগ্য স্বামীর গৌরব করবে কেন, বড়োমানুষের একটা মুখ্যু ল হলেই তোমার ঠিক হতো।'

াসিমার রূঢ়তায় সত্যশরণ দুঃখিত হয়ে বললো, 'কী বলছো মাসিমা, ও তো কিছু ানি।'

'দ্যাখ্ সত্য, আমার বুদ্ধিসুদ্ধি এখনো কিছু আছে, এখনো আমি চোখের মাথা খাইনি। না যদি তুই ওকে শাসন না করিস, ফলভোগ তুই-ই করবি।' মাসিমা রাগ করে ঘর ছেড়ে গেলেন।

কিসে থেকে কী হলো। বিমূঢ় সত্যশরণ নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে মেয়ে কোলে বেরিয়ে গেলো বাইরে। সে বেরিয়ে যেতেই মাসিমা চা আর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে লেন—লীলা ক্রুদ্ধমুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সত্যশরণ ঘরে নেই। গম্ভীর স্বরে লেন, 'সত্য কই?'

'আমি জানিনে।'

মাসিমা, ভ্রূকুটি করে বললেন, 'জানো না মানে? লোকটা সেই দশটার সময় দু'টি ড
ভাত খেয়ে স্কুলে গেছে আর এসেছে এই বেলা পাঁচটায়, তোমার কাছ থেকে সে না-খে
বেরিয়ে গেলো, তবু তুমি বলছো—জানো না? কেন জানো না?'

লীলার চোখে হঠাৎ ভয় নেমে এলো, মাসিমাকে সে রাগ করতে দেখেনি
চোখে তাকিয়ে রইলো চুপ করে, কথা বলতে সাহস পেলো না।

মাসিমা বললেন, 'তোমার কি হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই? কত কপাল করে সংস
এসেছো বলে এমন স্বামী পেয়েছো, তাকে তুমি দরিদ্র বলে গঞ্জনা করো, অবহেলা করো!
বড় অভাগিনী তুমি। এই অবহেলার ফল কি তুমি পাবে না ভেবেছো? নিশ্চয়ই পাবে। দে
জীবন যাবে তোমার।'

'আমাকে অভিশাপ দিলেন?' সহসা লীলা দু'হাতে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলো।

হতভম্ব হয়ে মাসিমা ওর কান্না দেখতে লাগলেন আর তাঁর মনে হতে লাগলো এই ক
সংক্রমিত হয়ে এক্ষুণি ছড়িয়ে গেলো, তাঁর মধ্যে, সত্যশরণের মধ্যে, সত্যশরণের মে
মধ্যে—সমস্ত সংসারের ভিত যেন নড়ে উঠলো লীলার এই কান্নায়। সচকিত হয়ে তিনি হ
রাখলেন লীলার মাথায়, 'ও মা, ছি-ছি-ছি' এই ভরা-সন্ধ্যেয় নাকি কেউ কাঁদে? ওতে
অমঙ্গল হয়। তোমার একটা সন্তান আছে না! চুপ করো, চুপ করো।'

লীলা চুপ করলো না, বেগে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো চোখে আঁচল চেপে।

অনেক রাত্রিতে অনেক সাধ্যসাধনা করে মাসিমা লীলাকে খাইয়ে ঘুমুতে পাঠি
সত্যশরণকে নিজের ঘরে ডেকে আনলেন। একদিনে যেন তিনি আরো বুড়িয়ে গেছেন ম
হলো, সংকুচিত সত্যশরণ মুখ নিচু করে তাঁর বিছানার পাশে বসে বললো, 'আমাকে কি
বলবে?'

'হ্যাঁ, শোনো'—মাসিমা একখানা মোড়া টেনে সত্যশরণের একেবারে কাছে বসে বললে
'কলকাতায় তুমি যে কাজটা পেয়েছো তার মাইনে কত?'

'মাইনে খুব বেশি নয়, কিন্তু—'

'কিন্তু কী? মাইনে যদি বেশী না হয় তবে ওখানে গিয়ে তো আরো কষ্ট হবে। আর স
বলতে, এখানে তো আমরা কোনো কষ্টে নেই। স্বচ্ছন্দে চলছে সংসার।'

'উল্টো কথা বলছো মাসিমা, এক সময় তুমিই বলেছিলে স্কুল-মাস্টারির চাইতে কলেজে
মাস্টারি অনেক সম্মানের।'

'তা তো বলেই ছিলাম! কিন্তু যখন বলেছিলাম সে সময়টা তো আজ আর নেই? ত
এক-রকমের হলে ভালো হতো, এখন আরেক-রকম হলে ভালো হয়।'

'লীলার এখানে ভালো লাগে না; আর এটাও সত্যি কথা, কোনো মানুষেরই এই পাড়াগঁ
ভালো লাগা সম্ভব নয়।'

'তুমি কি মনে করো কলকাতা গেলেই লীলা সুস্থির হবে? সুস্থির হওয়া যার স্বভাবে ন
তাকে স্থির করবে কে?'

মাসিমার কথার প্রতিবাদ চলে না, কেননা কথাটা সত্যি এটা সত্যশরণের বুদ্ধিও বলে, কি
তবু সত্যশরণ লীলার পক্ষ না নিয়ে পারলো না। ঈষৎ উঁচু গলায় বললো, 'লীলার দিক্‌টা ত

মাটেও দেখছো না, মাসিমা। কীভাবে ওর সময় কাটে বলো তো? সঙ্গী-টঙ্গী কেউ নেই, তা ছাড়া যে পরিবেশ থেকে এসেছে—'

মাসিমা মৃদু কেশে গলা সাফ করে বললেন, 'লীলার দিক্‌টা কি একা তুমিই বুঝবে চিরদিন? লীলা কি কখনোই বুঝবে না তোমার দিক্‌টা? এ-রকম অন্ধ করে রাখাও কোনো কাজের কথা নয়, সত্যশরণ। ওর বুদ্ধি কম, দম্ভ বেশী; কিন্তু ভিতরে একটি ভালোমানুষও আছে—ওকে মানুষ করো—শক্ত হও একটু। এই তিনটি বছর—আমরা দুটি প্রাণী ওকে যে আরো অধঃপাতে ঠেলে দিয়েছি। সকালবেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠে শাশুড়ীর হাতের তৈরী চা না-পেলেই এখন ওর রাগ হয়—এগারোটার মধ্যে তৈরী ভাত না-পেলে খাবো না বলে শুয়ে থাকে—চারটার মধ্যে চা না-পেলে আবার মাথাও ধরে। সত্য, তুই-ই বল তো, এতখানি কি ওর আশা করা উচিত আমার কাছ থেকে? আমি যে ওকে করি—সেজন্য ও কৃতজ্ঞ নয়—ও মনে করে এটা প্রাপ্য—ওকে করবার জন্যই সংসারের সমস্ত লোক উন্মুখ থাকবে অথচ ও কারো জন্যেই কিছু করবে না! গোড়াতেই যদি ওকে আমরা এতটা প্রশ্রয় না দিতাম তবে এতদিনে ও শুধরে যেতো।'

সত্যশরণ মুখ তুলে কিছুক্ষণ মাসিমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো, তারপর মৃদু গলায় বললো, 'কলকাতা গেলে আমার মনে হয় ভালো হবে সব দিক্ থেকে—'

'সে কথাই বলছিলাম—ওখানে গেলে মাথা আরো বিগড়ে যাবে—এখানে তবু—'

হঠাৎ সত্যশরণ একটু উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলো, 'তুমি ভুলে যাচ্ছো, মাসিমা, ও পাঁচবছরের খুকি নয়। শাসন করবার আমরা কে? তুমিও নও, আমিও নই। আর কী ঘোর অন্যায় ও করেছে যা নিয়ে এত বিব্রত হয়ে পড়েছো তুমি!'

মাসিমা সত্যশরণের কথায় চম্‌কে গেলেন, মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাও, শুয়ে থাকোগে, রাত হলো অনেক।

অপরাধীর মতো সত্যশরণ মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এর পর দিন-তিনেক সত্যশরণ একটা সাংঘাতিক গুমোটে কাটালো। এদিকে মাসিমা, ওদিকে লীলা—কারো মুখের দিকেই সে তাকাতে পারে না। দিনের অধিকাংশ সময় স্কুলে কাটিয়ে বাড়ি এসেই মেয়ে নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে! মনে-মনে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানায় এই মেয়ের জন্যে। ছোট্ট তুলতুলে এইটুকু মেয়ে—মাথা-ভরা কালো চুল, হাত তুলে "বাব্‌বা, বাব্‌বা" করে যখন তিনটে ছোটো দাঁত বার করে সত্যশরণের দিকে এগিয়ে আসে, সত্যশরণের সমস্ত শরীর-মন যেন আনন্দে বিভোর হয়ে যায়।

চতুর্থদিন সে আবার মাসিমার ঘরে গিয়ে বসলো। মাসিমা শুয়ে ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কী রে?'

'তুমি ঘুমুচ্ছো?'

'না—বোস।'

এবার সত্যশরণ আর ভূমিকা না করে বললো, 'চাকরিটা নেবো কিনা তা তো কিছু বলছো না তোমরা—আমার তো কালকেই যাবার দিন।'

'নিবি বইকি—ভালো কাজ পেলে ছেড়ে দেয় নাকি কেউ?'

'তুমি যে সেদিন—'বলতে-বলতে সত্যশরণ চুপ করলো।

'ও, সেদিন?'—মাসিমা হেসে বললেন, 'সেদিনের কথা কি মনে রাখবার কথা নাকি? —কে যদি যাস তবে আজকেই একটা ব্যবস্থা করতে হয়।'

সত্যশরণ গেলো এবার লীলার কাছে।—'তুমি কী বলো—কলকাতাই চলে যাই—'

'আমি কী জানি—'

'তুমিই তো জানো—তোমার জন্যেই তো ওখানে চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম।'

'তোমার যেমন খুশি করো।'

'পাগল নাকি !'—সত্যশরণ দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'এখনো রাগ করে আ
তোমার খুশি আর আমার খুশি আলাদা নাকি ?'

এবার লীলার চোখের পাতা কেঁপে উঠলো, মাথা গুঁজলো সে সত্যশরণের কাঁ
সত্যশরণ ঐকান্তিক আগ্রহে সে-মাথা তার নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরলো।

এর পরের দিন অত্যন্ত শান্তমনে সত্যশবণ কলকাতা গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখাশে
করে কাজে জয়েন করবার দিন ঠিক করে এলো, এবং তার পনেরো দিনের দিন এখানব
তল্পি-তল্পা গুটিয়ে তারা কলকাতা চলে গেলো।

লীলা মেয়েকে নিয়ে প্রথমটায় এসে বাপের বাড়ি উঠলো আর সত্যশরণ মাসিমাকে নি
মাসিমারই এক দেওরের বাড়ি উঠলো। তারপর চললো বাড়ি খোঁজা। বাড়ি খোঁজা, না
খোঁজা—লীলার কোনো বাড়িই পছন্দ হয় না। বলে—'শেষে নাকি এ-বাড়িতে আমি থাকবে
বন্ধুবান্ধবদের আমি মুখ দেখাবো কেমন করে!' অবশেষে সত্যশরণ মরিয়া হয়ে অবস্
অতিরিক্ত ভাড়াতেই এক ফ্ল্যাটে এসে উঠলো। মাসিমা চোখ কপালে তুলে বললেন, '
পাগল হ'লি নাকি ? মাইনে হলো তোর দেড়শ' টাকা— বাড়িভাড়া দিবি পঁয়ষট্টি ?'

সত্যশরণ বললো, 'ও হয়ে যাবে।'

লীলার তবু মন উঠলো না, কিন্তু কী করা যায়। খুঁতখুঁত করতে-করতে এলো সেই পঁয়ষ
টাকার ফ্ল্যাটে। তারপর শুরু হলো বাড়ি সাজানো—লোক এলে বসতে দিতে হবে তো?
বাবার বাড়ির যে অংশটায় ও একলা থাকতো সেটাও যে এর চেয়ে বড়ো। সত্যশরণ লীল
মন যোগাবার কোনো উপায়ই আর দেখতে পায় না। ওকে সুখী করা—এ যেন সত্যশরণে
তপস্যা।

মাসিমা সব বোঝেন আর মনে-মনে গুমরে মরেন।

এবারেই ঠিক অভাবে পড়লো সত্যশরণ। মাসের পনেরো তারিখেই
ফক্কিকার—তারপর যে সে কী করে সংসার চালায় তা লীলা জানেও না, জানবার অবকাশ
ইচ্ছেও তার নেই। আসছে নিত্য নতুন জুতো—বন্ধুবান্ধবদের সমকক্ষ হবার প্রতিযোগিত
নতুন শাড়ি—নতুন ডিজাইনের গয়না—মেয়ের ফ্রক—এদিকে ধার করতে-কর
সত্যশরণের মাথার চুল পেকে গেলো। মাসিমা আর পারলেন না। নিরালা পেয়ে একা
বললেন, 'সত্য, তোর কি মাথা-খারাপ হয়েছে? স্ত্রীকে কি আর কেউ ভালবাসে না? কি
সংসারে কি আর কারো স্ত্রী নেই?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে? অবাক করলি—তোর সাধ্য আছে তুই লীলার মর্জি-মতো চলতে পারি
আর দ্যাখ, পুরুষ যদি পৌরুষ না দেখায়, কোনো মেয়ে কখনোই তাকে পছন্দ করে না।'

'পৌরুষ কেমন করে দেখাতে হয় তা তো আমি জানিনে, মাসিমা।'

'নিশ্চয় জানিস, অবশ্য জানিস—সত্য, আমার মাথা খাস, এ-ভাবে নিজেকে ফকির রিসনে—'

মৃদু হেসে সত্য বললো, 'তুমি কিছু ভেবো না, মাসিমা—লীলার এ-পাগলামি ছেলেমানুষি ই তো নয়—এ ঝোঁক ওর কেটে যাবে।'

'কাটলেই ভালো, কিন্তু যাতে কাটে তার চেষ্টাও তোর একটু করা উচিত।'

'চেষ্টা কেমন করে করবো, মাসিমা—কী অবস্থা থেকে কী অবস্থায় পড়েছে তা তো আমি ঝি—আমার মতো জন্মদুঃখীর সঙ্গে ওর ভাগ্য না জড়ানোই উচিত ছিলো।'

মাসিমা বোঝেন ছেলের কাছে তাঁর এ-সব কথা একান্তই অরণ্যে রোদন—লীলার পেরূপ সুন্দর মুখ সত্যশরণকে সমস্তক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে, সত্যশরণের সাধ্য নেই সে-মাহ সে কাটিয়ে ওঠে—তাই তিনি চুপ করে গেলেন। কিন্তু দুপুরবেলা সত্যশরণ কলেজে গলে লীলা যখন বাপের বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো মাসিমা তাকে কাছে াকলেন—অত্যন্ত কোমল স্বরে বললেন, 'লীলা, রোজ-রোজ কি তোমার না-গেলেই নয়? মি তো সত্যশরণের অবস্থা জানো—প্রত্যেক দিন মেয়ে নিয়ে, চাকর নিয়ে ট্রামে যাতায়াতে তা মন্দ পয়সা যায় না—'

লীলা বাধা দিয়ে বললো, 'আমার বাপের বাড়ি থেকে গাড়ি পাঠায় না কেন রোজ, তাই তা বলছেন আপনি?'

মাসিমা এবার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'গাড়ি পাঠানো না-পাঠানোর কথা নয়—রোজ-রাজ তোমার যাওয়া উচিত নয় সে-কথাই আমি বলছিলাম।'

'মোটেও আপনি সে-কথা বলেননি—আপনি পয়সার কথাটাই বড়ো করে ধরেছেন—'

মাসিমা চটে উঠলেন—'ধরলামই বা, তাতেই বা কী, ঠিকই তো, কেন তুমি একজনের াীরের রক্ত-জল-করা পয়সা এভাবে অপব্যয় করবে!'

'অপব্যয় আবার কী? আমি তো আর হেঁটে যেতে পারি না। যাওয়া উচিত আমার মাটরে—কিন্তু উপায় নেই বলেই আমি ট্রামে যাই।'

'এবং উপায় নেই বলেই'—মাসিমা যোগ করলেন—'তোমার বাড়িতে বসে থাকা চিত।'

লীলা চুপ করে তাকিয়ে রইলো মাসিমার মুখের দিকে। মুখে-মুখে কথা বলাব তার অভ্যেস নই—কাউকে রাগ হতে দেখলে তার কেমন ভয়ই করে। কিন্তু চোখ দিয়ে তার জল বেরিয়ে লো। মাসিমা নিষ্ঠুরেব মতো বললেন, 'আহ্লাদ পেয়ে-পেয়ে তোমাদের চোখের জলও আহ্লাদী য়ে গেছে। লজ্জা করে না এত সামান্য কথায় অতোবড়ো বুড়ো মেয়ের চোখের জল ফলতে!'

লীলা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

'নেকামি যত'—মাসিমা বিরক্ত মনে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখলেন সত্যশরণ প করে দাঁড়িয়ে আছে দরজা ধরে—মুখের ভাব এমন শক্ত যে মাসিমা একটু ঘাবড়ে গেলেন। চাখাচোখি হতেই সত্যশরণ বললো, 'আমার অনুপস্থিতিতে তুমি বুঝি বউকে শিক্ষাদীক্ষা দবার চেষ্টা করো একটু?'

মাসিমা দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, হ্যাঁ, করিই তো—গুষ্টিসুদ্ধ মাথা খাওয়াটাও কোনো াজের কথা নয়।'—মাসিমা জোরে-জোরে পা ফেলে চলে গেলেন সেখান থেকে।

এদিকে লীলা স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে আরও বেগে কাঁদতে লাগলো। সত্যশরণ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জামা ছাড়তে ছাড়তে বললো, 'কী হয়েছিলো?'

লীলা জবাব দিলো না। সত্যশরণের পক্ষে এটা অপ্রত্যাশিত নয়, কেন না রাগের মুখে লীলা কথা বন্ধ করাটাই চরম শাস্তি মনে করে। তবু সত্যশরণ বললো, 'কথা বলছো না কেন' এগিয়ে কাছে গিয়ে সে হাত দিলো লীলার মাথায়। লীলার সম্বন্ধে অদ্ভুত তার মনের গতি ন্যায় নেই, অন্যায় নেই—বিচার বিবেচনা নেই—চোখের জল দেখলে সে পাগল হয়ে যায় কী করবে, মনের সহজ অবস্থায় সে কিছুতেই থাকতে পারে না এ ক্ষেত্রে। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে সে কাছে বসে পরম মমতার সঙ্গে আদর করতে-করতে বললো, 'কাঁদো না, লক্ষ্মী তো,—মাসিমা তো আমাদের মা-ই, উনি বললে কখনো রাগ করতে হয় নাকি? বোকা বোকা!' নিজের প্রশস্ত বুকের সঙ্গে সজোরে লীলার মাথা সে চেপে ধরলো। আহত কণ্ঠে লীলা বললো, 'আমি কী করি তোমার, কী ব্যয় করো তুমি আমার জন্য—আমি গয়না গড়াই, ন শাড়ি কিনি—যা দেবার সব তো বাবা দেন—হাত পেতে গ্রহণ করো, আর আমাকে যা-ত শোনাও।'

সত্যশরণের বুকের মধ্যে লাগলো কথাটা। দুঃখিত হয়ে বললো, 'কী হাত পেতে গ্রহণ করি লীলা—তুমি যে এটা-ওটা ওখান থেকে আনো তাতে কি কখনোই আমার সম্মতি পেয়েছো—বারণ করেছিলুম বলে খেপে গিয়েছিলে—'

'থাক্ থাক্'—লীলা ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে বসলো—'তোমাদের হচ্ছে গরিবের ঘোড়ারোগ! নিজেদের সামর্থ নিজেরা জানে না? আর গ্রহণ করা না-করার কথা কী—এই যে বাড়ি-ভরা ফার্নিচার—এই যে বাক্স-ভরা কাপড়—এই যে গা-ভরা গয়না—এ কি তোমার পয়সায়? ভেবে দেখেছো সে কথা? আর এই যে মেয়েটা—তার যে নিত্য নতুন জামা আসছে কাপড় আসছে—রুপোর থালা, রুপোর বাটি—এও বোধ হয় তোমার দেয়া?'

সত্যশরণের মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো; বললে, 'আমি তো বলেছি, লীলা—ও-বাড়ি থেকে কোনো বিলাসিতার সামগ্রী যেন আমার মেয়ের জন্য না আসে। তাঁদের মেয়েকে তাঁরা দেবে এর উপরে আমি বলবো কী, কিন্তু আমার মেয়ে নিতান্তই গরিবের মেয়ে—তাকে যেন তাঁরা দয়া না করেন।' সত্যশরণ সরে গিয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে তুললো—হাতের সোনার বালা গলার হার—সমস্ত টেনে-টেনে খুলতে-খুলতে বললো, 'এ-সব যেন আর কক্ষনো ওর গায়ে না ওঠে।' লীলা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো—এত স্পর্ধা এই লোকটার দরিদ্র—ভিখারীর অধম—স্ত্রী-কন্যাকে খেতে দিতেই যার জিব বেরিয়ে আসে, তার এ সাহস? দুই চোখ তার জ্বলে উঠলো আক্রোশে। হাতের মুঠোয় হার বালা সংগ্রহ করতে-করতে সে বললো, 'ইতর, ছোটোলোক'—তার মুখ দিয়ে আর-কোনো কথা বেরুলো না।

মাসিমা ঘরে ঢুকে বললেন, 'তোর শ্বশুর এসেছেন, সত্য।' মেয়ে কোলে ক'রেই সত্যশরণ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো বাইরে বসবার ঘরে। আনন্দবাবু এসে বসেছিলেন,—সত্যশরণ ঘরে ঢুকতেই হাসিমুখে বললেন, 'এই যে এসো, বাবা—লীলা কোথায়? হাত বাড়িয়ে তিনি কোলে নিলেন নাতনীকে।—'এসেছিলাম একটু এদিকে, ভাবলাম ক'দিন তোমার সঙ্গে দেখা হ না—লিলি তো রোজই যায়। তুমি যাও না কেন?'

সত্যশরণ মাথা নিচু করে চুপ করে রইলো। শ্বশুরকে দেখে তাব গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছিলো। এই এক ভদ্রলোক—দেবতার মতো মান্য করে সত্যশরণ—ভালোবাসে বন্ধুর মতো।

আনন্দবাবু হঠাৎ সত্যশরণের মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন—'কী হয়েছে তোমার? রীর ভালো নেই? এর উত্তরে সত্যশরণের চোখ ছাপিয়ে জল এলো—এবার উঠে এলেন াছে, সস্নেহে কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো তো, লীলা কী করছে দেখি।'

লীলা কান্নার অকূল সমুদ্রে ভাসছিলো—বাপকে দেখে একেবারে গর্জে উঠলো, 'আমাকে য়ে যাও, বাবা, আমি আর এক মুহূর্ত থাকবো না এখানে।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'না না না'—ছোটো মেয়ের মতো লীলা বাবাকে আঁকড়ে ধরলো।

একটু বিব্রত হয়ে বললেন, 'কী পাগলামি করিস! কী হয়েছে তাই বল্ না?'

সত্যশরণের মাসিমা এতক্ষণ পরে ঘরে এলেন। বললেন, 'বেয়াই, নিজের মেয়েকে নিজে নেন না? অত সুখে পালিতা সে—সে কি শোভা পায় এই দরিদ্রের ঘরে। সত্য তো চায় াথায় করে রাখতে, কিন্তু যে মুকুট শোভা পায় রাজার মাথায়, সে কি ভিখারী মাথায় ধারণ রতে পারে?'

সত্যশরণ মাসির এ-কথায় লজ্জিত হলো। আনন্দবাবু হেসে বললেন, 'সে কি কথা—রাজা সংসারে এক রকমই আছে, বেয়ান? কত রকমের—কোনো মানুষ অর্থ দিয়ে রাজা য়—কোনো মানুষ যোগ্যতা দিয়ে রাজা হয়—আর সেই যোগ্যতায় রাজাই তো আমাদের ত্যশরণ। সংসারে কী এতো দামী মুকুট আছে যা ওর মাথায় বসানো যায়। আমি তো রাজা বছে ঠিকই বার করেছিলাম, কিন্তু ওর যোগ্য মুকুটটাই দিতে পারলাম না।'

আনন্দবাবু মেয়েকে তুলে বসালেন। 'লীলা, পাগলামি করিসনে, মা—দ্যাখ, মেয়েটা াদছে, এখনো তুই ছোটোটি আছিস নাকি!' আদর করে-করে তিনি মেয়ের মান ভাঙাতে াগলেন

তারপর মেয়েকে উঠিয়ে শান্ত করতে-করতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেলো। যাবার সময় তিনি ত্যশরণকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিভৃতে বললেন, 'তুমি ওকে ক্ষমা কোরো, বাবা—ও তো বুঝ।'

ীলা যে নিতান্তই অবুঝ এ-বিষয়ে কি সত্যশরণের মনেই কোনো সংশয় ছিলো! কিন্তু তবু ার আশা ছিলো একদিন লীলা সবই বুঝবে—একদিন তার নিশ্চয়ই মনে হবে যে সংসারে হ-মমতাটাও টাকার চাইতে কম মূল্যবান নয়। তাছাড়া খুকু বড়ো হচ্ছে, এটাই আজকাল ত্যশরণের সবচেয়ে বেশী ভাবনার বিষয় হয়েছে। মা'র এই ব্যবহার তার পক্ষে শুভ নয়, র ছায়া যদি কন্যার চরিত্রেও বর্তায় তাহলে তার চেয়ে বড়ো দুঃখ আর কী আছে? এজন্যই ত্যশরণ আজকাল যেন আরো বেশি সহিষ্ণু, আরো বেশি চুপচাপ হয়ে গেলো। কোনো কমেই যেন গণ্ডগোল না বাধে—কোনো রকমেই যেন লীলা বিরক্ত না হয়—এই হয়ে ঠলো তার সাধনা। কিন্তু মাসিমা হয়ে উঠলেন ততোধিক অসহিষ্ণু। হয়তো অত্যন্তই ছোটো থা, নেহাতই একটি তুচ্ছ ঘটনা—যার চেয়ে লীলার অনেক বড়ো বড়ো অপরাধও তিনি সিমুখে সস্নেহে সহ্য করেছেন একসময়ে—তাই নিয়েই হয়তো তিনি একেবারে কুরুক্ষেত্র াধালেন। সত্যশরণ শান্ত করতে চেষ্টা করে—'চুপ করো, চুপ করো, মাসিমা,—এ কি ছাটোলোকের বাড়ি হলো? মেয়েটার কথা ভেবেও থামতে পারো না তোমরা?'

মাসিমা রুখে ওঠেন—'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। বৌয়ের কাছে মুরোদ নেই মাসিকে শাসন করতে আসে—লজ্জা নেই, কাপুরুষ? পাঁচ বছর ধরে যে কেবল বৌয়ে পা-ই চাটলি, বৌ তোকে পুঁছলো? বৌ তোকে—'

কানে আঙুল দিয়ে মেয়ে নিয়ে সরে আসে সত্যশরণ। তখনকার মতো মনে হয় এর চে মৃত্যু ভালো। বুকের মধ্যে সমস্ত দুঃখ পুষে রেখে তার দিন কাটে। অশান্তিতে উদ্বেগে আ হতাশায় তার মন অবিরাম পুড়ে যেতে থাকে।

এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন ধর্মতলার মোড়ে তার দেখা হয়ে গেলো বিকাশের সঙ্গে। কলে থেকে ফেরার পথে নেমেছিল সেখানে মেয়ের জন্য ট্রাইসাইকেল কিনতে। মন ছিলো দোকা দোকানে, পিঠে হাত পড়তেই চমকে উঠে ফিরে তাকালো। পুরোনো বন্ধু, একসঙ্গে পড়েছিলে দু'বছর। অবশ্য তাই বলে এমন নয় যে কোনোকালেই তার সঙ্গে সত্যশরণের খুব একা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো, তবু আজ অনেকদিন পরে বন্ধুটিকে দেখে সে সত্যি অত্য আনন্দবোধ করলো। অতীতের কোনো এক শান্তিময় জীবনের আভা যেন এখনো সে দেখতে পেলো এই বন্ধুটির উজ্জ্বল চোখে-মুখে। অকৃত্রিম খুশীতে বলে উঠলো, 'আরে, বিকাশ! তুমি তুমি কোথা থেকে?' বিকাশ হাসিমুখে বললো, 'ভালো আছো? এত রোগা হয়ে গেছো কেন?

দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলো রাস্তায়। দিল্লী থেকে বিকাশ ট্যুরে এসেছে এখানে কয়েকদিনে জন্য। এরকম মাঝে-মাঝেই সে আসে। কিন্তু অনেক বন্ধুদেরই ঠিকানা জানে না ব দেখাসাক্ষাৎও করতে পারে না। খানিকক্ষণ খবরাখবর চললো। সত্যশরণ বললো, 'রাস্তা দাঁড়িয়ে আর কতোক্ষণ? চলো আমার ওখানে। না-হয় যে ক'দিন আছ ওখানেই থাকবে।'

'না, না, সে কি হয়? হোটেলে যখন একবার উঠেছি—' মুখের থেকে কথা কেড়ে নি সত্যশরণ বললো, 'হোটেলে তো আর বণ্ড লিখে দাওনি যে একবার উঠলে অন্য কোথা যেতে পারবে না। চলো, চলো—'

খুব বেশি আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিলো না বিকাশের। হোটেল তার পক্ষে সুখে নয়। একটু বলাবলিতেই গেলো। আসলে বহুদিনের বিচ্ছেদের পর এই মিলনে দু'পক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলো। সত্যশরণকে নিয়ে বিকাশ প্রথমে তার হোটেলে এলো,—দু'দিনকা ছড়ানো সংসার গুছোতে গুছোতে চা-সহযোগে কত পুরোনো কথার জাবর কাটলো, তারপ একটা ট্যাক্সিতে মালপত্র চাপিয়ে রওনা হলো সে সত্যশরণের সঙ্গে।

বিকেলের আবির আলো ঘন ছাই-রং হলো, রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বলে উঠলো, মেয়ে ট্রাইসাইকেলের বদলে বন্ধু নিয়ে বাড়ি এলো সত্যশরণ, আর এসেই তার মনখারাপ হয়ে গেল স্বাধীনভাবে এ কর্মটি করা যে তার পক্ষে সমীচীন হয়নি, সে বিষয়ে এতক্ষণে অবহিত হ সে।

বলাই বাহুল্য, স্বামীর এই নির্বুদ্ধিতাকে লীলা ক্ষমা করতে পারলো না। জিনিস কিন বেরিয়ে, বলা নেই কওয়া নেই, জিনিসের বদলে হুট করে এক বন্ধুকে অতিথি করে বাড়ি নিয়ে আসা যে তার পক্ষে কত অপরাধের তার আর সীমা দেখতে পেলো না সে। গরিবে ঘোড়ারোগ! নিজেদেরই নেই মাথা গোঁজবার জায়গা, তা আবার বোঝার উপর শাকের আঁ রাগ করে সে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলো। অনুনয়ের সুরে চাপা গলায় সত্যশরণ বললো, ' লীলা! ওঠো। বাড়িতে কেউ এলে তাঁর সঙ্গে দেখা না-করা মানেই তাঁকে অপমান করা। ওঠে ওঠো—'

ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত রেখে লীলা চুপ করে রইল। সত্যশরণ এগিয়ে এসে হাত ধরে বললো, 'ওঠো, লক্ষ্মী তো, একটু খাওয়া-দাওয়ার—'

এক ঝটকায় হাত সরিয়ে বিরক্তিতে মুখর হয়ে উঠে লীলা বললো, 'কী বিরক্ত করছো বারে-বারে। বলেছি তো আমি পারবো না। যাও, প্যানপ্যান কোরো না।'

ম্লানমুখে সত্যশরণ উঠে গেলো তার কাছ থেকে। দুঃখে, ক্ষোভে আর একটা অন্ধ রাগে তার গলা যেন বুজে এলো। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একটু, তারপর মাসিমার শরণাপন্ন হলো। লীলার অনুপস্থিতিকে নিজের যত্ন দিয়ে যতটা সম্ভব পূরণ করবার চেষ্টা করলো সে। ছোটো বাড়ি—তারই মধ্যে আরামের সব রকম ব্যবস্থা করে দিলো। তেতলার উপর ছোট্ট একখানা ঘর ছিলো, সেই ঘরে আবোল-তাবোল জিনিসের ভিড় সরিয়ে পরদিন সকালেই ধুয়ে-মুছে খাট পাতলো, ছোটো একটি টেবিল আর চেয়ারে শোভিত হয়ে চারদিক্ খোলা ঘরখানা মুহূর্তে মনোরম হয়ে উঠলো। লজ্জিত হয়ে বিকাশ বললো, 'না ভাই, এ তুমি ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছো। এত বেশি অতিথি-সেবা কিন্তু ভালো কথা নয়, শেষে আর নড়তে চাইবো না এখান থেকে।'

'ভালোই তো', মুখের উপর চোখ রেখে আগ্রহভরে সত্যশরণ বললো, 'সত্যি, মাত্র সাতদিন থাকবে এ কি একটা কথা? অন্তত দু'সপ্তাহ তো নিশ্চয়ই।'

'তা তুমি যেরকম অতিথিপরায়ণ হয়ে উঠেছো তাতে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমার স্ত্রী কোথায়? তিনি কি অসূর্যম্পশ্যা নাকি?'

আকর্ণ লাল হয়ে সত্যশরণ বললো, 'একটু অসুস্থ আছেন কিনা। দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি।' সত্যশরণ নিচে নেমে গেলো। নিজের ঘরের সামনে গিয়ে একটু দাঁড়ালো চুপ করে। তারপর পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। লীলা আয়নার সামনে বসে পাউডার মাখছে মুখে, পোশাকেও তার প্রসাধনের ছাপ। সত্যশরণকে দেখে অত্যন্ত সহজ গলায় বললো, 'কই, তোমার বন্ধু কোথায়? ঠিকমতো চা পেয়েছিলে তো?'

'হুঁ।'

'এখন কি কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে হবে? তোমার কলেজ ক'টায়?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে গম্ভীর হয়ে সত্যশরণ বললো, 'কোথাও যাচ্ছো নাকি?'

'কোথায় যাবো? বাড়িতে অতিথি—'

'ও।'

আসলে কাল নিজেব ব্যবহারের জন্য লীলা নিজেই অত্যন্ত লজ্জাবোধ করছিলো। একজন বন্ধুকে না-হয় ভালোবেসে বাড়িতে ডেকেই এনেছে সত্যশরণ, এটা এমন অপরাধ কী? কেন লীলা ও-রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করলো? সারা রাত সত্যশরণের জন্য তার মন কেমন করেছে। মাঝে-মাঝে তার এরকম অনুশোচনা হয়। মনে-মনে বিশ্লেষণ করেছে কেন সে সত্যশরণের সঙ্গে ও-রকম উদ্ধত অভদ্র ব্যবহার করে, অথচ সে তো কত সহ্য করে—কত প্রশ্রয় দেয় তাকে।

পরদিন সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি চায়ের ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিলো সে খাবার ঘরে। রাত্তিরে সত্যশরণের সঙ্গে তার কোনো কথা হয়নি। সকালবেলাও তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলতে সাহস করেনি, কিন্তু মনে-মনে আশা করেছিলো সত্যশরণ তাকে অন্তত চা-খাবার সময়ে নিশ্চয়ই ডেকে নেবে। কিন্তু সত্যশরণের নীরবতা তাকে আরো ব্যাকুল করলো।

সত্যশরণকে আশ্চর্য করে দিয়ে লীলা বললো, 'চলো, তোমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিে দেবে—কাল কী-একটু বলেছি তাইতেই তুমি কী-রকম রাগ করে আছো!' বলতে-বলে স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

মাঝে-মাঝে লীলার ব্যবহারে একটা আশার বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে সত্যশরণে বুকের মধ্যে। ভারী গলায় বললো, 'চলো।' তার মনের ভাব এক নিমেষে হালকা হয়ে উঠলো

কলেজ থেকে ফিরে এসে কিন্তু সে আরো অবাক হয়ে গেলো। ইতিমধ্যেই বিকা চমৎকার জমিয়ে নিয়েছে লীলার সঙ্গে। তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বললো, 'আচ্ছা, দ্যাখে তো কী অন্যায়—ইনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন কেন?'

হাসিমুখে লীলা বললো, 'করবো না? কেন মিছিমিছি—

'মিছিমিছি? খুকুকে কি আমি কিছু দিতে পারি না? সত্যশরণের মেয়ের উপর কি আমা একটুও দাবি নেই?' কী বলো? বিকাশ সত্যশরণের পিঠের উপর হাত রাখলো।

সত্যশরণ বললো, 'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলো দেখি আগে।'

'দ্যাখো না', লীলা বললো, 'একটি রাজত্ব কিনে এনেছেন ইনি খুকুর জন্যে। এত্তে চকোলেট—এত্তো খেল্‌না—'

'তা রাজকন্যাটি কোথায়? তাকে তো দেখছিনে।' মেয়েকে দেখবার জন্য চারদিকে একট তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সত্যশরণ।

হাসিমুখে লীলা বললো, 'অত সম্পত্তি রক্ষা করা কি সহজ ব্যাপার? ভয়ানক ব্যস্ত সে।

সত্যশরণ একটুখানি তাকিয়ে রইলো লীলার দিকে। স্ত্রীর মুখের এই সহাস্য সরস ভাব যেন হঠাৎ সে বিশ্বাস করে উঠতে পারলো না। ভালোও লাগলো—আবার কোথায় যে একটা ব্যথার মতো অনুভব করলো বুকের মধ্যে।

পরের দিন বিকাশ সবাইকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলো ট্যাক্সি করে। গঙ্গার ধারে খানিক ঘোরাঘুরি করে শেষে থামলো এসে মার্কেটে।

'আরো, নামোই না', বিকাশ তার হাত ধরে আকর্ষণ করে লীলার দিকে তাকিয়ে বললে 'আপনি আসুন তো মেয়ে নিয়ে—'

মার্কেট সম্বন্ধে লীলার অফুরন্ত আগ্রহ। এ-আহ্বানে সে সুখী হলো, কিন্তু স্বামীর অনিচ্ছু ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করছিলো, বিকাশের আর-এক তাড়াতেই নেমে পড়লে

একটি জুয়েলারি দোকানে ঢুকলো তারা। লীলার কানের কাছে মুখে এনে বিকা ফিসফিসিয়ে বললো, 'একটা গলার কোনো জিনিস পছন্দ করুন তো।'

'কিনবেন?'

'দেখি।'

অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই এই কার্যভারটি লীলা গ্রহণ করে ঝুঁকে পড়লো শো-কেসটি উপর। উৎসাহদাতা বিকাশ—আর বেচারা সত্যশরণ নিতান্ত বিরস মুখে মেয়ে নিয়ে কো দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। একবার পিছন ফিরে বিকাশ বললো, 'এসো দেখবে।'

'না ভাই, ও-সব আমি বুঝি-টুঝি না।'

হাত তুলে লীলা বললো, 'মিছামিছি-ই ওঁকে ডাকছেন—অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং।'

'সত্যি, তুমি যেন কী।'—বিকাশ আবার মন দিলো ওদিকে।

অনেকক্ষণ পরে একটি জিনিস পছন্দ হলো লীলার। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, 'কিনতে চান তা এটা কিনুন—চমৎকার। অবিশ্যি দামও চমৎকার।'

ঈষৎ চোখ টিপে মৃদু গলায় বিকাশ বললো, 'যার জন্যে, তিনি কিন্তু আরো চমৎকার।'

বিকাশের ভঙ্গিতে হঠাৎ যেন লীলা একটু চকিত হলো—মুখ তুলে বললো, 'কার জন্য?'

'একটা বিয়ের উপহার।'

'ও'—এবার লীলা নিশ্চিন্ত বোধ করলো। বিকাশ বললো, 'তাহলে এটাই পছন্দ করছেন াপনি? দাম কত? পকেট থেকে টাকা বার করে নেকলেসটি কিনে নিলো বিকাশ।

বাড়ি ফিরেই কেসটি সে লীলার হাতে দিয়ে বললো, 'দেখুন, আমাদের একটা দেশাচার াছে। বৌ দেখতে দর্শনী লাগে—বিয়েতে উপস্থিত ছিলুম না—দুর্ভাগ্য। কিন্তু—'

'ছি-ছি, এ অসম্ভব—' লীলা লাল হয়ে উঠলো।

দুঃখিত হয়ে বিকাশ বললো, 'অত্যন্ত সামান্য জিনিস—কেবল আমার আনন্দের একটা াকাশ মাত্র। এ নিতেও যদি আপনি এত কুণ্ঠিত হন—'

বাধা দিয়ে সত্যশরণ বললো, 'বিকাশ, তুমি দয়া করে যে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছো াই আমার পক্ষে যথেষ্ট—বলাই বাহুল্য, আমার মতো দরিদ্রের আতিথ্য খুব সুখকর নয়। নেক অসুবিধে হচ্ছে তোমার, কিন্তু তাই বলে তুমি যদি ও-রকম লৌকিকতা করতে থাকো াহলে বলতেই হয় গরিবখানায় টেনে আনবার এই শাস্তি—'

অত্যন্ত আহত হয়ে বিকাশ বললো, 'এ-কথা তুমি মনে আনতে পারলে, সত্যশরণ? আনন্দ রে বন্ধুর স্ত্রীর জন্যে একটা উপহার কেনা কি এতই অপরাধ!' বলতে-বলতে বিকাশ হাত াড়ালো লীলার দিকে, বললো, 'দিন্, সত্যি যদি এটার জন্যে আপনাদের তিলমাত্রও অসম্মান য় এই মুহূর্তে এটা বর্জন করা ভালো।'

লীলা দিতে গিয়ে হঠাৎ ফিরিয়ে আনলো হাত—একটুখানি চুপ করে থেকে বললো, 'কেউ ালোবেসে দিলে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করবো না, আমি কি এতই মূঢ়? বসুন—আমি চা করতে বলে আসি।'

নেকলেসের কেসটি হাতে নিয়ে লীলা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

বকাশের পৈতৃক জোর ছিলো চিরকালই। দু'হাতে খরচ করবার ঝোঁকও তার চিরকালের। ত্যশরণের সঙ্গে তার কখনোই কোনো মিল ছিলো না—বি. এ. ক্লাসে দু'বছর তারা একই রে বসেছে এই পর্যন্ত—তারপর সত্যশরণ গেলো তাকে ডিঙিয়ে—বিকাশ আরো দু'বছর ্যর্থ চেষ্টা করেও আর তার নাগাল পেলো না। এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়ে সত্যশরণ যখন াকরির উমেদারিতে এ-দরজা থেকে সে-দরজায় ঘুরছে তখন বিকাশ গেলো বিদেশে।

বিদেশে গিয়ে সে অনেক পয়সা উড়ালো, অনেক সময় নষ্ট করলো, অবশেষে কৃষিবিদ্যা শখে ফিরে এলো দেশে। বলাই বাহুল্য, দেশে ফিরে তাকে বেকার-সংঘের মেম্বর হতে হলো া। কেন না যার খুঁটির জোর আছে তার সবই আছে। অতএব এসেই বাপের সুপারিশে মস্ত াকুরে হয়ে বসলো।

প্রকৃতি তার চিরদিনই চপল। হয়তো শৈশবেই মাতৃহীন হওয়ায় জীবনে এত ভারসাম্যের অভাব ঘটেছিলো। ছাত্রাবস্থায় এই চপলতার রূপটি একটু নিরীহ ছিলো—সাধারণত সহপাঠিনী

বা আশেপাশের তরুণীদের প্রতিই তার অনুরাগ আবদ্ধ থাকতো—কিন্তু বিলেত গিয়ে ভা
চালাক হয়ে গেলো। ফিরে এসেও সেই উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রাটি যখন সংযত করতে পারলো ন
বাপ অস্থির হয়ে উঠলেন বিয়ে দেবার জন্যে। অপরিসীম অবজ্ঞায় বিকাশ মৃদু হাসলে
জীবনটা কি এতই মূল্যহীন যে, ঐ একটি সংকীর্ণ পরিধিতেই তার সমাপ্তি ঘটাতে পারে
বাপের চেষ্টা ব্যর্থ করলো সে।

বছর তিনেক পরে যখন পিতার মৃত্যু ঘটলো, হঠাৎ বিকাশ বড়ো একা হয়ে গেলে
একজন স্ত্রীলোককে কেন্দ্র না-করলে সত্যিই যে জীবনে কোনো প্রশান্তি আসে না, এ-কথা
সে বার-বার মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে লাগলো। নিজে থেকেই দমিত হয়ে এলো ত
উচ্ছৃঙ্খলতা—কিন্তু বিয়ে করা আর ঘটে উঠলো না—কিছুতেই এমন একটা যোগাযোগ ঘটে
না, যা শেষ পর্যন্ত বিবাহে পরিণতি লাভ করতে পারে।

এখানে সত্যশরণের আতিথ্য গ্রহণ করে বহুদিনের একটা বঞ্চিত আকাঙক্ষা যেন হঠ
মাথা-নাড়া দিয়ে উঠলো। প্রথমত, সৌন্দর্যের প্রতি তার অপরিসীম লোভ—আর লীলা সতি
সত্যিই সুন্দরী—তার উপর দু'একদিনের মধ্যেই সে বুঝতে পারলো সত্যশরণকে লীলা প্রস
মনে গ্রহণ করেনি। সে যে কী চায়, কিসের জন্য এই সংসার তাকে শান্তি দিতে পারে
না—বিকাশ যেন বুঝে ফেললো সেই গোপন তথ্যটি। প্রথম দর্শনেই তার চোখ আপ্যায়ি
হয়েছিলো—লীলার মতি-গতি বুঝে এবার নিজের ইচ্ছাশক্তিটাও সে প্রয়োগ করলো ত
প্রতি।

বিকাশের চেহারা সুন্দর—হাব-ভাব কথাবার্তায় পুরোদস্তুর সাহেব সে। গুনগুনি
ইংরেজী গান করে, শিস দেয় জোরে-জোরে—পাইপ মুখে দিয়ে পায়চারি করে খাবার ঘ
অভাব নেই, অভিযোগ নেই, ভাবনা চিন্তা কী জানে না—যেন টগবগ করছে প্রাণ শক্তিতে
চেহারায় তখনো সে অতি তরুণ। দু'বেলা ট্যাক্সি চড়ে বেড়াতে বেরোয়, রাশি-রাশি ফল কি
বাড়ি ফেরে, রাশি-রাশি ফুল—ভাবটাই অন্যরকম। অর্থাৎ মুঠো-মুঠো টাকা খরচ করাটাই যে
তার পেশা—এই যেন তার পরম আনন্দ।

লীলা মুগ্ধ হয়ে গেলো। সাতদিনের জায়গায় বিকাশ যখন চোদ্দদিন কাটিয়েও যাবার ন
করলো না, তখনো তার মনে হলো দিনগুলো যেন বড়ো ছোটো—বড়ো দ্রুত।

রাত্রিতে সত্যশরণের পাশে শুয়ে-শুয়ে লীলার আর ঘুম আসে না—রাত কাটলেই
সকাল, এ-কথাটাই বারে-বারে তার বুকের মধ্যে শিহরণ তোলে। এঁর কাছে সত্যশরণ কী?-
মনে মনে লীলা ভাবে—অকালপক্ক বৃদ্ধ—যেন প্রাণহীন জরদ্গব! পুঁথি, পুঁথি, পুঁথি—এই ম
অক্ষরগুলোর মধ্যেই যেন তার যত প্রাণরস নিহিত আছে। কল্পনার লঘুপক্ষে ভর করে লীল
মন কোথায় চলে যায়—হঠাৎ এক সময়ে সচেতন হয়ে কেঁপে ওঠে—ছি, এ-সব কী ভাব
সে? তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত সত্যশরণের দিকে পাশ ফিরে খুকুর বুকের উপর স্নেহভরে হ
রাখে—মনের মধ্যে যেন একটা অসহায় দুঃখ গুমরে-গুমরে উঠতে থাকে।

ভাবগতিক দেখে মাসিমার কিন্তু ভালো লাগলো না। একটু সতর্ক হলেন তিনি। মনে-ম
ভাবলেন, লোকটা যায়ই না বা কেন! রাগ হলো তার নিজের ছেলের উপরই। পৌরুষ য
নেই, সে কেমন পুরুষ!

লীলা আজকাল বাপের বাড়ি যেতে পারে না। ঘরে অতিথি—কেমন করে যাবে? নিজে
ঘরে শুয়ে-শুয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে মাসিমা। এর মধ্যে একদিন তিনি দিবা-শয্যা ত্য

করে উঠে পড়লেন আস্তে-আস্তে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে খাবাব-ঘরের কাছে আসতেই লীলার গলায় একটা সহজ হাসি শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

'বেশ মানুষ তো—আমি হাত দিলেই মিষ্টি হয়ে যায় বলছেন—'

'নিশ্চয়ই! এ-কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, আপনাকে দেখলেও পেট ভরে যায়।'

'তাহলে তো কথাই ছিলো না—আপনার বন্ধু তাহলে ঘরেই বসে থাকতেন।'

'বন্ধু থাকেন না কেন, জানি নে—আমি হলে থাকতুম।'

'থাকবার ব্যবস্থা করলেই তো হয়—বাংলাদেশে তো আর মেয়ের অভাব নেই!'

'মেয়ের অভাব নেই? কী বলছেন আপনি! আমি তো মাত্র একজন মেয়েই দেখলুম এদেশে—'

মাসিমার ভালো লাগলো না এ-রসিকতা—কথাটার জন্য নয়, কথার ভঙ্গির জন্য। হলোই বা বন্ধুজন। আবার তাঁর সত্যশরণের উপরই রাগ হলো। ভাবতে-ভাবতে তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন এবং লীলা এর উত্তরে কী বললো তা তিনি শুনতে পেলেন না, কিন্তু বিকাশের কথা শুনে তাঁর শরীরে আগুন ধরে গেলো।

—'জানতে চান কে সেই মেয়ে? আশ্চর্য, আপনি কি এখনো বোঝেন না সে-কথা? আমার হঠকারিতা মাপ করবেন, কিন্তু আজ যদি ঈশ্বর আমাকে কোনো বর দিতে চান তাহলে আমি কী বর চাইবো জানেন—?' এর পরেই বিকাশের স্বর অতিশয় খাদে নেমে এলো—মাসিমা শুনতে পেলেন না।

একটু পরেই লীলা আরক্তমুখে বেগে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মাসিমা ওর পায়ের শব্দ পেয়েই পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

সাড়ে-চারটা পর্যন্ত ক্লাস করে সত্যশরণ ফিরে এলো কলেজ থেকে। এসে সে হঠাৎ লীলার এমন একটা পরিবর্তন দেখলো যে, তার মনের আকাশ ভরে গেলো একটা নতুন আশায়। কিছুদিন থেকেই সে সংসারে বড়ো ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলো—কোনো আশা, কোনো উদ্যম যেন আর তার ছিলো না। কলেজ থেকে এসে অভ্যেস-মতো জামা না-খুলেই মেয়েকে আদর করে চুমু খেলো। লীলা বসে ছিলো খাটে, মুখখানা ঈষৎ মলিন। একবার চকিতে সে-মুখের দিকে তাকিয়ে লোভ গেলো ঘনিষ্ঠ হবার, কিন্তু নিজেকে সংযত করলো সে। হঠাৎ লীলা অভিমানের সুরে বললো, 'বাঃ, আমি বুঝি কেউ না?'

সত্যশরণ বিস্মিত হয়ে লীলার মুখের দিকে তাকালো, সহসা জবাব এলো না তার গলায়।

লীলা কাছে এসে সত্যশরণের হাতদুটো জড়িয়ে ধরে বললে, 'দোষ না-হয় আমি করি-ই, তাই বলে লঘুপাপে কি এই গুরুদণ্ড?'

সত্যশরণ লীলার নরম হাত নিজের বলিষ্ঠ হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে বললো, 'কী গুরুদণ্ড আমি দিলাম তোমাকে? তোমাকে কোনো দণ্ডই আমি দিতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই পারো। যদি দণ্ডদাতা কেউ হয়, সে একমাত্র তুমিই। মনে করে দ্যাখো তো, কতদিনের মধ্যেও ভালো করে কথা বলো না?'

'কথা কি আমি বলি না—বলতে তো তুমিই দাও না!'

'আমি অবুঝ—আমাকে বুঝিয়ে দাও—আমাকে ভালোমন্দ শিখিয়ে দাও—' বলতে-বলতে লীলার চোখ জলে ভরে গেলো।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ করে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলো।

চা খেতে বসে লীলা বললো, 'আচ্ছা, এই যে তোমার বন্ধু এসেছেন, ইনি যাবেন কবে বলতে পারো?'

মুখ তুলে মৃদু হেসে সত্যশরণ বললো, 'হঠাৎ তার উপর এত বীতরাগ কেন?'

'অনুরাগেরই বা কী দেখেছো!' লীলা আচমকা চটে উঠলো।

'কাজ ফুরোলেই যাবে,' সত্যশরণ উদাস ভঙ্গিতে বললো।

'এসেছিলেন তো তিনদিনের জন্যে—প্রায় যোলো দিন হলো। আশ্চর্য! তোমার মতো ভালোমানুষকে ঠকানো—' লীলা চুপ করে গেলো।

'ঠকাতে যদি কেউ চায় তবে সে ঠকাবেই—আমি ঠেকাবো কেমন করে?'

লীলা চকিতে সত্যশরণের মুখের দিকে তাকালো। সত্যশরণ কি মানুষের অন্তঃকরণ দেখতে পায়?

একটু চুপ করে থেকে সত্যশরণ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'দ্যাখো লিলি, সংসারে যে প্রবঞ্চনা করে বঞ্চিত সে-ই হয়—আমি অন্তত তা-ই বিশ্বাস করি।'

লিলি ডাকটা বহুকাল পরে শুনতে পেলো লীলা। বিবাহের অনতিপরেই এই অন্তরঙ্গ ডাকটি সত্যশরণ গ্রহণ করেছিলো নিজের গলায়, কিন্তু কী যে ব্যবধান রয়ে গেলো তাদের মধ্যে—কে যে পাথরের দেয়াল রচনা করলো মাঝখানে, দু'পক্ষই এগুতে গিয়ে কেবল দুঃখ পেলো।

এ-থা শুনে লীলা কেমন অস্থির হয়ে উঠলো—চায়ের কাপটা হাতে তুলে অকারণে একবার উঠে দাঁড়িয়ে তখুনি আবার বসে পড়ে বললো, 'চুরি করলেই কেবল চোর হয় না—চুরির যে প্রশ্রয় দেয় চোরের চেয়ে অপরাধ তারই বরং বেশি।'

'তা হলে পারে'—আলস্য ভাঙতে-ভাঙতে সত্যশরণ উঠে দাঁড়ালো।—'বিকাশ কোথায় গেছে?'

'বিকাশ আমার কে যে রাতদিন বিকাশের খোঁজ আমাকেই রাখতে হবে?'—রাগে লীলা গর্জে উঠলো।

সত্যশরণ মৃদু হেসে লীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'এই তো তুমি কত সহজে রাগ করো আর আমি কত সহজে তা ক্ষমা করি। তাই বলে কি লোকে আমাকেও রাগী বলবে?'

এই কথার জবাব লীলা তক্ষুণি দিতে পারলো না, কিন্তু একটু পরে বললো, 'রাগী নাই-বা বললো, কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে যে শাসন করতে পারে না—দোষ যে শুধরে দিতে পারে না, তাকেও লোকে এমন-কিছু বীরপুরুষ বলবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,—' সত্যশরণ সস্নেহে হাত বাড়িয়ে লীলাকে কাছে টেনে এনে বললো, 'এখন তুমি দরকারী কথাটা শোনো তো—তোমার বাবা আজ রাত্রে আমাকে একবার যেতে বলেছেন, তুমি যাবে নাকি?'

এর মধ্যে দরজার ঘন নীল পর্দা দুলে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ এসে ঘরে ঢুকলো। লীলা এবং সত্যশরণকে এত ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে দেখে সে অপ্রস্তুত হয়েছিলো কিনা বলা যায় না, মুখে বললো, 'Sorry—'

কিন্তু লীলা বিদ্যুৎবেগে সরে দাঁড়ালো সত্যশরণের সান্নিধ্য থেকে—মুখ তার টুকটুকে হয়ে
লা মুহূর্তে।
ক্ষমা করুন, মিসেস সেন, আমি বড়ো অসময়ে এসে পড়লাম—'
সত্যশরণ সহাস্যে বিকাশের পিঠে হাত রেখে বললো, 'আরে, তোমার ফরম্যালিটি রাখো
—' বিকাশ যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলো, সত্যশরণের কথায় থমকে দাঁড়ালো।
লীলা সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি প্রস্তুত হয়ে নিইগে, তুমি বেশি দেরি
রা না কিন্তু—'
বিকাশকে যেন সে গ্রাহ্যই করলো না—বিনা সম্ভাষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে
 বিকাশের মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেলো। সত্যশরণ বললো, 'বোসো
শ—ওর বাবা কী জানি কেন যাবার জন্য খবর পাঠিয়েছেন,—একটু যেতে হবে।'
'বেশ তো, তোমরা যাও—আমাকেও একটু বেরুতে হবে।'
'এই তো বেড়িয়ে ফিরলে, এক্ষুণি আবার কোথায় যাবে হে?'
'আছে একটু কাজ—' বলতে-বলতে সে অনুভব করলো লীলা এসে আবার ঘরে
ছে—বললো, 'রাত্তিরেও বাড়ি ফিরতে পারবো কিনা জানি নে!'
লীলা এগিয়ে এসে বললো, 'কেন?'
অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে ভান করে বিকাশ চম্‌কে ফিরে তাকালো লীলার দিকে। সে চোখের
তে কী ছিলো কী জানি—হঠাৎ লীলার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো।
বিকাশ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'তোমরা ঘুরে এসো, সত্য আমি চললুম—'
'আপনি চা না-খেয়ে যাবেন না।
না, দেখুন—' বিকাশ কিছু বলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, কেন না লীলা তার আদেশটা
ই যথেষ্ট মনে করলো যে বিকাশের কোনো কৈফিয়তে সে কান না-দিয়েই ঘর ছেড়ে চলে
লা, আর বিকাশ নিতান্ত নিরুপায়ের মতো মুখভঙ্গি করে সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে
লা।
একটু পরেই চায়ের পট্ হাতে লীলা ফিরে এসে সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললো,
ার নিশ্চয়ই জরুরী কোনো কাজ আছে, তুমি না-হয় চট্ করে একটু ঘুরে এসো গিয়ে।'
'তুমি তাহলে যাবে না?'
'না, যাবো না তা বলছিনে, এই একটু—'
'দেরি হবে?'—সত্যশরণের মুখ যেন শক্ত হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় কথা না-বলে সে বেরিয়ে
লা ঘর থেকে। সে ঘর থেকে বেরুতেই বিকাশ বললো, 'আপনি যান—আমি তো এখুনি
 যাবো।'
'কোথায় যাবেন?'
'যাবো—যেখানে হয়—'
'যেতেই হবে?'
'যেতে হবেই।'
এ-কথার পরে দু'জনেই দু'জনের দিকে চোখ তুলে তাকালো—দৃষ্টি মিলিত রেখে বিকাশ
বললো, 'আপনিই বলুন—যেতে কি হবে না?'

লীলা চোখ নামিয়ে নিঃশব্দে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললো, 'একটু বসুন, আমি আসছি।' .

লীলা শোবার ঘরে এসে দেখলো সত্যশরণ চুপ করে একটা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে লীলার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো—সত্যশরণ কী ভাবছে? আস্তে এসে সে পিঠে হাত রাখতেই সত্যশরণ চমকে উঠলো।

'কী ভাবছো?'

'না তো—'

'নিশ্চয়ই ভাবছো।'

ম্লান হেসে সত্যশরণ বললো, 'আমার মন যদি তুমি বোঝোই তাহলে তুমিই বুঝে নাও কী ভাবছি।'

'ভাবছো যে আমি বুঝি সত্যিই যাবো না—বুদ্ধি তোমার অনেক কিন্তু। ও-বাড়িতে ক'দিন ধরে যাই না জানো?'

লীলার ভাবে-ভঙ্গিতে সত্যশরণ অবাক্ না হয়ে পারলো না। সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললো, 'খুকু কোথায়?'

'মাসিমা বেড়াতে নিয়ে গেছেন।'

সত্যশরণ ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবি টেনে গায়ে দিলো। লীলা বললো, 'আমাকে ফেলেই যাবে?' ম্লান হেসে সত্যশরণ বললো, 'আমি নিয়ে যাবার কে?'

'সত্যি, তুমি যেন কী!' একটা লীলায়িত ভঙ্গি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললো, 'আমি আসছি, যেয়ো না কিন্তু—'

বিকাশের তখনো চা খাওয়া শেষ হয়নি—লীলাকে দেখে বললো, কী যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, ঘুরে আসি একটু। অনেকদিন যাই না—'

'আমি কিন্তু সত্যি আজ রাত্তিরে এখানে খাবো না।'

'শোবেন তো?'

'তাও বলতে পারি না।'

'দেখুন—বলে গেলুম ফিরে এসে যেন আপনাকে দেখতে পাই।'

বিকাশ লীলার চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'এ কি দেবীর আদেশ নাকি?'

'আদেশ উপদেশ জানিনে—যা বললুম তা যেন করা হয়।'

এর পরে লীলা আর দাঁড়ালো না।

লীলা আর সত্যশরণ চলে যেতেই বিকাশ নিজের ঘরে এসে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলো। বিবেকের কাছে এই প্রথমবারের জন্য তার নিজেকে নিতান্ত অপরাধী মনে হলো লীলা মজেছে, কিন্তু মজালো কে? ক্রমাগত সে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করতে লাগলো, আর ভাবতে লাগলো সত্যশরণের কথা। যে-মানুষ লক্ষজনের একজন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী সে? হঠাৎ কেমন একটা সমবেদনায় তার মন ভরে গেলো। হঠাৎ যেন নিজেকে বড়ো অসহায়, বড়ো ছোটো মনে হলো তার। লোকটা যে সত্যি কত ভালো, কত মহৎ—

কথা তো সে জানে! মনে-মনে বিকাশের নতুন করে সত্যশরণকে ভালোবাসতে ইচ্ছে পেলো। কিন্তু লীলার প্রতি আকর্ষণও তার কম নয়। সত্যশরণ যে নিজের স্ত্রীকে নিজের দিকে ফেরাতে পারে না, সে দোষ কি তার? অমন সুন্দর পদ্মের মতো মেয়ে—সে-মেয়ে যদি তাকে ভালোবাসে—সে তা প্রত্যাখ্যান করবে, এতবড়ো মূঢ়তারও অর্থ হয় না।—বিকাশ নিজের মনে-মনে নানারকম যুক্তিতর্ক করে নিজের বিবেককে শান্ত করতে লাগলো, তারপর একসময়ে নিজের অসুখ বলে আরো পনেরো দিনের ছুটির একখানা দরখাস্ত লিখতে বসলো।

মাসিমা কোনোদিনও বিকাশের ঘরে আসেন না—প্রথম-প্রথম একটু-আধটু আদর-আপ্যায়ন করতেন, কিন্তু আজ প্রায় পাঁচ দিনের মধ্যেও সে মাসিমাকে চোখে দেখতে পায়নি। দরখাস্তখানা লিখে উঠে দাঁড়াতেই দেখলো, মাসিমা এসে সত্যশরণের মেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তার পিছনে। 'কী, মাসিমা?'—সহাস্যে বিকাশ নিতান্ত অমায়িকভাবে এগিয়ে এলো মাসিমার কাছে। সত্যশরণের মেয়েকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বললো, 'কী রে দুষ্টু, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

মাসিমা বললেন, 'ওরা কোথায় গেছে?'

'সত্যশরণ তো বললো ওর শ্বশুর নাকি ডেকে পাঠিয়েছেন।'

মাসিমা কী যেন বলতে এসেছিলেন, কিন্তু কেবলি তিনি ঢোঁক গিলতে লাগলেন। বিকাশ চালাক লোক—মাসিমা যে তাকে বিশেষ ভালো চোখে দেখছেন না আজকাল, এটা সে বুঝতে পেরেছে—লীলার সঙ্গে মেলামেশায় যে তাঁর অনুমোদন নেই এও সে জানে—অত্যন্ত বিনীতভাবে সে মাসিমাকে নানারকম অভ্যর্থনা করে সত্যশরণের মেয়েকে আদর করে-করে তার মন যোগাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

খুকু বললো, 'বাবাল্ কাছে যাবো, ঠাকুমা।'

'বাবাল্ কাছে যাবি?'—বিকাশ ওকে বুকে নিয়ে বললো, 'চল নিয়ে যাই—মাসিমা, একে একটু নিয়ে যাই বাইরে?'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যে আমার একটা কথা ছিলো।'—মাসিমা অনেক চেষ্টা করে বললেন কথাটা।

বিকাশ চম্‌কে উঠলো, মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো নির্বোধের মতো।

মাসিমা বললেন, 'কিছু মনে কোরো না—লীলার না-হয় বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম, তাই বলে বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে তুমিও কি ওর সঙ্গে নির্বোধের মতো ব্যবহার করবে? তুমি তো জানো যে, ও একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, ভদ্রলোকের মেয়ে—'

বিকাশের ফরসা মুখ টুকটুকে হয়ে উঠলো নিমেষে। চট্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বললো, 'আপনি কী বলতে চান, মাসিমা? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

'ন্যায়-অন্যায়ের কথা নয়, বাবা—এখন শান্তি-অশান্তির কথাতেই দাঁড়িয়েছে। সত্যশরণ যখন তোমার বন্ধু, তুমি তাকে অবশ্যই চেনো। তার মধ্যে পাপ নেই, দোষ নেই, কারও দোষও সে দেখতে পায় না। তার চোখে ধুলো দেয়া অতিশয় সহজ এ-কথাও বোধহয় তুমি বোঝো।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না, মাসিমা—যদি অজ্ঞাতে দোষ করে থাকি, আমাকে ক্ষমা করুন—' বিকাশের মুখে একটা কারুণ্য ফুটে উঠলো।

মাসিমার কোমল মন ভিজতে সময় লাগে না—বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি দুঃখ বোধ করলেন। ঘরের শত্রুই বিভীষণ, তিনি আর দোষ দেবেন কাকে! গলার স্বর নরম করে বললেন, 'না. দোষ নয়, তবে একটু বিবেচনা করে চলো, এই আমার ইচ্ছা। দ্যাখো আজকালকার মানুষ তো নই আমি—স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশায় আমি অভ্যস্ত নই—আজকালকার ছেলেমেয়েদের ঠাট্টা-তামাশা আমার ভালো লাগে না।'

দুপুরবেলার কথা যে মাসিমার কানে গেছে, এ-কথা হঠাৎ মনে হলো বিকাশের।

এদিকে মাসিমাও খুকুকে দেখতে না-পেয়ে ব্যস্ত হয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

মাসিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই বিকাশ টেবিলের কাছে গিয়ে টুকরো-টুকরো করে দরখাস্তখানা ছিঁড়ে ফেললো, তারপর ব্র্যাকেট থেকে একটা জামা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলে বাড়ি থেকে।

এ-রাস্তায় ও-রাস্তায়,—পার্কে—ট্রামে এই ভাবে ঘুরে-ঘুরে রাত যখন প্রায় সাড়ে-ন'টা হঠাৎ সে ঢুকে পড়লো চৌরঙ্গিপাড়ার এক সিনেমায়।

এদিকে লীলা পিত্রালয় থেকে ফিরে এসেই দেখলো বিকাশ বাড়ি নেই—আত্মসম্মানে ঘা লাগলো তার। এত করে বলে গেলুম তবু এলো না? ভারী হয়ে উঠলো মন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে খাওয়া-দাওয়াও শেষ করলো—শুতেও গেলো—তবুও বিকাশ ফিরে এলো না সত্যশরণ বললো, 'বলেই তো ছিলো আজ সে রাত্তিরে কোথায় যাবে।' লীলার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আবার বললো, 'বিকাশ তো ছেলেমানুষ নয়, লীলা—ভয় নেই, ও হারিয়ে যাবে না।'

লীলা চটে উঠলো এ-কথায়, 'বাজে বকা তোমার বদভ্যাস—বিকাশ তোমার বন্ধু, আমার নয়।'

'তা কিন্তু মনে হয় না।'

'কী মনে হয়?—বিছানা থেকে উঠে বসলো লীলা। তার 'যুদ্ধং দেহি'' মূর্তিতে সত্যশরণ চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলো, কিন্তু কী জানি কেন সে হঠাৎ বলে ফেললো, 'মনে হয়, আমিই বিকাশ আর বিকাশই সত্যশরণ—'

কথাটা বলে ফেলেই সত্যশরণ সভয়ে একটা সাংঘাতিক জবাবের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে রইলো। লীলা কিন্তু এ-কথার জবাব দিলো না—সত্যশরণের উপর রাগ করা উচিত ছিলো তাও সে করলো না—চুপ করে বসে বসে যেন কথাটা উপলব্ধি করতে লাগলো। সত্যশরণ অস্পষ্ট আলোতে লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে ভারি মমতা বোধ করলো। কঠিন কথা বলা তার স্বভাব নয়, বিশেষত লীলাকে। অথচ আজ দু'তিন দিন থেকে তার মনের মধ্যে যে কেমন করছে, ইচ্ছে করে রাগারাগি করতে, কাউকে খুব কঠিন কথা বলতে। কতক্ষণ পরে আস্তে সে লীলাকে টেনে কাছে এনে সমস্ত শরীরে গভীর ভালোবাসার চিহ্ন এঁকে দিলো।

পরের দিন খুব সকালেই লীলার ঘুম ভেঙে গেলো। কেন ভাঙলো, কী আশায় ভাঙলো তার একটা অস্পষ্ট কারণও যেন সে খুঁজে পেলো মনের মধ্যে। অমনি নিজের উপর তার ঘৃণা হলো—রাগ হলো—ছি, এটা সে কী করছে! তার স্বামী দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তাঁর মতো মহৎ তো বিকাশ নয়? তবু বিকাশের উপর তার এ কী দুর্দমনীয় আকর্ষণ! মনকে সে বিবেকে

াসনে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো, কিন্তু এ-নেশা বড়ো নেশা—এখানে ধর্ম নেই, পাপ নেই, ণ্য নেই—কেবল টেনে নিয়ে যায়—জলের ঘূর্ণিতে পড়লে মানুষ যেমন কেবলই তলিয়ে ায়। ছোটো খাটে শুয়ে তখনো খুকু অঘোরে ঘুমুচ্ছে—লীলা জাপটে তাকে কোলে তুলে ালো—বুকের মধ্যে চেপে ধরে-ধরে অস্পষ্ট গুঞ্জনে বলতে লাগলো, 'সোনা রে, রক্ষা কর্ তার মা-কে—তোর ভালোবাসা দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখ্।' হঠাৎ তার কান খাড়া হলো। াইরে কে কড়া নাড়ছে না? খুকুকে শুইয়ে সে ত্রস্তা হরিণীর মতো উঠে দাঁড়ালো, তারপর টলো ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে।

দরজার বাইরে বিকাশকে দেখেই অভিমানে তার মুখ থমথমে হয়ে উঠলো, চোখে চোখ াড়তেই চোখ নিচু করলো। বিকাশ এই অভিমানের ভাষা জানে, মৃদু হেসে বললো, 'কী য়েছে? অতো মেঘ কেন?'

লীলা জবাব দিলো না। বিকাশ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থেকেই হাত-জোড় করে বললো, শুনুন—কালকে আপনার আদেশ যে রক্ষা করিনি সেজন্যে কিন্তু আমি দায়ী নই, আমার াতখানি সাহস নেই যে আপনার কথা অমান্য করবো।' এবার লীলা চোখ তুললো। বিকাশ হসে বললো, 'ঠিক জানি সে-জন্যে ভাগ্যে অনেক লাঞ্ছনা আছে। কিন্তু যা-ই বলুন, আপনার াছে লাঞ্ছিত হবারও যে যোগ্যতা আমার আছে—সে জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না-জানিয়ে ারছিনে।'

'কথায় আপনি সকলের ওপরে—নিন, দয়া করে এবার ভিতরে আসুন।'

বিকাশ দরজা বন্ধ করে লীলার পিছনে-পিছনে বসবার ঘরের দিকে আসতে-আসতে ললো, 'কেউ ওঠেনি?'

'এটা কি কারও উঠবার সময়?'

'কেন, আমি আর আপনি কি কারুর মধ্যে গণ্য নই?'

'বর্তমানে নয়।'—বলেই লীলা ফিরে তাকালো বিকাশের দিকে—বিকাশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হনে বললো, 'বর্তমানটাই ভবিষ্যতের প্রতিনিধি কিন্তু—'

লীলা জবাব না দিয়ে ঘরে এসে বললো, 'বসুন, কালকে ছিলেন কোথায়? আর এত ভোরেই বা এলেন কেমন করে?'

'ছিলুম এক বন্ধুর বাড়ি, আর এলুম মনের পাখায় ভর করে।'

'মনের যদি পাখাই ছিলো তবে সে-পাখা কাল রাত্তিরে ওড়েনি কেন?'

'মনের যেমন পাখাও আছে, মনের তেমন খাঁচাও আছে—বেশীর ভাগ সময়েই তো নকে খাঁচায় তালাবন্ধ করে রাখি—ঝটপট করে-করে কত ক্ষত-বিক্ষত হয়, তবু কি খুলতে পারি খাঁচার মুখ?'

লীলার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠলো—বিকাশ বললো, 'দেখুন, পাখি হলেই তার নজর থাকে ভালো ফলের দিকে—কিছুতেই এ-কথা ভেবে সে ক্ষান্ত হয় না যে এ-ফল অন্যের বাগানের।'

'বিকাশবাবু—' লীলা ঈষৎ রুষ্টস্বরে বললো, 'ভুলে যাবেন না যে পাখি মানুষ নয়—'

'মানুষও তো পাখি নয়, লীলা দেবী, তাই তো সমাজের এই কড়া বাঁধুনিতে মাথা খুঁড়ে মরি।'

'বাঁধন একটু কড়া থাকাই ভালো—আজকাল এতদিনকার বাঁধন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে এমন একটা জায়গায় এসেছে যে একটু টানলেই ছেঁড়বার সম্ভাবনা, তাই না আপনি এতখানি কথা আমাকে অনায়াসেই বলে যেতে পারলেন।'

লীলার কথায় বিকাশ অবাক হয়ে গেলো। চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চা হলে আমাকে ডাকবেন—আমি ঘরে আছি।' যেতে-যেতে একটু থেমে পেছন ফিরে লীলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'দেখুন, আজ দশটার মধ্যে আমার এক বন্ধুর ওখানে যেতে হবে—অত শিগগির বোধ হয় আপনাদের রান্না হবে না, না?'

'কেন, বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে কেন?'

'দেখা করতে—আজ তুফান মেলেই তো আমি চলে যাবো।'

'তাই নাকি? এটা আবার কখন ঠিক হলো? এইমাত্র বোধ হয়।'

বিকাশ আর কথা বললো না—কেবল লীলার চোখের উপর দু'বার চোখ ফেলে গম্ভীর মুখে চলে এলো নিজের ঘরে।

কালকে রাত জাগবার কোনো চিহ্ন এখনো মুখে অবশিষ্ট আছে কিনা সেটাই সে সর্বাগ্রে আয়না দিয়ে দেখতে লাগলো। এখানে আসবার আগে সে যথেষ্ট ফিটফাট হয়ে এসেছিলো কোনো-এক সেলুন থেকে—গালে এতটুকু দাড়ি নেই—ঘাড়ে এতটুকু বাড়তি চুল নেই, একেবারে পরিপাটি পাউডার-মাখা মুখ। তবুও চোখের কোলটা যেন বসে গেছে। শরীরটাও ক্লান্ত লাগছিলো—আয়নাটা রেখে সে জুতোসুদ্ধ পা নিয়েই বিছানার উপর কাত হলো। খানিক পরেই চা এলো ঘরে,—চা খেতে-খেতে বিকাশ মনে করলো, এই ভালো হলো, ওদের সঙ্গে গিয়ে একসঙ্গে চা খেলে সত্যশরণের মুখোমুখি তো বসতে হতো? চা খেয়ে সে আবার শুয়ে পড়লো।

সেই ঘুমের মধ্যে যে এতখানি সময় তাকে ফাঁকি দিয়েছে তা কেমন করে জানবে? রোদ চড়লো, বেলা বাড়লো, তুফান-মেলের সময় ধরো-ধরো হলো, তবু তার ঘুম ভাঙলো না অবশেষে লীলা এসে ডাকলো তাকে। তাকিয়ে অবাক্। হাসিমুখে লীলা বললো, 'চমৎকার!'

ঘুম-জড়ানো চোখে বিকাশকে বড়ো সুন্দর দেখালো। গৌরবর্ণ মুখে ঘুমের আমেজ—বড়ো-বড়ো ঈষৎ লাল চোখে যে কত স্বপ্ন মাখা—লীলা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো বিকাশের দিকে। হাই তুলে উঠে বসতে-বসতে বিকাশ বললো, ইস, এ যে দেখছি অনেক বেলা হয়ে গেছে!'

'বেলার তো বড়োই অপরাধ—'

'বেলার অপরাধ বলছি না তো—অপরাধ সব আমারি।'

'ও বাবা—' লীলা অন্তরঙ্গভাবে হেসে বললো,—'রাগ হয়েছে দেখছি—'

'কেন? রাগ দেখলেন কোথায়?'

'একেও যদি রাগ না বলি,—উঠুন—চান-টান নেই? আজ তো দশটার সময় যাওয়া হলো না বন্ধুর বাড়ি—তুফান-মেলটাও বোধ হয় মিস্ করবার ইচ্ছে আছে।'

'ইচ্ছেটা সময়-মতোই দেখানো ভালো। সত্যশরণ কোথায়? কলেজে চলে গেছে?'

'আপনার জন্যে অপেক্ষা করলে যে তাঁর চাকরি থাকে না।'

বিকাশ হাসলো। ও-ঘর থেকে লীলা মাসিমার গলা পেয়ে আর দাঁড়ালো না, যেতে-যেতে বললো, 'আপনি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন—আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।'

মাসিমা বোধ হয় এ-দিকে আসছিলেন, লীলাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'কোথায় ছিলে?'

'বিকাশবাবুকে চান করতে বলছিলাম।'

'বিকাশবাবুকে চান করতে বলবার জন্য বাড়িতে কি লোকের অভাব? লীলা, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ—আমার কথা শুনলে তোমার ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। তুমি এরকম ভাবে ঐ ছেলেটির সঙ্গে মেলামেশা কোরো না।'

লীলা চুপ করে শাশুড়ীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'মেলামেশা কার সঙ্গে করবো না-করবো, তাও কি আপনি বলে দেবেন?'

মাসিমা স্নেহভরে লীলার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া—আমি বলতে পারি বইকি। তুমিও নিজের মনে বিবেচনা করে দেখো।'

'আপনাদের মনে যদি এত কালি ছিলো তবে আমাকে বললেন না কেন—আগে থেকেই আমি অন্তঃপুরচারিণী হয়ে থাকতুম। এখন তো তা আর সম্ভব হয় না—'

'তুমি অনর্থক রাগ করছো, লীলা—তুমি এ-কথা সর্বদাই মনে রেখো আমি তোমাদের মঙ্গলাকাঙক্ষী। আর আমার বয়স তো অনেক হলো—অভিজ্ঞতাও তোমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী।'

লীলা আর কথার জবাব দিলো না, নিজের ঘরের দিকে চলে গেলো।

সত্যশরণের বেলা দুটো অবধিই ক্লাস ছিলো—বাড়ি ফিরে এসে সে দেখলো মেয়ে নিয়ে লীলা পিত্রালয়ে গেছে। মাসিমার খোঁজ করবার আগেই তিনি এ-ঘরে এলেন—তাঁর চোখ-মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ। সত্যশরণ জামা-কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বললো, 'ওরা কোথায়?'

মাসিমা বললেন, 'বাপের বাড়ি গেছে।'

'কেন?'

'কেন আবার কী—কখনো কি যায় না?'

'আজকাল কম যায় বলে বলছিলাম।'

মাসিমা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'রাগ করেছে আমার উপর।'

সত্যশরণ পিছন ফিরে প্যান্ট ভাঁজ করছিলো—এ-কথায় সে ফিরে দাঁড়ালো—'আবার কী হলো তোমাদের?'

'হয়েছে কিনা সে-কথাটা আমিও ভালো জানি না, কেন না তোমার বৌর কাছে আমি এমন কোনো অপরাধ করিনি যাতে তিনি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারেন।'

'আর ভালো লাগে না!'

মাসিমা বললেন, 'ভালো তোমার আরো অনেক লাগবে না—এ তো সবে সূত্রপাত। আমি বলছি, সত্য—ভালো চাও তো বাড়ি থেকে ও-আপদ তুমি বিদায় করো—'

'কী বলছো তুমি? কার কথা বলছো?' সত্যশরণ অত্যন্ত বিরক্তভাবে মাসিমার মুখের দিকে তাকালো।

'বিরক্তই হও, আর যাই হও—আমি একটা মানুষ যদ্দিন আছি, তদ্দিন ভালোমন্দ না বলে পারবো না। বিকাশকে আমার একটুও ভালো লাগে না।'

এ-কথায় সত্যশরণের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ঢোঁক গিলে বললো, 'কেন—কী হয়েছে?'

'এখনো কিছু হয়নি, কিন্তু হতেও দেরি নেই।'

'যাও, যাও—' অস্বাভাবিক জোরে সত্যশরণ বলে উঠলো।

মাসিমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'এর চেয়ে বেশী আ আমি কী বলবো, এখন তোমার বুদ্ধি আর ঈশ্বরের ইচ্ছা।' বলেই তিনি দ্রুত পায়ে ঘর ছে চলে গেলেন। হাতের প্যান্ট হাতেই রইলো, হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সত্যশরণ কী ভাবে লাগলো। আরো কতক্ষণ সে এ-ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতো বলা যায় না, বিকাশের ডাকে চমকে উঠলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিকাশ বললো, 'সত্য, আমি আসতে পারি?'

'এসো', সত্যশরণ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো দরজার দিকে। ঘরে এসেই বিকাশ বললো, 'আ ভাই আজই যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে তো দেখাশোনা হয়ই না মোটে, আমি যখন কাজে যাই তু থাকো বাড়িতে, আর আমি এলেই তুমি ছোটো কলেজে—' বিকাশ একটু হাসবার চে করলো।

সত্যশরণের মনে হলো বিকাশ বোধ হয় তাদের কথাবার্তা শুনেছে, মাসিমা কাণ্ড—লজ্জায় যেন সে মরে গেলো। বাড়িতে একজন অতিথি এলে তাকে যোগ্য সমাদ করাই ভদ্রতা—লীলাদের শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরকম—তাই মাসিমার চোখে যেটা বেমানান ম হয় সেটাই হয়তো তাদের ভদ্রতার রীতি। নিতান্ত অপরাধীর মতো মুখ করে বললো, 'আজ যাবে? কেন?'

'বাঃ, যেতে হবে না? কতদিন থাকলাম—এবার যাওয়াই দরকার।'

'তোমাকে কিছু যত্ন-আদর করা গেলো না—আমি তো জানোই সামাজিকতা একেবারে জানি না, আমার স্ত্রী আশা করি—' এটুকু বলতেই সত্যশরণের গলা যেন হঠাৎ আট গেলো।

বিকাশ হেসে বললো, 'নাঃ, তুমিও শেষে ফরম্যালিটি আরম্ভ করলে দেখছি— সত্যশরণের দু'হাত জড়িয়ে ধরে সে বললো, 'নাথিং, নাথিং—খুব ভালো ছিলাম, খুব সু ছিলাম—মনে মনে এখন এই-ই বলছি যে, তোমার উপর যেন আমার চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকে—মনে নেই, হোস্টেলে থাকতে আমার একবার অসুখ করেছিলো, আর তুমি—'

'থাক থাক—' সত্যশরণ নিজের প্রশংসা শুনতে হবে ভেবেই ওকে তাড়াতাড়ি থামি দিয়ে বললো, 'আজকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?'

থাকবার ইচ্ছে বিকাশের পুরোমাত্রায়, কিন্তু বিবেকের কাছে তো একটা কৈফিয়ত আছে আর সত্যশরণের মুখের দিকে তাকালে তার সত্যিই নিজেকে একটা পশু মনে হয়। তবু লোভ দমন করতে পারলো না। একটু ইতস্তত করে বললো, 'পারি না এমন নয়, তবে কী দরকার।'

যে মুহূর্তে বিকাশ এ-কথা বললো, সেই মুহূর্তে সত্যশরণের মনটা ভয়ানক খারাপ হ গেলো। অথচ ভাবতে গেলে এর তো কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। যখন সে বিকাশকে থাকবা জন্য অনুরোধ করলো তখন যে সে নিছক ভদ্রতার জন্যেই বলেনি এ-কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি তার মনের তলায়ও মাসিমার মনটাই বাসা বেঁধেছে? মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেলো তার বিকাশ সে-মুখ লক্ষ্য করলো কিনা বোঝা গেলো না, তক্ষুণি বললো, 'আজকেই যাবো—ম করেছি যখন, চলেই যাই—'

অসম্ভব ব্যাকুলভাবে সত্যশরণ বিকাশের হাত চেপে ধরে বললো, 'না, না, আজকের দিনটা থেকে যাও।'

'আশ্চর্য মানুষ তুমি—' বিকাশ কথাটা বলেই নিজের ঘরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললো, 'আমি উপরে আমার ঘরে চললুম। তুমি যখন চা খাবে আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, কেমন?' খানিক গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো, 'আচ্ছা, সত্য, তোমার মেয়ের কোনো নাম রাখোনি কেন? চিরদিন ও খুকু থাকবে নাকি?'

'তুমি রাখো না একটা নাম?'

'আমি রাখবো! অতবড়ো পণ্ডিত বাপের মেয়ে—তার নাম রাখবো নাকি আমি?'

'উঁহু—' সত্যশরণ মাথা নেড়ে বললো, 'পণ্ডিত মানুষের মগজটা বেশী ভালো থাকে না, স্ত্রী-কন্যার যোগ্য হবার ক্ষমতা তাদেরই সবচেয়ে কম।'

কথাটায় বিকাশ একটু যেন ধাক্কা খেলো, কিন্তু সামলে নিয়ে বললো, 'শকুন্তলা'র মতো একটা সুন্দর নাম আমি তো আর দেখিনে, বেশ ছোটো করে কুন্তলা-ও ডাকা যায়—চমৎকার! রাখো না নামটা?'

'বেশ তো।' অকৃত্রিম উৎসাহে সত্যশরণ বললো, 'খুব ভালো নাম—আমারও এ-নামটা খুব পছন্দ। তা ছাড়া লীলার সঙ্গে কুন্তলা তো চমৎকার শোনাবে। অনেক ধন্যবাদ, বিকাশ।'

'ভালো কথা—সত্য, আজ কিন্তু বিকেলে বেরিয়ে যেয়ো না—একসঙ্গে একটু ফূর্তি করা যাবে।'

'আজ? বিকেলে? কেন, কী করবে?'

'এই একটু সিনেমা-টিনেমা। নতুন ফিল্ম-টিল্মের খোঁজ রাখো নাকি?'

সত্যশরণ হেসে বললো, 'ও বালাই আমার নেই, ভাই। নিতান্ত ভালো কিছু না হলে—'

'তোমার স্ত্রীও যান না?'

'কেমন করে যাবেন—সঙ্গী বলতে তো এই একটামাত্র আমিই?'

'যেতে চান না?'

'চান বইকি—কিন্তু কী করবো বলো তো, ও আবার বাংলা-ছবির পোকা আর আমি পৃথিবীর সব কষ্টের মধ্যে বসে-বসে বাংলা ছবি দেখবার কষ্টটাই মারাত্মক মনে করি।'

'তাই বলে—'

'আমার খুব অন্যায় স্বীকার করি—কিন্তু আমার এও ইচ্ছে নয়, বিকাশ—যে লীলাব ও-সব ভালো লাগে।'

'যা, যা,—' বিকাশ হেসে বললো, 'এ তোমার বাড়াবাড়ি। আজ চলো যে-কোনো একটায় ঢুকে পড়া যাবে'খন—আরে দ্যাখো না ওরা কী করছে, দেশটা তো বসে নেই, নিশ্চয়ই এগিয়েছে অনেক।'

সত্যশরণ হেসে বললো, 'আচ্ছা, দেখা যাবে'খন—'

বিকাশ উঠে এলো নিজের ঘরে।

দোতলার ফ্ল্যাটে—তলায় ছোটো একখানা ঘর—মাত্র একখানাই, এবং ঐ ঘরখানাতেই বিকাশ থাকে। ঘরে এসেই সে আড়মোড়া ভেঙে একটা চেয়ারে বসলো—যাওয়াটা যে স্থগিত হলো এবং তা যে একান্তই সত্যশরণের ইচ্ছায় এ-কথাটা ভেবে মনে-মনে সে খুব আরাম পেলো এবং একটু পরেই চেয়ারে বসেই তার চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সত্যশরণের মাথায় যত রাজ্যের চিন্তা এসে ভিড় দাঁড়ালো। বেড-কভারে-ঢাকা খাটটার উপর আধোশোয়া অবস্থায় হাতে মাথার ভর একটা বইয়ে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো বটে, কিন্তু একটা অক্ষরও তার মগজে ঢুকলো না। রা হলো তার মাসিমার উপর—বুড়োমানুষদের কি মাথা-খারাপ হয়ে যায়? তিনি কী বলতে চান তিনি কি সন্দেহ করেন লীলাকে? আর সেই সন্দেহের বীজ তিনি ঢোকাতে চান তার মাথায় ছি-ছি, এর চেয়ে যে মৃত্যু ভালো। যদি লীলা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে এ-কথা, কী ভাব সে? কত কষ্ট হবে তার! লীলার কষ্ট হবে ভাবতেই তার মনটা বেদনায় ভরে উঠলো। ঘ ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের তলায় সাদা ধবধবে কপাল, পদ্মের মতো অপরূপ মুখ—কী সুন্দর—হঠা সত্যশরণ উঠে দাঁড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে পাঞ্জাবিটা টেনে গায়ে দিলো এবং জুতোর মধ্যে প গলাতে-গলাতে চেঁচিয়ে ডাকলো, 'মাসিমা?'

ডাকবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি এক কাপ চা নিয়ে ঘরে এলেন—আরেকটা প্লেটে সামান্য কি খাবার। নামিয়ে রেখে বললেন, 'এ কী. বেরুচ্ছিস নাকি?'

'হুঁ।'

'কোথায়?'

একটু লজ্জিত মুখে সত্যশরণ বললো, 'খুকুদের নিয়ে আসি।'

'চা-টা খেয়ে যা।'

'দাও—' অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সে চায়ের কাপটি শূন্য করে বললো, 'খাবার-টাবা রেখে দাও এখন, এক্ষুণি আসবো—এসে খাবো।'

মাসিমা গম্ভীর দৃষ্টিতে একবার তাকালেন ছেলের মুখের দিকে, তারপর ঘর থেকে বেরি গেলেন।

আনন্দবাবু বসবার ঘরে বসে-বসেই বই পড়ছিলেন, সত্যশরণকে ঢুকতে দেখে হাসিমু উঠে দাঁড়ালেন—'এসো, এসো, তোমাকে তো দেখতেই পাইনে!'

মাথা নিচু করে সত্যশরণ বললে, 'সময়ই পাইনে মোটে—আজ এই শনিবারটাই যা কি কম কাজ।'

'ইস! কী খাটুনি দ্যাখো তো—ক'টা টিউশনি করো তুমি?' জামাইয়ের কষ্টটা আনন্দবাবু মুখেই যেন ফুটে উঠলো।

সত্যশরণ বললো, 'তিনটে।'

'তিনটে?'—আনন্দবাবু আঁতকে উঠলেন—একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এভা ক'দিন চালাবে? শরীরটা তো দেখতে হবে? আর আমি কি তোমার কেউই নই?'

শেষের কথাটা এমন করে বললেন যে, সত্যশরণের দস্তুরমতো মমতা হলো আনন্দবাবু জন্য। বললো, 'এ আপনি কী বলছেন, আপনি ছাড়া আমার সত্যিই তো কেউ নেই। আম বাবা বেঁচে থাকলেও হয়তো আমি এর চেয়ে বেশী মনে করতুম না।'

'তা হলে একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে—''না'' বলতে পারবে না তুমি— আনন্দবাবু সত্যশরণের দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন। সত্যশরণ বললো, 'আপনি আদেশ কর আমি তো তা অমান্য করতে পারিনে—'

'তবে তুমি আমাকে এই অনুমতি দাও আমার জমিটা তুমি নেবে এবং বাড়িটা আমি ামার নামে তুলে দেবো।'

'বেশ তো। লীলা যদি রাজী হয়—'

'নিশ্চয়ই, এতে আবার লীলার মতামতের কথা ওঠে নাকি?'

আনন্দবাবু উৎসাহে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে-বেড়াতে বললেন, 'ছোটো ড়—এই ধরো খান-ছয়েক ঘর—একখানা বড়ো ঘর তোমাদের শোবার, আর একখানা টো তোমার স্টাডি—দু'খানা, আর একখানা বেয়ানঠাকরুনের—হলো তিনখানা, একখানা মণির খেলাধুলো করবার, আর দু'খানার মধ্যে একটা খাবার ঘর আর একটা -কেমন হলো তো? পছন্দ হলো?' বলেই তিনি টেবিল থেকে কাগজ-কলম তুলে সত্যশরণের দিকে না-তাকিয়েই প্ল্যান আঁকতে বসলেন—'এই যে, এই যে, এইখানা শোবার, এইখানা হলো স্টাডি'—বলতে বলতে তিনি সত্যশরণের দিকে তাকিয়েই চুপ গেলেন।

সত্যশরণ ইতস্তত করে বললো, 'আমি বলছিলাম কী, লীলাকে—'

'লীলার জন্যে ভাবছো কেন?' আনন্দবাবু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন সত্যশরণের দিকে। সত্যশরণ বুঝলো আনন্দবাবু ঈষৎ উত্তেজিত হয়েছেন; আর কথা না কেটে বললো, 'তা হলে আপনার খুশিমতোই সব হবে।'

ইতিমধ্যে যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি লীলার মা। বোধ হয় জামায়ের গলা পেয়েই তিনি উঠে এসেছেন, তবুও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ওমা, সত্যশরণ যে, কখন এলে?' তারপরেই একটু হেসে স্বামীকে খোঁচা দিয়ে বললেন, 'তুমিও যেমন! পড়েছো শ্বশুরের খপ্পরে, আর কি তোমার সাধ্য আছে নাকি উঠে যাবার! চলো, ভিতরে চলো।' আনন্দবাবু বললেন, 'কেন? কেন যাবে ভিতরে? ভিতরে কী আছে—তোমাদের সঙ্গে কথা বলে কোনো আরাম হয় মানুষের?'

'একটুও না—' স্বামীকে আর গ্রাহ্য না করে তিনি জামাইকে নিয়ে এলেন শোবার ঘরে। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'খুকু, তোর বাবা এসেছেন—' বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে খুকু ছুটে এলো এ-ঘরে, ঝাঁপিয়ে সে মুখ লুকোলো সত্যশরণের দুই হাঁটুর মধ্যে। সত্যশরণ ওকে বুকের মধ্যে জাপটে তুলে নিলো—দুই গালে চুমু খেয়ে বললো, 'তুমি যে আমাকে ফেলে চলে এসেছো?'

'আমি বুঝি? মা-ই তো আমাকে নিয়ে এলেন।'

'তুমি এলে কেন? বলতে পারলে না আমি যাবো না বাবাকে ফেলে?'

'আর আসবো না—কেমন?' কেমনটা বলতে গিয়ে একদিকের ঘাড়টা সে এত সাংঘাতিক নিচু করলো যে, সত্যশরণ আর লীলার মা দু'জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলো।

লীলার মা বললেন, 'না বাপু, তোমার মেয়ে বড়ো বেইমান, আমি যে এত করি আমার নামটিও করবে না, ওদিকে বাপের কথা বললেই মুখে আর হাসি ধরে না। দুষ্টু!' সজোরে উনি খুকুর গাল দুটো টিপে দিলেন। 'তুমি বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' সত্যশরণ বসলো। কিন্তু কী কথা বলবে শাশুড়ীর সঙ্গে? দু-একটা কথার পরেই কথা থেমে গেলো। লীলার মাও উঠে গেলেন। একটু পরে লীলাই এসে দাঁড়ালো সেখানে। সত্যশরণ একবার চোখ তুলে তাকিয়েই আবার ঘুরিয়ে নিলো চোখ। নীলাম্বরী শাড়ি পরেছে, চুল মেলে দিয়েছে পিঠ ভরে,

ছোট্টো সাদা কপালে লাল সিঁদুরের টিপ। এটা একটা অভিনব সাজ নয়, কিন্তু লীলার দিে
তাকিয়ে সত্যশরণ মুগ্ধ হয়ে গেলো। একটু চুপ করে থেকে বললো, 'বাড়ি যাবে না?'

'আজ আমি এখানে থাকবো।' লীলার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে
বললো, 'বাড়িতে অতিথি, তোমার কি ভালো দেখায় এখানে থাকাটা?'

'অতিথি যদ্দিন আছেন তদ্দিন আমি এখানেই থাকবো।'

'কী যে ছেলেমানুষি করো—' সত্যশরণ কাছে এগিয়ে এলো। লীলা খুকুর দিকে তাকিে
বললো, 'খুকু, তুমি বাইরে গিয়ে খেলা করো—' খুকু নিতান্ত অনিচ্ছায় বাবার কোল থেে
নেমে চলে গেলো। লীলা দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে বললো, 'ছেলেমানুষি বলো আর যা
বলো, মোট কথা, তোমার বন্ধু থাকতে আর আমি ও বাড়ি যাবো না।'

'কেন যাবে না?'

'না।'

'শোনো—' সত্যশরণ বললো, 'এরকম যদি করো তা হলে আমি ভয়ানক কষ্ট পাবে
আর, আমাকে তুমি সত্যই কি কষ্ট দিতে পারো কখনো?'

হঠাৎ লীলার চোখ ছলছল করে উঠলো; মাথা ঝেঁকে বললো, 'আমি যাবো না,
যাবো না, আমার না-যাওয়াই ভালো।'

'মাসিমা বুড়োমানুষ, তাঁর উপর কি আমাদের রাগ করা উচিত ? ওঁদের সময় ছিলো অ
রকমের, ওঁদের মনও তো অন্য রকমের হবে? তুমি কি বোঝো না—তুমি কি অবুঝ হ
যাবে?'

লীলা চোখ তুলে সত্যশরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সেখানে কে জানে কী দেখে
সে, সহসা দু'চোখ বেয়ে তার কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো। সত্যশরণ তাকে কাছে টে
নিয়ে বললো, 'সোনা, লক্ষ্মী, কে তোমাকে কাঁদিয়েছে! তুমি কাঁদলে কি আমি সইতে পারি

লীলা চুপ করে রইলো।

'আর রাগ নেই? বলো—মাসিমাকে তুমি ক্ষমা করেছো।'

বিষণ্ণ মুখে লীলা বললো, 'ক্ষমা আমি কাকে করবো, নিজেই আমি ক্ষমার অযোগ্য।'

এত বিনীত, এত সুন্দর কথা লীলা কখনোই বলে না, কিন্তু কয়েকদিন ধরেই সত্যশ
লক্ষ্য করছে লীলা যেন অন্যমানুষ হয়ে গেছে—তার কথা, তার ব্যবহার সবই যেন অ
মানুষের মতো। সত্যশরণ আজকের এই ব্যবহারও আশা করে আসেনি—একটা আসন্ন ঝড়ে
জন্যই সে প্রস্তুত হয়ে ছিলো। মনের মধ্যে একটা আলোড়ন অনুভব করে কতক্ষণ পর্য
সত্যশরণ কোনো কথা বলতে পারলে না। একটু পরে বললো, 'যে জানে সে ক্ষমার যোগ্য ন
সেই তো সবচেয়ে ক্ষমার যোগ্য। স্বীকৃতির মতো পুণ্য কি আর আছে?'

'স্বীকৃতি! কিসের স্বীকৃতি?'—লীলা আঁতকে উঠে সরে গেলো সত্যশরণের সান্নি
থেকে।

'কী বলতে চাও তুমি?' লীলার চোখে সত্যিকারের লীলা ফুটে উঠলো এবার।

সত্যশরণ নিতান্ত উদাসীনভাবে বললো, 'আমি কিছুই বলতে চাইনে—আমি কেবল বল
আর বেশীক্ষণ আমি এখানে বসবো না, বিকাশ অপেক্ষা করবে চায়ের জন্য—তা ছাড়া—

'তা ছাড়া কী?'

'তা ছাড়া ও বলছিলো আমাদের নিয়ে সিনেমায় যাবে। আমি তো বাংলা-ছ
ভালোবাসিনে, তুমি যেয়ো।'

ঈষৎ বিচলিত স্বরে লীলা বললো, 'আজকে না উনি চলে যাবেন বলছিলেন?'

'আমি যেতে দিলুম না।'

'কেন?' লীলা বিরক্তির সুরে বললো।

'কেন আবার? ইচ্ছে করলো না, তাই।'

'আমি যাবো না সিনেমায়।'

'আপাতত বাড়ি চলো, লীলা। সত্যি বিকাশ চায়ের অপেক্ষায় বসে থাকবে।'

একটু ভেবে লীলা বললো, 'মাকে বলতে হয় তা হলে, উনি নিশ্চয়ই তোমার খাবার াগাড়ে গেছেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুণি যাও, বারণ করো গিয়ে,' সত্যশরণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। লীলা ঘরের ইরে পা দিতেই দেখলো মা এদিকেই আসছেন—কাছে আসতেই বললো, 'মা, তুমি চায়ের বস্থা করো না—ও এক্ষুণি চলে যেতে চাইছে।'

'কে? সত্যশরণ? চাইলেই হলো?' তিনি মেয়ের কথায় কান না দিয়ে ঘরে এসে বললেন, ্মি নাকি না-খেয়েই যেতে চাইছো—সে কখনো হয়? আর, আমি তো রাত্রেও তোমাদের -খেয়ে যেতে দেবো না।'

সত্যশরণ কিছু বলবার আগেই লীলা এসে ব্যগ্র হয়ে বললো, 'না মা, আজ না, আজ না— ারেকদিন এসে হবে।'

হঠাৎ সত্যশরণের মনের মধ্যে আবার ধাক্কা লাগলো। কেন এই ব্যগ্রতা লীলার? এ-কি ধু অতিথিপরায়ণতাই, না আরো কিছু? নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, 'আমার বাড়িতে । অতিথি রয়েছেন, এতক্ষণ তিনি চায়ের জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, তার উপর াত্তিরের খাওয়া—সে কেমন করে হবে?'

'বেশ তো, অতিথিকে এখানেই আনিয়ে নাও না?'

সত্যশরণ লীলার দিকে তাকাতেই লীলা বললো, 'তা উনি আসবেন না।'

'কেন?' লীলার মা বললেন, 'তুই আর তোর বাবা গিয়ে নিয়ে আয়, নিশ্চয়ই আসবেন। াজ আমি সত্যকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না—এইটুকু তো পথ, আসে নাকি কখনো?'

সত্যশরণ বললো, 'আমার বন্ধুটির আজ লীলাদের নিয়ে সিনেমায় যাবার ইচ্ছে লো—আমি এ-জন্যেই ওদের নিতে এসেছিলাম—'

লীলার মা বাধা দিয়ে বললেন, 'বেশ তো। এখানে আসুক—এলে চা খেয়ে সবাই তোমরা ানেমায় যাও। তারপরে এখানেই ফিরে এসে, খেয়ে বাড়ি যেয়ো। তোমার মাসিমাকেও আমি ঠি লিখে পাঠাচ্ছি।'

'তা হলে তুমি যাও তোমার বাবার সঙ্গে—' সত্যশরণ লীলার মুখের দিকে তাকালো।

লীলা একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আমার আবার যাবার দরকার কী, বাবাই তো াবেন—'

লীলার মা বললেন, 'না, না, সে ভালো দেখায় না—তা ছাড়া তোর বাবার উপর ভরসা াছে? উনি কী বলতে কী বলবেন, হয়তো আসল কথাই না-বলে চলে আসবেন।'

লীলা সত্যশরণকে বললো, 'তা হলে তুমিই সঙ্গে যাও।'

'আচ্ছা—' বলে সত্যশরণ উঠে দাঁড়াতেই লীলা বললো, 'থাক, আমিই যাই, একটু রকারও ছিলো বাড়িতে—' কথাটা যে অছিলা এটা অনুভব করে লীলা নিজেই ভয়ানক

লজ্জিত হলো আর সত্যশরণ নিঃশ্বাস ফেলে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে বললো, 'তা ভালো, আমি বড়ো ক্লান্ত।'

মীমাংসা হয়ে গেলো দেখে লীলার মা স্বামীকে বলতে গেলেন এবং লীলাও কিছুক্ষ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলো।

বাড়ি গিয়ে লীলা তার বাবাকে বসিয়ে দ্রুত পায়ে তেতলায় উঠে গেলো। সিঁড়ি যেখানে শে হয়েছে ঘরের আরম্ভও সেখানেই। দরজাটা একেবারে হাঁ করে খোলা। ঘরের সমস্তই স্প দেখতে পেলো লীলা। জানলার ধারে ছোটো টেবিল পাতা—চেয়ারে বসে সেই টেবিলে প তুলে দিয়ে বিকাশ চোখ বুজে আছে। লীলা একটু কাশলো, শব্দ করলো, কিন্তু বিকাশে কোনো ইন্দ্রিয়ই সজাগ হলো না। অবশেষে সে ঘরে ঢুকে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ি ডাকলো, 'ঘুমুচ্ছেন?'

বিকাশ যেন স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে জেগে উঠলো এবং তক্ষুণি টেবিলের উপর থেকে প নামিয়ে বললো, 'Sorry—'

বিনা ভূমিকায় লীলা বললো, 'চলুন—'

'চা হয়েছে?'

'আজ্ঞে।'

'বোধ হয় অসুবিধে হলো—আপনি এলেন কখন?'

'এই মাত্র।'

'সত্য কই?'

'তিনি বর্তমানে তাঁর শ্বশুরবাড়ি।'

'শ্বশুরবাড়ি?' বাঃ, সে তার শ্বশুরবাড়ি, আর আপনি এখানে?'

'মন্দ কী! সে তার শ্বশুরবাড়ি, আমি আমার শ্বশুরবাড়ি। —কিন্তু না—সময় নিতা কম—আমার বাবা নিচে বসে অপেক্ষা করছেন আপনাকে নিয়ে যাবেন বলে।'

'আমাকে? কোথায়?' বিস্মিত হয়ে বিকাশ লীলার মুখের দিকে তাকালো এবং চোখে চো পড়তেই মৃদু হেসে বললো, 'দুষ্টুমি, না?'

'দুষ্টুমির সময় নেই। শিগগির উঠুন—'

'বা রে, কোথায় যাবো, কেন যাবো, কিছু বলবেন না—'

'তা হলে আমি চললুম—' লীলা পা বাড়াতেই বিকাশ খপ্ করে লীলার হাতটা ধ ফেললো এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিয়ে বললো, 'রাগ করলেন?'

লীলার মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। একটু চুপ করে থেকে বললো, 'আমার বাবা আপনা নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। এখন গিয়ে চা খাবেন এবং রাত্তিরে ভাত। আমি নিচে যাচ্ছি, আপ আসুন—'

লীলা চলে গেলো। বিকাশ থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবলো, তারপর যে-হাত দি লীলার হাত সে চেপে ধরেছিলো সে-হাতে চুম্বন করলো।

লীলা দোতলায় নেমেই গেলো শাশুড়ীর ঘরে। পিছন ফিরে তিনি শুয়েছিলেন—লীলা পায়ের শব্দেই মুখ ফেরালেন। লীলা বললো, 'মাসিমা, মা একটা চিঠি দিয়েছেন আপনাকে— মাসিমা লীলার মুখ লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হলেন। নাঃ, মেয়েটার রাগ নেই, আর যাই হোব

সিমা হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেখি—' চিঠি পড়েই তিনি উঠে বসলেন, 'ওমা, তোমার বাবা সেছেন নাকি? কই তিনি?' মাসিমা বিছানা ছেড়ে কাপড় ঠিক করে বসবার ঘরে এলেন। ানন্দবাবু হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই যে বেয়ান, আসুন আসুন, আমি এসেছিলাম ছেলেটিকে নিয়ে যেতে—'

মাসিমার মুখের হাসি মলিন হয়ে গেলো। 'কাকে? বিকাশকে? কেন? ওর জন্যে তো ামি-ই বাড়িতে রয়েছি।'

'না, না, সে কি হয়!'

এই কথোপকথনের মধ্যে লীলা আর দাঁড়ালো না—শোবার ঘরে এসে আলমারি খুলে সে ালো সিল্কের সোনালী-পাড়ের একখানা শাড়ি বার করলো,—গলার, হাতের, কানের সমস্ত দানা খুলে জড়োয়ার সেট্ পরে নিলো এবং শাড়িখানা আর একজোড়া দামী স্যুয়েডের হীল-তালা জুতো খবরের কাগজে মুড়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। আনন্দবাবু বললেন, 'কই, ছলেটি এলো না? ডাকিস নি?'

'না, এই যাই—' মাসিমার মুখোমুখি এই মিথ্যেকথাটা বলে বিনা দ্বিধায় লীলা আবার তেতলায় উঠে এলো।

বিকাশ বেরিয়ে আসছিলো ঘর থেকে। ঈষৎ বাদামী রঙের সিল্কের স্যুট পরেছে, মুখ থাসম্ভব পালিশ, মাথার চুল ব্যাকব্রাশ করা—লীলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বিকাশের দিকে। াঙালী ছেলের এমন চেহারা হয়।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে খুব কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বিকাশ বললো, 'কী দেখছেন?'

লীলা জবাব দিলো না। বিকাশ সিগারেটটা জুতোর তলায় ঘষে নিবিয়ে দিয়ে বললো, 'রাগ রেছেন?'

'যদি করি?'

'আমি কি আপনার ক্ষমার যোগ্য নই?' অত্যন্ত মনোহর ভঙ্গিতে সে তাকিয়ে রইলো ীলার দিকে। লীলা অস্পষ্ট স্বরে বললো, 'সে-কথাই যদি বলেন, তা হলে কি আমি আপনি কউই ক্ষমার যোগ্য?'

'শরীরকে আমি থামাতে পারি বলপ্রয়োগ করে, কিন্তু হৃদয়ের উপর কি মানুষের হাত াছে?'

'আছে। মানুষ তো সেইজন্যেই মানুষ—যে, মনের উপরও তার প্রচণ্ড সংযম', বলেই ীলা নিচে নামতে-নামতে সহজ গলায় ডাকলো, 'আসুন বিকাশবাবু, বড়ো দেরি হয়ে াচ্ছে—'

আনন্দবাবুর কাছে এসে বললো, 'চলো, বাবা। মাসিমা, আমরা দশটা-এগারোটার মধ্যেই ফরে আসবো।

বিকাশ নেমে আসতেই লীলা বললো, 'এই যে আমার বাবা, আর ইনি বিকাশ পাকড়াশী। ামাদের বন্ধু।' প্রথম পরিচয়ের পালা সেরেই তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো, হঠাৎ কী নে পড়ায় বিকাশ বললো, 'আপনারা নামুন, এক্ষুণি আসছি।'—ব'লেই সে তিন লাফে াবার তেতলায় উঠে গেলো। আনন্দবাবু আর লীলা নিচের সিঁড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে াগলো। একই সিঁড়ি তেতলা পর্যন্ত উঠে গেছে একেবারে সোজা হয়ে—একটু পরেই নিচে থেকে লীলা দেখতে পেলো বিকাশ নেমে আসছে দ্রুত পায়ে এবং কয়েক সিঁড়ি নামতেই হঠাৎ

পা ফসকে সে গড়িয়ে পড়লো। 'গেলো—গেলো' করে আনন্দবাবু আর লীলা দৌড়ে গে কাছে, কিন্তু ধরতে-ধরতেও সে কয়েক সিঁড়ি গড়ালো। আনন্দবাবু বললেন, 'লেগেছে? ব লেগেছে? কোথায়?'

বিকাশ ওঠবার চেষ্টা করলো, কিন্তু আর্তনাদ করে তক্ষুণি বসে পড়লো। লীলা কাঁদে কাঁদো গলায় বললো, 'কোথায়? পায়ে? পায়ে লেগেছে?' নিচু হয়ে সে পায়ে হাত রাখলে উপর থেকে মাসিমা ছুটে এলেন—চাকররা ঘুম ভেঙে দৌড়ে এলো, তারপর ধরাধরি ক তোলা হলো বিকাশকে, লীলার শোবার ঘরের খাটেই তাকে শুইয়ে দেয়া হলো। মুহূর্তে এম একটা বিপর্যয় ঘটতে পারে এটা কেউ আশাই করেনি। চোট পেয়েছে সাংঘাতিক—সবচে বোধ হয় কোমরে আর পায়ে—কপালের একটা দিকও দেখতে-দেখতে ফুলে উঠলো। লী ব্যাকুল হয়ে চাকরদের বললো, 'ওরে, তোরা দৌড়ে যা, বরফ নিয়ে আয়—বাবা, তু ডাক্তারকে বরং খবর দাও, আর ওঁকে—'

বিকাশ হাত নেড়ে বললো, 'ব্যস্ত হবেন না, এখুনি কমে যাবে, কিচ্ছু দরকার নে ডাক্তারের—' কিন্তু অসহ্য ব্যথায় সে কাতর হয়ে ক্ষীণস্বরে ককিয়ে উঠলো।

লীলা দৌড়ে গিয়ে বালতি ভরে বাথরুম থেকে জল নিয়ে এলো—জলপটি দিতে লাগলে কপালে—কখনো হাত বুলোতে লাগলো পায়ে—মাসিমা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর ব্যাকুলতা দে নিঃশ্বাস ছেড়ে সরে গেলেন সেখান থেকে।

আনন্দবাবু বললেন, 'তুই অত ব্যস্ত হোস নে লিলি, আমি যাচ্ছি—এক্ষুণি সত্যকে পাঠি দিচ্ছি, ডাক্তারকেও পাঠিয়ে দেবো।' বিকাশের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'কোথায় লেগে বাবা? এখানে? কোমরে? বড্ড লেগেছে?'

'বড্ড—' কাতরকণ্ঠে বলতে গিয়ে ব্যথায় বিকাশের চোখ ভরে জল এলো। আনন্দবা আর দেরি করলেন না, তক্ষুণি নেমে গেলেন। বিষণ্ণমুখে লীলা মাথার কাছে বসে রইলো।

একটু পরেই সত্যশরণ ব্যস্ত হয়ে ফিরে এলো। লীলা মাথার কাছ থেকে উঠে দাঁড়ি বললো, 'কী কাণ্ড হলো বলো তো!'

'কেমন করে পড়ে গেলো?'—বলতে বলতে বিকাশের কাছে গিয়ে ডাকলো, 'বিকাশ!'

'উঃ—'

'কোথায় বেশী লেগেছে? পা-টা মচকে-টচকে যায়নি তো?'

চোখ মেলে বিকাশ বললো, 'কোমরটাতেই অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার মনে হয় ওখানেই কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।'

'ডাক্তার আসছেন এক্ষুণি, সব কষ্ট বলো তাঁকে। ছি, ছি, কী দুর্ভোগ বলো তো!' সত্যশরণ স্নেহভরে বিকাশের গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। লীলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ কী, তোমার শাড়ি যে একেবারে ভিজে গেছে—যাও, শাড়িটা ছেড়ে এসো, আর চায়েরও একটু ব্যবস্থা করো। গলা যেন আমার শুকিয়ে আসছে।'

বিকাশ বললো, 'আমার জন্যেই তোমাদের এত কষ্ট, সেই কখন এসেছো কলেজ থেকে—'

'তুমি ব্যস্ত হয়ো না, বিকাশ, তোমারও তো চা খাওয়া হয়নি এখনো।'

লীলা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন বিকাশকে, চিন্তিতমুখে বললেন, 'আপাতত ব্যথাটা কো হলেও আমার মনে হয় হাঁটু-ই ওঁর জখন হয়েছে। এক্স-রে না করলে তো বোঝা যাবে

'এক্স-রে? তবে কি হাড় ভেঙেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। অবশ্যি তা নাও হতে পারে, কেন না এমন অনেক দেখা গেছে যে, ন হয় হাড় ভেঙেছে কি সরেছে অথচ শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে—মচকালেও ও-রকম হয়। খছেন না কত অল্প সময়ে কী রকম ফুলে উঠেছে পা-টা?'

প্যান্টটা তুলে হাঁটুটা দেখতেই সত্যশরণ আঁতকে উঠলো।

ডাক্তার প্রেসকৃপশন লিখে দিয়ে হাত ধুতে-ধুতে বললেন, 'আজ রাতটা একটু কষ্ট পাবেন থায়—সামান্য জ্বরও হতে পারে, ভাববেন না কিছু, আমি কাল সকালবেলা আবার সবো।'

ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন, সত্যশরণও সঙ্গে-সঙ্গে নিচে গেলো।

লীলা ডাক্তারের যাবার অপেক্ষাই করছিলো, চলে যেতেই চাকরকে দিয়ে চা নিয়ে ঘরে লো। বিকাশের মাথার কাছে এসে বললো, 'একটু চা দি', কেমন?'

'না।'

'না কেন?' লীলা কপালে হাত রেখে বললো, 'ডাক্তার বলছিলেন জ্বর হবে—কই, গা া খুব ঠাণ্ডা।'

বিকাশ লীলার হাতের উপর হাত রেখে বললো, 'জ্বর কি তখুনি আসে—হয়তো বেশি ত্তিরে হবে—আর সমস্তটা রাত ছটফট করে কাটবে।'

হাতের উপর হাত পড়তেই লীলা কেঁপে উঠলো, কিন্তু সরিয়ে নিলো না, আবিষ্টের মতো ঃশব্দে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘর অন্ধকার হয়ে এসেছে, আলো জ্বালা নিতান্ত দরকার, ন্তু সে-খেয়াল তার ছিলো না। সহসা সিঁড়িতে সত্যশরণের পায়ের শব্দে সে চমকে উঠে ত সরিয়ে আনলো বিকাশের হাতের তলা থেকে এবং সুইচ টিপে তক্ষুণি সমস্ত ঘর আলোয় াবিত করে দিলো। চায়ের ট্রের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে চা ছাঁকতে মন দিলো বটে, ন্তু হাত তার থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

সত্যশরণ ঘরে এসে বিমর্ষমুখে বললো, 'লীলা, শুনেছো ডাক্তার কী বললেন?'

মুখ না-তুলেই লীলা বললো, 'কী?'

'ওকে এক্স-রে করা দরকার, হাঁটুর কোনো হাড় ভেঙেছে বলেই তাঁর বিশ্বাস।'

লীলা চায়ের কাপটি সত্যশরণের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'তুমি ব্যস্ত না হয়ে একটু স্থিরে চা খাও। বিকাশবাবু, আপনিও একটু খান, দেখবেন ভালো লাগবে।' মাথার কাছে কটা ছোটো টিপয় রেখে সে এক কাপ চা এগিয়ে দিলো।

সত্যশরণ বললো, 'খুব ব্যথা করছে, না হে?'

'না, খুব কিছু তো মনে হচ্ছে না, জানি না রাত্তিরে কী হবে।'

লীলাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে সত্যশরণ বললো, 'তুমি চা নিলে না?'

'নেবো, শিঙাড়া ভাজতে বলেছিলাম ওদের—আসুক, তোমাকে দিয়ে নিই।'

'না, না, তুমি চা নাও, ওরা আসুক না—আর ঐ মিষ্টিই তো আছে, দাও না,—ওতেই বে।'

'মিষ্টি দিয়ে মানুষ কখনো চা খেতে পারে—'

'হ্যাঁ, আমি পারি। তুমি চা নাও।' সত্যশরণ নিজের হাতের কাপ নামিয়ে রেখে লীলার ন্য চা ঢেলে বললো, 'খুকুকে এখন আনিয়ে নেয়া উচিত, না?'

চায়ের কাপটা সত্যশরণের হাত থেকে নিয়ে বিমর্ষমুখে লীলা বললো, 'আমি তে ভেবেছিলাম বাবাই নিয়ে আসবেন।'

বিকাশ বললো, 'সত্য, তোমার স্ত্রীকে বলেছো তোমার মেয়ের নাম আমি কী রেখেছি?'

'বলবো আর কখন?'—সত্যশরণ হেসে বললো, 'যা একখানা কাণ্ড তুমি করলে!'

লীলা বললো, 'কী নাম?'

'শকুন্তলা। শকুন্তলা নামটা আপনার ভালো লাগে না?'

'মন্দ না, আমি কিন্তু আরেকটা নামও খুব ভালোবাসি।' এতক্ষণে লীলার গলায় এক সহজ সুর বেরুলো।

সত্যশরণ দরজায় ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঐ তোমার শিঙাড়া এসেছে লীলা।'

নামের প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেলো—শিঙাড়া সহযোগে চা পান করতে-করতে নানারক গল্পগুজবের মধ্যে খানিকটা সময় মন্দ কাটলো না।

একটু পরেই আনন্দবাবু এলেন খুকুকে নিয়ে। বিকাশের কপালে হাত রেখে বললেন, 'ন গা বেশ ভালো। খুব কিছু মারাত্মক না-ও হতে পারে।'

সত্যশরণ বললো, 'ডাক্তার তো বলেছেন এক্স-রে করা দরকার।'

আনন্দবাবু দুঃখিতস্বরে বললেন, 'কিসে থেকে কী হলো দ্যাখো তো! বড্ড খারাপ লাগে আমার।'

বিকাশ হেসে বললো, 'কী হয়েছে তাতে, এ আমার দু'তিন দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।

এদের কথার ফাঁকে লীলা খুকুকে নিয়ে উপরের ঘরে চলে এলো। চিন্তা করলো শোবা কী ব্যবস্থা করা যায়। বিকাশের যা খাট তাতে তাদের কুলোনো অসম্ভব। খাটের উপর না-হ একা সত্যশরণ শুক, খুকু আর ও নিচে বিছানা করে শোবে। চাকর ডাকিয়ে সে ঘর পরিষ্কা করে বিছানা করিয়ে নিলো। দুপুরে ঐ মাসিমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে থেকেই তার শরীর মন যেন কেমন অসুস্থ লাগছিলো—তারপরে তো এই হাঙ্গামা—বিছানা পেতে সে হাত-প ছড়িয়ে শুয়ে বললো, 'খুকু, সোনা—তুমি নিজে-নিজে আজ খেয়ে এসো তো মা।'

'তুমি চলো—' খুকু আবদার ধরলো।

'তুমি যদি যাও, নিশ্চয় তোমাকে কাল চকোলেট কিনে দেবো।'

'না, তুমি চলো—' খুকু যখন কিছুতেই ছাড়ে না, অবশেষে লীলা রাগ করে বললো, 'দাঁড় যেমন কথা শুনিস না তেমন আমি তোদের বাড়ি থেকে চলে যাবো, আর ফিরে আসবো ন তারপর একদিন মরে যাবো—আর আমাকে মা বলে ডাকতে পাবিনে।'

খুকু অধীর হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো, 'তুমি যেয়ো না, আমি রোজ নিজে-নিজে খাবো— বলতে বলতে অভিমানে তার ঠোঁট ফুলে উঠলো—আর লীলার দুই চোখ অনর্থক জলে ভ গেলো। একটু পরেই চাকর এসে নিয়ে গেলো খুকুকে খাওয়াতে, আর লীলা কখন গভীর ঘু অচেতন হয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙলো তার সত্যশরণের ডাকে। ঘুম ভেঙে উঠে তাকিয়ে দেখলো তার ভাত ঢাক দেয়া আছে সামনে, আর সত্যশরণ শিয়রে একান্ত কাছে বসে তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে সে তাকাতেই সত্যশরণ সরে বসে বললো, 'খাবে না? কতক্ষণ থেকে ডাকছি—'

আড়মোড়া ভেঙে লীলা উঠে বসে বললো, 'অনেক রাত হয়েছে নাকি ? ইস, কী-রকম মিয়েছিলাম!'

'আর রাত করো না, মুখ ধুয়ে এবার খেয়ে নাও।'

'তুমি খেয়েছো?'

'হ্যাঁ। বিকাশও খেয়েছে। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

'ভাত আবার আনালে কেন, আমি তো নিচে গিয়েই খেতে পারতাম।' কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে কবার সত্যশরণের দিকে তাকালো, কিন্তু তাকিয়েই সে তক্ষুণি চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো, কন না সে দেখলো অস্বাভাবিক একটা উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে সত্যশরণ তাকিয়ে আছে তার কে—সে দৃষ্টি লীলা সহ্য করতে পারলো না।

পাশে ঘুমন্ত খুকুর গায়ে একবার হাত রেখেই সে চোখ ধুতে উঠে এলো জানলার ধারে।

সত্যশরণ বললো, 'দ্যাখো, তুমিই ঐ খাটে শোও গিয়ে, আমি এখানে খুকুর পাশে শুই।'

'কেন?'

'এই মাটিটার মধ্যে ভয়ানক শক্ত লাগবে যে—'

'তোমার লাগবে না?'

'আমার তো জানোই পশুর ঘুম, ইঁটের পাঁজায় শুলেও ওর ব্যাঘাত হয় না।'

গম্ভীর মুখে লীলা খেতে বসলো, কোনো জবাব দিলো না, আর সত্যশরণ এদিকে হাত-পা মলে আরামসূচক ধ্বনি করে মাটির বিছানায় শুয়েই চোখ বুজলো।

লীলা তাকিয়ে-তাকিয়ে নিঃশব্দে আহার সমাধা করে মুখ ধুয়ে যখন ঘরে ফিরে এলো তখন য়তো সত্যশরণ ঘুমিয়ে পড়েছিলো—চকিতে লীলার একবার বিকাশের কাছে যাবার কথা নে হলো, আর সেই মুহূর্তে সে দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিয়ে বসলো এসে ত্যশরণের মাথার কাছে। মুখ নিচু করে ডাকলো, 'তুমি ঘুমিয়েছো?'

সত্যশরণ বালিশের উপর মাথাটা ঠিক করে বললো, 'না।'

'এখানে শুলে যে! ওঠো, খাটে যাও।'

'তুমিই যাও লীলা, আমার বড়ো ঘুম পেয়েছে, বেশ আরাম করে শুয়েছি।'

অসহিষ্ণু হয়ে লীলা বললো, 'আচ্ছা, আমি কি এ বাড়ির অতিথি, না পর—যে, তুমি সব ময়ে আমার সঙ্গে কেবল ভদ্রতা করো?'

সত্যশরণ একই ভাবে শুয়ে থেকে বললো, 'তুমি আমার পরও না, অতিথিও না। তোমার ঙ্গে আমি ভদ্রতাও করি না। কিন্তু আপাতত তুমি ঘুমিয়ে পড়োগে।'

লীলা জেদ করে বললো, 'না, আমি এইখানেই শোবো।'

'শোও।'

'যাও তুমি খাটে।'

'কেন, আমি এখানে শুলে তুমি শুতে পারো না?'

'এতটুকু জায়গায়?'

'তোমার-আমার পক্ষে এতটুকু নয়।'

সত্যশরণ উঠে বসলো আর সঙ্গে সঙ্গে লীলা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকের ওপর—'ইচ্ছে করে তুমি আমাকে কাঁদাও, তোমার জোর নেই, কেড়ে নিতে পারো না আমাকে ? কাপুরুষ! কাপুরুষ! স্ত্রীর উপর যে জোর করে না, সে কাপুরুষ ছাড়া কী?' আকুল হয়ে কেঁদে ফেললো লীলা। সত্যশরণের মুখ অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিলো না—কিন্তু তার চোখ অন্ধকারেও জ্বলজ্বল

করতে লাগলো—লীলার ভিতরটা যেন একটি নিমেষে তার কাছে উদঘাটিত হয়ে গেে আয়নার মতো স্বচ্ছ পরিষ্কার সে দেখতে পেলো ওর বিক্ষত হৃদয়কে। বুক ভেদ করে এব দীর্ঘশ্বাস পড়লো, আর চুপ করে বসে-বসে শুনতে লাগলো ওর ফুঁপিয়ে কান্না। একটু শ হলে আস্তে সে শুইয়ে দিলো ওকে বালিশে, তার পর নিঃশব্দে খাটে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ে

কাটলো একটা দীর্ঘরাত্রি। একটা মস্ত বড়ো দুঃস্বপ্নের মতো। সমস্ত রাত সত্যশরণের চো একফোঁটা ঘুম এলো না। সকালের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে পরের দিন উঠতে ত যথেষ্ট বেলা হলো। চোখ মেলে দেখলো মাথার কাছে পুবের জানলাটা খোলা, জানলাটা দি এতক্ষণ তার গায়ে-মাথায় সমস্ত রোদটা লেগেছে, আর সেইজন্যে খুকু বসে একমনে জানল ছিটকিনি বন্ধ করবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে।

সত্যশরণ হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনলো। খুকু বাবার গায়ে হাত রেখে বলে 'তোমার গা একদম গরম হয়ে গেছে, বাবা। জানলাটা ভারি খারাপ, কিছুতেই বন্ধ হ না।'

'আমাকে ডেকে দাওনি কেন?'

'ডাকতে তো যাচ্ছিলাম, মা যে তোমার ঘুম ভাঙাতে বারণ করে গেছেন।'

'মা? আমার? কেন?' সত্যশরণ শোয়া অবস্থা থেকে অর্ধেক উঠে বসলো।

'মা বললেন, কাল নাকি তুমি মোটেই ঘুমুতে পারোনি। আমি কিছু গণ্ডগোল করছিলাম তবু মা আমাকে বকেছে বাবা।'

খুকু সুযোগ পেয়ে একটা নালিশ জানালো।

সত্যশরণ আদর করে খুকুকে চুমু খেয়ে বললো, 'মা ভারি দুষ্টু, আমি বকে দেবো মা-ে

রাত্রিতে যে লীলারও দু'চোখের পাতা এক হয়নি এটা বুঝতে পেরে সত্যশরণ দুঃি হলো। সারা রাত বেচারা ঘুমোয়নি তাহলে? তারই দোষ—উচিত ছিলো লীলাকে ঘুম পাড়ি শুতে যাওয়া। সে কাপুরুষ। সে কেবল ছেড়ে দেয়, ধরে রাখে না পৌরুষের জোরে। বি সত্যশরণ এ-কথাও না-ভেবে পারলো না যে—ভালোবাসা দিয়েই যাকে বাঁধা গেলো না, কি বশ হবে তার পৌরুষের জোরে? ভালোবাসার কি কোনো মূল্য নেই তাহলে? তবে কি সব কেবল ফাঁকা কল্পনা? উঠি-উঠি করেও সত্যশরণ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রই বিছানায়।

বাবার গম্ভীর মুখ সহ্য করতে না-পেরে একসময় খুকু উঠে গেলো সেখান থেকে। এ পরেই লীলা এলো ঘরে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকালো সত্যশরণ। এরি মধ্যে স্নান হ গেছে লীলার। লাল-টুকটুকে পাড়ের একখানা বোম্বাই মিলের পাতলা শাড়ি পরেছে, গ ঈষৎ নীলাভ রঙের পাতলা ব্লাউজ। কাছে এসে বললো, 'কাল ঘুমোতে পারোনি বলে ডাকি কিন্তু তাই বলে মানুষ নাকি এত বেলা অবধি ঘুমোয়? ইস, রোদ্দুরে একেবারে ভরে গে বিছানাটা।' লীলা অত্যন্ত একটা সহজ ভঙ্গিতে সত্যশরণের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। লীলার ি স্নাত শরীরের দিকে তাকিয়ে সত্যশরণের মনটা অভিভূত হয়ে গেলো। একবার ইচ্ছে হ তাকে ছুঁতে, কিন্তু ইচ্ছাকে সে তক্ষুণি সামলে নিয়ে খাট থেকে নামলো—বাজুর উপর থে টেনে গেঞ্জিটা গায়ে দিতে-দিতে বললো, 'বিকাশ কেমন আছে?'

বোধ হয় জ্বর হয়েছে একটু।'

'টেমপারেচার নিয়েছিলে, নাকি হাতের আন্দাজ?' সত্যশরণের কথায় বিদ্রূপ ছিলো কিনা া গেলো না, কিন্তু লীলা চটে উঠে বললো, 'প্রথমটা তো মানুষ হাতের আন্দাজেই উত্তাপ ।, এত কৈফিয়তের কী তাতে?'

বিস্মিত চোখে সত্যশরণ শুধু বললো, 'আশ্চর্য! তার পরেই সে চটিতে পা গলিয়ে চটপট া এলো নিচে। প্রথমেই সে বিকাশের ঘরে এলো। কপালে হাত দিয়ে চোখ বুজে শুয়েছিলো শ, সত্যশরণের জুতোর শব্দে চোখ তুলে তাকালো। 'কেমন আছো?'—বলতে-বলতে শরণ হাত রাখলো ওর কপালের ওপর—ঈষদুষ্ণ ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী খারাপ লো তার বিকাশের চোখ-মুখের চেহারা দেখে। অমন সুন্দর মুখশ্রী ব্যথায় একেবারে মলিন গেছে। মাথায় হাত রেখেই সত্যশরণ বললো, 'রাত্রে ঘুম হয়নি? চেহারাটা যে বড্ডই াপ দেখাচ্ছে।' বিকাশ মৃদু হেসে বললো, 'উঃ! এমন রাত্রি যেন আর জীবনে দ্বিতীয়বার না ন, সত্য—কী অসহ্য যন্ত্রণায় আমার রাত কেটেছে—' বিকাশ একটা কাতরোক্তি করলো।

সত্যশরণ ভয়ানক লজ্জিত হয়ে বললো, 'ছি ছি, আমার কালকে এখানেই শোয়া উচিত ।। আমি ভাবলাম, তুমি যখন একবার ঘুমিয়েছো, তখন রাতটা হয়তো বিশেষ কিছু হবে আর তা ছাড়া এখানে শোবার কথা আমার খেয়ালও হয়নি।'

'তাতে কী হয়েছে, তুমি শুতে চাইলেই আমি এখানে শুতে দিতাম নাকি? এমনিতেই মার উপর কত অত্যাচার করলাম, আরো কত করবো তার ঠিক নেই—'

খুকু এসে বললো, 'বাবা, চা খেতে এসো, মা বসে আছেন।'

ব্যস্ত হয়ে বিকাশ বললো, 'হ্যাঁ ভাই—যাও, তোমার স্ত্রীরও বোধ হয় চা খাওয়া হয়নি। াকে তোমার মেয়ে এসে অনেকক্ষণ আগে চা দিয়ে গেছে। আমি তোমাদের কথা জিজ্ঞেস লাম, বললো যে বাবা ঘুম থেকে ওঠেননি, মা বলেছেন বাবা উঠলেই তখন তিনি খাবেন।'

আশ্চর্য হয়ে সত্যশরণ বললো, 'কেন, লীলা এ-ঘরে আসেনি একবারও?'

'না তো। তোমার মেয়ে একবার এসে খুব গিন্নীপনা করে গেছে। বলে, কাকা তোমার -টর হয়নি তো? আমি বলেছি, হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু তুমি কাছে থাকলেই সেরে যাবে। কয়েক কণ্ড বুড়ির মতো বসে থেকে পালিয়ে গেলো।'

'ও। আচ্ছা, আমি এখানেই চা নিয়ে আসছি দাঁড়াও। তোমার মুখ ধোবার জল-টল—'

'সে-সব আমি ঠিকমতোই পেয়েছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।'

সত্যশরণ চিন্তিত মনে খাবার ঘরে এসে দেখলো, চা নিয়ে গালে হাত দিয়ে লীলা চুপ করে আছে। সে আসতে কোজি তুলে টী-পট্ থেকে এক কাপ চা ছেঁকে এগিয়ে দিলো শরণের দিকে, তারপর রুটিতে মাখন লাগাতে বসলো।

সত্যশরণ বললো, 'এক কাপ কেন? তুমি খাবে না?'

লীলা জবাব দিলো না।

'কী হয়েছে?'

'কী হবে?'

'তবে চা নিলে না কেন?'

'ইচ্ছে করছে না।'

'তাহলে আমারও ইচ্ছে করছে না।' চায়ের কাপ ঠেলে সত্যশরণ উঠে দাঁড়ালো।

লীলা একটুও বিচলিত না হয়ে সেরকম নিঃশব্দেই বসে রইলো। সত্যশরণ কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'কেন তুমি এতক্ষণ কিছু না-খেয়ে বসে আছো? চা-ই বা খাবে না কেন? কী হয়েছে তোমার?'

'খাবো না—ইচ্ছে নেই, এর উপরেও তুমি জোর করবে নাকি?'

'জোর! জোর তো আমি করতে জানি না, সে তো তুমিই বলেছো।'

'জানবে না কেন? কোনো-কোনো বিষয়ে বেশ জানো।'

'লীলা, আমার সঙ্গে তোমার কী অশুভ মুহূর্তে দেখা হয়েছিলো বলতে পারো! আমি বলি তাতেই তুমি বিরক্ত হও, সব কথাই তুমি ভুল বোঝো।'

লীলা চুপ করে রইলো। সত্যশরণ আরেক কাপ চা ঢেলে লীলার কাছে এগিয়ে দি বললো, 'আমি জানি যে আমি যদি এখন রাগ করে না-খেয়ে থাকি তাহলে কোনো উদ্বেগ হবে না তোমার; কিন্তু এটা তুমি বিশ্বাস করতে পারো যে, তুমি না-খেয়ে থাকলে আ কোনোরকমেই শান্তি পাবো না।'

লীলা নিঃশব্দে চায়ের কাপটি হাতে তুলে নিলো। সত্যশরণ তার পাশে বসে বললে 'লিলি, ভালোবাসা মানুষকে উদারও করে, নীচও করে। এর তুল্য মহৎও কিছু নেই, আবা এর মতো মারাত্মকও আর-কিছু হতে পারে না।'

লীলা কেমন এক আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সত্যশরণের মুখের দিকে। সত্যশর আস্তে একখানা হাত লীলার কাঁধের উপর রেখে বললো, 'কাল তো তুমিও ঘুমোতে পারো আমি সে-কথা জানতাম না, কিন্তু তুমি তো বুঝতে পারছিলে যে আমি ঘুমুইনি—তবে কে আমার কাছে উঠে এলে না? আমাকে তোমার কাছে ডাকলে না?'

বলতে-বলতে সত্যশরণ অত্যন্ত আবেগভরে লীলার দিকে ঝুঁকে এলো এবং টেবিলে উপর লীলার প্রসারিত ডান হাতটির উপর মাথা রাখলো।

সত্যশরণের এই আবেগে লীলা অভ্যস্ত ছিলো না। মানুষটিকে সে যতই অপরাধী ভে থাকুক, যতই অবহেলা করুক—তবু তার ব্যক্তিত্ব, তার মহত্ত্ব, তার উদারতা ভিতরে-ভিত তাকে স্বতঃই একটা ঘা দিতো। এটুকু অন্তত সে মনে-মনে অনুভব করতো যে মানুষ হিসে সত্যশরণের কাছে অনেক মানুষই একটা তুচ্ছ মাটির ঢেলা। আজ সেই মানুষটির এ বিহ্বলতায় সে শুধু অবাক হলো না, স্তম্ভিত হয়ে একই ভাবে হাত রেখে চুপ করে বসে রইলে নড়বার-চড়বার ক্ষমতাও যেন তার লুপ্ত হয়ে গেলো। একটু পরেই সত্যশরণ সংযত হয়ে মু তুললো। অনেক দিনের অনেক ছাইচাপা আগুন যেন লকলক করে জ্বলে উঠেছে তার মুখে ঈষৎ লালাভ চোখ, একমাথা রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল—সমস্তটা মিলিয়ে তার অপূর্ব পৌরুষ-দী অভিনব মুখশ্রীর দিকে লীলা তাকাতে পারলো না।

দুই হাতে কপালের চুল উপরের দিকে তুলে দিতে-দিতে সত্যশরণ বললো, 'বিকাশ অত্য অসুস্থ এবং আমাদের আশ্রিত—তবুও সকাল থেকে একবারও তুমি ওর কাছে যাওনি, খোঁ নাওনি—এটা কি তোমার উচিত হয়েছে? চলো ওখানে গিয়েই চা খাই।'

লীলা তক্ষুণি বাধ্য মেয়ের মতো উঠে দাঁড়ালো। ভীত চকিত চোখে সত্যশরণের দিে তাকিয়ে বললো, 'চলো—'

কাশের পা ভাঙাটা যত শক্ত ব্যাপার ভাবা গিয়েছিলো আসলে ঠিক ততটা কিছু হয়নি। রের দিন ডাক্তার এসে বললেন, মচকেই গিয়েছে, তবে একটু বেশী রকম মচকেছে; দিন নরো অন্তত ভোগাবে। মেডিকেল সারটিফিকেট নিয়ে সত্যশরণ ছুটির জন্য দরখাস্ত করে লো বিকাশের আপিসে। বিকাশ মনে-মনে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ানিয়ে পাশ ফিরলো।

লীলার গম্ভীর মুখ বিকাশ সকাল থেকেই লক্ষ্য করছিলো। মনের মধ্যে যে তার একটা ন্দ্ব চলেছে বিকাশ তা বুঝতে পারছিলো; তাই ভেবেছিলো এ-নিয়ে আর কিছু বলবে না আজ, ন্তু সত্যশরণ কলেজে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লীলাও যখন তার ঘর থেকে অদৃশ্য হলো খন সে অস্থির হয়ে উঠলো। খাওয়া-দাওয়া তার সত্যশরণ থাকতেই হয়ে ায়েছিলো—লীলাই মাথা ধুইয়ে দিয়েছে, খাবার নিয়ে এসেছে, কিন্তু সে মুখে কেবল র্তব্যেরই ছায়াপাত ছিলো। দুপুরবেলাটা ক্রমেই বিকাশের অসহ্য মনে হতে লাগলো। অথচ মন কী কারণ আছে যার জন্য লীলাকেই আসতে হবে। আজেবাজে অনেক কথা সে চিন্তা রলো এবং একসময়ে ভয়ানকভাবে আর্তনাদ করে উঠে ভীষণ কাতরাতে শুরু করলো। রজার ধারে গামছা পেতে শুয়েছিলো বাচ্চা চাকরটা। সেই শব্দে তার তন্দ্রা ছুটে গেলো। াড়াতাড়ি উঠে এসে বললো, 'বাবু, কী হয়েছে?'

বিকাশ বললো, 'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, মাকে একবার ডেকে আনতে পারো?'

চাকরটা ছুটে গেলো লীলার ঘরে। লীলা পাটি পেতে মেঝের উপর সত্যশরণের যত-সব টা-ফাটা জামাকাপড় নিয়ে স্তূপ করে বসেছিলো। একটা পাঞ্জাবিও আস্ত নেই, কাপড়গুলোও াধিকাংশই পুরোনো জিরজিরে, ছোট্টো একটা চাবি-ভাঙা স্যুটকেস থেকে এইসব সম্পত্তি বার রতে-করতে লীলা নিজেকে শতবার ধিক্কার দিলো। আশ্চর্য মানুষ!

এমন সময় হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে এলো রমণী। হন্তদন্ত হয়ে বললো, 'বৌদি, একবার ীগগির আসুন, বাবুর ভয়ানক ব্যথা লেগেছে—'

কথাটার সঙ্গে-সঙ্গেই লীলা স্প্রিঙের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ালো এবং তক্ষুণি ধপ্ করে াসে পড়লো খাটের উপর। অবসন্নভাবে বললো, 'আমি তার কী করবো? আমি কি ডাক্তার?'

চাকরটা একটু বিব্রত হয়ে বললো, 'বাবু যে আপনাকে ডেকে দিতে বললেন—'

'আমাকে?' ভুরু কুঁচকে লীলা অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো রমণীর দিকে, তারপর মোহগ্রস্ত রাগীর মতো ধীর পায়ে নেমে এলো নিচে। দরজার বাইরে থেকেই বিকাশের কাতরোক্তি শানা গেলো। লীলা ঘরে ঢুকে এগিয়ে এসে বললো, 'কী হয়েছে? হঠাৎ আবার ব্যথা হলো কন?' বিকাশ জবাব দিলো না, চোখ বুজে তেমনি পড়ে রইলো। লীলা একটু অস্বস্তি বোধ রে বললো, 'একটু সেঁক দিয়ে দেবো কি ?' বিকাশ চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলো এবার। লীলা চোখ নামালো; বিকাশ বললো, 'কিছু করতে হবে না, আপনি যান, ঘুমিয়ে থাকুন গে—'

কথার সুরে লীলার বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়লো। একটু চুপ করে থেকে বললো, আমাকে ডেকেছিলেন—'

'তাই আমাকে দয়া করতে এসেছেন? আর কত দয়া নেবো আপনাদের বলুন তো?' বলতে-বলতে বিকাশ উঃ-আঃ বলে পাশ ফেরবার চেষ্টা করতেই তার পায়ে সত্যিই ভয়ানক াগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে কাতর আর্তনাদ করে উঠলো। লীলা নিচু হয়ে আস্তে পায়ের লার বালিশটা ঠিক করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একটু পরেই সে ফিরে এলো

গরম জলের ব্যাগ হাতে নিয়ে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে স্তব্ধ মুখে বসে-বসে সেঁক দিতে লাগলো কথা বললো না একটিও। বিকাশও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আড়চোখে লীলার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললো, 'ভাবছি কবে পা-টা একটু শায়েস্তা হবে, আর কবে যাবো। তা আশা করছি এ-রকম সাংঘাতিক ব্যথা আর দু'একদিনের বেশী থাকবে না।'

লীলা বললো, 'হুঁ।'

হঠাৎ বিকাশ হাত বাড়িয়ে দিলো লীলার হাতের উপর, তারপর অত্যন্ত মৃদুস্বরে ডাকলো 'লীলা!'

লীলার মুখ লাল হয়ে উঠলো। মাথা আরো নিচু হয়ে গেলো, কিন্তু রাগ করে সে উঠে দাঁড়ালো না।

বিকাশ বললো, 'লীলা, বিধাতার এ কী খেলা বলো তো? আমি কী পাপ করেছি—যার জন্য আমার এই চির-বিরহ?'

আস্তে লীলা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো, তারপর শান্তস্বরে বললো, 'আপনার মাথা আজ প্রকৃতিস্থ নেই, আপনি শান্ত না হলে আমার এখানে থাকা উচিত নয়।'

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বিকাশ বললো, 'মাথা আমার খুবই ঠাণ্ডা আছে, আমি মোহগ্রস্ত বা বিকারগ্রস্ত হইনি; কিন্তু আমি কী করবো, কী করলে আমার শান্তি হবে, কেন দেখা হলো তোমার সঙ্গে—কেন এর পরেও আমি বেঁচে থাকবো, কী হবে এই ব্যর্থজীবন বয়ে বেড়িয়ে—' বলতে-বলতে বিকাশ প্রায় অর্ধেক উঠে বসলো।

তাড়াতাড়ি লীলা তাকে দু'হাত দিয়ে জোর করে শুইয়ে দিয়ে ভীতস্বরে বললো, 'আপনি কি ক্ষেপে গেলেন? আপনার কি এতটুকুও জ্ঞান নেই? ডাক্তার বলেছেন, আপনার পায়ে যেন কোনোরকমেই চোট না লাগে—'

'লাগুক! লাগুক! যাক ভেঙে-চুরে—সব ভেঙে যাক—' বিকাশের দুই চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, আর লীলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

এ-ভাবে আরো কতক্ষণ কাটতো বলা যায় না—হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনে লীলা সচকিত হয়ে উঠলো। দরজার কাছে এগিয়ে এসে দেখলো—আনন্দবাবু উঠে আসছেন পিছনে ওর মা।

'ও মা, তুমিও এসেছো!'

মা মৃদু হেসে বললেন, 'কেন, আমি কি তোর বাড়িতে আসতে পারি না নাকি?'

'কোথায়! এই নিয়ে হয়তো দু'বার কি তিনবার হলো।'

আনন্দবাবু বললেন, 'কেমন আছেন সেই ভদ্রলোক? আমি আর সকালে কিছুতে আসতে পারলুম না।'

'ভালোই আছেন। এসো।'

আনন্দবাবু ঘরে ঢুকে সহাস্যে বিকাশের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিকাশ বালিশের তলা থেকে রুমাল বার করে ভালো করে মুখটা মুছে নিয়ে বললে 'বসুন। কী দুর্ভোগেই ফেললুম এঁদের!'

'কী যে বলেন, দুর্ভোগটা কি এঁদের, না আপনার! বলতে গেলে আমিই উপলক্ষ্য- আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হচ্ছে।'

'সে কী কথা! আমার অনেক ভাগ্য যে আপনাদের কাছে আছি, আমি তো কখনো তেই পারি না যে অন্য কোথাও এর চেয়ে আরামে, এর চেয়ে আনন্দে আর কখনো কছি।'

লীলা তার মা'র সঙ্গে বিকাশের পরিচয় করিয়ে দিলো। মনোরঞ্জনে বিকাশ স্বভাবনিপুণ। টুখানি সময়ের মধ্যেই সে লীলার মা'র সঙ্গে জমিয়ে ফেললো "মা" ডেকে। এমন সময় মা এলেন ঘরে। তাঁর আঁচল ধরে ঘুম-ভাঙা চোখে খুকু। এঁদের দেখে মাসিমা মৃদুহাস্যে করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'কী ভাগ্য আজ, বেয়ান যে এসেছেন!' লীলার মা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার তো এ-ভাগ্য এ-জীবনেও হলো না। কত বলি সত্যশরণকে যে মার মাসিমাকে একদিন নিয়ে এসো—তা সে নিজেই যায় না—আর আপনার বৌও তো মাকে ভুলতে বসেছে—' কথাটার সঙ্গে-সঙ্গেই বিকাশ আর লীলার চোখাচোখি হয়ে লা। লীলা আরক্ত মুখে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে যেতে-যেতে বললো, 'মাসিমা, আপনি বসুন নে, আমি একটু আসছি।'

লীলা সেখান থেকে সোজা উঠে এলো তেতলার ঘরে। এসে সে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো ৈর উপর। যেখানটায় বিকাশ হাত রেখেছিলো, বারে-বারে মুছে ফেললো সে-জায়গাটা, পর এক সময়ে সেখানটাতেই মুখ রেখে কাঁদতে লাগলো আকুল হয়ে। সে মরেছে—এর ক আর তার অব্যাহতি নেই। বিকাশ যে তার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে আছে এ-কথা সে এই মবার না হলেও এই প্রথমবারই এত তীব্র, এত ভয়ানকভাবে অনুভব করে নিজের কপালে ড়াতে লাগলো।

সত্যশরণকে সে প্রকাশ্যে ঘৃণা করে দরিদ্র বলে—বিশ্বাস করে যে তার বাবাকে সে ভুল ঝবার অবকাশ নিশ্চয়ই দিয়েছিলো কিন্তু মনের অনেক গভীরে হয়তো সত্যশরণের নিষ্ঠ ভালোবাসা তাকে অভিভূত করে রেখেছিলো—সেখানেই ছিলো তার আসন। দুঃসহ নায় তার বুক ভেঙে যেতে লাগলো। প্রেমের যে আনন্দ, যে-মধুরতা তা আর সে ভোগ তে পারলো না। হয়তো তার প্রতি ঈশ্বরই নিষ্ঠুর—তা নইলে মানুষের কখনও এমন তব্য হয়? সত্যশরণের সঙ্গেও হলো তার ব্যর্থ মিলন—কোনো আনন্দ কোনো মাধুর্যই লা না তার বিবাহিত জীবনে—আর এই বিকাশ—এই যে এমন দুর্নিবার আকর্ষণে হারাত্র তাকে আকৃষ্ট করে, তাতেই বা সে কী আনন্দ পেলো? তা ছাড়া ন্যায়-অন্যায় বলেও কিছু আছে? সে কি মূঢ় ? সে কি পাথর? সে কি বোঝে না সত্যশরণকে ? সে কি অনুভব া না সত্যশরণের শান্ত সমাহিত ভালোবাসা? সমস্ত সংসারময় ব্যাপ্ত হয়ে আছে শরণের স্নিগ্ধতা। কিন্তু বিকাশ?

লীলা প্রায় আধঘণ্টা পরে মুখ-চোখ ধুয়ে নিচে নেমে এলো। রান্নাঘরে গেলো সে চায়ের করতে, যতটা সম্ভব নিজেকে যেন সে লুকিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে। কিছু দরকার লা না, তবু সে বসলো ময়দা মাখতে।

—'তুমি কেন? সুরেন নেই?'

চমকে লীলা পিছন ফিরে দেখলো সত্যশরণ এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। তার মুখের দিকে কয়েই মাথা নিচু করে লীলা বললো, 'আছে। তুমি কখন এলে?'

'এই তো এইমাত্র, কিন্তু তুমি কেন এসেছো এই গরমের মধ্যে? ওঠো।'

ময়দা মাখতে-মাখতেই সে বললো, 'তা কী হয়েছে। রমণী আজ বিকাশবাবুর কাছেই আছে ক্ষণ, সুরেন কি একা-একা পেরে উঠবে?'

'যা পারে তাই করবে—'

লীলার মাও এলেন পেছন থেকে, 'তুই করছিস কী? বড়োই যে গিন্নী হয়েছিস। উঠে আয়—'

'দেখুন তো—' সত্যশরণ শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে লজ্জিতমুখে বললো, 'এই গরমের মধ্যে—'

লীলা ময়দা রেখে উঠে এলো—সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি কাপড় ছাড়োনি?'

'রমণী তো খুঁজে পেলো না—'

'আমি দিচ্ছি', মা'র দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা, তুমি একটু বসো গিয়ে, আমি ওঁর কাপড়টা দিয়ে আসছি। মা ফিরে এলেন বিকাশের ঘরে। সত্যশরণ আর লীলা উঠে এলো উপরে। উপরে এসেই লীলা বললো, 'আচ্ছা, রাতদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে এতগুলো টাকা উপার্জন করো তাতে তোমার নিজের কী সুখ হয়, শুনি?'

সত্যশরণ লীলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—বুঝতে পারলো না লীলা কী বলতে চায়।

'একটা জামা আস্ত নেই, দু'খানার বেশী তিনখানা ধুতি নেই,—জুতোটা ছেঁড়া—তোমার কি ভদ্রলোকের মতো থাকতে ইচ্ছা করে না?'

'ও—' সত্যশরণ বুঝলো এবার কথাটা।

'না, সত্যি এভাবে তোমার থাকা হবে না—সকলের সব হয় আর তোমারই হয় না?'

'আঃ, লীলা—ও-সব কথা থাক। নিচে তোমার বাবা-মাকে একলা বসিয়ে রেখে এসেছো মনে আছে?'

'খুব মনে আছে—কিন্তু তুমি আগে আমার কথার জবাব দাও।'

'কী জবাব দেবো, বলো? যদি মনে করো দরকার, তবে তুমিই আমাকে দিয়ো। তোমারই তো সব।

'হ্যাঁ, আমিই দেবো—আজই আমি বাবার সঙ্গে বেরিয়ে তোমার ধুতি-জামা-জুতো সব নিয়ে আসবো।'

'দিয়ো! দিয়ো—' সত্যশরণ পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করলো। লীলা একটা পরিষ্কার কাপড় এনে হাতে দিতেই সে তাকে দুহাত বাড়িয়ে টেনে আনলো বুকের কাছে, মৃদুকণ্ঠে বললো, 'লিলি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, কিছু নেই, তাই মাঝে-মাঝে যেন কেমন ভয় করে আমার, মনটা ছোটো হয়ে যায়, চেষ্টা করেও নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করো তুমি!'

'তোমাকে ক্ষমা!' লীলা বিষণ্ণ মুখে হেসে বললো, 'তোমার মহত্ব দিয়ে আমার সমস্ত কালি তুমি যেদিন মুছে দেবে, সেদিন আমি তোমাকে ক্ষমা করবো।'

সত্যশরণ দুই হাতে শক্ত করে লীলাকে জড়িয়ে ধরলো—তারপর মুখে-চোখে পাগলের মতো চুম্বন করতে লাগলো।

'ছাড়ো, ছাড়ো', লীলা নিজেকে ছাড়িয়ে আনবার প্রচণ্ড চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু তার লতার-মতো পাতলা নরম শরীরের স্বাদে সত্যশরণ তখন অভিভূত। একটু পরেই দরজায় খুকুর মুখ দেখা গেলো—দৌড়ে এসে সত্যশরণকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'তুমি কখন এলে বাবা?' মুহূর্তে লীলার সান্নিধ্য ছেড়ে খুকুকে কোলে তুলে নিলো সে।

নিচে নেমে আসতেই আনন্দবাবু সত্যশরণকে বললেন, 'দ্যাখো হে, আমার তো মনে হয় এঁকে একবার ডাক্তার দে'কে দেখানো উচিত। খুব ভালো সার্জন উনি।'

'ডাক্তার ব্যানার্জি তো আজ সকালে ভালো করে দেখলেন, বললেন খুব সিরীয়স কিছু নয়, তবে ভোগাবে।'

লীলার মা বললেন, 'ওঁর ঐ এক ডাক্তার দে—তুমিও যেমন তোমার শ্বশুরের কথায় ভোলো!'

সলজ্জ হেসে সত্যশরণ বললেন, 'না, না, ডাক্তার দে সত্যিই খুব ভালো ডাক্তার। এখন ব্যথাটা কেমন, বিকাশ?'

'আছে—এ তো থাকবেই কিছুদিন।'

লীলার মা বললেন, 'এঁকে আমরা বড্ড বিরক্ত করছি। রোগীর কাছে অত হৈ-চৈ না করাই ভালো।

আনন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যি কথাই। চলো সত্য, আমরা বরং ওঘরে গিয়ে বসি। আর বেলাও তো নেই।—চারটা তো বেজে গেছে দেখছি। লিলি, এঁকে এবার খেতে দে।—বুঝলেন—' আনন্দবাবু বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাওয়াটাই হচ্ছে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠবার আসল ওষুধ। এই চারটা বাজলো, আপনি এক্ষুণি খেয়ে নিন।' বলতে-বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

ঘর থেকে সবাই চলে যেতেই লীলার দিকে তাকিয়ে বিকাশ বললো, 'আমার খাবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হয়ো না। দুপুরের খাওয়াই আমার যেন হজম হয়নি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লীলা বললো, 'বিকাশবাবু, আপনার মতো লোকেদের কখনও কাদা ছুঁড়তে পারার মতো কাছে আসতে দিতে নেই। আমাকে তুমি বলবার অধিকার আপনি পেলেন কোথায়?'

এ-কথায় বিকাশ খুব বিচলিত হলো না; বললো, 'অধিকার পেয়েছি আমার মন থেকেই। আমি যদি মনে-মনে তোমাকে তুমি-ই বলি, প্রকাশ্যে আপনি বললে কি মনকে অবমাননা করা হবে না?'

'আপনার মনের কথা শোনবার ইচ্ছে বা ধৈর্য্য আমার নেই—কিন্তু এটুকু আপনি জেনে রাখুন যে, স্পর্ধারও একটা সীমা থাকা দরকার,' বলেই লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর রমণীকে দিয়ে বিকাশের দুধ, ফল ও ডাক্তারের নির্দেশ-মতো অন্যান্য খাবার পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এলো বসবার ঘরে। আনন্দবাবুকে বললো, 'বাবা, তোমাদের এখন চা দিক?'

'বেশ তো, সত্যর নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে—যাই বলো, তোমাদের চাকরিকে লোকে যতই ঈর্ষা করুক, আমি করি না। যতটুকু সময়ের জন্যই হোক না কেন, ঐ একটানা বক্তৃতা! উঃ! আমার যেন ভাবলেই পরিশ্রম হয়।'

'তুমি?' লীলার মা হেসে ফেললেন—মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলি, লিলি, তোর বাবার কথা? তার নাকি আবার বক্তৃতায় পরিশ্রম হয়!'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আনন্দবাবু বললেন, 'আহা, তুমি ও-সব বোঝো না। যার সঙ্গে কথা বলে সুখ হয় তার সঙ্গে অনর্গল বলা যায়—ধরো আমাদের সত্যশরণ—ওকে পেলে আমি তো সমস্ত দিন রাত কেবল কথা বলেই কাটাতে পারি, কিন্তু তোমার সঙ্গে দুটোর বেশী তিনটে বলতেই আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।'

লীলার মা সত্যশরণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুনলে তোমার শ্বশুরের কথা! এবার থেকে যখন ওখানে যাবে তখন আমাদের পশ্চিমের ঘর দিয়ে যেয়ো, সামনের বৈঠকখানার দিকে সাবধান—ওখান দিয়ে গেলেই ইনি ধরে ফেলবেন।'

সত্যশরণের মাসিমা হেসে বললেন, 'তা বেয়ান, আপনি যতই বলুন, সত্য কিন্তু তার শ্বশুরের নিতান্তই অনুগত জামাই।'

আনন্দবাবু হেসে বললেন, 'বা রে, তা হবে না? আমি বুঝি ওর কম অনুগত? এ্যাঁ, কী বলো?' পরম স্নেহে তিনি সত্যশরণের পিঠে হাত দিলেন।

মাঝখানে লীলা বললো, 'বাবা, আমি আজ তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।'

'বেরুবি? কোথায় যাবি?'

'যাবো একটু কাজে।'

মা বললেন, 'জানো না বুঝি, তোমার মেয়ে যে আজকাল বড্ডই কাজের মানুষ হয়ে গেছে। দেখছো না, কেমন গিন্নী-গিন্নী ভাব মুখে?'

সত্যশরণ মৃদু হেসে বললো, 'ইনি না-থাকলে সংসার অচল কিনা, তাই বোধ হয় মুখের ভাবে কিছুটা সে-ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করছেন।' আনন্দবাবু ও তাঁর স্ত্রী হাসলেন এ-কথায়।

একটু পরেই রমণী চা নিয়ে ঘরে এলো।

চায়ে আর গল্পে বেরুতে-বেরুতে তাদের একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। স্ত্রীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে লীলা আর খুকুকে নিয়ে আনন্দবাবু বেরুলেন দোকানে। যেতে যেতে বললেন, 'কী কিনবি রে?'

লীলা লজ্জিত মুখে বললো, 'দ্যাখো না, একেবারে জামাকাপড় কিছু নেই, তাই ভাবছিলাম—'

'কার? সত্যশরণের?'

লীলা মাথা নাড়লো। আনন্দবাবু মনে-মনে খুশী হলেন মেয়ের ব্যবহারে। বললেন, 'ওরা হচ্ছে জাতপণ্ডিত—বেশভূষায় কি আর ওদের খেয়াল থাকে? কিন্তু তোর যে ওর প্রতি এতটা মনোযোগ আছে, এতে সত্যি আনন্দিত না হয়ে পারছিনে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে লীলা বললো, 'দ্যাখো বাবা, সংসারে পণ্ডিতেরও যত প্রয়োজন, অর্থের তার চেয়ে তিলমাত্র কম প্রয়োজন নয়। তা ছাড়া সর্বদা সমানে-সমানেই মেলে। ধনীর সঙ্গে ধনীর, দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের আর মহতের সঙ্গে মহতের। এ-সত্যটা যদি তুমি বুঝতে তাহলে আমার জীবনে এই গরমিল হতো না।'

আনন্দবাবু মেয়ের কথায় অবাক হয়ে বললেন, 'গরমিল? তুই কি বলিস যে, সত্যশরণের সঙ্গে বিয়ে না-দিলেই আমি বুদ্ধিমানের কাজ করতুম?'

খুব শান্তকণ্ঠে লীলা বললো, 'আমি তো তাই মনে করি। দারিদ্র্যকে আমি ঘৃণা করি।'

'লিলি!'

'হ্যাঁ বাবা, তোমার খামখেয়ালির জন্য শেষ পর্যন্ত কী হবে আমি তা বুঝতে পারছিনে। অন্ধকার হয়ে গেছে আমার ভবিষ্যৎ।'

লীলার কথা শুনে আনন্দবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। উত্তর ভেবে পেলেন না। অনেকক্ষণ রে বললেন, 'আমি জানতাম চন্দনের সঙ্গে থাকলে যে-কোনো কাঠ চন্দন-ই হয়ে ওঠে, ভবেছিলাম সে-সৌরভ তোর দেহমনকেও সুবাসিত করে তুলবে, তুই আসবি নতুন জগতে, তুন আলোয় স্নান করে তুই জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠবি। মনে হয়েছিলো সত্যশরণের সঙ্গে যেদিন ই একসঙ্গে এসে দাঁড়াবি আমার কাছে, তোর সেই সিঁদুর-মাখা আনন্দময় মুখখানার দিকে াকিয়ে আমার সমস্ত জীবন সার্থক হয়ে উঠবে। সে-মুখ আমার আজও বুকের মধ্যে ছবি হয়ে াছে। কিন্তু প্রথমবার যখন এলি তখনই আমার মনটা কেমন করে উঠেছিলো—দেখেছিলাম কাথায় যেন মেলেনি—ভেবেছিলাম সে আমার কল্পনা। তারপরে আরো দু'একবার ত্যশরণের ব্যথিত মুখ আমাকে দুঃখ দিয়েছে; আমি বুঝেছি তুই তাকে বুঝিসনি। কিন্তু তুই । এতবড়ো মূঢ় তাও আমি বুঝিনি। লিলি, তুই আমার একমাত্র—তুই আমার সর্বস্ব, তোকে খী করাই আমার জীবনের একমাত্র সার্থকতা।'

এই ভর্ৎসনায় লীলা রাগ করলো না, একটু চুপ করে থেকে বললো, 'তোমার কাছে তিনি মুদ্রের মতো বিরাট, আর আমি হলাম কূপের মতো সীমাবদ্ধ। তবে তাই যদি জানো, তাহলে তা তোমার জানা উচিত ছিলো যে—কূপের জলের সঙ্গে কখনোই সমুদ্রের মিলন হয় না।'

'আমার উপর তুই এ-অভিমান রাখিসনে। আমি জানতাম না, মানুষের কাছে মানুষের চয়েও অর্থটাই বেশী লোভনীয়। আর সেই লোভী মানুষটি কিনা আমারই সন্তান!' আনন্দবাবু ার্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ভুল হয়েছিলো। কিন্তু দ্যাখ লীলা, অর্থটা স্রোতের মতো, ওটা াসে আর যায়। আমি জানি এই সত্যশরণের ঘরেও হয়তো একদিন রুপোর হাট বসে যাবে। কন্তু কতগুলো মানুষ থাকে যারা আর-সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র—যাদের হৃদয়বৃত্তি আর-সকলের চয়ে অনেক উপরে—এ-ধরনের মানুষ সংসারে বিরল। এরা সংসারের পাঁকে পদ্মের মতো; কচুপাতায় যেমন জল ধরে না, এদের মধ্যেও কোনো দোষ ধরে না—সত্যশরণ সেই দুর্লভ ানুষের মধ্যে একজন। এদের বিচার অর্থ দিয়ে করবার মতো মূঢ়তা আমার ছিলো না—আমি াত্যশরণকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আর সেই মুগ্ধতাই তোর কাল হলো। লিলি, সত্যি কি তুই এত নির্বোধ! সুখী হবার উপকরণ কি তোর কাছে কেবলই টাকা? আমি কি তোকে এই কথা শিখিয়েছিলাম? তোকে সুখে রেখেছি, স্বচ্ছন্দে রেখেছি,—তাই বলে কি ঐটাই সর্বস্ব? —তা ছাড়া এ-কথা তো তুই জানিস যে তোর আর অংশীদার নেই, আমার বাড়িঘর জনিসপত্র সবই তোর!'

খুকুকে কাছে টেনে আবার আনন্দবাবু বললেন, 'আর এই? এই-যে চাঁদের মতো সন্তান পেলি তুই, তাতেও তোর মন ভরলো না?'

খুকুর কথায় হঠাৎ লীলা সচেতন হয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলো তাকে, তারপর নিঃশব্দে বসে রইলো বাইরের দিকে তাকিয়ে।

রাত্রিবে শুতে গিয়ে লীলা সত্যশরণকে বললো, 'দ্যাখো, আমি ক'দিন মা'র কাছে গিয়ে থাকি—'

'কেন?'

'কেন কী আবার? গিয়ে কি দু'দিন থাকতে নেই?'

চুপ করে থেকে সত্যশরণ বললো, 'বেশ তো।' আরো একটু চুপ করে থেকে আবার বললো, 'বিকাশ যে-ক'দিন আছে—'

আচমকা লীলা চটে উঠে বললো, 'বিকাশের জন্য আমি বসে থাকবো? সময়মতো চলে গেলেই তো এই যন্ত্রণাটা হতো না।'

'যন্ত্রণাটা কার, তোমার না ওর—'

'আমারও, ওঁরও—'

'হুঁ।'

'হুঁ মানে?'

'না, কিছু না—' সত্যশরণ পাশ ফিরলো।

একটু চুপচাপ কাটবার পরে লীলা বললো, 'ঘুমুলে নাকি?'

'কেন?'

'আমার কথার জবাব দিলে না?'

'কী কথার?'

'বারে-বারে বলতে পারি না—' লীলা অসহিষ্ণু হয়ে বললো, 'ভদ্রলোক এ-অবস্থায় কদ্দিন থাকবেন কে জানে, আর রাতদিন ঐ নিয়ে মাথা ঘামানো সে আমাকে দিয়ে হবে না।'

সত্যশরণ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমাকে তো কেউ জোর করেনি, লীলা, মাথা তোমার নিজে থেকেই ঘামছে। দ্যাখো না, ঘাম দিয়ে যদি জ্বরের ভূতটা নামাতে পারো।'

'তার মানে?' লীলা লাফিয়ে উঠে বললো, 'তুমি কী ভাবো মনে-মনে? কী তোমার মনের কথা তাই আমি জানবো আজ।'

'আমার মনের কথা?' সত্যশরণ মৃদু হেসে বললো, 'আগুনে পুড়লে যেমন সোনা খাঁটি হয়, আমি চাই তুমিও সে-রকম খাঁটি হও পুড়ে-পুড়ে। নিজেকে নিয়ে পালালেই তো পালানো যায় না, মনটা যাবে কোথায়? সেখান থেকে তোমার অব্যাহতি নেই।'

'কী বললে?' গর্জন করে লীলা উঠে বসলো। 'দরিদ্র যে, সে অন্তরেও দরিদ্র হয়, বুঝলে, তা নইলে নিজের স্ত্রীকে কেউ সন্দেহ করে?'

সত্যশরণ শান্তস্বরে বললো, 'লীলা, রাগ কোরো না—কেন অনর্থক শরীর খারাপ করছো—'

'না, আমি এর একটা বিহিত করতে চাই।'

'সে-বিহিত তোমার মনের সঙ্গে করো, এখন শোও।' সত্যশরণ তার হাত ধরে কাছে আনবার চেষ্টা করলো। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে লীলা বলে উঠলো, 'ছাড়ো হাত, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে—'

সত্যশরণ ঐ আবছা অন্ধকারে লীলার মুখের দিকে একদণ্ড কাল তাকিয়ে রইলো, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বালিশে মাথা গুঁজলো।

দিন-পনেরোর মধ্যেই বিকাশ আস্তে-আস্তে বেশ ভালো হয়ে উঠলো। নানারকম ভালো খেয়ে, নিয়মে থেকে আর সর্বোপরি লীলার ঐকান্তিক যত্নে এ-ক'দিনেই তার ফরসা র

টকে হয়ে উঠলো, ঈষৎ ফোলা গাল আরো গোল হলো এবং এর আরো সাতদিন পরে সে খানি ভালো হলো যে, অনায়াসে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে পারে। ডাক্তারের ইচ্ছেমতো গল-বিকাল সে খানিকটা হাঁটতে শুরু করলো। এর মধ্যে একদিন মাসিমা বললেন, 'সত্য, নেকদিন তো সংসার করলাম, তুই মানুষ হলি, বড়ো হলি—এবার আমায় ছুটি দে।'

'ছুটি মানে?'

'কাশী যেতে চাই, সঙ্গীও জুটেছে অনেক।'

'কেন, তোমার ভালো লাগছে না আমার কাছে? কথার সুরে একটু অভিমানের আভাস লো। মাসিমা কাছে এসে পিঠে হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন, 'তোর কাছে ছাড়া আমার র ভালো লাগবার জায়গা আছে?'

'তবে তুমি যেতে চাও কেন?'

মাসিমা চুপ করে রইলেন। কতক্ষণ চুপ করে থেকে সত্যশরণ বললো, 'লীলার সংস্পর্শ ামার ভালো লাগে না, এই তো?'

ইতস্তত করে মাসিমা মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'কথা যখন তুললি তখন সত্যকথাই বলা ভালো। ই কি চাস যে, স্ত্রীলোক হয়ে আমি স্ত্রীলোকের এতবড়ো সর্বনাশ বসে-বসে দেখবো?'

চকিতে একবার মাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যশরণ বললো, 'যাতে দেখতে না হয় র ব্যবস্থা করলেই পারো।'

'তার ব্যবস্থার জন্যই তো আজ তোর কাছে এসেছি। হয় এ-বাড়ি থেকে আমি দূর হবো, া দূর করবি ঐ কালসাপকে। ও আরো একমাসের ছুটির দরখাস্ত করেছে এবং আমি এও ানি যে ছুটি না-পেলেও ও চাকরির জন্য পরোয়া করে না, কেন না ওর বাপের পয়সা াছে।'

হঠাৎ সত্যশরণ চটে উঠে বললো, 'তোমার এই কাজ—আড়ি পেতে-পেতে অন্যের কথা '—লজ্জা করে না?'—টেনে ব্র্যাকেটের এক রাশি জামাকাপড় ফেলে একটা জামা হাতে রে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

মাসিমার দুই চোখ জলে ভরে গেলো। 'আমার মরণ নেই কেন, মরণ নেই কেন! হে র, দয়া করো, দয়া করো আমাকে—' গুনগুনিয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন।

লীলা বিকাশকে স্নান করবার জন্য তাড়া দিতে এসেছিলো, অত্যন্ত নিচু গলায় বললো, াশ্চর্য আলসে তুমি সত্যি—কখন থেকে বলছি—' সমস্ত মুখে এক মধুরতার আভা ছড়িয়ে কাশ বললো, 'জানো তো আলসেমিটা নিতান্তই নবাবি—আর অহোরাত্র কাজ করবার চ্ছেটা একান্তই কুলীমজুরদের। তা ছাড়া আমার হাত-পা কাজ করছে না বটে, কিন্তু চোখের া বিশ্রান নেই। লীলা, তোমাকে দেখে-দেখে আমার আরো দেখবার তৃষ্ণা বেড়ে যায় কেন? ামি তো আর চিরদিন পাবো না তোমাকে, তবু কেন মন—'

লীলা চোখ-ইশারা করতেই থেমে গেলো বিকাশ। ঈষৎ উঁচু গলায় লীলা বললো, 'আপনি ান করতে যান—ওঁর আজকে তাড়াতাড়ি কলেজ—' বলতে-বলতেই মাসিমা ঘরে ঢুকলেন ার লীলা ব্যস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলো।

মাসিমা বিকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো ভূমিকা না-করেই বললেন, 'কিছু মনে করো বিকাশ—প্রায় দু'মাস হতে চললো তুমি এখানে এসেছো, এখন বোধ হয় তোমার যাবার কোনো বাধা নেই।'

হঠাৎ বিকাশ থতমত খেয়ে গেলো এই প্রশ্নে। জবাব দিতে গিয়েও হাঁ করে চেয়ে রই মাসিমার মুখের দিকে।

মাসিমা কঠোর মুখে বললেন, 'দ্যাখো, তুমি আমার সন্তানের বয়সী, তোমার চালাকি ত বুঝবো না এটা না-ভাবলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতে। লীলা অত্যন্ত অপরিণামদর্শী এ নির্বোধ ও দাম্ভিক মেয়ে, আর সত্যশরণ অপরিসীম ক্ষমাশীল মানুষ—সেই সুযোগটার যথেষ্ট ব্যবহার করছো! একটা সংসার ভেঙে দিয়ে কী লাভ হবে তোমার? তোমার কী শ করেছে সত্য?' বলতে-বলতে মাসিমার গলা কেঁপে উঠলো।

বিকাশ নিজেকে সামলে নিলো এবার, ধীরে-ধীরে বললো, 'কী জন্য আপনি আমাকে করছেন জানি না, জানি না আপনি কেন অযথা আমাকে এ-রকম অপমান করছেন। আপ মনে যদি আমাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ গড়ে উঠে থাকে তাহলে জানবেন সেজন্য দায়ী এক আপনার ছেলে। তার মতো বোকা ভালো-মানুষ সংসার-ক্ষেত্রে অচল।'

'আমার ছেলে সত্য? সত্য!'—মাসিমা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, 'তোমার মতো অকৃ ভণ্ডকেও সে নির্বাক হয়ে ক্ষমা করতে পারছে, এই তো তার অপরাধ? তুমি কি মনে করো কিছু বোঝে না, সে কিছু দেখতে পায় না?'

'কী দেখতে পায় না?'—লাফ দিয়ে লীলা ঘরে এসে দাঁড়ালো মাসিমার মুখোমুখি।

চড়া গলায় মাসিমা বললেন, 'দেখতে পায় তোমার ব্যভিচার, তোমার পশুত্ব—'

'মুখ সামলে কথা বললেন। আপনাদের অনেক দাসত্ব আমি করেছি, কিন্তু আর আপনার ছেলেকে আপনি যতই দেবতা ভাবুন, আমি তা ভাবি না। তিনি তাঁর শঠতা দি আমার বাবাকে বশ করেছেন—তা নইলে—'

হঠাৎ, দরজার ধারে এসে সত্যশরণ দাঁড়ালো। সঙ্গে-সঙ্গে লীলার গলা বন্ধ হয়ে গে বিকাশ চোখ নিচু করলো, আর মাসিমা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলের দিকে, 'সত্য, আমাকে দেখতে হলো, এও শুনতে হলো?' দেয়ালে তিনি মাথা ঠুকতে লাগলেন। সত্যশরণ মাসিম শান্ত করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে লীলার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর সুরে বললো, 'বেরিয়ে এখান থেকে—' নিঃশব্দে লীলা বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। বিকাশের দিকে তাকিয়ে সত্য বললো, 'বিকাশ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু না বলে পারলুম না যে, এখন আর তো এখানে থাকা উচিত নয়। কথাটা আমি ক'দিন থেকেই বলবো-বলবো ভাবছিলাম, ভদ্রতায় বেধেছে। কিন্তু ভদ্রতার সকল সীমাই তো তুমি লঙঘন করেছো—'

এ-কথার উত্তরে বিকাশ সত্যশরণের মুখের দিকে অনেকক্ষণ হিংস্র দৃষ্টিতে তা রইলো, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা—' আর এক মুহূর্তও দেরি করলো না একটা ট্যাক্সি ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। স্যুটকেসটা রমণী মা করে নিয়ে এসেছিলো নিচে, ট্যাক্সিতে উঠে বিকাশ একটা কাগজে কী লিখে ওর হাতে বললো, 'এটা তোর বৌদির হাতে দিবি। আর কারও হাতে না, বুঝলি?' সঙ্গে-সঙ্গে প থেকে দুটো টাকা হাতে দিয়ে বললো, 'মনে থাকে যেন, আর কারও হাতে না—বৌ হাতে।—এই, চলো—', ট্যাক্সি স্টার্ট দিলো, আর রমণী এতখানি মাথা হেলিয়ে তার স জানালো।

অভুক্ত সত্যশরণ বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে, মাসিমা উনুনে জল ঢেলে রইলেন—আর খুকুকে নিয়ে লীলা চলে গেলো তার পিত্রালয়ে, এবং যাবার মুখে রমণী সেই কাগজটি হাতে দিলো।

পরে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেলেও লীলা যখন নিজে থেকে ফিরে এলো না—মাসিমা
-ভয়ে বললেন, 'ওদের এবার আনালে হয় না?'

বই থেকে চোখ তুলে সত্যশরণ বললো, 'কাদের?'

কাদের আবার! এতদিন হয়ে গেলো, আর ক'দিন থাকবে? মেয়েটা না-থাকলে কি টেঁকা
বাড়িতে?'

'ও—' সত্যশরণ আবার চোখ ডোবালো বইয়ের মধ্যে। মাসিমা বললেন, 'ঘরের বৌ ঘরে
াকলে কি চলে? এবার তুই নিয়ে আয় ওদের। আজই যা।'

সত্যশরণ বই বন্ধ করে রেখে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'খুকু তো রোজই আসছে, আর লীলাকে
আমি যেতে বলিনি! যেদিন সে নিজে থেকে আসবে সেদিনই তার আসা উচিত।'

'কী যে বলিস!' মাসিমা সত্যশরণের মুখের দিকে ভালো করে তাকালেন। মাথার চুলগুলো
অসম্ভব পাতলা হয়ে গেছে এ-ক'দিনে। ভিতরে-ভিতরে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন তিনি,
পর ঈষৎ আবদা..র ভঙ্গিতে বললেন, 'তা বাপু, তুই না যাস আমিই না-হয় নিয়ে আসবো
।। ছেলেমানুষ রাগ করে গেছে, এখন কি আসতে পারে নিজে?'

'কক্ষনো না—' আদেশের ভঙ্গিতে বলে উঠলো সত্যশরণ—'খুকুকে চাও, আমি নিয়ে
বো তাকে।—তা ছাড়া ওখানে আর রাখাও আমার ইচ্ছে নেই। যথেষ্ট বড়ো হয়েছে, অথচ
শুনা হচ্ছে না। ওকে এনে এবার স্কুলেই ভর্তি করে দেবো।'

'শোনো কথা!' মাসিমা শুকনো হেসে বললেন, 'তাই নাকি হয়? ঐটুকু পাঁচবছরের বাচ্চা
মা ছেড়ে আসতে পারে!'

'তুমিই তো আছো।'

'আমি কি ওর মা?'

'তুমি কি আমারও মা? জন্ম দিলেই কেবল মা হয়, এ তোমাকে কে বলেছে? মা হতে হলে
গ্যতা চাই।'

এ-কথায় মাসিমার বুকের ভিতরটা ভরে উঠলো। চোখ ছলছলে হয়ে উঠলো। একটু চুপ
। থেকে বললেন, 'সত্য, কেবলি ছেড়ে দিবি, কেবলি সরে দাঁড়াবি? ন্যায়ত-ধর্মত যা
াস্তই তোর, তাও তুই জোর করে দাবি করবি না?'

চকিতে মাসিমার মুখের দিকে তাকালো সত্যশরণ। মাসিমা বললেন, 'তা ছাড়া লীলার কথা
য় ছেড়ে দিলাম—আনন্দবাবু আর তাঁর স্ত্রী কী মনে করছেন বল তো? আজ পনেরো-

'হুঁ।'

'হুঁ নয়। সত্য—আমার কথা শোন—তুই ওদের নিয়ে আয়। ওকে ক্ষমা কর।'

সত্যশরণ মুখ নিচু করে রইল।

'যাই তোর খাবার আনিগে—' বলে মাসিমা চলে গেলেন আর টেবিল-ল্যাম্পটা নিবিয়ে
য়ে সেই নিঃশব্দ অন্ধকারে বসে-বসে সত্যশরণ আকাশ-পাতাল ভেবে চললো।

পরের দিন কলেজ করে বেলা প্রায় সাড়ে-তিনটার সময় অনেক ভেবে-চিন্তে সে গেলো
আনতে। প্রখর রোদ্দুরে তার গায়ের জামা ভিজে গেলো, পা পুড়ে গেলো উত্তাপে।

আনন্দবাবু বাড়ি ছিলেন না, ঝি এসে দরজা খুলে দিয়ে ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ালো। ও
তিনটা ঘর পার হয়ে নির্দিষ্ট ঘরটির দরজায় দাঁড়িয়েই সত্যশরণ দেখতে পেলো, খুকুকে বুকে
কাছে নিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন লীলার মা। —শব্দ পেয়ে তিনি তখুনি চোখ খুললেন, তার
ধড়মড় করে উঠে বসে মাথায় আঁচল টেনে বললেন, 'তুমি যে!'

প্রশ্নটা যে বিস্ময়ের তা তাঁর সুরে বোঝা গেলো। লজ্জিত হয়ে সত্যশরণ বললো, 'ভ
খাটুনি পড়েছিলো, তাই এ-ক'দিন আসতে পারিনি।'—তার চোখ একটু অনুসন্ধিৎসু হ
চারদিক ঘুরে এলো।

লীলার মা বললেন, 'তুমি কি কলেজ থেকে এলে? লীলা তো ওখানেই গেছে!'

'ও—'

'বোসো।'

সত্যশরণ বসে একটু হেসে বললো, 'আমার মেয়েটিকে কিন্তু আপনি একেবারেই
ক'রে দিচ্ছেন।'—লীলা নিজে থেকেই বাড়ি গেছে শুনে তার মন যেন অনেক হালকা হ
গেলো। তাই এই ঠাট্টার কথা বেরুলো তার মুখ দিয়ে।

লীলার মা পালটে ঠাট্টা করলেন, 'তা বাপু, এ-কথাও না বলে পারছিনে, আ
মেয়েটিকেও তোমরা কম পর করোনি। এসে এ-রকম করে থাকে নাকি আর কোনোদিন?
ও এলো তা আবার প্রত্যেক দিন তার একবার অন্তত নিজের বাড়িতে না-গেলেই নয়—
রোদই হোক আর জলই হোক।'

চকিত হলো সত্যশরণ। ভুরু কুঁচকে বিস্ময়-ভরা চোখে সে হাঁ করে তাকিয়ে রই
শাশুড়ীর মুখে।

শাশুড়ী উঠে গিয়ে পাখার স্পীড্‌টা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইস, একেবারে ঘামে ভি
গেছো! যা রোদ্দুর! আর বাড়িটা ট্রাম থেকে সত্যি বড়ো দূরে—'

সত্যশরণের কথা বলবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না। এটুকু সে ঠিকই জানে যে,
পনেরো দিনের মধ্যে লীলা একবার এক মুহূর্তের জন্যও তার বাড়ি যায়নি। কিন্তু গিয়েছে
কোথাও নিশ্চয়ই! আর তাও বাড়ির অছিলায় যাওয়া! তার মানে, মায়ের কাছেও গো
রাখবার মতো জায়গা সেটা? তবে কি—হঠাৎ সত্যশরণের মাথার মধ্যে যেন দপ্ করে জ্ব
উঠলো। সহসা দুহাতে ঝাপটে ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি এখ
যাই— ওকেই নিতে এসেছিলাম—'

এবার হাঁ হলেন শাশুড়ী—বিস্ময়ের শেষ সীমায় গিয়ে তিনি বললেন, 'সে কী!
রোদ্দুরে! আর এইমাত্র এলে, এক্ষুনিই যাবে?'

সত্যশরণ দরজার কাছ থেকে অদৃশ্য হতে-হতে বললো, 'আমাকে যেতেই হবে।'

লীলার মা কোনো কথা বলবার আর অবকাশ পেলেন না।

খুকুকে দেখে মাসিমা অবাক্ হয়ে বললেন, 'এ কী রে, এই রোদ্দুরে মেয়েটাকে নি
এলি—লীলা এলো না? গাড়িতে এসেছিস?'

'না।'

'লীলা এলো না কেন?'

'তাকে দিয়ে কী হবে?'

'তার মানে?'—ছেলের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। চম্‌কে উঠে বললেন, 'তোর কি সুখ করেছে? এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'অসুখ! অসুখ তো আমার সাত বছরের!—তুমি জানো না?'

সত্যশরণের ভাবে-ভঙ্গিতে মাসিমা স্তব্ধ হলেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকিয়ে রইলেন মুখের কে।

'মাসিমা, শোনো—' মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সত্যশরণ বললো, 'লীলা কি একদিনও এসেছিল র মধ্যে?'

'না তো—'

'ঠিক জানো?'

'ঠিক জানবো না তো কী—'

'তবে যাও—'

মাসিমা মন্থর পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, আর সত্যশরণ ঘরময় পায়চারি করতে গলো—তারপর একবার চুপ করে দাঁড়ালো—একবার এলো জানলার কাছে, অবশেষে য়ারে বসে টেবিলের উপর নিচু হয়ে দুহাতে মুখ গুঁজলো। গরম সীসের মতো জল গড়িয়ে-ড়িয়ে পড়তে লাগলো তার দু'গাল বেয়ে—এতদিনের অবরুদ্ধ সমস্ত দুঃখ গলে-গলে বয়ে লো অবিরাম ধারায়।

এদিকে সত্যশরণ চলে আসবার একটু পরেই ফিরে এলো লীলা। শাড়ি ছাড়তে-ছাড়তে লো, 'খুকু কই?'

মা'র মন এমনিতেই চিন্তাক্লিষ্ট ছিলো—মেয়ের প্রশ্নে অবাক হয়ে বললেন, 'কেন, তুই নিস না?'

'আমি জানবো কী করে?'

'তার মানে! তুই ওখান থেকে এলি না?'

হঠাৎ লীলা বুঝতে পারলো কথাটা। সচেতন হয়ে তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুকু তো খানেই গেছে, আমার কী ভুল!'

মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে লীলা কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে লো। মা বললেন, 'সত্যশরণ কখন ফিরলো?'

'এই তো খানিকক্ষণ—'

'খুকু কখন গেলো?'

লীলা চটে উঠলো—'তুমি পাঠিয়েছো আর তুমি জানো না কখন গেলো? অত নিকেশ আমি দিতে পারবো না তোমার কাছে!'—লীলা রাগ করে চলে যাচ্ছিলো—মা খপ্ করে আঁচল টেনে ধরে বললেন, 'তোদের কী হয়েছে বল তো?'

'কী হবে?'

'আমি মা, আমাকে তুই ফাঁকি দিতে পারবিনে। আমি জানি তুই ওখানে যাসনি—অন্ত আজ যাসনি—কোনোদিনই যাস কিনা তাও আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে লীলা জবাব দিলো, 'তবে কোথায় যাই বলতে চাও? মা হয়ে নিজে মেয়েকে সন্দেহ করো—লজ্জা করে না?'

'তবে রোজই তুই ও-বাড়ি যাস?'

'তা নয় তো কী?'

'আজ গিয়েছিলি?'

'না।'

'তবে?'

একটু থেমে লীলা বললো, 'তবে শোনো—ওঁর সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেই আমি বাড়ি এসেছি। আর, কোথায় যাই তা আমি বলবো না। হলো?'

স্তম্ভিত হয়ে মা বললেন, 'সত্যি?'

'সত্যি—' লীলা বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আনন্দবাবু ফিরে এসে সব শুনে কতক্ষণ যেন নিজের মধ্যেই নিজে মগ্ন হয়ে রইলে অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'আচ্ছা।' বিষণ্নমুখে স্ত্রী বসে রইলেন। তিনি উঠে গেলেন লীলার ঘ

লীলা চিঠি লিখছিলো নিচু হয়ে। আনন্দবাবুর পায়েব শব্দে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালে

আনন্দবাবু কিছুমাত্র ভূমিকা না-করে বললেন, 'তোমাকে তো যেতে হয়?'

'কোথায়?'

'তোমার সঙ্গে যদি সত্যশরণের ঝগড়া হয়েই থাকে, এ-কথা আমি নিঃসংশয়েই বল যে সে-দোষ তার নয়, তোমার। তোমাকেই ক্ষমা চাইতে হবে সেজন্য।'

লীলা চড়া গলায় বললো, 'কক্ষনো না—আমি আর যাবো না।'

'যাবে না!—আনন্দবাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, 'স্ত্রীলোক হয়ে তুমি বল পারলে এ-কথা!'

'তুমিও তো বাপ হয়ে বিনা দ্বিধায় আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছো।'

'আমি বাপ বলেই আমার এত মাথা-ব্যথা, লিলি।'—আনন্দবাবুর গলা যেন ধরে এ

'সত্যশরণকে আমি তোর চেয়ে কম ভালোবাসি না—সে সত্যিই আমার সন্তানতুল্য। য বুঝতুম অপরাধ তার, যেতে দিতুম না তোকে সেখানে—জুতো মেরে ফিরিয়ে দিতুম নি এলে। কিন্তু তা তো নয়। যেতে তোকে হবেই—আমি রেখে আসবো তোকে।'

'আমি যাবো না।'

'লিলি!'

'না।'

'তবে তোর মেয়ে? মেয়ে ছেড়ে থাকতে পারবি?'

'মেয়ে ছাড়বো কেন? মেয়ে আমার। কষ্ট করে আমিই জন্ম দিয়েছি তাকে। মেয়েকে আমি যেতে দেবো না।'

'তুই দিবি না, কিন্তু আইন?'

'আইন কী? আইন মায়ের পক্ষে।'

আনন্দবাবু কাছে এসে মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'ওরে পাগলি! তা নয়, তা নয়। াইন সম্পূর্ণ বাপের দিকে। খ্যাপামি করিসনে, চল্ তোকে নিয়ে যাই।'

'না, বাবা।'

এবার আনন্দবাবু ধৈর্য্য হারালেন—'কেন যাবিনে? যেতেই হবে। এক্ষুণি যেতে হবে।'

'অসম্ভব।'

'তাহলে মেয়ে ছাড়বি, তবু যাবিনে?'

'মেয়ে আমার। মেয়েকে কে ছিনিয়ে নেবে? মেয়েকে আমি ছাড়বো কেন?'

'তুই জানিস আজ সত্যশরণ নিজে এসে তার মেয়েকে নিয়ে গেছে?'

'নিক। আমিও নিজে গিয়ে আমার মেয়েকে নিয়ে আসবো।'

আনন্দবাবু মেয়ের ভাবগতিক দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। কতক্ষণ আর কী বলবেন তা যেন ঃবে পেলেন না। অবশেষে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, 'তবে, তাই চল্। মেয়েকে আনতেই ল্, নিয়ে যাই!'

তীক্ষ্ণ চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো লীলা। তারপর বললো, 'তার মানে, যে করেই াক এ-বাড়ি থেকে আমার দরজা তুমি বন্ধ করেই দেবে। বেশ। তাই হোক।' বাপকে স্তম্ভিত রে লীলা যাবার জন্য দরজা পর্যন্ত এলো, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আজকের রাতটা ন্তত থাকতে দিয়ো—তারপর আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেবো।'

আনন্দবাবু বললেন, 'শোন্—'

লীলা শুনলো না, অসংকোচে জোরে-জোরে পা ফেলে পাশের ঘরে এলো শাড়ি ছাড়তে।

একটু পরেই যৎসামান্য প্রসাধন সেরে, জুতো পায়ে বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। আনন্দবাবু প করে দাঁড়িয়ে দেখলেন, বাধা দিতে ইচ্ছে করলো না। স্ত্রী বললেন, 'কোথায় গেলো?'

হাত উল্‌টিয়ে বিষণ্ণমুখে আনন্দবাবু জবাব দিলেন, 'জাহান্নমে।'

স্ত্রী ব্যাকুলস্বরে বললেন, 'জিজ্ঞাসা করলে না কোথায় গেলো? যাও, সঙ্গে যাও—'

'দরকার নেই।'

'গাড়ি নিলো না?'

'না।' আনন্দবাবু চলে গেলেন আর লীলার মা-বেচারা সজল চোখে ভাবতে াগলেন—কী হলো!

আনন্দবাবু ভেবেছিলেন—গেলো, ভালোই হলো—মেয়ে আনতে গিয়ে হয়তো একটা াটমাটও হয়ে যেতে পারে। মনে-মনে একটু আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে লীলা বড়ো রাস্তায় এসে ভাবতে লাগলো, কী করবে। খুকুকে আনতে াথমে ও-বাড়িই যাবে, না প্রথমটায় বিকাশের সঙ্গে কথা বলে নেবে। মন লীলা এর আগেই ম্বর করেছিলো, কিন্তু সমস্যা তার মেয়েকে নিয়ে। বিকাশ তাকে সমাজ-সংসার মা-বাবা সব াাকর্ষণ থেকেই বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছিলো, কিন্তু পারছিলো না কেবল মেয়ে থেকে। এ নিয়ে ানেক মান-অভিমান খোশামোদ সব হয়ে গেছে তার, কিন্তু লীলা মেয়ে ফেলে যাবার কথা

কিছুতেই ভাবতে পারে না। বিকাশের মেয়াদও তো ফুরিয়ে এলো—এবার তাকে যেতেই হবে নইলে চাকরি থাকে না, অথচ এদিকটাই বা ছাড়ে কেমন করে। আনন্দবাবুর মতো এ-কথা সে বলেছিলো যে, মেয়ের ভার সে নিতে চাইলেও পিতাই সন্তানের অধিকারী—আইন তা দিকে। 'তা হোক, তবু আমার মেয়ে আমি নেবো।'—বিকাশকে হতাশ করে অবুঝের মতে জবাব দিয়েছে লীলা।

ট্রাম এলো। ভা লীলা হাত বাড়িয়ে উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি। ভাগ্যিস এক একা চলাফেরার অভ্যাস হয়েছে তার। গরীব হবার এই একটাই দেখা যায় যে একটু ভালো বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারেনি কোনোদিন স্টপে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ট্রাম থামাবে তারপর উঠে বসবে একা-একা।

ভবানীপুরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রাম থামতেই নেমে পড়লো সে। এই কতক্ষণ আগে ফিরেছে এখান থেকে, আবার এইমাত্র তাকে দেখে বিকাশ বলবে কী?

বড়ো রাস্তার উপরেই ছোটো একটি ফ্ল্যাট নিয়েছে বিকাশ। সত্যশরণের বাড়ি থেকে অসময়ে বেরিয়ে একটি 'To Let' বাড়ির জন্য দশটাকা ট্যাক্সিভাড়া লেগেছিলো তার, কি সফল হয়েছে বই কি। রমণীর হাতের সেই চিরকুট দেখেই যে লীলা তার সঙ্গে দেখা করবে এ-কথা সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। বাড়ি ঠিক করে হোটেলে গিয়ে খেয়ে কোনোরকমে কাটালো সে-দিনটা। লীলার সান্নিধ্যের জন্য দেহ-মন দাবিয়ে রাখবে সেদিনের মতো। পকেটে টাকা থাকলে আরামের অভাব হয় না। ভাড়া করে নিয়ে এলো খাট চৌকি—একপ্রস্থ বিছানা এলো, তারপর তক্তাপোশে চাদর পেতে সে-রাতটা কাটিয়ে দিলে

পরের দিন বিকেলবেলা যখন দুরুদুরু বক্ষে সেই চিরকুট-বর্ণিত নির্দিষ্ট গাছটির তলা এসে সে দাঁড়ালো—বেলা তখন চারটা। লিখেছিলো সাড়ে-চার, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈ রাখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। তারপর সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অত্যন্ত মন্থর গতিতে যখন সাড়ে চারটা হলো, দেখা গেলো একখানা কমলা-রংয়ের শাড়ি পরে ছাতা-হাতে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাতে-তাকাতে এগিয়ে আসছে লীলা। বিকাশের হৃৎপিণ্ড প্রবল বেগে নড়ে উঠলো ছেলেমানুষের মতো ছুটে গিয়ে হাত ধরলো তার—ট্যাক্সি পেতে দেরি হলো না—ক রাত্রিতে যে-বিছানায় সে তার একা বাসরে রাত কাটিয়েছিলো, মুহূর্তে লীলাকে এনে সে বিছানায় বসালো সে। তারপর ষোলো দিন ধরে এই নিরালা নিভৃত ঘরটি তাদের প্রণয়লীলার সাক্ষী হয়ে রইলো, তা থেকেও কি বিকাশ নিঃশংসয়ে বুঝলো না যে, সত্যশরণকে সে সত্যিই পরাজিত করেছে!

নিতান্ত দ্বিধা-জড়িত হাতে দরজায় টোকা দিলো লীলা। বিকাশ বেরুবে-বেরু ভাবছিলো—দরজায় টোকা শুনে নিজেই দরজা খুলে দিলো। অবাক হয়ে বললো, 'বা (তুমি যে!'

'এলাম আবার—'

'এসো—'দরজা বন্ধ করে লীলাকে নিয়ে শোবার ঘরে এলো বিকাশ। বললো, 'এ ভালোই হলো—তুমি যাবার পরেই আপিসের চিঠি পেলুম, ছুটি নামঞ্জুর হয়েছে। তার ম পরশুর মধ্যেই আমাকে যেতে হবে, নয়তো চাকরি থাকে না। তুমি কী করবে?'

সহাস্যে লীলা বললো, 'আমিও যাবো।'

আনন্দের আতিশয্যে বিকাশ লীলার হাত চেপে ধরে বললো, 'সত্যি?'

'সত্যি নয়তো কী? কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা—'

'কী?'

'খুকুকে তার বাপ নিয়ে গেছে বাড়িতে, ওকে উদ্ধার করা যায় কী করে?'

একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বিকাশ বললো, 'লীলা, এ তোমাকে ছাড়তেই হবে।'

'তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না—' অত্যন্ত আহত স্বরে লীলা বললো, 'নিজের রক্তমাংস য়ে তিলে-তিলে যাকে গড়েছি তার বিচ্ছেদ কত ভয়ংকর!'

'সে-দুঃখ তোমার অনিবার্য।'

'এ-কথা বলছো কেন—তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি ওকে নিশ্চয়ই আনতে ারবো।'

'না পাগল, না—' আস্তে-আস্তে গালে টোকা দিয়ে বিকাশ বললো, 'যার মেয়ে সে খনোই ছেড়ে দেবে না।'

'আমারও তো মেয়ে—'

'তবুও—' লীলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বিকাশ চুম্বন করলো। লীলা গভীর আবেগে ম্পূর্ণ সমর্পণ করলো নিজেকে।

দেখতে-দেখতে ঘর আবছা হয়ে এলো—মিনিটের পর মিনিট কেটে ঘণ্টা হলো—ঘণ্টার র ঘণ্টা কেটে রাত ন'টায় এসে কাঁটা থামলো—লাফ দিয়ে উঠে বসলো লীলা।

'ইস, কত যেন রাত হলো!'

সংযত হয়ে উঠে গিয়ে আলো জেলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিকাশ বললো, 'নটা। আর কি তামার ফেরার সময় আছে?'

সহসা দু'চোখ ছাপিয়ে জল এলো লীলার, ব্যাকুল গলায় বললো, 'কী হবে—'

ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বিকাশ বললো, 'এর পরেও তুমি ফিরে যেতে চাও?'

লীলা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে বললো, 'খুকু—আমার খুকু—'

কের মধ্যে এই বারো বছর ধরে যে এমন একটি গভীর ক্ষত লুকিয়ে ছিলো তা কে জানতো! য়েবাড়ি থেকে ফিরে গাড়ির মধ্যে সমস্তটা রাস্তা একটা আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলো লীলা। াড়ি এসে শিথিল পায়ে নেমে আস্তে-আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো দোতলায়। সিঁড়ির ডাইনে সবার ঘরে আলো জ্বলছে, কথোপকথনের গুঞ্জন শোনা গেলো। আজ ছুটির দিনে তাসের াড্ডা বসিয়েছে বিকাশ। সেদিকে না-তাকিয়ে বাঁয়ের দরজা দিয়ে সে শোবার ঘরে এসে একটু মকে দাঁড়ালো—মৃদু আলোতে তাদের যুগল শয্যাটির দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ— ঠাৎ মনে হলো খুকুর ছোটো কট্‌টি যেমন ছিলো একটু আগেই, কে তুলে নিয়ে গেছে ও-াশ থেকে, কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে, যেন ঘরটাই শূন্য হয়ে গেছে ঐ কট্‌টির সঙ্গে-ঙ্গে। কে নিলো? কে নিলো! সমস্ত হৃদয় ভরে গেলো এই এক অশ্রুত অব্যক্ত কান্নায়। বিয়েবাড়ির পোশাকেই একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লো সে—পায়ের মূল্যবান ব্রোকেডের জুতোটি পর্যন্ত খোলা হলো না। খোলা জানলা দিয়ে সোজা তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে—কী যে মনে হলো, কী যে হলো না, তা নিজেও বুঝলো না—কেবল মাঝে মাঝে কাঁচা-পাকা দাড়ি-ভরা একটি প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর চন্দন চর্চিত অতি সুন্দর একটি তরুণীর মুখ

সিনেমার পর্দায় চলমান ছবির মতো কেবল তার হৃদয়ের মধ্যে ভেসে-ভেসে উঠতে লাগলে

হৃদয়টা কী? কত মহল আছে তার মধ্যে? কে কোথায় লুকিয়ে থাকে কিছুই বোঝা যা না—তারপর হঠাৎ একদিন মনের অবচেতন থেকে বেরিয়ে আসে তারা—ছিন্ন-ভিন্ন ক দেয় চেতনাকে। তবে কি ভুলে-থাকাটা সত্যি ভোলা নয়?

খুট করে বড়ো আলো জ্বললো—ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বিকা বললো, 'এ কী, তুমি! এর মধ্যেই ফিরে এলে?'

মূর্ছায় যেন মুহ্যমান হয়ে ছিলো লীলা, সচকিত হয়ে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, এক তাড়াতাড়িই এলাম, শরীরটা ভালো লাগছিলো না।' চোখে সে রুমাল চাপা দিলো।

একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসে বিকাশ বললো, 'কী হলো? আলো সইছে না? ব দেখলে কেমন?'

অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় লীলা বললো, 'এই—'

'কী? হয়েছে কী? তোমার কাপড়টাও যে ছাড়োনি দেখছি!'

'এই তো ছাড়ি—' লীলা উঠে দাঁড়ালো। বিকাশ বললো, 'এত অসাবধান তুমি— শাড়িটার দাম কত জানো? দুমড়ে-টুমড়ে একেবারে একাকার করলে—পাথরের গয়নাগুলো ছাড়োনি দেখছি—'বলতে বলতে লীলার সজ্জিত মূর্তির দিকে চোখ রেখে লক্ষ্য করে গলাটা খালি; বলে উঠলো, 'এ কী, তোমার গলার কণ্ঠি?'

লীলা থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি গলায় হাত দিয়ে বললো, 'অ্যাঁ, তাই তো!'

'তাই তো মানে—' প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠলো বিকাশ। হীরের এতবড়ো চও কণ্ঠি—যাবার সময় সে নিজের হাতে বার করে দিয়েছে পরবার জন্য!

লীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, 'ঐ দ্যাখো, কী ভুল, এ ওটা ড্রেসিং-টেবিলের দেরাজে রেখেছিলুম।—যা মাথা ধরেছে!' লীলা কাপড় ছাড়তে যাব জন্য পা বাড়ালো।

'কই, দেখি—'

'দেখবে আবীর কী, নতুন নাকি!' তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দি লীলা।

বিকাশ কিন্তু ভিতরে-ভিতরে ছটফট করতে লাগলো জিনিসটা দেখবার জন্য। সাধে অতিরিক্ত ব্যয়েও অনেক সময় সে স্ত্রীর সজ্জা যোগায়—তা নইলে কি সম্মান থাকে পুরুষের মর্যাদা তো স্ত্রীর বসন-ভূষণের বহুমূল্যতায়-ই। এই যে লীলা এমন জমকালো পোশ পরে গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালেই লোক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, সেটা কি তারই গৌ নয়?

লীলা একটু বেশী দেরিই করতে লাগলো কাপড় ছেড়ে আসতে। অসহিষ্ণু হয়ে দর ঠেলে বিকাশ বললো, 'কী করছো এতক্ষণ?' কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে সে আশ্চর্য হয়ে দেখ লীলা তখনো কাপড় ছাড়েনি, পশ্চিমদিকের জানলা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

চমকে লীলা ফিরে তাকালো—অত্যন্ত কাতর গলায় বললো, 'উঃ, মাথা যেন ছিঁ যাচ্ছে—এইখানটায় সুন্দর হাওয়া আসছিলো—' আলনা থেকে একটা কাপড় টেনে নি বিকাশের সামনেই লীলা কাপড় ছেড়ে ফেললো। বিকাশ বললো, 'দেখি কণ্ঠিটা?'

'কী জানি বাপু, আমি মরছি মাথার যন্ত্রণায়—'

দেরাজগুলো টেনে-টেনে দেখতে-দেখতে বললো, 'কোথায় আছে বলো না—আমি তো তামাকে খুঁজতে বলিনি?'

'ঐ তো ওখানেই একটা দেরাজে আছে। চলো ও-ঘরে যাই—পাখা ছেড়ে শোবো—'

'আমি যতক্ষণ আসিনি, এ-ঘরেই তো বেশ ছিলে!'

লীলা জবাব না-দিয়ে চলে এলো আর বিকাশ প্রত্যেকটা দেরাজ তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও ঠিটির কোনো সন্ধান পেলো না। হারায়নি তো! ছুটে সে এ-ঘরে এসে বললো, 'হারিয়েছো?'

'না।'

'তবে কোথায়?'

'আছে।'

'আমাকে দেখাও—'

'কী মুশকিল—' লীলা তার শুকনো মুখে একটু হাসির রেখা টেনে বললো, 'পুরুষমানুষ মন স্ত্রীলোকের মতো হলে সত্যি ভালো লাগে না।'

'ফাজলামি কোরো না—সত্যি বলো, হারিয়েছো নাকি?'

'যদিই বা হারায় তাহলেই বা কী করতে পারি?'

'সত্যি বলো।'

'সত্যি হারাইনি।'

'তাহলে কোথায় রেখেছো?'

একটু চুপ করে থেকে লীলা বললো, 'যদি কাউকে উপহারই দিয়ে থাকি—'

'ফাজলামিরও একটা মাত্রা আছে—'

কান্নাভরা গলায় লীলা বললো, 'তুমি কি চুপ করবে না?'

'আগে তুমি সত্যকথা বলো—'

'শুনবে?' মরিয়া হয়ে লীলা বলে ফেললো, 'ওটা আমি সুনীলের বৌকে উপহার দিয়েছি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'লীলা!'

'হ্যাঁ। সত্যি।'

'লীলা!'

'সত্যি! সত্যি! সত্যি!' অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে কথা ক'টা উচ্চারণ করেই লীলা দুহাতে খ ঢাকলো। অসহ্য ক্রন্দনের বেগে সমস্ত শরীর তার কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগলো।

এমন একটা অস্বাভাবিক ব্যবহার বিকাশকে খানিকক্ষণের জন্য স্তম্ভিত করলো। ও কি াগল? একি একটা উপহার দেবার জিনিস? সে যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারলো না। জোর রে দুই হাতে লীলার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, 'সত্যিকথা বলো।'

লীলা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবাব মুখ ঢাকলো—বিকাশ আবার জোর করে সে হাত সরিয়ে লো—'সত্যিকথা বলো!' টানাটানিতে লীলার সাদা মোমের মতো নরম হাত লাল হয়ে ঠলো, ব্যথায় চোখ ভরে জল এলো—তবু সে কথার জবাব দিলো না।

'কথা বলছো না কেন?'

লীলা চুপ।

'বলো—'

চুপ।

হাত মুচড়ে দিয়ে বিকাশ বললো, 'কথা বলো, সত্যিকথা বলো—' তবুও লীলা চুপ।

প্রায় অর্ধমৃত করেও বিকাশ লীলার মুখ থেকে একটি শব্দ বার করতে পারলো না। এক অন্ধ রাগে সমস্ত চিত্ত ভরে গেলো—রাত বাড়লো, খাওয়া হলো না। বারে বারে চাকর ঘুরঘুর করতে লাগলো আশেপাশে—এক সময়ে বিকাশ ক্লান্ত হয়ে খাটের উপর কাত হ ঘুমিয়ে পড়লো—আর লীলা ঠায় বসে রইলো সেই ইজিচেয়ারে।

পরদিন যথারীতি সংসারের কাজ আরম্ভ হয়ে গেলো। লীলা উঠেই রোজের মে বিকাশের আপিসে যাবার সব প্রস্তুত করে দিলো—তার খাবার ঠিক করলো—চাকরকে দি জুতো পরিষ্কার করালো। আর বিকাশও তাড়াতাড়ি দাড়ি কামালো, স্নান করলো, তারপ কোনো রকমে খেয়ে থমথমে মুখে আপিসে গেলো। সারা সময় তাদের মধ্যে একটাও বাব বিনিময় হলো না।

বিকাশ আপিসে যেতেই লীলা বাকী কাজকর্ম সেরে চাকরদের খেতে বললো, তারপ সেই অভুক্ত অস্নাত অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলো বাড়ি থেকে। কী এক দুর্নিবার ইচ্ছা যে তা আকর্ষণ করছিলো—সে আকর্ষণকে কিছুতেই এড়াতে পারলো না সে। একবার—মাত্র আ একবার দেখে আসবে সে ঐ মুখখানা—আর সেই-সেই.....

কাল রাত্রি করে এসেছিলো, আজ বাড়িটা চিনতে একটু অসুবিধে হলো। নম্বর মিলি বাড়িটির খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েই সে বুঝতে পারলো বাড়িতে কেউ নেই। বুক ধক করে উঠলো। ধীরে-ধীরে ভিতরে ঢুকে গেলো সে—ঘরগুলো সব খোলা—কালকে চিহ্নস্বরূপ কয়েকটা মাটির গেলাস, কতগুলো পরিত্যক্ত কলাপাতা এদিক-ওদিক ছড়ানো;- যে ঘরে কাল সে খুকুকে দেখেছিলো—ঠিক সেখানটায় এসে সে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। কয়ে ঘণ্টা আগে খুকু এখানটায় ।।—কথাটা ভাবতেই বুকটা ভারি হয়ে উঠলো—দুই হ বুকে চেপে মনে-মনে অনুভব করতে লাগলো খুকুকে, তারপর হঠাৎ নিচু হয়ে সেই ধূলিমি মেঝের উপর সে বসে পড়লো।

কোণের ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে লীলাকে দেখে একেবারে অবাক হ গেলো।

মুখ তুলে খানিক তাকিয়ে লীলা বললো, 'তুমি কি বলতে পারো এ-বাড়ির লোকে কোথায় গেলো?'

'বাড়িটা তো আজ একমাস হলো খালি পড়ে আছে। কেবল দু'দিনের জন্য এক বা এটা নিয়েছিলেন—বাড়িওলার বন্ধু কিনা, তাই আর ভাড়া-টাড়া দিতে হয়নি। তাদের বি হলো—'

'চলে গেছে তারা?' ভাঙা-ভাঙা গলায় লীলা উচ্চারণ করলো।

'আজ সকালে উঠেই চলে গেছেন।'

'সেই বৌটি? বৌটিকে দেখেছো তুমি?'

'নতুন বৌ? আহা, কী সুন্দর বৌ! দেখেছি বই কি, মা—কাল আমার নেমন্তন্ন
লা—আমিই তো এ-বাড়ির মালী।'

'আর ঐ বৌটির—' একটু কেসে লীলা বললো, 'বৌটির বাবা?'

'বৌটির বাবা?' ঈষৎ চিন্তা করে মালী বললো, 'তাঁকে তো আমি দেখিনি, মা—'

লীলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললো,
মি তার মা কিনা? মালী, আমি তার মা—'

'আজ্ঞে, আপনি মা?'

'হ্যাঁ, বাবা—আমি তার মা।' বুক ভবে লীলা উচ্চারণ করলো কথাটা। সমস্ত পৃথিবী যেন
পসা হয়ে গেলো তার চোখে।

এদিকে আপিসে গিয়েই বিকাশ সুনীলকে ডেকে পাঠালো। স্বভাবসুলভ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে
ীল মাথা নিচু করে কাছে এসে দাঁড়াতেই, নিজের মুখের উপর ভদ্রতার মুখোশ টেনে ঈষৎ
নলো বিকাশ।—'কী হে, কাল সব ভালোমতো হয়ে গেলো তো?'

'আজ্ঞে! আপনি গেলেন না—'

'তা আর কী, উনিই তো গিয়েছিলেন—' কী ভাবে আসল্ কথাটা উত্থাপন করা যায় মনে-
ন বিকাশ তাই ভাবতে লাগলো। একটু চুপ করে থেকে বললো, 'কোথায় বিয়ে করলে?'

লজ্জিতমুখে সুনীল বললো, 'এঁরা দশ-বারো বছর পাটনা আছেন, আমার শ্বশুর ওখানে
াফেসারি করেন।'

'প্রোফেসর! নাম কী বলো তো—'

'সত্যশরণ মিত্র। ওঁর নাম হয়তো শুনে থাকবেন, সেবার লণ্ডনে—'

'হুঁ! যাও তুমি—' সুনীলকে অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত বেগে হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে
ড়ালো বিকাশ।

এর পরে আর আপিস করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। একটা দুরন্ত ক্রোধ আর ঈর্ষা
র বুকের মধ্যে যেন জ্বলন্ত লাভার স্রোতের মতো গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তক্ষুণি বেরিয়ে
লো সে আপিস থেকে।

দুমদাম শব্দে সমস্ত সিঁড়ি প্রকম্পিত করতে-করতে সে উঠে এলো দোতলায়—শোবার
র ঢুকে গুম হয়ে বসে রইলো অনেকক্ষণ, কিন্তু লীলা কই? মৃদুতম শব্দেও সচকিত হয়ে সে
ড়-চড়ে উঠতে লাগলো। একটি চাকর উঁকি দিলো পর্দার ফাঁকে—অসময়ে বাবুকে দেখে
বাক্ হয়ে সরে যাচ্ছিলো—বিকাশের ইঙ্গিতে ভীত চকিত হয়ে সে ঘরে এলো। 'মা কই?'

'আজ্ঞে তিনি তো বাড়ি নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'তা তো জানিনে—আপনি যাবার পরেই না-খেয়ে চলে গেলেন।'

'চলে গেলেন!—' হঠাৎ যেন বিকাশের ভিতরে একটা কান্নার মতো অনুভূতি হলো।
ময় অস্থির বেগে পায়চারি করতে লাগলো জোরে-জোরে।

ঘরে ঢুকতে গিয়েই লীলা দ্বিধাভরে থমকে দাঁড়ালো দরজা ধরে—এমন অসময়ে
কাশকে দেখে অত্যন্ত অবাক হলো সে।

আর তাকে দেখতে পেয়েই বিকাশ বাঘের মতো লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো, তারপর হা চেপে ধরে গর্জে উঠলো, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

তার শক্ত হাতের পেষণে লীলার হাত যেন ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেলো বলো, কোথায় গিয়েছিলে তুমি—'

একটু চুপ করে থেকে হাতের যন্ত্রণাটা সহ্য করলো লীলা, তারপর অত্যন্ত শান্ত গলা জবাব দিলো, 'খুকুকে দেখতে।'

'আর তার বাবাকেও—' ঈর্ষাকাতর মুখে এক বিকৃত ভঙ্গি করলো বিকাশ।

মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলো লীলা, তারপর বললো, 'হ্যাঁ, তাঁকেও।'

'তবে যাও, তার কাছেই যাও। যাও—' শেষের কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই শরীরে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে এক ধাক্কায় লীলাকে ঠেলে ফেলে দিলো দরজার বাইরে, তারপ ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, 'তাই ভালো, তাই যাও তুমি!'

পড়ে যেতে-যেতে লীলা মুহূর্তের জন্য একবার হাত বাড়ালো উপরের দিকে— একটা অবলম্বন খুঁজলো—কিন্তু কে তাকে ধরে রাখবে? সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে-গড়াতে চোখের কোল বেয়ে লম্বা রেখায় জল বেরিয়ে এলো তার,—চুল খুলে গিয়ে একরাশ কা পশমের মতো ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, সরে গেলো বুকের আঁচল, বুকের ওঠা-পড়া হয়ে উঠলো, চোখের জলে আর সিঁড়ির ধুলোয় মেশা একটা অদ্ভুত স্বাদে তার মুখের ভিতর ভরে গেলো, আর তারপর সেই সুন্দর দেহটি বাঁকাচোরা রেখায় ধাক্কা খেতে-খেতে একেবা শেষ সিঁড়িটির তলায় এসে স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলো। ....

নীড়ের পাখী

সকাল বেলা খবরের কাগজ খোলামাত্রই যে খবরটি চোখে পড়লো এবং খবরের উপরে যার ছবিটির দিকে দৃষ্টি অনিমেষ করলেন ভবতোষ রায়, তিনি বম্বের একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী অভিনেত্রী অনুশ্রী দেব। নাম যদিও অনুশ্রী, কিন্তু সত্যিই যে তার শ্রী মোটেও অনু নয় তা তাঁর আবক্ষ ছাপা ছবিটিতেই প্রমাণিত। খবরের কাগজের মালিন্যও তাঁর লাবণ্যকে এতোটুকু ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। টানা টানা চোখের কোলের হাসিটি মোনালিসার হাসির সঙ্গে তুলনীয়। বয়েস জানা না থাকলে অনুমান করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবতোষ রায় জানেন অনেক ঋতুই স্পর্শ করেছে তাঁকে, তবুও দেহের সুঠাম ভঙ্গী সেই কুড়ি বছরের তরুণীর মতোই মনোহর। ভবতোষ রায় অভিভূত হলেন। তাঁর চশমার ক্ষীণদৃষ্টি অভিনেত্রীটির মুখের উপর কাঁচপোকার মতো আটকে রইলো।

'বাবা।'

চমকে উঠলেন তিনি, মানে ভবতোষ রায়, শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন, তারপরেই ঢোক গিলে কাগজটি ঠেলে সরিয়ে দিলেন দূরে।

'আমি তোমাকে কখন থেকে ডাকছি।' আঠারো বছরের মেয়ে লক্ষ্মী আবদারের ভঙ্গীতে কাছে এসে দাঁড়ালো।

'ও, ডাকছিস? কেন?'

'কেন আবার, চা খাবে না?'

'তৈরী?'

'অনেকক্ষণ। টেবিলে সব সাজিয়েই তো ডাকছিলাম। তুমি শুনতেই পেলে না।'

'ও। বড় অন্যমনস্ক ছিলুম।' এতক্ষণে নিজেকে তিনি সহজ করে নিতে পারলেন। নড়ে চড়ে বসে বললেন, 'এক কাজ করলি না কেন?'

'কী।'

'সুখনকে দিয়ে এই বারান্দাতেই নিয়ে এলি না কেন সব। বেশ খোলা জায়গায়, খোলা হাওয়ায় বসে গল্প করতে করতে খেতাম।'

'নিয়ে আসবো?'

'থাক, একবার ঠিক করে দিয়েছিস সব।'

'তাতে কী।'

'আবার টানাটানি করবি?'

'আহা। ভারি তো দুজনের ব্রেকফাস্ট, তা আবার টানাটানি। এক্ষুণি নিয়ে আসছি। সত্যি, বাইরেই ভালো। সুন্দর হাওয়া, সুন্দর আলো। ঘরের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা।' বলতে বলতে বাবার অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই লক্ষ্মী চলে গেল চায়ের সরঞ্জাম আনতে।

ভবতোষ রায় এক মিনিট অপেক্ষা করে আবার ক্ষিপ্রহস্তে টেনে নিলেন কাগজটা, আবার সেই ছবিটির মুখে একাগ্র হয়ে তাকালেন। তলাকার খবরটা পড়লেন।

যিনি এব ন্মে প্রায় ষোলো বছর সারা ভারতের অগণিত দর্শকের প্রাণ কখনো আনন্দে পূর্ণ করেছেন কখনো বেদনায় বিদ্ধ করেছেন আজ তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ডাক্তাররা আর কোন আশা দিতে পারছেন না। তাঁর মেরিন ড্রাইভের বাড়ি আজ অসংখ্য ভক্তের ভীড়ে সমাকীর্ণ। সাংবাদিকেরা টেলিফোনে কান দিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর সহকর্মীরা শিয়রে দাঁড়িয়ে সজল চোখে তাকিয়ে আছেন ভয়ে। আজ একটা দিনের মতো দিন।

কিছুদিন থেকেই তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন, রক্তের চাপ অত্যন্ত কমে গিয়েছিলো, কাজ করতে করতে একদিন হঠাৎ রাত বারটার সময়ে ফ্লোরের মধ্যেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান তারপর থেকে আর ওঠেননি। মাঝে মাঝে যখুনি একটু ভালো বোধ করছেন, মনে হয় কাকে যেন খুঁজছেন। তার মুখে বারে বারেই কী একটা নাম শোনা যাচ্ছে জড়িয়ে যাচ্ছে, বলে বোঝা যাচ্ছে না। হয় তো কারোকে দেখতে চান।

সবাই জানেন অভিনয় জগতে তাঁর মতো প্রতিভাময়ী শিল্পী খুবই কম আছে। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মতো—

'কার ছবি বাবা?'

কখন যে লক্ষ্মী আবার এসে চায়ের ট্রেটা এনে টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়েছে খেয়াল করেননি ভবতোষ রায়। হাতের কাগজটা কেঁপে গেল তাঁর। থতমত খেয়ে বললেন, 'ছবি কই? কার ছবি?' গলাটাও কাঁপলো।

ভুরু কুঁচকে লক্ষ্মী বললে, 'তুমি তো দেখছো।'

'আমি। কই? না তো একটা খবর পড়ছিলাম।'

'দেখি।'

বাবার হাত থেকে লক্ষ্মী কাগজটা টেনে নিল, নিয়েই চোখ বড়ো করলো' 'এমা, এতে অনুশ্রীদেবীর ছবি। দেখি দেখি। কী হ'য়েছে? স্ট্রোক! ফ্লোরের মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলেন সর্বনাশ। কী হবে?

'কী হবে মানে?' ভবতোষবাবু ট্রের উপর ভাঁজ করা ন্যাপকিনটা তুলে নিয়ে হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিলেন। ছবিটা দেখতে দেখতে ছটফট করলো লক্ষ্মী, নাকে কাঁদলো, 'আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, ভীষণ খারাপ লাগছে। তুমি তো সিনেমা দেখো না, আর থাক তো এই এক অজ পাড়াগাঁয়ে, তুমি বুঝবে কী? এ রকম একজন অভিনেত্রী হয় নাকি সহজে? আর আছে নাকি এঁর মতো কেউ? আমি ভীষণ, ভীষণ ভালবাসি।'

'তুই বুঝি আজকাল খুব সিনেমা দেখিস?'

লক্ষ্মী লজ্জিত মুখে হাসলো।

ভবতোষবাবু মুখ নিচু করে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'তাহলে পড়াশুনা করিস কখন?

'আহা, সিনেমা দেখলে যেন আর পড়ার সময় থাকে না।'

ভবতোষবাবু গলা ঝাড়লেন, 'এঁকেও দেখেছিস বুঝি? মানে এর ছবি।'

'দেখিনি!'

'ভালো লেগেছে।'

'বাব্বা! ভালো আবার লাগবে না। কী চমৎকার করেন। আর কী সুন্দর দেখতে সাধারণতঃ দুঃখের পার্ট করেন। জানো, সবাই বলে ব্যক্তিগত জীবনে ইনি—'

'ব্যক্তিগত জীবন থাক। অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করতে নেই।'

'বাঃ উনি বুঝি সে রকম অভিনেত্রী? উনি তো একজনের স্ত্রী ছিলেন।'

'তাতে কী হয়েছে। সব মেয়েই কারো না কারো স্ত্রী বা মেয়ে হয়ে থাকে। এ একটা নতুন কথা কী?'

'সবাই হয় না। তুমি কিচ্ছু জানো না। আমাদের বোর্ডিংয়ে আমারএক বন্ধু নাকি একে স্বচক্ষে দেখেছে। আমি তো সব তার কাছেই শুনেছি। একবার কলকাতা এসেছিলেন জানো?'

'তাই নাকি?'

'গ্র্যাণ্ড হোটেলে একদিন পার্টি হলো, কাগজে বেরিয়েছিলো এঁকে দেখার জন্য সেখানে এতো ভিড় হয়েছিলো যে পুলিশ দিয়ে ভিড় ঠেকাতে হলো। আমার সেই বন্ধুর চেনা তো? সে বলেছিলো, আয় ফোন করি। আমি বাবা সাহস পেলাম না।'

'কলকাতা থেকে দেখছি তোর অনেক উন্নতি হয়েছে।'

'তা যাই বলো, হোস্টেলেই থাকি আর যাই করি, কলকাতা কলকাতাই। আমার খুব ভালো লাগে।'

'কার্সিয়াংয়ের চেয়েও?'

'অনেক। অনেক।'

'এখানকার চেয়েও?'

'এখানকার। মানে তোমার এই পচা বন্দরপুর শহর? তার সঙ্গে কলকাতা!' দুই চোখের তারা আলোয় চিকচিক করে উঠলো। হেসে গড়িয়ে গেলো লক্ষ্মী, 'বাবা' সত্যি তোমার সাহস আছে।'

'কেন?'

'কলকাতার সঙ্গে টেক্কা দিতে চাও। তুমি কদ্দিন কলকাতা ছেড়েছ বলো তো?'

'অনেকদিন। সব তারিখ শুনে কী করবি?'

'আমি তখন কত বড়ো?'

'ধর দু' বছর।'

'মাত্র।'

'মাত্র।'

'আমাকে নিয়ে চলে এলে? আচ্ছা বাবা—' হাঁটুতে হাত রাখলো লক্ষ্মী, 'আমার মা কী হয়ে মারা গিয়েছিলেন?' ভবতোষ রায় চুপ করে তাকিয়ে থেকে কথা বদলালেন, 'আজকাল আর এখানে তোর ভালো লাগেনা না রে?'

'খুব ভালো লাগে। তুমি যেখানে আছ সেখানে আমার ভালো লাগবে না? কিন্তু তুমি কলকাতা যাও না কেন বাবা?'

'তুই যখন ছোট ছিলি, আর তোর যখন খুব অসুখ বিসুখ করতো তখন মনে হতো দূর ছাই, এক বিচ্ছিরি পাণ্ডব বর্জিত দেশ ছেড়ে এখুনি চলে যাই। আর সেরে উঠলেই ভাবতাম, কলকাতা আর জীবনে না।'

'তুমি কলকাতা ভালোবাসো না, না?'

'তুইও তো এখানেই প্রথম বড়ো হয়েছিলি। যখন কার্সিয়াং পাঠালাম, তখন তো তোর দশ বছর বয়স।'

'কী কান্নাই কেঁদেছিলাম, ঈশ!'

'বাবা,—' লক্ষ্মী বাবার পিঠে মাথা ঘষলো। 'আমার এখনো তোমাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়। বাবা, কেন তুমি এখানে একা একা পড়ে আছো?'

'তুই ছুটিতে ছুটিতে আসবি বলে।'

'না, বাবা, এবারে তুমি কলকাতা চলো।'

'কলকাতা গেলো খাবো কী?'

'কী আবার, এখানে যা খাও তাই।'

'এখানে তো চাকরী আছে—'

'চাকরী সব জায়গাতেই থাকবে। চেষ্টা করলেই হয়।

'কেন চেষ্টা করবো বল? দ্যাখ তো তাকিয়ে চারিদিকে কী সুন্দর সবুজ। দূরের পাহাড়গুলোর কেমন কুয়াশা রং আকাশ কেমন নীল। কলকাতা গেলে এ সব কোথায় পাবে?'

'তা না-ই পেলে। বদলে এর চেয়ে অনেক কিছু ভালো পাবে। সব তো আর একসঙ্গে হয় না।

'আমিই কি তা চাই? আমি তোদের সিনেমাও চাই না অনুশ্রী দেবীকেও চাই না, অতএব কলকাতাও চাই না।' ভবতোষ স্মিতহাস্যে চায়ের পেয়ালা শেষ করলেন।

মাখন মাখানো টোস্টটা বাবার দিকে ঠেলে দিয়ে লক্ষ্মী বললো, 'অত অবহেলা কোরো না। একবার দেখলে ভদ্রমহিলাকে অত তুচ্ছ করতে পারবে না।'

'এখন কি করছি নাকি?'

'করবেই বা কেন? তাঁর বিষয়ে তিনি যত উঁচুতে উঠেছেন, সেটা সত্যিই অবহেলার যোগ্য নয়। নিশ্চয়ই তিনি গুণী মানুষ। একটা বড়ো সম্মান আমাদের কাছে পাওনা হয়েছে তাঁর আমি এঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তা ছাড়া শুনেছি অভিনেত্রীদের মধ্যে এঁর মতো ডিগনিফাইড মহিলা খুব কম আছে।'

'আমাকে তুই মিছিমিছিই দোষারোপ করছিস লক্ষ্মী। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই বলিনি এঁর অভিনয়ই দেখিনি কোনদিন।'

'দ্যাখোনি অন্যায় করেছ।' রাগ করলো লক্ষ্মী 'দেশের গুণীমানী লোককে দেখবে কেন সব হলিউড দেখবে।' ভবতোষ রায় মেয়ের উত্তেজনা দেখে একটু হাসলেন।

'হাসছো কী। আমাদের দেশের লোকের এইতো মনের ভাব। বিশ্রী লাগে! এঁর কতো দান তা জান?'

'দানও আছে।'

'নেই! একটা বিশাল শিশু প্রতিষ্ঠান করেছেন, যক্ষ্মা হাসপাতালে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন, মহিলা আবাস হয়েছে—মুখখানা দ্যাখো বাবা, কী সুন্দর।' খবরের কাগজের ছবিটা লক্ষ্মী বাবার চোখের তলায় পেতে দিল, 'বাবা, আমার কান্না পাচ্ছে। যদি সত্যি মরে যান।'

'তাই তো।' ভবতোষ রায় চোখ নামালেন। ছবিটা যেন ঝাপসা লাগলো। চশমার কাচটা মুছলেন, তবু ঝাপসা।

'বাবা, তুমি খাচ্ছো না?'

'এ্যাঁ। হ্যাঁ। খাচ্ছি। খাচ্ছি বৈ কি। লক্ষ্মী ডিমের পোচটা আর খাবো না। ওটা তুই খেয়ে ফেল।'

'বাঃ, আমি তো আমারটা খেলাম। না, ওটা তোমাকে খেতেই হবে। কেন কী হলো তোমার?'

'খিদে নেই।'

াবার খাওয়া দাওয়া বিষয়ে লক্ষ্মীর যত্ন মায়ের মত। সে সনির্বন্ধ হলো 'এ বুঝি একটা খাওয়া। ডিম একটা না খেলে আমি ছাড়বো না। টোস্টটাও তো পড়ে রইল।'

'শোন, কাল রাত্রে তোর পাল্লায় পড়ে বড় বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম। আজ ভালো লাগছে তুই খা।'

'না।'

'খা না। আর একটা খেলে কি হয়? থাকিস তো কলকাতায়, পচা দেশে। এতো বড় ডিম থেতে পাস চোখে? তাই তো অতো রোগা হয়ে গিয়েছিস। সামনে পরীক্ষা, খেয়ে দেয়ে এই ন্টা মাসে একটু ভালো হয়ে নে।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, চোখের পুরু লেন্সের চশমাটা চিকচিক করলো সকাল লাকার রঙিন রোদে। কাচ ভেদ করে হয় তো সেই রোদ চোখের মধ্যেও ছায়া ফেললো, তো সেই জন্যই চোখটাও ছলছলে দেখালো।

লক্ষ্মী অবাক হয়ে বললো, 'এ কি উঠলে যে?'

'কাজ আছে একটু।'

'কী কাজ?'

'সব কাজের কথাই বুঝি বলতে হবে তোকে, না? মেয়ের মাথা ভরা কালো চুলে হাতের াসুর দিয়ে একটু আদর করে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

তাটুকু বা বাড়ি। এই তো এক নাম না জানা পাহাড়ি সহরের ছোট্ট স্কুল, তার হেড টারের কোয়ার্টার। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়া যতোখানি বিস্তৃত, বাড়িটিও ঠিক তাটুকু। দু'খানা বড়ো বড়ো শোবার ঘর আর সামনে পিছনে দুটি প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা। তরের উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘর আর স্নানের ঘর। এই কোনে বাঁধানো তুলসীতলা, ঐ কোনে য়াতলা। বাড়ির চারিদিক ঘিরে শাড়ির পাড়ের মতো গোল করে কাঁকর বিছানো, তারই কে ফাঁকে মাটি খুঁড়ে বারান্দার ধারে রঙিন ফুলের সারি। ভবতোষবাবুর ফুল গাছের সখ । কিন্তু এখানে তা জন্মানো অত্যন্ত শক্ত। পাথরে কাঁকরে লতাপাতা গুল্ম জন্মাতে চায় না। া ঢালতে ঢালতে প্রাণান্ত হতে হয়। কাজেই এ বাড়ির ফুলটুকু ফোটাতেই অনেক পরিশ্রম চ করতে হয়েছে। কিন্তু দেখাচ্ছে ছবির মতো। এখন যেখানে বসে ভবতোষ রায় তাঁর য়ার সঙ্গে গল্প করতে করতে আর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা পান করলেন, এটা ড়ির সামনেকার কৃষ্ণচূড়ার গাছের ডালপালার ছায়া। সকালে বিকেলে কাজ থেকে অবসর লই তিনি এখানে বসেন। হিন্দুস্থানী বালক-ভৃত্য সুখন খানকতক বেতের চেয়ার বিছিয়ে য় যায়, একটি বেতের টেবিলে এ্যাসট্রে, চায়ের আর খবরের কাগজের ভিড় থাকে। একটু ব গাছের ডালে দোলনাও বাঁধা আছে একটি, সেটি লক্ষ্মীর। লক্ষ্মীকে তিনি দু বছরের নিয়ে সেছিলেন। এখানে এতো বড়োটি হলো। অথচ তখন মনে করেছিলেন বাঁচাতেই পারবেন । তিনি নিজেই যে এতোদিন বেঁচে থাকবেন তাই কি ভেবেছিলেন। আসলে মানুষ সবই রে। এ বাড়িতে একটি বৃদ্ধা আয়াও আছে, এই আয়াই লক্ষ্মীকে মায়ের যত্নে মানুষ করে লছে। দশ বছর বয়েস পর্যন্ত লক্ষ্মী এই আয়াকে মা ডাকতো, ছেলে সেজে থাকতো আর ই বগলে বাবার স্কুলে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে হিন্দি পড়তো তারপর তাকে ভবতোষবাবু য়াং পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে সে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে মাত্র এক বছর হলো

বি. এ. পড়তে কলকাতা এসেছে। বারো মাস শূন্যই পড়ে থাকে এখানকার বাড়ি, ভবতোষব
একা একা দিন কাটান আর কবে মেয়ের ছুটি হবে তার দিন গোণেন।

তিনিও গোণেন, আয়াও গোণে।

আর এদিকে দিদিমণির আসবার সময় হলেই সুখন ঐ দোলনাতে নতুন দড়ি লাগ
চারপাশের ময়লা নোংরা সব পরিষ্কার করে ফেলে, মুখে আর হাসি ধরে না। যে ক'দিন ল
থাকে, তার তরুণ প্রাণের আনন্দে বাড়িটাও কানায় কানায় ভরে থাকে। এই কৃষ্ণচূড়ার ছায়
টেবিল পেতে আসরটি জমে ভালো।

ঝিমিয়ে পড়া ভবতোষ রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন।

এ জায়গাটুকু লক্ষ্মীরও খুব পছন্দের। আসলে গাছতলার এই তিনকোণা অংশটিই তা
বাপ আর মেয়ের আসল ড্রইং রুম!

এই বন্দরপুর শহরের এই বাড়িটিতে তিনি একাদিক্রমে ষোলো বছর বাস করেছে
বলতে গেলে এই তাঁর বাড়ি, এই দেশেরই বাসিন্দা হয়ে গেছেন তিনি। এখানকার জলব
মানুষজন সব মিশে গেছে তার জীবনের সঙ্গে। অথচ প্রথম যখন এসেছিলেন—'

ভবতোষবাবুর বুক ভেদ করে মস্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি ব্রা
থেকে আধ ময়লা শার্টটা গায়ে চড়িয়ে চপ্পল পায়েই বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে।

শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তির সংখ্যা এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরটিতে নিতান্ত বিরল। বেশির ভা
দেহাতি। একটি রেল স্টেশন আছে, তার কয়েক ঘর কর্মচারী, একটি আদালত আছে, ত
দু'চারজন উকিল মোক্তার, আর এই মিশনারি স্কুলের কিছু দিশী বিদেশী শিক্ষক। সকলের
ই সকলের যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা। সকলের কাজেই সকলে সঙ্গী। বিশেষ করে এই শান্তি
নিরিবিলি নির্বিকার মাস্টার মানুষ ভবতোষ রায়ের সঙ্গে প্রত্যেকেই ঘনিষ্ঠ। এই বিপত্নী
ভদ্রলোকটিকে ভদ্রলোকেরাও ভালোবাসেন ভদ্রমহিলারাও যত্ন করেন।

অত্যন্ত অল্পবয়সী এক নতুন এস. ডি. ও. এসেছে মাস ছয়েক যাবত। এককালে ছে
ভবতোষবাবুর ছাত্র ছিলো। এই পাণ্ডব বর্জিত নির্বান্ধব পুরীতে এসে প্রাক্তন মাস্টার মশাই
দেখে অকৃত্রিমভাবেই সে খুশি হয়ে উঠেছিলো। ইদানিং সেই খুশিটা আরো গভীর হয়ে
মাস্টারমশায়ের কন্যার সঙ্গে আলাপ হবার পর। মাস্টারমশায়ের জন্য যে সব সময়েই
কিছু করতে প্রস্তুত।

হন হন করে ভবতোষ রায় কোনদিকে না তাকিয়ে তার বাংলোতেই এলেন। পথ নিত
কম নয়। কিছুটা চড়াই উৎরাইও ভাঙ্গতে হয়। শ্রান্ত বোধ করছিলেন বোধ হয়। বাইরে
সুসজ্জিত বারান্দায় বসে দম নিলেন।

খবর পেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো তরুণ এস. ডি. ও. সুপ্রকাশ সেন। মোটা ফ্রেমের চশ
চোখে সুশ্রী যুবক। স্কুল কলেজে অদ্বিতীয় ছাত্র। ভবতোষবাবু ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'সুপ্রকা
একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'বলুন।'

'আমি বম্বে যাবো, প্লেনের বন্দোবস্ত করে দাও।'

'প্লেনের!'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আজই যেতে চান।'

'আজই।'

'কোনো জরুরী কাজ আছে?'

'ভীষণ।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু না বাবা। তুমি কলকাতা ট্রাঙ্ক কল করে জেনে নাও সব। আমাকে যেন একটা আসন অবশ্যই দেয়। আমি এখানকার এয়ারপোর্ট থেকে উঠবো।'

'সেও তো আপনার প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে গিয়ে উঠতে হবে।'

'আমি ট্যাক্সি করে যাবো।'

'সেজন্য কিছু নয়, আমার গাড়ি গিয়েই আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবে। মুশকিল হচ্ছে এতো শর্ট নোটিশে সীট রিজার্ভ করা যাবে কি না।'

'তুমি চেষ্টা করলেই যাবে। তোমরা সরকারী চাকুরে, জরুরী অবস্থা তোমাদের সারাদিন।' একটু হেসে ঠাট্টা করলেন 'মাস্টারমশাইকে একটা ভি. আই. পি. ট্রিটমেন্ট দিয়ে দাও না একদিনের জন্য।'

সুপ্রকাশও হাসলো, চুলের মধ্যে হাত ডুবোলো; ড্রেসিং গাউনের কর্ডটা হাতে দুলোলো,তারপরে আসল কথা জিজ্ঞেস করলো, 'ক'টা আসন? মানে—আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার মেয়ে—'

'না না, আমি একাই যাচ্ছি। ও থাকবে। আমি গিয়েই ফিরে আসবো। আয়া আছে, তুমি একটু খোঁজ খবর কোরো আমি না ফেরা পর্যন্ত।'

ছাত্রের উদ্যম বাড়লো। মুহূর্তে চটপটে হয়ে উঠলো সে।

মাস্টার মহাশয়ের দরকারের সময় সাহায্য করা তার নিতান্ত কর্তব্য বৈকি ! আর মাস্টার মশায়ের অবর্তমানে তাঁর কন্যাকে দেখাশুনো করা? সে তো নিশ্চয়ই। এরপর কয়েকটা এ পাশ ও পাশ ট্রাঙ্ক কলেই হয়ে গেল সব বন্দোবস্ত।

সেখান থেকে বেরিয়ে ভবতোষবাবু স্টেশনে এলেন, রেল লাইন পেরিয়ে তবে শহরের পাকা রাস্তা। মস্ত বটগাছের তলায় বাসের স্টেশন, ট্যাক্সির স্ট্যান্ড, খোপ খোপচা বিস্কুটের দোকান। জায়গাটায় সব সময়েই ভিড় থাকে। ড্রাইভারদের আড্ডা ইয়ার্কি তো বটেই, ইস্টিশনের নিম্নপদস্থ কর্মচারীদেরও এইটাই অবসর বিনোদনের সঙ্গমস্থল। দু'চারজন চেনা মুখের দেখা মিললো সেখানে। যথাযোগ্য সম্ভাষণ বিনিময়ও হলো। তারপর সেইসব পেরিয়ে গেলেন তিনি। গলির মুখে মস্ত মিষ্টির দোকানে এসে থামলেন। এখানকার কালু হালুইকর বিখ্যাত। কবে যে এই বাঙালী মিষ্টিওলাটি এসে এখানে রসের কারবারে ফেঁপে উঠেছে কেউ জানে না। যে ক'ঘর বাঙালী আছে তারা তো বটেই, অবাঙালীরাও এই মিষ্টি পেলে আর কিছু চায় না। ভবতোষ রায় নিজে কখনও মিষ্টি খান না, মেয়ে এলেই আসেন দু-একবার। কিন্তু লক্ষ্মীও তাব বাবার মতোই। মিষ্টির ভক্ত না সে। সব তার আমিষ। কিন্তু তবু যে কার জন্য মিষ্টি কিনতে দাঁড়ালেন কে জানে।

কোন একজন মানুষকে আজ এমন করে মনে পড়লো তার যে মানুষ খুব মিষ্টি খেতে ভালোবাসতো আর তাই নিয়ে ঠাট্টা করতেন ভবতোষ রায়। বাচ্ছা বলতেন। মিষ্টির দোকানটার কাচের বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন একটা ঝোঁকের মাথায় প্যান্টের পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে ধরে বললেন, 'রসগোল্লা। পাঁচ টাকার বড়ো রসগোল্লা দাও তো কালু!'

কালু অবাক হলো! ভুরু কুঁচকে বললো, 'ওমা মাস্টারবাবু যে, কী ব্যাপার? এতে রসোগোল্লা দিয়ে কী হবে? দিদিমণিকে কেউ দেখতে আসবে নাকি?'

এ কথায় ভবতোষ রায় নিজের মূঢ়তায় নিজেই লজ্জিত হলেন। আসলে কার জন্য যে কী করতে ইচ্ছে করছিলো তাঁর। তা বলে পাঁচ টাকার রসগোল্লা? খাবে কে?

লজ্জিত মুখে সেই রসগোল্লা নিয়ে আবার রেল লাইন পেরিয়ে, প্রায় আধ মাইল হেঁটে ঘর্মাক্ত দেহে বাড়ি ফিরলেন তিনি।

লক্ষ্মী উৎকণ্ঠিত হয়ে দরজায় দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করছিলো। অস্থির হয়ে বললো, 'বারে, না বলে কয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

ভবতোষ রায় বললেন, 'তোর জন্য রসগোল্লা আনতে, এই নে

'রসগোল্লা!' বাবার হাতের মস্ত বড়ো ঝুড়িটির দিকে তাকিয়ে অবাক না হয়ে পারলো না লক্ষ্মী 'এতো! আমি রসগোল্লা খাই নাকি!'

'কেন খাস না? রসগোল্লা তো ভালো।'

'আর খেলেই বা এতো খাবো নাকি?'

'আহা। ঐ ক'টা রসগোল্লা আবার অত। তুই কি একাই খাবি? তুই খাবি, আয়া খাবে, সুখন খাবে, বিকেলে সুপ্রকাশ যদি আসে খাবে।'

'আজ তোমার হয়েছে কি বাবা বলো তো!'

'কী হবে?'

'কেমন যেন অন্যরকম।'

'কিছু না। শোন, তুই তাড়াতাড়ি স্নান করে নে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে।'

'কেন বাবা?'

'আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'সে সব শুনবি পরে। আগে যা স্নান করে নে। তুই স্নান করতে করতে আমি আমার একটা কাজ সেরে নিই। সুখন কোথায়।'

'ডেকে দিচ্ছি।'

সুখনকে দিয়ে স্কুলে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন তিনি। একটা ব্যাগে তাড়াতাড়ি দুটো শার্ট প্যান্ট ভরে নিলেন। একটা আয়না চিরুনী নিলেন, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিলেন। দেয়াল আলমারী খুলে মানিব্যাগে টাকা ভরে নিলেন বেশী করে। সমস্ত ঠিকঠাক করতে তা আধঘণ্টার বেশী লাগলো না। আর ততক্ষণে স্নান করতে ঢুকলো লক্ষ্মী।

একা হয়ে তিনি চারিদিকে তাকালেন। দেখলেন সকালবেলায় খবরের কাগজটা তখন তেমনি এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে বারান্দার চেয়ারের উপর। আস্তে এসে আবার সেটা মেলে ধরলেন চোখের কাছে, আবার একাগ্র হলেন সেই ছাপা ছবিটির দিকে।

লক্ষ্মীর স্নানের শব্দ পাওয়া গেল। গুণ গুণ করে গান করছে সে, বাতাসে সাবানের ভেসে আসছে। আশ্চর্য! ঠিক ওর মায়ের মতো। এতোদিন পরে যেন লাফ দিয়ে উঠলো সম স্মৃতি। মনে পড়ে গেল সব খুঁটি নাটি। সে-ও বাথরুমে ঢুকলে এমনিই গুণ গুণ করতো, সুগ সাবানের গন্ধে এমনিই বাতাস উতলা হয়ে উঠতো। বাইরে হাঁটা হাঁটি করতে করতে সে অস্তিত্বের আভাসে ভবতোষবাবু মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অবিশ্যি তার মেয়াদ সপ্তাহে মাত্র এক দি রবিবার। ভবতোষবাবুর সেদিন নাকে মুখে গুঁজে রুটি রোজগারের জন্য ছুটোছুটি থাকত

।, লাবণ্যর মুখ সেদিন হাসিতে উদ্ভাসিত থাকতো। স্নানের ঘরে ঢুকে গানের আওয়াজটা াধহয় তাই জোর হতো বেশি। আর মা'র মুখ কুঞ্চিততরো হত। ঝিকে মেরে নি বৌকে শেখাতেন। নিজের মেয়েকে ঝংকার দিয়ে বলতেন বৌমা দয়া করে বেরুলে তুমি কে যেন আবার মজলিস বসিও না, তাড়াতাড়ি জল ঢেলে এসো। বাথরুম তো আর র্দ্ধমানের রাজবাড়ির মতো দশখানা বিশখানা নেই, ঐ একখানা। সাবান ঘসতে ঘসতে কজন গিয়েই যদি বেলা কাবার করো তা হলে আর সব যাবে কোথায়?'

হঠাৎ গুণগুণানি থেমে যেতো লক্ষ্মীর মা'র। ঝপাঝপ জল ঢালার শব্দ উঠতো। এক নিটেই বেরিয়ে আসতো সে। শীতল স্নিগ্ধ চেহারার দিকে তাকিয়ে যুবক ভবতোষ রায়ের কও শীতল হয়ে যেতো। আয়নায় দাঁড়িয়ে তার লম্বা চুলে চিরুনী চালানো দেখতে দেখতে ঠাৎ গিয়ে জড়িয়ে ধরতো তাকে।

একটি তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট। কতোটুকু বা আব্রু ছিলো। মা ভাইবোনেদের জোড়া জোড়া চাখের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি চারিদিকে ছড়ানো। লজ্জায় ভয়ে প্রায় কেঁপে উঠতো লাবণ্য। অস্থির য়ে বলতো 'ছি, ছি, দিনের বেলা এসব কী? এখনি কেউ এসে পড়বে।'

সত্যি! এসে পড়তোও! মা-ই এসে দাঁড়াতেন সকলের আগে। নিজের অসংযত আবেগের ন্য লজ্জিত হতেন ভবতোষ।

রাত্রি ছাড়া এতোটকু নিবিড় হবার উপায় ছিলো না সেখানে। প্রাণের কতো অদম্য াধকেই না পিষে মারতে হতো। তবু কতো সুখ ছিল সেই লুকোচুরি খেলায়। মায়ের সহস্র াখ রাঙানীতেও এতোটুকু দমিত হত না সেই সুখ।

সুখ! সুখ! সুখের জোয়ার! কোথায় গেল? কেন গেল? সেই ছোট্ট শব্দটির সব অর্থ কে মন করে মুছে নিল জীবন থেকে? কে! কে! কে!

ার তারপর এই পার্বত্য অঞ্চলের ছোট এক গ্রাম। না, কেউ আসতে দিতে চায়নি তাকে, নি নিজেই এসেছিলেন। নিজের ইচ্ছেতেই এসেছিলেন। নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে সেছিলেন।

অন্ধকার আর অন্ধকার হাত্ড়ে হাত্ড়ে তারই মধ্যে একদিন জোনাকির আলো দেখতে লেন। একদিন সেই জোনাকির আলোই তাঁকে পথ দেখালো, কলকাতার বিদ্যুতের আলোর খ সে জোনাকির আলোতেই মিশে গেল, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনের কলরব মিশলো ঝির ডাকে। নিঃসর্গকে ভালো বাসলেন, নিঃসর্গের সঙ্গী হলেন।

এখানে আসবার খবর শুনে মুখ বাঁকিয়ে বিদ্রূপ করেছিলো পরিতোষ। তার থেকে বছরের ছোট ভাই। আত্মীয় মহলে বলে বেড়িয়েছিলো, 'মাস্টারি তো করবেন, তা পড়াবেন ক? সেখানে তো শুনেছি দিনের বেলায়ও শেয়াল ডাকে, বাঘ হামলা করে বেড়ায়। যদি -ই করবেন তা হলে আর বাবার পয়সাগুলো নষ্ট করলেন কেন? এমন এম. এ. পাশ বার দরকার ছিলো কি? ম্যাট্রিক পাশ তো যথেষ্ট ছিলো। টাকাগুলো একা নিজের য়ালের পিছনে না ঢাললে অন্য প্রাণীগুলোর কিছু কাজে লাগতো।

এগুলো মায়ের কাছ থেকে শেখা কথা। নব বিবাহিত বোন অনুভা হাতের নোখে রং লাগাতে বলেছিলো, 'আরে বাপু সন্ন্যাসীরা তো বনে জঙ্গলেই যায়। দাদা যে এখন া-হারা ফণি।

ভাইবোনের মন্তব্য শুনে ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু প্রত্যুত্তর করেন নি। সেটা তাঁর স্বভাবে বাইরে।

শেষে মা এসে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হলেন। 'তা হলে এখানকার চাকরী তুই ছেড়ে দেয় ঠিক করেছিস?' চোখ না তুলে ভবতোষ রায় বলেছিলেন 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কলকাতায় থাকবো না।'

'থাকিস না থাকিস সেটা পরের কথা, অন্য দিকটা তোমাকে আগে দেখতে হবে?'

'সেটা কী।'

'এর চেয়ে ভালো চাকরী বা, ভালো মাইনে।'

'এই বা মন্দ কী।'

'এতে আমাদের চলবে না।'

ভবতোষ রায় রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন।'

'তুমি কিছু একা নও যে আপন বুঝেই পালাবে।'

এ কথারও জবাব দিলেন না ভবতোষ।

'আরো পাঁচজন আছে তোমাব। এবং তাদের ন্যায্য দাবীও আছে।'

'দাবী।'

'নিশ্চয়ই। তাদের সুখ সুবিধা দেখাটাও কিছু ফ্যালনা নয়।'

'মা।'

'তাদের কথাও তোমাকে ভাবতে হবে।'

'অনেক তো ভেবেছি।'

'কী ভেবেছ? কতটুকু ভেবেছ? না, এ চাকরী আমি কিছুতেই তোকে ছাড়তে দেবো তোর ঐ মাস্টারির ভিক্ষায় আমার চলবে না।'

'রাগে দুঃখে ক্ষোভে চুল ছিঁড়লেন তিনি। আমি বলছি, এই খামখেয়াল তোমার হবে।'

তা খামখেয়াল বৈ কি। নইলে সাধা লক্ষ্মীকে অমন করে পায়ে ঠেলে? এমন একটা চাকরী ছেড়ে নইলে কোন মূঢ় জঙ্গলে গরু ঠ্যাঙাতে যায়? পাশ করে বেরিয়ে থেকেই তো গরু ঠ্যাঙানির পালা চলেছে। [illegible] মাস্টারিতে কি আর সংসার চলতো? উদয় অস্ত আর মাস্টারি। মরে যেতেন ক্লান্তিতে। তবু আজ বাড়ি ভাড়া বাকী, কাল ভাইবোনদের মাই বাকী, পরশু গয়লা এসে শাসাচ্ছে, তারপরের দিন মুদি—কী অবস্থা। দিনের পর দিন

মায়ের মুখে এতোটুকু সহানুভূতি নেই। ভাইবোনেদের মুখে রাত দিন অন্ধকার।

কেবল অভাব, অভাব, আর অভাব। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর বছরগুলোর এ ইতিহাস।

টিউশনি করতে করতে মুখে রক্ত উঠে আসতো তারপর হঠাৎ একদিন ভাগ্য দয়া তাকে। কোনো এক বিকেলে এক বাল্য বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। দুজনের তাকিয়ে দুজনেই খুশি হয়ে উঠলো। যে দিনগুলো এক সময়ে কৈশোর এবং মাদকতায় অনেক অজ্ঞতা মুর্খতা নিয়েও আনন্দে উদ্দাম ছিল সে দিনগুলোর স্মৃতি হল। *পারস্পরিক খবরাখবরে জানতে পারল কে কী করছে, কোথায় আছে। সব শুনে*

ালে, যদি শিক্ষা বিভাগের উপরই তোমার একাগ্র ঝোঁক না থাকে তা হলে আমি কিন্তু একটা লো চাকরীর খোঁজ দিতে পারি।

'কোথায়। কোথায়?' আগ্রহে হাত চেপে ধরেছিলেন ভবতোষ।

'করবে?'

'নিশ্চয়। মাস্টারির মত গাধার খাটুনি আর কিছুতে নেই।'

'আমাদের ফার্মেই খালি আছে চাকরীটা। যিনি ছিলেন তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন। ভিতরে তরে লোক নেয়া হয়। আমি তো সেখানে একটা ভালো পজিসনেই আছি, চেষ্টা করলে হয় হয়ে যায়।'

'তা হলে এটা তুমি আমার জন্য করে দাও, আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো।'

বন্ধু বললো, 'কী আশ্চর্য! কৃতজ্ঞতার কী আছে এর মধ্যে? তুমি যথেষ্ট যোগ্য, পেলে ওরাই লুফে নেবে।'

এটা প্রায় মাস আটেক আগেকার কথা। কিন্তু সেই আট মাসেই যে জীবনের সমস্ত ধারা মনি ভাবে বদলে যাবে তা তো তিনি জানতেন না। মাত্র চারটি ঋতুর বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের সকল পাতা এমন করে খসে যাবে, তা কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন!

যেদিন চাকরীর খবরটা এলো, বাড়িতে ফুর্তির বন্যা বয়ে গিয়েছিলো। যেদিন কড়কড়ে াঁচখানা পাঁচশো টাকার নোট এনে মায়ের হাতে দিলেন, বাড়িতে ভোজ লেগে গেল। আর ারা বাড়ির সব আনন্দের দিকে তাকিয়ে ভবতোষ রায়ের সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এলো। ার সেদিনই তিনি ঠিক করলেন, এই শেষ। এই বাড়ির এই লোকগুলোর প্রবৃত্তিকে এই তার ণষ উপঢৌকন।

দ্বিতীয় মাসেই ছটফট করে কাজ ছেড়ে দিলেন। বিজ্ঞাপন দেখে ঠিক করে ফেললেন ন্দরপুরের এই হেডমাস্টারি। অবশ্য তখুনি হেডমাস্টার হলেন না। সহকারী প্রধান শিক্ষক সেবেই পুরো দশটা বছর কেটে গেছে। প্রধান শিক্ষক অবসর নেবার পরে তবে সেই আসনে সলেন তিনি।

কী থেকে কী।

আর তারপরেও যদি মা তাঁর সংহার মূর্তি না ধরেন তবে আর ধরবেন কবে?

ভবতোষ রায় মা'র কথার পৃষ্ঠে কথা না বাড়িয়ে চুপ করে থাকতেই চেষ্টা করেছিলেন। মা দিলেন না। আবার তিনি গর্জে উঠে বললেন, 'আমি বলছি তোমার যাওয়া হবে এ চাকরি আমি তোমাকে কখনোই ছাড়তে দেবো না।'

'তিনি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কেন?'

'কেন আবার কী? বললাম তো তোমার উপরে অনেকের খাওয়া পরার দায় আছে। তুমি নও।'

'তাই কী?'

'জানিস না?'

'না।'

'না বলতে তোর লজ্জা হলো না?'

'লজ্জার কি আছে।'

'কী।'

'আমার একমাত্র দায়িত্ব এখন আমার নিজের মেয়ে।'

ছেলের কথায় অনমনীয় ভঙ্গি দেখে হঠাৎ কোথায় যেন মা'র চোখে একটা ভয়ের ছা পড়লো। তার দুর্দান্ত ইচ্ছেশক্তি কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলো। তবু গলাটা তেমনিই চড়ি রেগে বললেন, 'তার মানে তুই আমাদের খেতে পরতে দিবি না, না?'

'তা বলিনি।'

'কী বলেছিস? গুষ্টি সুদ্ধু ঐ জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাবি?'

'টেনে আমি কাউকেই নেবো না। একা থাকবার জন্যই যাচ্ছি।'

'তবে? কী করে চলবে এখানে? কত টাকা তুই পাঠাতে পারবি শুনি?'

'যা পারি।'

'যা পারি মানে?'

'ওখানকার মাইনে আমার সব নিয়ে তিনশো দশ। নিজের সংসার চালিয়ে যা উদ্ থাকবে।'

'বুঝতেই তো পারছো।'

'বুঝিনি। বুঝিনি। বুঝিনি। কিছুই বুঝিনি আমি। আমি তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দি ভব, যেতে চাও যাও, কিন্তু কম পক্ষে অন্ততঃ চারশো টাকা মাসের পয়লা তারিখে আম চাই।'

ভবতোষ হাসলেন।

'হাসছিস যে?'

'হাসবো কেন? ভাবছিলাম কার জন্য চাই।'

'সেটা বোঝবার ক্ষমতাও তাহলে তোর লুপ্ত হয়েছে? অপদার্থ! অসার। তোকে আ দশমাস দশদিন কেন পেটে ধরেছিলাম, প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করে—ভবতোষ বাবু বাধা দিলে 'ও সব তো অনেক বার শুনেছি মা, আর কেন?'

'তা তো ঠিকই। এখন ওসব আর কেন শুনবে। এখন যে পাখা গজিয়েছে।'

'মা, তুমি অকারণে রাগ করছো।'

'কারণ অকারণ জানি না। যাবার সখ থাকে তুমি একা যেয়ো। ঐ জঙ্গলে আমিও যা না, ওরা তো যাবেই না।'

'আমি তো কাউকে যেতে বলিনি।'

'আর তোমার মেয়েকেও আমি পালতে পারবো না।'

'তাও তো আমি বলিনি।'

মা রাগে হাত কামড়ালেন, দাঁত ঘষলেন, এ জন্যেই কি তোকে হাতা কাঁথা বেচে আ লেখাপড়া শিখিয়েছি। এই বেইমানি করবি বলে? স্বার্থপর। নিজের কথাই কেবল ভাব শিখেছিস, না? আর পাঁচজনের কী করে চলবে সে কথা তোর একবারও মনে হচ্ছে না?'

চোখ তুলে ভবতোষ রায় বলেছিলেন, 'পাঁচজন? কে পাঁচজন?' মা-ও চোখে চো তাকিয়ে বাঘিনী হয়ে বলেছিলেন—

'আমি এবং তোমার আরো তিনটি ভাইবোন।'

এক পলক তাকালেন শুধু, জবাব দিলেন না।

'মা'র রাগ আরো চড়লো তুই কি একটা মানুষ?'

'আমার নিজেরও অনেক বার সেরকম সন্দেহ হয়।'

'সন্দেহ নয়। সেটা সত্য। তা নইলে এইসব নাবালক ভাইবোনের ভবিষ্যত না ভেবে—'

'তারা কেউ নাবালক নেই। মুখোমুখি দাঁড়ালেন ভবতোষ রায়। আমি তোমাকে স্পষ্টই বলছি, আর আমি তাদের দায়িত্বে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারবো না।'

মা চেঁচিয়ে বললেন, 'পারবে, পারবে, পারতে তুমি বাধ্য।'

এ কথার পরে ভবতোষের মুখে সেদিন অদ্ভুত এক হাসির রেখা বঙ্কিম হয়ে উঠেছিলো শুধু। মা তাঁর কণ্ঠস্বরে আরো জোর দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'আর তা যদি না পারো, তোমার এই স্বেচ্ছাচারিতার আমি যেমন করে পারি শোধ তুলবো।'

ভবতোষ রায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন বেরিয়ে যাবেন বলে। মা পথ আগলে দাঁড়ালেন, 'আমার কথার জবাব দিয়ে যেতে হবে।'

ভবতোষ রায় মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'কী জবাব?'

'তোর আসল মতলবটা কী?'

'এর মধ্যে মতলবের কিছু নেই।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'সংসার চালাবে কে?'

'বললাম তো যা পারি পাঠাবো।'

'তাতে চলবে না।'

'একার সাহায্যে না চললেও দুজনের আয়ে চলতে পারে।'

'দুজন কে?'

'আমিই কি তোমার একমাত্র ছেলে? পরিতোষও তো চাকরী পেয়েছে।'

'তার মাইনে কম। তা ছাড়া তুই খুব ভালো করেই জানিস সে খরচে, নিজেরটা কুলিয়ে সে দিতে পারে না।'

'অনুর বিয়ে হয়ে গেছে, সে থাকবে না, শোভা আর নিভা দুজনেই পড়াশুনো করছে না, বয়েসও নিতান্ত কম নয়, বল তো আমি তাদের চাকরীর বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাবো। সবাই মিলে যার যারটা করে নিলেই চলে যাবে।

'এ কথা তুই বলতে পারলি? তুই এতো পিশাচ হয়ে গিয়েছিস একটা ডাইনির মায়ায়?'

'এখনো ডাইনি! এখনো তাকে ভুলতে পারছো না?'

'তোর মনে বোনেদের বিয়ের চিন্তা হলো না, চাকরীর রাস্তা বাতলিয়ে দিলি? আর ঐটুকু ছেলে পরিতোষ, যে তোর ছ'বছরের ছোটো, তার ঘাড়ে এতোবড়ো সংসারের দায় ফেলে তুই পালাবার কথা ভাবলি?' কপালে করাঘাত করলেন তিনি, 'জানিস না তুই কলকাতার খরচ কী ভয়ানক। এক বাড়ি ভাড়াই তো দেড়শো।'

'কলকাতায় থাকার দরকার কী?'

'কোথায় থাকবো? তোমার ঐ জঙ্গলে?'

'না না, তা কেন। সেখানে আমি একা থাকতেই যাচ্ছি।'

'তবে?'

'কাছে পিঠে কোনো উপকণ্ঠে গিয়ে থাকবো।'

'মানে?'

'মা, আমি আর তর্ক করতে পারছি না, আমার কাজ আছে।'

'এও তোমার কাজ।'

'হতে পারে, কিন্তু একা আমার নয়।'

'বুড়ো বয়সে তুই শেষে ভাই-বোনেদের হিংসে করছিস?'

'হয়তো।

'তুই এতো হীন। এতো নীচ।'

'তোমার যদি তাই মনে হয়, তাহলে তাই।'

'বোনেদের মান ইজ্জৎ বেচতেও তোর এতোটুকু লজ্জা হলো না।'

'মান ইজ্জৎ!'

'তা নয় তো কী। ঐ টুকু টুকু মেয়ে বাইরে যাবে চাকরী করতে? এ কথা তুই বলতে পারলি? তোর বাপ থাকলে বলতে পারতো?'

'বাবা আর আমি কি এক? বাবা ভাবতেন তাঁর মেয়েদের সম্পর্কে, আমি ভাবছি বোনেদের কথা। কিন্তু থাক সে সব। পথ ছাড়ো আমি বেরুবো।'

'তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া না করে আমি তোমাকে বেরুতে দেবো না।'

'দ্যাখো মা, অবিবেচনার একটা শেষ আছে। নিষ্ঠুরতার একটা সীমা আছে। তুমি তো শুধু পরিতোষ আর অনুভা শোভা নিভারই মা নও, আমারও তো মা। আমার জন্য কি তোমার হৃদয়ে কোথাও কোন মমতা নেই?'

বলা মাত্রই মা কেঁদে কেটে হাট বসালেন। বিলাপে প্রলাপে মুছে দিলেন দিনটা।

'আমি জানি তুই আমাকে শেষ বয়সে এই সবই বলবি। এই সব বলার জন্যই তুই তখন আমাকে আমার ভাইয়ের বাড়ি থাকতে দিলি না। আমি কি চেয়েছিলাম তোরটা খেতে, যে আজ এই সব বলছিস?'

এর পরে আর কী বলতে পারেন ভবতোষ রায়। চুপ করে বেরিয়ে গেলেন। তার মায়ের ক্রন্দনজড়িত বিলাপ অনেক দূর পর্যন্ত হাওয়ায় ভর দিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে এলো, তারপর মিলিয়ে গেল।

এ কথা তো সত্যিই, মামাদের আশ্রয় থেকে তিনিই জেদ করে এতগুলো ভাই বোন আর মায়ের দায়িত্ব নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। সে বাড়ির অবহেলার ভাত তাঁর গলাতেই আটকে যাচ্ছিল বারে বারে, সে বাড়ির অসম্মানকে তাঁরই মৃত্যুতুল্য মনে হয়েছিলো। আর একমাত্র সেই ষোলো বছরের ছেলেটিই বুঝেছিল বাবার সঞ্চিত অর্থ এক হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরটিই মামাদের আসল লক্ষ্য। সেই কারণেই চারটি সন্তান সহ বিধবা বোনকে দয়া করে ভরণ পোষণ করছেন। কোনোরকমে ভুলিয়ে ভজিয়ে এই টাকাটা হাত করতে পারলেই পথ দেখতে বলবেন।

এত পাকা কথা ঐটুকু ছেলে সেদিন কী করে বুঝতে পেরেছিলো তা তিনি জানেন না। হয়তো সেটা তার বেঁচে থাকারই একটা অলক্ষ্য চেতনার নির্দেশ।

ভাইয়েদের দ্বারা শাসিত এবং মোহিত মাকে সরিয়ে আনবার জন্য কষ্ট করতে হয়েছিলো তাঁর। ভাই-বোনরা অবিশ্যি দাদার কথায় নাচতে নাচতে চলে এসেছিলো। নিজের বাড়ির কুঁড়েঘরে এসেও মামাবাড়ির দালানের জন্য দুঃখ বোধ করেনি, স্বাধীনতার স্বাদে তারা আনন্দিত হয়েছিলো অনেক বেশী।

মাও হয়েছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করেননি কখনো। ভাইয়ের বৌদের তাঁবে থাকাটা তাঁর পক্ষে কোনোদিক থেকেই সুখের ছিল না। ছেলের খুদকুঁড়োর সংসার হলেও তিনিই ছিলেন সম্রাজ্ঞী, তাঁরই অঙ্গুলিহেলনের দাস ছিল সবাই। ভবতোষ রায় তো বটেই।

কিন্তু তবু ছেলের উপর কোন কারণে বিরক্ত হলেই সেই পুরোনো কথায় ফিরে যান তিনি। তাঁর ভাইয়েরাই যে তাঁর আসল বান্ধব ছিল সে কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে থাকেন। ভাইয়েরা যে ভবতোষ রায়কে ঠিক চিনতে পেরেছিল এবং ভগ্নিকে যে ছেলে বিষয়ে বারবার সাবধান করে দিয়েছিল সে কথা বলতেও কসুর করেন না।

'আমার ভাইরা তো বলেইছিল এই ছেলে তোমাকে অনেক দুঃখ দেবে।' আজ অনেকদিন পরে সেই বিলাপ তার আবার উথলে উঠলো। 'তোর মতিগতি যে কেমন তা তারা তখুনি বুঝে ফেলেছিলো। কেন বঝবে না। তারা কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে? নাকি সংসারে দেখতে তারা কম দেখেছে? হায়! হায়! সেই সময়ে আমি কেন তাদের কথা শুনিনি, কেন তোর সঙ্গে মরতে তাদের ছেড়ে চলে এসেছিলাম। তারা আমাকে ঠিকই বলেছিলো। তোর যে ঐটুকু বয়সেই টাকার উপর এতো লোভ আমি কী করে জানবো? পেটের ছেলে হয়ে শেষে তুই অনাথা মায়ের টাকা চুরি করবি তা কে ভাবতে পেরেছিলো। কেন আমি তোর হাতে অতগুলো টাকা লিখে দিয়েছিলাম। কেন আমার ঐ দুর্মতি হয়েছিলো। লেখাপড়া শিখিয়ে আমার কী লাভ হলো? যা খরচ করলাম তা কি আর চোখে দেখলাম? ফিরে পেলাম? তোর মতো অকালকুষ্মাণ্ড স্বার্থপর ছেলে না জন্মালেই বা আমার কী ক্ষতি ছিলো। তোর জন্য যত টাকা ঢেলেছি, সবই তো আমার জলে গেলো। সেই টাকা যদি আজ পরিতোষের পিছনে খরচ করতাম তা হলে আজ আমি রাজার রানী।'

জীবনের এই অপরাহ্নে এসে মাঝে মাঝে মায়ের কথা ভাবেন ভবতোষ রায়। একজন ভদ্রলোক যেমন আর একজন চেনা মহিলার বিষয়ে নিরপেক্ষ হয়ে ভাবতে পারেন, ঠিক সেই হৃদয় দিয়েই ভাবেন।

ভাবতে ভাবতে তিনি অবাক হয়ে যান, বুঝতে চেষ্টা করেন এর মধ্যে কী মনস্তত্ত্ব লুকোনো ছিলো। মা হয়ে সন্তানের উপর এই নির্মমতার কারণটা কী? নিজের কথাও ভাবেন। তিনিই বা এমন হাতের পুতুল হয়ে সুতোর টানে নড়েছেন কেন? কেন কখনো একটা প্রতিবাদের আওয়াজ তার মুখ দিয়ে বেরোয়নি? কেন তিনি অনেক আগেই বিদ্রোহ করে এই অদ্ভুত বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারেন নি?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আজকের ভবতোষ রায় সেই মেরুদণ্ডহীন ভবতোষ রায়কে তীব্র ঘৃণায় অজস্র ধিক্কার দিতে থাকেন। পরিষ্কার বুঝতে পারেন মায়ের উপর তাঁর সেই নির্বিকার নির্বিচার ভালোবাসায় ক্ষমাশীলতায় কোথায় যেন এক বিকৃত মনের অন্ধকার লুকোনো ছিল। মা'র দোষ ত্রুটি, অপরাধ অন্যায় কিছুর বিরুদ্ধেই যে তিনি কখনো তাঁকে প্রত্যাঘাত করতে পারতেন না সেটা আর কিছুর জন্য নয়, কিছু তার দুর্বল চরিত্রের অকারণ ভীরুতা, বাকীটা—

বাকীটা কী! হাতের কাগজ ফেলে ভবতোষ রায় ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়ালেন। দৃঢ়মুষ্টি পিছনে যুক্ত করে হেঁটে হেঁটে বারান্দার এমাথা ওমাথা বেড়াতে লাগলেন!

স্নান করে ঘরে এলো লক্ষ্মী। শোবার ঘরে যেতে যেতে পর্দার ফাঁকে বারান্দায় বাবার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়ালো। মাথা না আঁচড়েই বেরিয়ে এলো সে। ব্যস্ত হয়ে বললো 'তোমার কী হয়েছে বাবা? কেন আমাকে কিছু বলছো না?'

যেন ধরা পড়ে গেছেন, এমন ভাবে আপাদমস্তক্ চমকে উঠে পায়চারি থামালেন ভবতোষবাবু। তারপর কী বলতে গিয়েও অপলকে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে।

'কী দেখছো?'

সহজ হয়ে ভবতোষবাবু বললেন, 'তুই বড়ো সুন্দর হয়েছিস লক্ষ্মী।'

লক্ষ্মীর মুখে খুশি ঝরে পড়লো, 'সুন্দর না ছাই।'

'তোর বয়েস কতো হলো রে?'

'এমা, আমার বয়েসও তুমি জানো না?'

'আঠেরো পূর্ণ হয়েছে, না?'

'জানো বাবা, এবার জন্মদিনে যে তুমি আমাকে শাড়ি কিনতে টাকা পাঠিয়েছিলে, তা থেকে দশটা টাকা আমি বন্যার্তদের সাহায্যভাণ্ডারে দিয়েছিলাম।

'সত্যি?'

'আমাদের কলেজ থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছিলো—'

'লক্ষ্মী।'

'বাবা।'

'শোন, আমি কিন্তু দু'তিনদিন থাকছি না এখানে।'

'থাকছো না!'

'আঁতকে উঠিস না। ভয় পাবার কিছু নেই। আয়া আছে, ঘরে শোবে, সুখন বারান্দায় শোবে। আমাদের সেকেন্ড মাস্টার শীতলবাবুকে লিখে রেখে যাবো, ওঁর স্ত্রী এসে যাতে একটু দেখাশুনো করেন, তাছাড়া সুপ্রকাশ আসবে—'

''বাবা।'

'আমি দু-একদিনের মধ্যেই চলে আসবো।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

'কাজ আছে।'

'কলকাতা?'

'আমি তোকে পরে বলবো।'

'না এখুনি বলো। আমার ভাবনা হচ্ছে। আমার ভয় করছে।'

'দূর বোকা।'

'কেন, আমাকে বললে কী হয়?'

'সব কথাই কি সকলকে বলা যায়?'

'ও, আমার কাছেও তবে তোমার লুকোনো কথা আছে? মাতৃহীন কন্যা অভিমানে ছলোছলো হয়ে উঠলো।

ভবতোষবাবু তাকে আদর করলেন। এলোমেলো চুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকি এখনো মাথাই আঁচড়াসনি! যা যা শীগ্‌গির আঁচড়ে নে। কী বিশ্রী দেখাচ্ছে।'

'বাবা, কেন তুমি আমাকে গোপন করছো?'

'কিছু গোপন করছি না। কিছুই তোর ভাববার মতো ব্যাপার নয়। আমার খাবার ঠিক কর য়ে, আমি চান করে আসি।'

মেয়েকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তিনি স্নানের ঘরে ঢুকে গেলেন।

দড়মার বেড়াঘেরা ছাদহীন ছোট্ট স্নান ঘর। ড্রাম থেকে হুস হুস গায়ে মাথায় জল ঢেলে র্তে বেরিয়ে এলেন ভবতোষ রায়। স্নান তাঁর কাকস্নান। যান আর আসেন। তাঁর বাবারও ক এই অভ্যেস ছিল। আর তাই নিয়ে মা রাগ করতেন। বলতেন নোংরা, গায়ে মাথায় বান দেয় না। অথচ ভবতোষ রায়ের যতদূর মনে পড়ে বাবার গায়ে কখনো তিনি ময়লা মতে দেখেননি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম মানুষ। বরং একঘণ্টা স্নান করা সত্ত্বেও মায়ের ড়টা কালো হয়ে থাকত, মা বসে বসে সাবান আর ধুন্দুলের খোসা দিয়ে ঘসতেন।

ঢাকা শহরের উয়ারী পাড়ায় বাড়ি ছিল তাদের। সেখানেও এইরকম দড়মার বেড়াঘেরা নের ঘর ছিল। মা দরজা বন্ধ করতেন না, ছোটো কাপড়ে গা ঢেকে স্নান করতেন, তাকে কতেন পিঠ ঘষে দিতে।

দশটার সময় খেয়ে দেয়ে মহীতোষবাবু আপিসে চলে যেতেন, ঠিকে ঝি কাজ সেরে ঘরে তো, আর খালি বাড়িতে দরজা খুলে স্নান করতে বসতেন মা। তিনি আর তার মা। রাদুপুর ঐতো দুটি প্রাণী। একপ্রস্থ বাবার সঙ্গে খেতেন, একপ্রস্থ মায়ের সঙ্গে খেতেন, রপর মা ঘুমিয়ে পড়লে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন ঘরে ঘরে। একা একা বেশ লাগত তাঁর।

মা'র দ্বিতীয় সন্তান পরিতোষ যখন জন্মালো তখন তাঁর ছ' বছর বয়েস। কী ভালোই াগেছিল লালটুকটুকে ভাইটিকে দেখে। মা কলা হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার ভাই এনেছে ামার জন্য। ভাইকে কিন্তু হিংসে করো না।' মা'র চোখে ভবতোষ রায় তখন যেন একটা াকৃতি দেখেছিলেন। মা আদর করে চুমু খেয়েছিলেন তাঁকে। বাবা আঙ্গুল ধরে বাজারে নিয়ে য়ে কমলালেবু কিনে দিয়েছিলেন, লজেন্স কিনে দিয়েছিলেন, একজোড়া জুতো কিনে য়েছিলেন। তখন বোঝেননি, পরে বুঝেছিলেন একলা আদর পাওয়া বালক যাতে তার িকে সুনজরে দেখে তার জন্যই এতো সব ঘুষের ব্যবস্থা। তা ছাড়া কোথায় হয়ত একটু দনাও ছিলো। হাজার হোক একটির পরে আর একটি হলে প্রথমটি একটু দূর হয়েই যেতে য়। সেটা মায়ের মনে লাগে।

তারপর পর পর আরো চারটি বোনকে সংসারে আনলেন মা। অনুভা, শোভা, নিভা আর ভা। আর এদের জন্ম দিয়েই বাবা যেন তাঁর ভবসংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করে াড়াতাড়ি চোখ বুজলেন। কী সামান্য অসুখ, ভালো করে মনেও পড়ে না। দু'তিন দিনের ধ্যেই সব ভাসিয়ে চলে গেলেন। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সবচেয়ে ছোট বোনটিও নন্তের থাবায় সাঙ্গ হয়ে গেল।

তখন তাঁর নিজের বয়েস ষোলো, পরিতোষেরই দশ, অনুভার সাত, শোভার পাঁচ, নিভার ন, আভার দেড়। স্বামীহীনা শোকার্ত অসহায় মায়ের দিকে তাকিয়ে বুকটা যে কীরকম করে ঠেছিল কিশোর ভবতোষের! না, কষ্টের সেই তীব্রতার কোনো ভাষা ছিল না। পি ংসার যে কত কঠিন তখুনি বুঝেছিলেন তিনি। বিহ্বল মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'কেঁদো মা, কেঁদো না। আমি আছি।'

মা আর্তনাদ করে উঠে তার বুকে মাথা রেখেছিলেন, তিনি তখন মা ছিলেন না, কন্যা হয়ে য়েছিলেন। ষোলো বছরের ভবতোষও তখন পুত্র ছিলেন না, পিতা হয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু তখুনি নয়, সেই পিতার পার্ট তিনি আর ভোলেননি কোনোদিন। 'আমি আছি' শব্দটিকে তিনি সজোরে আঁকড়ে রেখেছিলেন বুকের মধ্যে। মায়ের সেই আশ্রয়ের জন্য নির্ভরের জন্য সমর্পিত চেহারার স্মৃতি আর ভুলে যেতে পারেননি সহজে। আর ভোলেননি বলেই মায়ের হৃদয়হীনতার যুপকাষ্ঠে নিঃশব্দে বলি হয়েছিলেন।

এখন তিনি মাকে স্পষ্টই বুঝতে পারেন। মায়ের কাছে নামতই তিনি সন্তান ছিলেন, আসলে মা তাঁর কাছে যুগপৎ স্বামী এবং পিতার কর্তব্যই আশা করতেন। সেটাই তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। তাই পূরণ না হলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। পরিতোষ রায় ছিল তাঁর আসল সন্তান। তাঁর সঙ্গে তাঁর মা'র সম্পর্কটা পাকে চক্রে সত্যি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

ভবতোষবাবুর মনে আছে বাবাকেও মা অশেষ গঞ্জনা দিতেন এই খাওয়া-পরা নিয়ে। তিনি যা চাইতেন, তা দেবার শক্তি বাবার ছিলো না। পার্থিব সমস্ত জিনিসের উপর অতিমাত্রায় লোভ ছিলো মা'র। শাড়ি গয়না খাওয়া বেড়ানো এগুলোর প্রতি এতো আসক্ত ছিলেন যে সামান্য সাধারণ একজন কেরানী স্বামীর কাছ থেকে সেই আসক্তি পূরণ হওয়া তাঁর নিতান্ত কঠিন হতো। চাপ দিয়ে আদায় করে নেবার জন্য ঝগড়া করতেন তিনি। বাবা কখনো নীরবে কখনো সরবে প্রতিবাদ জানাতেন, অক্ষমতা জানাতেন, কিন্তু মা ছাড়তেন না। ফলে একটা চাপা অশান্তি লেগেই থাকত সংসারে। আর ধার দেনার পরিমাণও ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকত। বাবার উদ্‌ভ্রান্ত গলদঘর্ম চেহারা দেখে কষ্ট হতো ভবতোষবাবুর। কিন্তু তিনি এটা বুঝতেন না যে কারণটা তাঁর মা, তাঁর মায়ের অবিবেচনার ফলেই তাঁর বাবা এমন সুখহীন শান্তিহীন জীবন যাপন করে করে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন। জানলে হয়ত তিনি নিজেও আজ এখানে এই জীবনের দরজায় এসে দাঁড়াতেন না!

'এ কি বাবা, তুমি মাথা মোছোনি?'

'মুছিনি!' অন্যমনস্ক ভবতোষবাবু ভেজা চুলে হাত দিয়ে একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসলেন। তারপর তাড়াতাড়ি তোয়ালে ঘষলেন। লক্ষ্মীর মন কেমন করতে লাগল। আজ যে তার বাবা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই এটা সে ঠিকই বুঝেছে, কিন্তু কী হলো?

সকালে উঠেও তো বাবা ঠিক এই রকম ছিলেন না। যতদূর মনে পড়ছে ঐ কাগজটা পড়ার পর থেকেই যেন কী হলো। না কি কোনো চিঠি এসেছে ঠাকুমার কাছ থেকে। মাঝে মাঝে টাকা চেয়ে পাঠান তিনি। মাঝে মাঝে যেতে লেখেন। বাবা টাকাটা ঠিকই পাঠিয়ে দেন কিন্তু যান না।

আর এই ঠাকুমাদের কথা লক্ষ্মী শুধু কানেই শুনেছে, আজ পর্যন্ত দেখেনি। বাবা নিজে যান না তাকেও যেতে দেন না। কিন্তু লক্ষ্মীর ইচ্ছে করে। সে জানে তার কাকা জামশেদপুরে থাকেন, কাকিমাও আছেন, সাতজন খুড়তুতো ভাইবোন আছে। পিসি আছেন তিনজন। ছোটোপিসির কাছেই জলপাইগুড়িতে আছেন ঠাকুমা। বাবা সেখানেই টাকা পাঠান।

লক্ষ্মীর মন অজস্র কৌতুহলে ভরে উঠল আজ। সে বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে। জগৎ সংসারের কত খবর তার নখদর্পনে, শুধু নিজেদের পারিবারিক ঘটনাগুলোই তার কাছে রহস্যের আঁধারে লুকিয়ে আছে। আত্মীয় পরিজন কাউকেই চেনে না সে। চেনার অবকাশই বা হলো কোথায়? জ্ঞান হয়ে চোখ মেলে সে নিজেকে এইখানে বাবার কাছে একা দেখেছে। বাবা তার বাবা মা বন্ধু আত্মীয় সব। কোনো দুঃখ তিনি জমতে দেননি তার মনে। স্নেহের কাঙাল হয়ে বেড়ে ওঠেনি সে। কারো জন্য কোনো অভাববোধ ছিল না তার। প্রকৃতির সঙ্গে খেলাধুলো সাঙ্গ করে যখন কার্সিয়াংয়ে পড়তে গেলো, দশ বছর পার হয়েছে তখন, তারপর

সাত বছর কেটে গেল সেখানে। ছুটি হলে এই বন্দরপুরে বাবার কাছে আসা আর ছুটি ফুরোলে বোর্ডিংয়ে ফিরে যাওয়া। এই ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকুর মধ্যেই কেটে গেছে এতোগুলো বছর।

কলকাতা এসেছে আর ক'দিন। তাও তো আবার গণ্ডি। বোর্ডিংয়ের গণ্ডি। তবু এই কলকাতা এসেই অনেক কথা জেনেছে সে। নিজের পরিজনের খবরাখবর পেয়েছে। সত্যি বলতে তাদের সম্পর্কে একটা নতুন আগ্রহ জন্মেছে তার। অথচ বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে সংকোচ হয়। সে বুঝতে পারে বাবা তা চান না। পারিবারিক সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই তিনি তাকে নিয়ে এই নির্বান্ধব শহরে এসে একা বাসা বেঁধেছেন। নইলে বাবার তো সবাই আছে। ভাই বোন মা—শুধু স্ত্রী নেই। শুধু আমার মা নাই। মা। মা থাকাটা কী রকম?

আশ্চর্য! একটা ছবিও নেই, তা হলে অন্তত লক্ষ্মী তাঁর চেহারাটা দেখতে পেতো!

'ভাত দে। ভাত দে।' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবতোষ, 'এক্ষুনি গাড়ি পাঠিয়ে দেবে সুপ্রকাশ। তুইও খেয়ে নে না আমার সঙ্গে। রসগোল্লা! রসগোল্লা খেয়েছিস?'

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি খাবার টেবিলে এলো। বাবার অভ্যাস মতো প্লেট কাঁটা ন্যাপকিন সব সাজিয়ে দিল। আয়া রান্না করছিল, দৌড়ে এসে দেখে গেল একবার। সুখন জাগে জল ভরে নিয়ে এলো। ভবতোষবাবু খেতে বসলেন।

'আর তুই?'

'আমি একটু পরে খাব বাবা।'

'কেন খেয়ে নে না।' দ্রুত হাতের ভাতের সঙ্গে ডাল, ডালের সঙ্গে মাছ সব একত্র মিশিয়ে নিলেন তিনি।

লক্ষ্মী হাসলো, 'প্রথমত আমার খিদে পায়নি, দ্বিতীয়ত তুমি যে রকম ইঞ্জিন চালাচ্ছো হাতে, আমি তার সঙ্গে পেরে উঠবো না।'

'হাতে ইঞ্জিন চালাচ্ছি! ও—ভবতোষবাবুও হাসলেন, 'বড্ড তাড়াহুড়ো করছি, না? কী করব বল। সময় যে নেই। তা হলে তুই ঐ রসগোল্লা—' বলতে বলতে থেমে গেলেন।

সত্যি বলতে এগুলো কেনবার সময়ে লক্ষ্মীর কথা তিনি ভাবেন নি। কী ভেবেছিলেন সেটা খুব স্পষ্টও ছিল না। তলাকার মনে হয়ত সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সেটা যে অসম্ভব উপরের মন তৎক্ষণাৎ তাঁকে সে কথা সমঝে দিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই কেনা হয়ে গিয়েছিল, আর কেনা হবার পরেই মনে হলো লক্ষ্মী খেলেই তিনি তৃপ্তি পাবেন।

অদ্ভুত সব অলিগলি দিয়ে ঠাসা মানুষের হৃদয়। কিসে কী হয়, কী থেকে কী ভাবে, কিছুই বোঝা যায় না।

তিন মিনিটে খাওয়া সাঙ্গ করে আঁচিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু আঁচিয়ে আসার পরে প্রায় আধঘণ্টা বসতে হলো। সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে বারান্দায় পায়চারি করে, রাস্তায় নেমে বারবার এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে এসে যখন প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছেন তখন গাড়ি এলো সুপ্রকাশের।

মেয়েকে আদর করলেন তিনি। মাথায় চুমু খেলেন, পিঠে হাত বুলোলেন। বললেন, 'সাবধানে থাকিস; কেমন? দরকার হলেই সুপ্রকাশকে ডেকে পাঠাস। কিছু সংকোচ করিস না, সে আমার ছাত্র, অতি সুন্দর স্বভাব, ভাইয়ের মতো মনে করবি। আমি এসে গেলাম বলে।'

লক্ষ্মী ধরা গলায় বলল, 'কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ, তা আমাকে বললে না।'

'তোর ভয় নেই, ভয় নেই। ফিরে এসে সব বলব।'

তিনি গাড়িতে উঠলেন। দরজা ধরে সজল নয়নে দাড়িয়ে রইল লক্ষ্মী। মুখ ফিরি ভবতোষবাবুও নিজের দুর্বলতা লুকোলেন।

বারোটার বেলা চড়ে উঠেছে ততক্ষণে, রৌদ্রে কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার ছায়ারা থর করে কাঁপছে, খোয়াইয়ের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠছে।

ভবতোষবাবুকে নিয়ে গাড়িটা দেখতে দেখতে চোখের আড়াল হয়ে গেল, তবু দাঁড়িয়ে রইল সেই হলকা হাওয়ার তাতে। হঠাৎ তার ভয়ানক কান্না পেতে লাগল। কান্না। বুকের ভিতর থেকে উঠে এলো সেই শোক। জীবনের এই অজানা প্রথম দুঃখে বিহ্বল হলো।

সুখন বলল, 'দিদিমণি ঘরে চলো, দরজা বন্ধ করে না দিলে দুপুরে টিকতে পারবে না।'

আয়া এসে কাঁধে হাত রাখল।

লক্ষ্মী বলল, 'আজকে রোববার নয় সুখন?'

'হ্যাঁ দিদিমণি।'

'একবার এস. ডি. ও'র বাংলোয় যেতে পারবি?'

'কেন পারবো না!'

'তা হলে একবার দেখে আয় উনি কী করছেন, বলে আয় দিদিমণি একবার দেখা করতে চান।'

'ঠিক আছে।'

প্রায় দৌড় লাগিয়েছিল সুখন, লক্ষ্মীই আবার ডেকে থামাল। বলল, 'শোন, তোকে যেতে হবে না। তুই বরং আমাকে একটা সাইকেল রিক্সা ডেকে দে।'

'সাইকেল রিক্সা! কেন?'

'আমি নিজেই যাবো।'

আয়া বাধা দিলো, 'সে কি কথা খোকি, তুমি কেন যাবে এই গরমে?'

লক্ষ্মী আয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো, 'গলে যাব?'

'তার চেয়ে সুখন গিয়ে সাহেবকেই ডেকে আনুক যদি এখুনি তোমার কোনো দরকার থাকে।'

'দরকারটা তো আমার। ঐ রোদ্দুরে তিনি কেন ঘর থেকে বেরুবেন? কাজটা আমারই করা উচিত।'

'বাবু বলে গেছেন কিছু? তা হলে একটা চিঠি লিখে দাও না। তবেই তো হয়!'

'সে হয় না।'

'তা হলে তুমি বিকেলে যেয়ো।'

'আমার এখুনি দরকার আয়া।'

'ভর দুপুরে, চান করে না খেয়ে—'

'তুমি কিছু ভেবো না, আমি যাবো আর আসবো। তুই যা সুখন ডেকে নিয়ে আয় সাইকেল রিক্সা।'

লক্ষ্মী ঘরে গিয়ে ঢুকলো প্রস্তুত হতে। আর প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এসেই দেখলো যার কাছে সে যেতে চেয়েছিলো, তিনি নিজে এসে অপেক্ষা করছেন বারান্দায়।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল লক্ষ্মী। হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা করল তার। মনের কোন বিশেষ মুহূর্তে সে যে এই ব্যক্তিটিকেই স্মরণ করছিল সেটা ভেবে অপ্রস্তুত বোধ করল। বিশ্লেষণ

রতে চেষ্টা করল এই বেলা বারোটার দুরন্ত রোদ্দুরের তাপে যেখানে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বেরোয় না সেই তাপ অগ্রাহ্য করে কেন সে দেখা করতে চেয়েছিল। এই াহাড়ী শহরটুকু যে এইসময়ে তাতানো লোহার টুকরো হয়ে ওঠে। তা কি তার অজানা?

যতদিন কার্সিয়াংয়ের বোর্ডিংয়ে ছিল, এই গরমের ছুটিটা বাবা গিয়ে কাটাতেন তার সঙ্গে। কমাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়া হতো। কী ভাল লাগত। কলকাতা আসবার পরে এই াষ্মের ছুটিই প্রথম ছুটি। বাবা কলকাতা যেতে চান না, তাই তাকেই আসতে হয়েছে। অবিশ্যি ই তার আবাল্যের বাসভূমি, এই তার দেশ, এখানে আসতে সে ভালবাসে। এখানে থাকতে ার ভাল লাগে। কিন্তু এই গরমে এবার কষ্ট হচ্ছে তার। বহু বছর শীতের দেশে থেকে রমের স্মৃতি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো, আবার নতুন করে সইয়ে নিতে হচ্ছে।

তার বাবা এমন হঠাৎ, এমন রহস্যময়ভাবে কোথায় যেতে পারেন, সেকথাটা জানবার াগ্রহ অবিশ্যি স্বাভাবিক নিয়মেই তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই ভদ্রলোক যে তাঁর াবাকে সাহায্য করেছেন তাও সে বুঝতে পেরেছে। এঁরই গাড়িতে বাবা এয়ারপোর্টে গেলেন। কাথায় গেলেন তাও হয়তো ভদ্রলোকটি জানেন।

কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই এতোবড়ো কারণ নয় যার জন্য প্রায় অর্ধপরিচিত একটি মানুষের াছে এই আগুনলাগা রোদ বেয়ে এমন অসময়ে দৌড়ে যাওয়া যায়। তা ছাড়া তার বাবার বর সে যখন নিজে জানে না, অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে জানাও তো তার পক্ষে লজ্জার, :খের, অভিমানের। আর সেই অভিমানও যথেষ্টই হয়েছে লক্ষ্মীর।

তবে কী জন্য দেখা করতে ব্যাকুল হয়েছিল সে। কী তার অর্থ তার মন কেমন করছে? ার ভয় করছে? একা লাগছে? সঙ্গী চায়? সহানুভূতি চায়? মমতা চায়? কিন্তু তার জন্য এই কটিকেই মনে পড়ল কেন। বাড়িতে আয়া ছিল, বুকে করে যে মানুষ করে তুলেছে তাকে। য তার সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। যে তার জন্য রাত জেগেছে, নাওয়া খাওয়া ুলে সেবা করেছে, তিলতিল যত্ন দিয়ে গড়ে তুলেছে জীবন। তাকে বলতে পারত। যদি ায়াকে দিয়ে তার মন শান্ত না হতো সে শীতলকাকিমার কাছে চলে যেতে পারত! াতলকাকিমা তাকে ভালোবাসেন, ছোটো থেকে দেখাশুনো করেছেন, অসুখে বিসুখে দৌড়ে াসেছেন, কোলে করে নিয়ে বেড়িয়েছেন ছেলেবেলায়। লোকের কাছে বলেছেন আমার ময়ে।

আর শুধুই কি এই সেকেন্ড মাস্টার শীতলকাকাবাবুর স্ত্রী শীতলকাকিমা? কাউলরা অছে া? পাঞ্জাবী হলে কী হবে, তাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সে এক আত্মা এক প্রাণ। মাদ্রাজী াবিবার আছে একটি। মাতৃহীন লক্ষ্মীকে কে না ভালোবাসে এই শহরে? কে না যত্ন করেছে শশবে। এঁদের আদরে আদরেই তো মানুষ হয়ে উঠেছে সে। এঁদের সবাই তার আপন জন। স এঁদের সকলের কাছে প্রিয়। বাঞ্ছিত।

এই শহরে তার কাছে নতুন মানুষ কেবল এই সুপ্রকাশ। তাকেই সে এইবার এসে প্রথম দখলো।

লক্ষ্মী এখানে এসেছে ঠিক তেইশ দিন। মাত্র তিন সপ্তাহের পরিচয়। শুনেছে বাবার ছাত্র ইল, লেখাপড়ায় ভালো ছিলো বলে বাবা ভালোবাসতেন। এতোদিন পরে আত্মীয় বর্জিত দশে একটি আত্মীয়োপম মানুষকে দেখে উচ্ছসিত হয়ে ওঠা বাবার পক্ষে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। কিন্তু তার দিক থেকে সেটা হবার কোনো প্রশ্ন নেই। এখানকার লোকেরাই তার আত্মীয়। সে ার বাবার মতো সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে, সমস্ত যৌবন বিসর্জন দিয়ে তারপর এখানে এসে বাসা াঁধেনি। এখানেই সে প্রথম চোখ মেলেছে। জ্ঞান হয়ে এই দেশটাকেই নিজের দেশ বলে

চিনতে শিখেছে। এই দেশের মানুষকেই কাকা, জ্যাঠা, মামা, দাদা বলতে বলতে বড়ো হয়ে উঠেছে।

তবে হঠাৎ সুপ্রকাশকে তার মনে পড়েছিল কেন?

'আপনি কি আমার ওখানে যাচ্ছিলেন?'

লক্ষ্মীকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সুপ্রকাশ।

লক্ষ্মীর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেলো। একটু থামতে হলো জবাব দেবার আগে। তারপর আস্তে বললো, 'হ্যাঁ।'

'দরকার ছিল কিছু?'

'তা একটু ছিল।'

'বলুন।'

'বারান্দাটা তেতে উঠেছে, ঘরে এসে বসবেন কি?'

'বেশতো।'

'আমি বেশি সময় নেবোনা আপনার।'

'কী আশ্চর্য! আজ আমার কাজই বা কী। সময় নিয়ে কোনো টানাটানি নেই।'

আমি যাচ্ছিলাম সেটা আপনাকে কে বললে?

'সুখন।'

'কোথায় দেখা হলো তার সঙ্গে?'

'পথে। রিক্সা ডাকতে যাচ্ছিল সে।'

'আপনি কি এখানেই আসছিলেন, না কি সুখন ধরে নিয়ে এল।'

'আমাকে কি আর ধরে আনতে হয় কখনো?'

লক্ষ্মী চকিতে তাকালো এক পলক।

প্যান্টের পকেটে হাত রেখে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়ালো সুপ্রকাশ, 'বলুন কী দরকার।'

লক্ষ্মী তার গলা খোলা ব্যুশ শার্টের মধ্যে প্রশস্ত এবং সুগঠিত বুকের অনেকটা অং দেখতে পেল। চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'এমন কিছু নয়। ধরে নিন না বেড়াতে যাচ্ছিলাম

'এতো ভাগ্য!'

'আমি কারো বাড়িতে গেলে সেটা যে ভাগ্যের পর্যায়ে পড়ে তা কিন্তু আমার জানা ছিল না। বরং না গেলেই লোকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে উৎপাত করাই আমার স্বভাব।'

'এই অভাজন যদিও তার কোনো পরিচয় পায়নি।'

'তার জন্যই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন।'

'সে না হয় দেওয়া যাবে, তার আগে উৎপাতটা হোক তো।'

'আর তার আগে আপনাকে কী দিয়ে আতিথেয়তা করি বলুন। চা? কফি? অরেঞ্জ স্কোয়াস?'

'এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল।'

'আসুন, ঘরে বসবেন।'

পর্দা সরিয়ে সাজানো বসবার ঘরের শীতলতায় ঢুকলো দুজনে। ততোক্ষণে সুখন খস্ খস্ ফেলে দিয়েছে জানালায় জানালায়, পিচকিরি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। উত্থিত চন্দনের গন্ধে বাতাস আকুল হয়েছে। বাইরের তাপ থেকে ঘরে ঢুকে স্নিগ্ধ হয়ে গেল শরীর।

লক্ষ্মী চেয়ার এগিয়ে দিল, 'বসুন, আমি জল নিয়ে আসছি।'

কিন্তু সত্যিই সে শুধু জল নিয়ে এলো না। প্লেটে করে বাবার আনা মিষ্টি সাজালো, ডাব কাটিয়ে সেই জলে অল্প চিনি মিলিয়ে জলের উপরে কচি শাঁস ভাসিয়ে দিয়ে নিয়ে এল।

সুপ্রকাশ খুশি হয়ে ডাবের জলটা নিতে নিতে বলল, 'একি ! মিষ্টি কেন? মিষ্টি কিন্তু আমি খাবো না। এই ডাবের জলটাই খুব ভালো। অপ্রত্যাশিত রকমের ভালো।'

লক্ষ্মী বললো, 'বাবা বলে গেছেন মিষ্টিটা যেন আপনাকে দেয়া হয়। এটা ওঁর আদেশ। পালন করা উচিত।'

'উচিত, কিন্তু এই মুহূর্তে অসম্ভব।'

হাসলো লক্ষ্মী, 'এই মিষ্টিটা পৌঁছে দিতেই তো আমি যাচ্ছিলাম।'

'তাই নাকি ?' চোখ বড়ো করলো সুপ্রকাশ, 'তা হলে তো এখন আমি কিছুতেই খাবো না।'

'কেন?'

'আমি এতো বোকা নই যে সেই সুখের সম্ভাবনাটাকে এখুনি গ্রাস করে ফিরে যাব।'

একটু থেকে, ঈষৎ আরক্ত মুখে লক্ষ্মী বললো, 'যেতে চাইলে, যাবার কি ঐ একটাই মাত্র উপলক্ষ্য?'

'আমি কাঙাল, ঐ একটা উপলক্ষ্যও ছাড়তে রাজী নই।'

'বলুন, লোভী।'

'তাই সই।'

এগুলো হচ্ছে কথা নিয়ে খেলা করা। পরস্পরের মনের সঙ্গে মন ছোঁয়াছুঁয়ি। হঠাৎ সচেতন হয়ে সেই খেলা লক্ষ্মী থামিয়ে দিল। শিশির সিক্ত বাতাসে সকালবেলার বোঁটা খসা ফুলের টুপ টাপ শব্দের মতো এই কথোপকথন নিস্তব্ধ হলো।

প্রসঙ্গ বদলে লক্ষ্মী বলল, 'শুনুন।'

'বলুন।'

'আমি বাবার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'আমার কাছে?'

'আপনার কাছেই। তার কারণ—আমার মনে হচ্ছে বাবা কী কাজে এবং কী কারণে এমন হঠাৎ শহরের বাইরে গেলেন, তা আপনাকে জানিয়ে গেছেন।'

'না তো।'

'তবে?'

'সে তো আপনার জানবার কথা।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কী বলে গেছেন আপনাকে?'

'বলতে গেলে কিছুই না। আমার খুব বিশ্রি লাগছে, আমার ভয় করছে।'

'ভয় কী! ভয়ের কিছু নেই। বম্বেতে কে থাকে আপনাদের?'

'বম্বে!'

'উনি তো বম্বেতেই গেলেন।'

'সেখানে তো আমাদের কেউ নেই।'

'তবে?'

'বাবা বম্বেতে গেছেন? আপনি ঠিক জানেন?'

'কেন আপনি জানেন না?'

'না।'

'আপনাকে কী বলেছেন?'

'কোথায় যাচ্ছেন সে বিষয়ে কিছু বলেন নি। শুধু বললেন, 'ফিরতে দু'চারদিন দেরি হবে

'সে কী।'

'আমি আপনার কাছেই প্রথম বম্বের কথা শুনছি।'

'আপনি জিজ্ঞেস করেন নি কিছু?'

'অনেকবার।'

'কী জবাব দিয়েছেন?'

'ঐ তো বললাম, ফিরতে দু'চারদিন দেরি হবে, এ ছাড়া আর কিছু বলেন নি।'

'স্ট্রেন্‌জ।'

আর বললেন, 'ভাবিস না। ফিরে এসে সব বলবো।'

'হয়তো আমাকেও বলতেন না যদি প্লেনের আসন যোগাড় করার দরকার না হতো।'

'আমি সে জন্যেই আপনাকে খুঁজছিলাম। আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।'

'যাওয়াটা উনি কবে ঠিক করলেন?'

'কবে আবার। এই তো খানিক আগে বাড়ি ফিরে এলেন, তাড়াহুড়ো করে চান করলে খেলেন, চলে গেলেন।'

'সকালেও কিছু বলেন নি?'

'কিচ্ছু না। তবে সকাল থেকে একটু অস্থির ছিলেন। 'আমার তখুনি মনে হচ্ছিলো খুব বিচলিত।'

'কাল রাত্রে ঠিক ছিলেন?'

'কাল রাত্রে কেন? ঘুম থেকে উঠেও তো সুখনকে স্কুলের পোশাক পাট করে রাখ বললেন, আমার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বললেন! চা তৈরী করে ডাকতে গিয়ে দেখি ভী অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন। সামনে খবরের কাগজ।'

'খবরের কাগজ। তাতে কোনো মন খারাপ করা সংবাদ বেরোয়নিতো?

'যদি মন খারাপ করা সংবাদের কথাই বলেন তবে একটি বেরিয়েছে ঠিকই এবং সে বম্বেরই, কিন্তু তার সঙ্গে বাবার কোনো সংশ্রব নেই।'

'সেটা কী খবর?'

'অভিনেত্রী অনুশ্রীদেবীর স্ট্রোক হয়েছে। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'আমার অবিশ্যি খুব মন খারাপ হয়েছে, কিন্তু বাবা তো তাঁকে জীবনেও দেখেন নি, না শোনেননি!'

'ঈশ! ভদ্রমহিলা আমার খুব প্রিয় অভিনেত্রী। ভারি দুঃখের। দেখি কাগজটা।'

লক্ষ্মী উঠে গিয়ে সেলফ থেকে কাগজটা নিয়ে এলো। সুপ্রকাশ সেটা খুলে ধরলো চোখে কাছে। ডান দিকের পাতায় সেই খবরটা দেখতে দেখতে সহসা বাঁদিকের পাতায় চোখ পড়ল তার। আর সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠলো 'এই দেখুন। আপনার বাবা কেন গিয়েছেন এখানে লেখা আছে সেটা।'

'দেখি, দেখি।'

সাগ্রহে এগিয়ে এলো লক্ষ্মী। একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন। চাকরীর বিজ্ঞাপন। বম্বের এক

লী প্রতিষ্ঠিত স্কুলের জন্য একজন বাঙ্গালী হেডমাস্টার চাইছে। মাইনে এই স্কুলের দেড়া। তাড়াতাড়ি লোক নেয়া হবে। আবেদন পত্রের বদলে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎই বেশী বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞাপনে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই যেন তাদের কাগজপত্র নিয়ে দেখা করতে ান। অন্তত দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

ুপ্রকাশ বিজয়ীর ভঙ্গিতে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'এবার তা হলে আসি। আশা করি নার চিন্তা ভাবনা এবার কিছুটা দূর করতে পেরেছি।'

ভুরু কুঁচকে তবু লক্ষ্মী তাকিয়ে রইলো বিজ্ঞাপনটার দিকে। তার মনের ভার কমেছে বলে হলো না।

ুপ্রকাশ বললো 'এর পরেও মেঘ?'

লক্ষ্মী উঠে দাঁড়ালো, আচ্ছা শুনুন—'

বলুন।'

বাবা কি আর কিছু বলে গেছেন আপনাকে?'

আর কিছু? আর কী বলবেন? ও, হ্যাঁ, বলেছেন।'

'কী?'

'তাঁর মেয়েকে যেন দেখাশুনো করি। সেজন্যই এসেছিলাম।'

লক্ষ্মী একটু হাসলো, 'বাবা ভুল বলেছেন।'

'কেন?'

এ দেশটা তাঁর ছাত্রের নয়, তাঁর মেয়েরই। ছাত্রটি এখানে অতিথি—'

'অতএব—'

'অতএব দেখাশুনোর দায়িত্বটাও তাঁর নয়; অর্থাৎ আমার।'

উৎকৃষ্ট প্রস্তাব।' ডান হাতের সিগারেট বাঁ হাতে ঠুকলো সুপ্রকাশ, 'আপনি যদি এই ব্যকর্মে অবিচলিত থাকেন, আমি খুব সুখী হব।'

বাইরে বেরিয়ে এলো দু'জনে। রোদ কাঁপা ধুধু রাস্তার দিকে তাকিয়ে চোখ ঝলসে গেল। 'উঃ কী গরম আপনাদের দেশে।'

'দাঁড়ান, একটা সাইকেল রিক্সা ডেকে দিক। এই গরমে যাবেন কী করে?' ব্যাকুল হয়ে লো লক্ষ্মী। সুপ্রকাশ হাসলো, বারান্দা থেকে সিঁড়িতে নেমে টুপিটা পরে নিলো মাথায়, ে যেতে বলল, অনেক রোদ জল সওয়া শরীর। ভাববেন না। নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম করুণ, বিকেলে আসব।'

। ছাড়িয়ে ধূ ধূ মাঠের মাঝখানে ছোট্ট এরোড্রাম। খেলনার বাড়ির মতো লাল মাথা টালির দেয়ালের লবি। চারপাশ ঘিরে চওড়া বারান্দা, বারান্দা ঘিরে অজস্র ফুল। অন্দরে সুন্দর স্থর বাড়ির মত কাঁকর বিছোনো উঠোনের ধারে ক্যান্টিন। চা হচ্ছে সেখানে, ডিম সেদ্ধ ;, কলা কিনতে পাওয়া যায়, কাঁচের বৈয়মে কেক!

এখান থেকে একটা মালের প্লেনে চড়ে ভবতোষবাবু কলকাতা যাবেন প্রথমে, সেখানে তবে আসল প্লেন ধরবেন। সীট বুক করে দিয়েছে সুপ্রকাশ। মনে-মনে তিনি অজস্র বাদ দিলেন তাকে।

কিন্তু এই তাঁর প্রথম প্লেনে চড়া। শুধু তাই নয়, কাছে থেকে একটা জলজ্যান্ত প্লেনও এই প্রথম দেখলেন। হলোই বা মালের প্লেন, তাই দেখেই তাঁর চোখ বিস্ফারিত হলো।

লবিতে এসে অপেক্ষা করতে করতে চা খেলেন এক কাপ, হঠাৎ মনে পড়াতে উঠে গি সুপ্রকাশের ড্রাইভারকে বকসিশ দিয়ে এলেন পাঁচটা টাকা, এক গ্লাস জল খেলেন। তার ডাক এলো।

রীতিমতো ধুকধুক করছিলো বুকটা। প্লেন তো দূরের কথা। রেলে চড়েছেন কবে ত তো মনে পড়ে না। মালের প্লেনের সীটনম্বরের বালাই ছিলো না, গিয়ে একটা জানলার পা বসলেন। প্লেন মাটি ছাড়ল।

জেট প্লেন নয় যে হুস করে উঠে যাবে আকাশে। বেশ নিচে দিয়েই যায় মালবাহী ছোট প্লেনগুলো। তবুও তলায় পড়ে-থাকা বিশাল চত্বরের দিকে তাকিয়ে ভয় ভয় কর তাঁর। একটু পরে তলার বড়ো বড়ো মাঠ ঘাট নদী নালা সব ছোট হয়ে এলো চোখে। বৃ আর ক্ষুদ্র এক হয়ে গেল। হাওয়া দিচ্ছিলো খুব, প্লেনটা দোল খাচ্ছিলো শূন্যে। একবার ম হলো শোঁ করে রসাতলের দিকে বিদ্যুৎগতিতে নেমে যাচ্ছে, আর উপায় নেই কো ভবতোষবাবু হাত মুঠো করে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চোখ বুঝলেন। পরমুহূর্তেই অনুভব কর হঠাৎ যেন কিসের ধাক্কায় আবার বেগে আকাশে উঠে গেল অনেকখানি। একবার নাম একবার উঠছে। দমকে দমকে এই হচ্ছে শুধু। আর হাত পা বুক সব হিম হয়ে আস ভবতোষবাবুর। ছোট্ট গোল জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে একলা ফেলে আসা লক্ষ্মী কথা ভেবে বুকটা দমে যাচ্ছে সাত হাত।

এখন সত্যি যদি প্লেনটা পড়ে যায়, ভেঙ্গে যায়, আগুন লেগে যায়, আর তিনি মরে য তবে কী হবে ওর? কে দেখবে ওকে? কে আছে তিনি ছাড়া! কেউ নেই। কেউ নেই। লক্ষ্মী কেউ নেই। যে শিশু জন্ম থেকে মায়ের স্নেহ বর্জিত, তার মতো হতভাগ্য আর কে আ সংসারে? হে ভগবান! আমাকে এখুনি তুমি মৃত্যুতে টেনে নিয়ো না, বাঁচতে দিও, লক্ষ্মী জন্যই বাঁচতে দিও। আমি তার সব দুঃখের মূল, কিন্তু এই দুঃখ যেন এই অসময়ে দিতে না তাকে। অসহায় একা মেয়েটার জন্যে আমাকে দয়া করো।

অবিশ্যি মোটা ইনসিওর করে প্লেনে উঠেছেন। মরে গেলে একা লক্ষ্মীই পাবে সব। ত পিতৃশোক নিবারিত না হলেও অভাবের দুঃখ তাকে ছুঁতে পারবে না। তা ছাড়াও লক্ষ্মীর জ তিনি আরো সঞ্চয় রেখেছেন। অকাল মৃত্যুর অপরাধ ছাড়া আর কোন অপরাধেই অপরাধী ভাববে না তার বাবাকে।

কিন্তু যদি কপর্দকহীন করে রেখে মারা যান, তা হলেই কি সব মায়া মমতা স্নেহ ভালোব মুছে যাবে মন থেকে? বাপকে তার একটা পাষণ্ড বলে মনে হবে? তাঁর কী তাই ম হয়েছিলো? মহীতোষবাবু যখন মারা গেলেন, কি ছিলো তার জন্য? বিধবা মা আর পাঁ নাবালক ভাই বোন।

তিনি কি সেজন্য তার বাবাকে দোষ দিয়েছিলেন? অবিবেচক ভেবেছিলেন? না কি ত এই উত্তর চল্লিশে পৌঁছেও তার বাবার স্নেহের স্মৃতি এতোটুকু ম্লান হয়েছে তাঁর জীবনে

তিনি নিজে ছাড়া তাঁরও কেউ ছিলো না। আত্মীয় স্বজন কেউ এগিয়ে আসেনি নিঃসঙ্গ বিপদের দিনে। মা'র বৈধব্য দেখে, কান্না দেখে, পিতৃবিচ্ছেদে শোকার্ত ভবতোষ যখন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, কেউ সান্ত্বনা দেয়নি তাকে, কেউ সাহায্য করেনি। সেই সম ষোলো বছরের বালকটিকেই জগৎ সংসারের সমস্ত সাধ আহ্লাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে একরা ব্যবধানে পুত্র থেকে একেবারে পিতায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে হলো।

থাকবার মধ্যে সেই লাইফ ইনসিওরের টাকাটা, যার শোকে আজও মা পাগল আছেন। সেই টাকা ক'টার দয়াতেই সেই সময়ে ম্যাট্রিকটা তিনি নিরাপদে পাশ কর

?রেছিলেন। এক বছরের খাওয়া পরাটা কোন রকমে চলেছিলো। আই. এ. তে ভর্তি হতে
:তেই তা তলানীতে ঠেকল।

মা বললেন 'চাকরীর চেষ্টা কর।' তিনি খোঁজও এনে দিলেন দু-একটা। পাড়ারই মুদি
াকানে হিসাব নিকাশের জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল। কোন ধনী আত্মীয়ের বাড়িতেও ঐ
রনের কী একটা কাজ ছিল। সে সবের ধার দিয়ে গেলেন না তিনি। তার চেয়েও ভালো
কটা কাজের খবর এনে দিলেন বড়ো মামা। আপিসের কাজ। মাইনে পঞ্চাশ। মা হাতে স্বর্গ
পলেন। আহ্লাদে আটখানা হলেন। কৃতী এবং উপকারী ভাইদের সম্পর্কে আরো উচ্চ ধারণা
:লা।

ভবতোষ রায় সকলের বিরাগভাজন হয়ে তাতেও রাজী হলেন না। মাকে বুঝিয়ে
লেজেই ভর্তি হলেন। মা অবিশ্যি বুঝলেন না। রাগে দুঃখে ক্ষোভে মুণ্ডপাত করতে লাগলেন
হলের। এতোটুকু ছেলে এতো অবাধ্য হলো কেমন কবে তা নিয়ে ভাইদের সঙ্গে গবেষণা
রতে বসলেন।

তা ঠিক অতটুকু ছেলে অত জেদ কী করে বজায় রাখতে পেরেছিলো, সেকথা অনেকবার
বতোষবাবুও ভাবে বৈকি।

কিন্তু মাকে তিনি টাকা দিতেন। উদয় অস্ত টিউশনির সূত্রপাত তাঁর তখন থেকেই। মাকে
লেছিলেন, 'আমি কলেজে পড়লেও, আমি তোমাকে যে টাকা কেরাণীগিরিতে পেতাম ঠিক
াই এনে দেব।' অবিশ্যি এটা কবুল করেছিলেন বলেই ভর্তি হতে পেরেছিলেন। সেকথাও
িনি রাখতে পেরেছিলেন।

আই. এ. পাস করলেন ফার্স্ট ডিভিসনে। বোধহয় সেই একবার মায়ের মুখে খুশির আলো
দেখেছিলেন। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। আই. এ পাস করেও তিনি যখন চাকরীতে নাম লেখালেন
া, তখন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তা নিয়েও মাকে তিনি দোষারোপ করেননি,
রং সস্নেহে ক্ষমায় শান্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজ তার রাগ হয়। সংসার চালাবার
ায়িত্ব কি একা তাঁরই ছিল? মানিয়ে গুছিয়ে বুঝে সুঝে সন্তান পালন করার কর্তব্যটা কি
ায়েরই প্রধান ছিলো না? নাবালক সন্তানের জন্য মায়েরা ভিক্ষা পর্যন্ত করে। তিনিও তো
াবালকই ছিলেন। সেই সতেরো আঠারো বছরের বালকের জন্য নিশ্চয় তারই দায়ী থাকার
থা।' কোনোদিন কি সেকথা একবারও ভেবে দেখেছেন তাঁর মা? তাদের প্রতিবেশী জ্ঞানবাবু
খন মারা গেলেন, তার অল্পবয়সী বিধবা স্ত্রী তিনটি সন্তান নিয়ে কি ভেসে গিয়েছিলেন? না
ি ছেলেমেয়েরা রোজগারে বেরিয়েছিল? সেই ভদ্রমহিলাকে তো দেখেছেন ভবতোষবাবু!
কাল থেকে রাত অব্দি তাঁর কাজের বিরাম ছিলো না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সেলাইয়ের কাজ
াতেন, আচার তৈরী করে বিক্রী করতেন, ঠোঙা বানাতেন। এই করে করে বড়ো মেয়েটিকে
িনি বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন।

কিন্তু ভবতোষবাবুর মা চাইতেন তখুনি ভবতোষবাবু তার বাবার সমান উপার্জন করে
াবার সংসার মাথায় নিয়ে মাকে নিশ্চিন্ত করুক। নিজের সুখ সুবিধার অভাব তিনি সহ্য
রতে পারতেন না। সন্তানের সুখ সুবিধা বিসর্জন না দিলে যে সেটা সম্ভব নয় তা তিনি
ঝতেন না। সুখ সুবিধা কাকে বলে তা ভবতোষবাবু কখনোই জানতেন না, বিসর্জনের প্রশ্নও
হলো না। চাকরীতে ঢুকলেই বরং সেটা ধরা দিত তাকে। তবু সেই খাটুনির একটা নির্দিষ্ট
ময়াদ থাকত। কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বাড়ি বাড়ি ছেলে পড়িয়ে আর নিজের পড়া
ালিয়ে কখনো একটা সকাল সন্ধ্যা চোখে দেখেননি তিনি।

এই করে ক'রেই আই. এ.'র পর বি. এ.; বি. এ.'র পর এম. এ. পাশ করলেন। তখন চাকরী এতো সহজ ছিল না। এম. এ. পাশ করেও কম ধান্দা করতে হয়নি। অবশেষে স্কুল মাস্টারি। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তেমন ভালোভাবে পড়তে পারেন নি বলে পরীক্ষার ফল উৎকৃষ্ট হলো না। তাতে তিনি হতাশ হলেন না কেননা পরীক্ষায় পয়লা নম্বর হবো, এমন কোনো পণ ছিল না তাঁর। পড়াশুনো করতে ভালোবাসতেন, তার মধ্যেই আছেন, এতটুকুই ভালো লেগেছে।

ভাইবোনেরা বড়ো হয়ে উঠেছে ততোদিনে। পরিতোষ ম্যাট্রিক পাশ করেছে, বোনেরা স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী। খরচ বেড়ে চারগুণ। কী করে চালিয়ে-ছিলেন ভাবলে অবাক লাগে। যেমন করে পারতেন, যেভাবে পারতেন মাসের শেষে অন্তত চাল ডাল কিনবার টাকাটা এনে দিতেই হতো মায়ের হাতে। ভাইবোনদের মাইনেই কি কম? পরিতোষ গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতো।

তবু মায়ের ঐ একই ক্ষোভ, অতগুলো টাকা তুই নিজের পিছনেই খরচ করলি, যদি থাকতো তা হলে—'

তা হলে যে কী হতো আর কেমন করে থাকতো এ হিসেব আর তাঁর মাথায় ঢুকতো না কী অবান্তর আর অবাস্তব কথা। ভবতোষবাবু আগে আগে রেগে যেতেন, প্রতিবাদ করতেন, বুঝিয়ে দিতেন সে টাকা তাঁর একার পিছনেই খরচ হয়নি, তারা সবাই মিলেই সেই টাকা দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করেছে, খেয়েছে, বেঁচেছে। শুধু ন'মাস চার টাকা করে চার নয়ে ছত্রিশ টাকা তিনি তাঁর মাইনে বাবদ স্কুলে দিয়েছিলেন, আর ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফি লেগেছে ষোলো টাকা সব সুদ্ধ, এই বাহান্নটি টাকাকেই যদি তিনি অপব্যয় বলে মনে করে থাকেন, তা হলে ভবতোষ রায়ের বলবার কিছু নেই; ষোলো বছরের পিতৃহীন বালক, তখন তিনি কী করতে পারতেন রোজগারের কতোটুকু শক্তি ছিলো তাঁর। ম্যাট্রিক পাশ না করা পর্যন্ত কোনো বাড়িতে বয় বেয়ারা হওয়া ছাড়া আর কি কোনো কাজ জুটতো? মা কি তাই চেয়েছেন?

নির্বোধ মা। তবু তিনি গণ-গণ করেছেন, তবু আবারও কথা প্রসঙ্গে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে মাথায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। এরপরে আর একটা কথাও উচ্চারণ করেন নি তিনি, বুঝেছেন করে লাভ নেই। মাকে বোঝানো শিবের অসাধ্য। আসলে তিনি বুঝতে চান না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাইবোনরাও সেই সুর ধরেছে। যেন কৈফিয়ৎ তলব করেছে তাদের বাবার এক হাজার টাকার জন্য। তারপরে যে কতো এক হাজার শরীরের রক্ত জল করে এদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি সংগ্রহ করে এনেছেন, সেকথা আর মনে করে দেখেনি কেউ।

আজ জীবনের এক তৃতীয়াংশ খরচ হয়ে গেছে ভবতোষ রায়ের, এখন তিনি নাগপাশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে দূরের দিকে তাকিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে পান সব। দেখতে পান তিনি ঠকেছেন, কেবলি ঠকেছেন। তিনি শান্ত, ভদ্র, সহিষ্ণু এটাই তাঁর ঠকে যাবার একমাত্র কারণ ভুল হলো। সেজন্য নয়, তাঁর ব্যর্থতার জন্য তাঁর কাপুরুষতাই দায়ী। তাঁর ব্যাধির মতে মাতৃভক্তিই সকল অনর্থের মূল। নিজেকে নিষ্পেষণ করে তিনি যখন সংসারে সকলের সব চাহিদা মিটিয়েছেন, কেউ তার কথা বোঝেনি, কেউ আহা—বলে এগিয়ে আসেনি জল পাখা নিয়ে শ্রান্ত দেহে স্নেহের স্পর্শ বুলিয়ে দিতে। তিনি কী করেছেন সেটা যাচাই করেনি কেউ, কী করেননি তা নিয়ে কথা উঠেছে অনেক।

ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে রুষ্টস্বরে পবিতোষ বলেছে, 'আমার স্কুলের ইনেটা কি দিতে পারবে? না, নাম কাটিয়ে দেব?'

মা চোখের মধ্যে রাজ্যের অভিযোগ ভরে নিয়ে বলছেন, 'যাদের বাপ নেই, তাদের আবার খাপড়া, তাদের আবার মান-সম্মান। যা, নাম কাটিয়ে দে গিয়ে, যা।'

ভবতোষ রায় চকিত হয়ে উঠেছেন, চোখেমুখে অপরাধের ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। অপ্রস্তুত য় বলেছেন, 'আমি কালকের মধ্যেই তোমার মাইনে যোগাড় করে দেব পরিতোষ।' বলেই কেট থেকে এইমাত্র ছেড়ে রাখা শার্টটা আবার গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন তক্ষুনি।

বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র-ছাত্রীর মা বাবা কারো কাছে হাত পাততে বাকী রাখেন নি।

রাত্রিবেলা অন্ধকার ঘরে শুয়ে কেমন একা লেগেছে, ব্যর্থ লেগেছে কিন্তু মায়ের উপর গ হয়নি কখনো। ব্যথিত হয়ে ভেবেছেন, মা'র দোষ কি? বেচারা! সারাটা জীবনই কেবল ভাব আর অভাব। কেবল বিড়ম্বনা। ভালো কি লাগে? মাকে আমি সুখী করবো।

বাবা বেঁচে থাকতে সেই প্রথম দু'এক বছর, যখন তিনি একা ছিলেন। তারপর তো কেবল ন্তান ধারণে আর লালনেই কেটে গেছে দিন। মুখ বেড়ে অভাব বেড়েছে, খিটিমিটি হয়েছে, শান্তির শেষ থাকেনি।

বাবার মৃত্যু বাবার কোনো ক্ষতির কারণ হয়েছে বলে তাঁর মনে হয়নি। তিনি তো ড়িয়েছেন, সংসারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছেন, যে মুক্তির ইচ্ছে মায়ের তাড়নায় বতোষ রায়ের মনেও অনেকবার উঁকি দিয়েছে। কিন্তু ক্ষতি করেছেন স্ত্রীর, যে স্ত্রীকে তিনি চটি সন্তানের জননী করে গেছেন অথচ তাদের সংস্থান রেখে যাননি।

উপর বাবার সেই নিষ্ঠুরতার ঋণ তাঁর ছেলে হয়ে জন্মে তাকেই এখন পরিশোধ রতে হবে বৈকি। সুতরাং প্রতারিত মাকে তিনি কী করে কঠিন কথা বলেন, কী করে রাগ রেন তার উপর?

একদিন নয়, দু'দিন নয়, এক বছর দু'বছর ও নয় টেনে টেনে এই সংসারটাকে এইভাবেই ঃসমুদ্র থেকে তীরে এনে তুলেছিলেন।

যে বছর কলকাতা এলেন, সবাইকে নিয়ে এসে ঢাকার বাস তাঁর ছাড়তে ইচ্ছে ছিলো না। লকাতার খরচ সম্পর্কে ভীতি ছিলো তাঁর। ভাইবোনেরা পড়ছিলো সেখানে, তুলে আনা নেই আবার নতুন করে সকলকে ভর্তি করার সমস্যা। সেটা সাংঘাতিক। লেখাপড়ায় কেউ মন ভালোও নয়। ফেল করাটা তাদের প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তার উপরে রিতোষের সিগারেট আর সিনেমার নেশা সমান তালে চলেছে। এর উপরে নাড়া চাড়া রলে তো আরো ক্ষতি হবে। ঢাকা সস্তার শহর। বাড়ি ভাড়া সস্তা, খাওয়া দাওয়া সস্তা, লেমেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার বন্দোবস্ত ভালো। কলকাতা যে তিনি একটা খুব উঁচুদরের চাকরী য়ে যাচ্ছেন তা তো নয়, সেই স্কুল মাস্টারিই। তফাতের মধ্যে সরকারী স্কুল, মাইনেটা ভদ্র মের। কিন্তু সেই লোভে তিনি আসেননি, এসেছেন নানা কথা ভেবে। জীবিকার পক্ষে এই রে অনুকূল বলে। উপার্জনের অনেক রাস্তায় হাঁটা যায় বলে। একটা থেকে আর একটার ষ্টা সহজ বলে।

কিন্তু মা কিছুতেই শুনলেন না, ট্রাঙ্ক বাক্স গুছিয়ে জেদ ধরলেন তিনিও কলকাতা ভবতোষ রায় প্রায় অন্ধকার দেখলো চোখে। এতোটি মানুষের টিকিট কাটাই তো পক্ষে সমুদ্র সাতরে পার হবার মতো। বুঝিয়ে বললেন, 'কয়েকটা মাস এখানে থাক, আমি

নিয়ম মতো টাকা পাঠাবো, তারপর অন্যরকম সুবিধে হলে বাড়ি ঠিক করে নিয়ে যাব।

মা ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'আমি আমার পিসতুতো বোন ভুতিকে লিখে দিয়েছি, গি
তার ওখানে উঠবো, সে বাড়ি ঠিক করে দেবে।'

'মা, তুমি কি পাগল? কলকাতার বাড়ি ভাড়া কী ভয়ানক তা কি জানো না। আর কী :
ছোটো ছোটো ফ্ল্যাট। এ রকম আস্তো আস্তো বাড়ি নয় যে একটু হাত পা ছড়াবে। আমি আ
যাই, তারপর গুছিয়ে নিয়ে যাব।'

মা'র ঐ এক জেদ। কলকাতা তিনি আসবেনই। কলকাতা তিনি জীবনে দেখেননি, এই
দেখবেন। কে কোথায় আত্মীয় পরিজন আছে, চিঠিপত্র লিখে লিখে তাগাদা দিয়ে একটা ব
ঠিক করে ফেললেন ভবানীপুরে। পাছে দল নিয়ে কারো ঘাড়ে এসে সোওয়ার হন, সেই ভ
গরজ করে তারা তাড়াতাড়ি বাড়ি ঠিক করে দিল। ভবতোষ রায় ধার করে সব সংসার তু
নিয়ে চলে এলেন।

ধার। ধার। আর ধার। ধার শোধ করতে করতে চুল পেকে গিয়েছিল তাঁর। তবুও
পর্য্যন্ত স্কুলের মাইনের উপরে এসে টিউশনির টাকাটা বেশ ভালো একটা সংখ
দাঁড়িয়েছিল। স্কুলের ছেলেরা এখানে স্কুলের মাস্টার রাখতেই সচেষ্ট। বড়লোক ছাত্রেও অ
নেই। সুবিধেই হয়েছিল বেশ। মাসের শেষে তিন চারশ টাকা উপার্জন হত। দিন
টিউশনির হাড়ভাঙা খাটুনির সমস্ত বিনিময়টুকু তিনি নিঃশেষে তুলে দিতেন মা'র হাতে

আস্তে আস্তে কখন যেন সংসারটা একটু স্বচ্ছল হয়ে উঠল, ভাইবোনদের জামা কাপ
কড়া কলপ পড়ল, মা শান্তিপুরী থান কিনলেন, শান্তিনিকেতনী চটি কিনলেন, একজন ঠি
ঝিয়ের জায়গায় রাত দিনের লোক রাখলেন। মায়ের মুখে সেই সময় একটু হাসিও ফুটে
পেরেছিলেন ভবতোষ রায়।

কিন্তু সে হাসি ক্ষণিক। কয়েকদিনের মধ্যেই একটা অঘটন ঘটে গেল। ভবতোষ রায়
পড়লেন। তাঁর সাতাশ বছর বয়সের প্রথম প্রেম। অনভ্যস্ত হৃদয়ে ধাক্কাটা একটু জো
লাগল। আর প্রেমে পড়ার খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝে ফেললেন তাঁর বিয়ে
দরকার।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মা। বজ্রপতন হলেও তিনি বোধহয় এতোটা বিস্ময় প্র
করতেন না। তার ছেলে, যে ছেলেকে তিনি অঙুলি হেলনে চালান, সে তার অনুমতি ছা
প্রেমে পড়েছে? যে ছেলের পরিশ্রমে কতোকাল পরে একটু সুখের মুখ দেখেছেন, সে
করে পর হয়ে যাবে? পর বৈকি। বিয়ে করলেই পর। পরের মেয়ে তো ঘর ভাঙতেই আ
বরং তিনি ভেবেছিলেন ভবতোষের আর একটু আয় বাড়লে, বহির্মুখী পরিতোষটাকেই
বিয়ে দিয়ে ঘরমুখো করবেন। তা ছাড়া তিন তিনটা হস্তিগোদা মেয়ে ঘরে।

ছেলেকে তিনি ছি ছি করলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'একথা তুই ভাবতে পারলি
করে? এতো বড়ো সংসার তোর ঘাড়ে, ঐ বোনগুলোর এখনো গতি করলি না, পরি
এখনো দাঁড়ালো না—'।

সাতাশ বছর বয়সের ভবতোষ রায় মরমে মরে গেলেন কথা শুনে। সত্যিই তো,
কারো কথা না ভাবলেও বোনেদের কথা তো ভাবা উচিত। মাথা নিচু করলেন তিনি।

আর বিকেলে যখন তার সঙ্গে দেখা হল, ঠোঁট কামড়ে বললেন, 'আমার পক্ষে বিয়ে
এখন অসম্ভব।'

সে মুখে মুখে বলল, 'অসম্ভব?'

ভবতোষ রায় বললেন, 'অসম্ভব।'

'কেন?'

'আমার মায়ের মত নেই।'

'কেন?'

'তুমি তো আমাদের সংসারের অবস্থা সব জানো। আমার উপরই সব নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। বোনেদের বিয়ে হয়নি—'

'কিন্তু—'

'আমি তোমার বিপন্ন অবস্থা সবই বুঝতে পারছি।'

'তবে?'

'মা'র মত না পেলে তো বিয়ে করতে পারি না।'

লাবণ্য এবার রাগ করলো। মুখ নিচু করে বললো, 'আমার সঙ্গে পরিচয়টাও তা হলে মায়ের অনুমতি নিয়ে করা উচিত ছিল।'

ভবতোষ রায় চুপ করে রইলেন।

প্লেনের লাল আলো জ্বলে উঠেছে, প্লেন নামছে, এবার বেল্ট বাঁধতে হবে। ভবতোষ রায় চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে সচেতন হয়ে জানালার ছোট্ট ফোকরে নিচের দিকে তাকালেন। তেমনিই ঝক ঝক করছে রোদ, যেমন দেখে এসেছেন বন্দরপুরে। এই তো এইমাত্র তিনি সেখানে ছিলেন, এইমাত্র চলে এলেন। বন্দরপুর থেকে কলকাতা এতো কাছে।

সেই কলকাতা। তাঁর সুখ দুঃখের কলকাতা। ষোলো বছর আগে যে কলকাতার মাটি ছেড়েছিলেন তিনি।

প্লেন এয়ার পোর্টের মাটি ছুঁয়ে দৌড় দিল। হঠাৎ ভয় পেয়ে আবার চোখ বুজলেন ভবতোষ রায়।

কিন্তু এর আগে দমদম তিনি আসেন নি। এই এরোড্রোম তাঁর চোখে নতুন। লবিতে এসে বসলেন। বম্বের প্লেন ছাড়বে আরো চার ঘণ্টা পরে।

রেঁস্তোরায় গিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে চা খেলেন। বাইরে এসে কম্পাউন্ডটা তিন চারবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর কী ভেবে একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে চেপে বসলেন।

হাতে এখনো পুরো তিন ঘণ্টা সময় আছে। কতকালের প্রিয় শহর, একবার ঘুরে দেখে এলে কী হয়? ভবানীপুরের সেই বাড়িটা এখনো নিশ্চয় ধ্বসে যায়নি। আর সেই টালিগঞ্জের শিবতোষবাবুর একতলা?

বুক তার ভারি হয়ে উঠল স্মৃতির বেদনায়। নিশ্চয়ই তিনি সেই বাড়ি দুটোকে দেখবেন। শেষবারের মত দেখবেন।

দমদম থেকে ভবানীপুর, সহজ দূর নয়। ট্যাক্সিতে বসে একটু একটু ভয় হল তাঁর। শেষে আবার দেরি হয়ে যাবে না তো? প্লেনটা ধরতে পারবেন তো? কিন্তু কতক্ষণ লাগবে? তিনি তো আর দাঁড়াবেন না। ট্যাক্সি থেকেই দেখবেন, তক্ষুনি ফিরে আসবেন শুধু একবার চোখের দেখা সেই বাড়িটাকে।

রাস্তায় তখনো ভিড় জমে ওঠেনি, আপিস ছুটি হয়নি, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ট্যাক্সি দ্রুতগতি হলো। বারে বারে ঘড়ি দেখতে লাগলেন তিনি। পরিচিত রাস্তার ফিতে বেয়ে বেয়ে পৌঁছতে লাগলেন গন্তব্যে।

বুকটা যেন ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। মনে করতে চেষ্টা করলেন লাবণ্যর সঙ্গে যখন তাঁ প্রথম দেখা হয়েছিল কী মাস ছিল তখন।

বৈশাখ। হ্যাঁ বৈশাখ। স্কুলের ছেলেদের ষান্মাসিক পরীক্ষা চলছিল, ভীষণ গরম পড়েছিল সেবার। কাল বোশেখী হয়নি, একফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি।

একদিন টিফিনের সময় একটি মেয়ে এসে গেটের ভিতরে ঢুকল। তার ভাই পরীক্ষা দিচ্ছে, টিফিন নিয়ে এসেছে তার জন্য। পাশ দিয়ে হন হন করে বোধহয় এক প্যাকেট সিগারেট কিনতেই বেরুচ্ছিলেন, (না কি বাড়ি চলে যাচ্ছিলেন, ঠিক মনে পড়ছে না) ধাক্কা লেগে গেল। মেয়েটির হাত থেকে সব খাবার পড়ে গেল মাটিতে। লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলেন তিনি, অপ্রতুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

অপ্রস্তুত মেয়েটিও কম হলো না। ভবতোষ রায়ের কুণ্ঠিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে, কেউ তো আর ইচ্ছে করে ফেলে দেয়নি।' নিচু হয়ে সে জলের বোতলটা তুলে নিল। জিব কেটে মাথা চুলকে ভবতোষ রায়ের কী অবস্থা 'একটু যদি দয়া করে অপেক্ষা করেন' বলেই তিনি ছুটলেন দোকানে। দুহাত ভর্তি রাশীকৃত খাবার নিয়ে ফিরে এলেন।

যার জন্য টিফিন, সে বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে। দশ এগারো বছর বয়সের এক বালক। প্রশ্নপত্র দেখাচ্ছে দিদিকে। ভবতোষবাবু বললেন, 'এখানটায় বড় রোদ, ওদিকে একটা ছায়াছায়া জায়গা আছে, মস্ত তেঁতুল গাছ, ওদিকটায় আসতে পারেন।' হাতের খাবারগুলো তিনি এগিয়ে ধরলেন।

চোখ তুলে তাকালো লাবণ্য 'একি!'

লাবণ্যর চোখ যে দেখেনি তাকে ভবতোষবাবু বোঝাতে পারবেন না সেই দৃষ্টির মাধুর্য শুধু কি চোখ, এমন একটি সুন্দর মেয়ে আর কি কোনোদিন দেখেছেন তিনি? ভবতোষবাবু হেসে বললেন, 'ওকে দিন।'

'না না, এ খুব অন্যায়।'

'কেন, অন্যায় কিসের।'

'খুব অন্যায়। কেন আপনি এ সব নিয়ে এলেন?'

'ও খাবে না?'

যে খাবে সে ততোক্ষণে ভয়ে বিস্ময়ে পুলকে, জড়োসড়ো হয়ে প্রায় দিদির আঁচলে লুকিয়েছে। তাদের মাস্টারমশাই যে তার দিদির পরিচিত, তাতো কই সে জানত না। আর কী আশ্চর্য। মাস্টারমশায় নিজ হাতে তার জন্য খাবার কিনে নিয়ে এসেছেন? অথচ এর আগে কখনও তো তার সঙ্গে কথা বলেননি। বড়ো ক্লাসের ছাত্রদের পড়ান উনি, কিন্তু এই মাস্টারমশাইকে দেখতে খুব ভালো লাগে তার। সে প্রায় গদগদ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি তবু হাত বাড়িয়ে খাবারটা ধরল না। ভবতোষবাবু তখন ছেলেটির হাতেই গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এটা তো মানবেন, ছাত্রটি আমার স্কুলেরই? তাকে দেবার অধিকার আমার আছে। নাও তো তুমি। নাম কি তোমার?

ভীরু ভীরু চোখে তাকিয়ে খাবারটা নিল সে, আস্তে বলল, 'নীলাঞ্জন সেন।'

'নীলাঞ্জন! বাঃ কী সুন্দর নাম। কোন ক্লাসে পড় ?'

'ফাইভে। এ সেকসনে।'

'খুব ভাল। যাও এবার, খেয়ে নাও।'

চলে যাচ্ছিলেন, থামলেন, বললেন, 'চলুন, ছায়াতে নিয়ে যাই।'

কিন্তু ছায়াতে গিয়ে মেয়েটি তাকে ছাড়ল না, ভাইয়ের সঙ্গে খাবার ভাগ করল। স্মিতহাস্যে রম গলায় বলল, 'টিফিন তো একা ছাত্রদেরই হয়নি, মাস্টারদেরও হয়েছে। তাছাড়া তগুলো খাবার একা খেতে পারে কখনো? নষ্ট করতে পারব না।'

হাজার হোক ছাত্রের সঙ্গে টিফিন খাওয়া শোভন নয় তাঁর পক্ষে। মেয়েটিকে সেকথা াঝানো গেল না। একথাও বোঝান গেল না অন্য মাস্টার আর অন্য ছাত্রদের চোখের তলায় ার এ অবস্থাটা খুব রমনীয় হবে না।

শেষ পর্যন্ত স্কুলের পিছনে, আরো একটু নির্জনে নিয়ে এলেন ওদের।

আলাপের এই সূত্রপাত।

যাবার আগে মেয়েটি বলল; 'তাহলে আসি?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'সে তো আমি দেব।'

'আপনি কেন? আপনি নিতান্ত ভালমানুষ তাই রক্ষে। আমাকে যদি কেউ ওরকম ধাক্কা য়ে হাতের খাবার ফেলে দিত, আমি তো খুব রেগে যেতুম। রীতিমতো ঝগড়া করতুম।'

'কী আশ্চর্য! ধাক্কা ব্যাপারটা তো একা একা হতে পারে না। নিশ্চয়ই ওটা পারস্পরিক। াতে আপনারও যতটুকু দায়িত্ব আমারও তার চেয়ে কম নয়। আমার হাতে খাবার না থেকে াপনার হাতে থাকলেও পড়তে পারত।

'হ্যাঁ, কোর্টে মামলা হলে এসব যুক্তি কাজে লাগত বটে। তা, যাই হোক, ক্ষমা করেছেন টা অন্তত বুঝতে পেরেছি।

ভবতোষবাবু মেয়েটিকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরলেন।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ে গেল। ভবতোষবাবু ধীর মন্থর পায়ে দোতলায় উঠতে উঠতে াশায় বুক বাঁধলেন, যেন কাল আবার দৈব তার সহায় হয়।

ন্তু তা হলো না। পরের দিন পরীক্ষা ছিল না ছেলেটির। সুতরাং তার টিফিনেরও দরকার ল না, তার দিদিও এলো না।

যুবক ভবতোষ কম্পিত হৃদয়ে অনেকবার গেটের কাছে এসে এসে ফিরে গেলেন, নেকবার অন্যমনস্ক হলেন কাজে।

তারপরের দিন শনিবার, সেদিনও ছেলেটির পরীক্ষা ছিল না। ভবতোষবাবু জেনে নিলেন, াামবারে অঙ্ক পরীক্ষা। একটা আশার আলো ধিক ধিক করে জ্বলতে লাগল। সেই সঙ্গে একটা জ্জাও আচ্ছন্ন করল তাকে। নিজের মনকে তিনি ধিক্কার দিলেন। মন তার বাধ্য হলো না।

তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, মনটা মানুষের কী? কোথায় তার অবস্থান, কী তার চেহার কেন তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শাসন করা যায় না।

সোমবার তাঁর ডিউটি ছিল না, তবু যাবার জন্য তাঁর হৃদয় সমুদ্রের মত লাফাচ্ছি দাপাচ্ছিল, ঢেউ হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিলো। অথচ, এমন একটা ছুটির দিনে একটু আলস্য করতে বিশ্রাম নিতে কত তাঁর সাধ।

কী অছিলায় যে যাবেন, শেষে সেটাই ভাবতে লাগলেন আগের দিন সারারাত ধরে পরের দিন সারা সকাল ইচ্ছে করে বিছানায় গড়ালেন। কিন্তু ঘড়িটি রইল হাতে বাঁধা, ঘন ঘ দৃষ্টিক্ষেপ চলতে লাগল তার কালো কাঁটা দুটির উপর, তারপর এক সময়ে তড়াক করে উ দৌড়ে স্নান করতে গেলেন।

ডিউটি থাক ছাই না থাক, স্কুলে আসতে কি আর মাস্টারদের কৈফিয়তের অভাব থাকে যেন কত কাজ এমনি ভাবে এলেন। এসে বসে রইলেন স্টাফরুমে, যতো রাজ্যের খবরে কাগজ পড়ে পড়ে সময় কাটাতে লাগলেন।

দেরি ছিল টিফিনের, ইচ্ছে করলে তিনি নাকে মুখে গুঁজে এই সাড়ে ন'টাতে এসে বসে থাকলেও পারতেন। কিন্তু কে বলতে পারে, শুধু সে টিফিনেই আসবে কিনা। এমনও হতে পারে ভাইকে পৌঁছে দিতেও এলো। আর সেই সময়েই হয়ত টিফিন রেখে গেল। হ তো সেই দুপুরে কাজ আছে তার হয় তো, দুপুরে রোদ্দুরে আসতে কষ্ট হয় তার। কতো হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার ভার কে নেয় সাধ করে? তাই আগে আগে এসে অপেক্ষা কর কি ভালো না? যদি এমন হয়, দু'বার এলো, পৌঁছে দিতেও এলো, টিফিনেও এলো, তা হ তো কথাই নেই। কিন্তু একটা সময়ও সে অবহেলায় নষ্ট করতে রাজী নয়।

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, সমস্তটা দিন কেটে গেল, না এলো সে পৌঁছে দিতে, না এলো টিফি দিতে। খুব অন্যায়। মনে মনে ভবতোষবাবু ভ্রূকুটি করলেন। ঐটুকু একটা দশ বছরের দুধে ছেলে, তাকে মানুষে টিফিন দিতে আসে না? কেমন পরীক্ষা দিয়েছে দেখতে আসে না। ছি। কী ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। তবে দিদি হওয়া কেন? এক ফোঁটা স্নেহ নেই?

একটা ব্যর্থ অভিমান যেন থেকে থেকে গুমরে উঠল। কিন্তু কার বিরুদ্ধে? যাকে তি চেনেন না। মন খারাপ করে সেই বেলা চারটে পর্যন্ত বসে থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। শে পর্যন্ত আশা করেছিলেন, পৌঁছে দিতে না আসুক, টিফিন দিতে না আসুক, পরীক্ষা দিয়ে ক্লা ভাইকে নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই আসবে। সে এলো না।

পরের দিন নিজের ডিউটি ছিলো, আসতেই হলো। কিন্তু অবিরাম অন্যমনস্ক রইলে মাস্টার মশায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগে ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলাবলি কর টোকাটুকি করল, খুব মজার দিন গেল তাদের। আর টিফিন না হতে তারা যত হুড়মুড়ি বেরোলো, ভবতোষ বেরুলেন তাদের চেয়ে দ্রুত। একেবারে সোজা গেটে এসে দাঁড়ালেই তাঁ প্রত্যাশিত অতিথিটিও এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু দাঁড়ালো। চোখে চোখে তাকিয়ে দুজনেই ব্যস্ত হয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ঢোক গি কেশে, ভবতোষ রায় বললেন, 'এই যে, আজও দেখা হয়ে গেল।'

মেয়েটিও আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, তাই তো।'

'কাল বোধহয় আসেন নি।'

'খোঁজ করেছিলেন নাকি?'

খোঁজ? না তো। খোঁজ করব কেন?'

কী করে জানলেন আসিনি?'

বাঃ টিফিন তো আমাদেরও হয়? দেখলুম আপনাদের ভাইটি একা একা বসে আছে।'

কিন্তু এসেছিলাম।'

এসেছিলেন! কই, আমার সঙ্গে তো দেখা করেন নি।'

সে রকম কি কোনো কথা ছিলো?'

না না, তা নয়। তা থাকবেই বা কেন? কিন্তু আমি তো দেখিনি।'

খোঁজ করলেই দেখতে পেতেন।'

খোঁজ? কেন করবো না, আমি তো জিজ্ঞেস করেছি আপনার ভাইকে।'

কী জিজ্ঞেস করেছেন?'

আপনার কথা।'

তবে যে বললেন খোঁজ করেননি।'

হাঁ, সেটাকে যদি খোঁজ বলেন।' ধরা পড়ে ভবতোষ রায় মাস্টারজনোচিত গাম্ভীর্য ধারণ রলেন।

একটু হাসল মেয়েটি, নরম গলায় বলল, ঐটুকুর জন্যই আমি কৃতজ্ঞ, আমার ভাই ামাকে বলেছে আপনি তাকে এ কথাও জিজ্ঞেস করেছেন, টিফিনে যখন আসিনি, ছুটির পরে াকে নিতে আসার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। এবং ছুটির পরেও যে আপনি তার সঙ্গে থা বলেছেন এ বিষয়ে, সে জন্য আমার অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কিছু কি দরকার ছিলো?

'না না, দরকার আর কী।' মনের উদ্দামতায় অস্থিরতায় কাল যে কী করতে কী করেছেন, া বলতে কী বলেছেন কিছুরই ঠিক নেই। এ তার কী দশা হলো। লজ্জায় অধোবদন হলেন। ারপর বললেন, 'সত্যি এসেছিলেন কাল?'

'আমার মা'র অসুখ ছিল, আসতে পারিনি।'

'তবে যে বললেন।'

বারে, সশরীরের আসাটাই আসা নাকি? হাসল সে।

এরপরে মেয়েটির ভাই এলো, আবার সেই তেঁতুলতলার ছায়ায় বসল এসে তিনজনে। পুরের রোদ, তাপ, সব জুড়িয়ে গেল সেই ছায়ার শীতলে। এলোমেলো বাতাস দিলো, ধুলো ড়ল, পাতা খসল, সামনের সবুজ পচা ডোবাটাতে ঘাই মারল মাছেরা, চিলে ছোঁ মারল, াছরাঙা টি টি করল, তারপর ঘণ্টা বেজে টিফিন শেষ। ভবতোষবাবু শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সখানে খরচ করে বললেন, 'ওর তো কালও পরীক্ষা আছে, না?'

'এখন তো পরপর সব ক'দিনই পরীক্ষা। বরং মাঝে মাঝে একটু ফাঁক থাকলেই ভাল লে।'

'কেন?'

'পড়িয়ে দেয়া যেত, আমারও বিশ্রাম হতো।'

'সারা বছর পড়ে যদি তৈরি না হয়, ঐটুকু ফাঁকে আর বেশি কিছু হবে না। আর বিশ্রামের টা যে বলছেন, আমার তো মনে হয়, যা হয় এক চোটে হয়ে যাওয়াই ভাল।

'বাঃ, রোজ রোজ এই দুপুরে আসতে আমার কষ্ট হয় না?'

'সে তো যেদিন আসবেন সেদিনই কষ্ট।'

একটু অন্যমনস্ক হলো মেয়েটি, মৃদু হেসে বলল, 'অবিশ্যি এই কষ্ট আর মাত্র ছ'দিনে

'ছ'দিন। কেন?

'কেন আর কী। বিষয় ফুরিয়ে যাবে পরীক্ষাও শেষ হবে।'

'মাত্র ছ'দিন?'

'মাত্র ছ'দিন।'

'তারপর?'

'তারপর টানা বিশ্রাম। নিশ্চিন্ত। ও-ও নিশ্চিন্ত, আমিও তাই।'

মেয়েটির নিশ্চিন্ততার কথা শুনে কেন যে ভবতোষবাবুর বুকে বাজল কে জানে। দুঃ চেহারা করে অনেক দূরে তাকিয়ে রইলেন তিনি, অনেক পরে বললেন, 'তা ছ'দিনই বা কী। এর মূল্যও কম নয়।'

ছেলেটি দৌড়তে দৌড়তে বলল, 'দিদি, যাই ঘণ্টা পড়ে গেছে।' সুতরাং মাস্টার দৌড়তে হলো সেই সঙ্গে। তারও ডিউটি আছে

ছ'দিনও যে সত্যিই কম নয় জীবনে, এর পরে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন ভবতে কেননা যা হবার সেই ছ'দিনেই হয়ে গিয়েছিল। মুখে চোখে অবিশ্যি দু'জনেই ভান করে যেন নেহাৎই ভদ্রতা করছে, নেহাৎই একটা পরিচিত মানুষ আর একটা পরিচিত মানু সঙ্গে আলাপ করছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বুকের খাঁচায় পাখিরা তখনই ডানা ঝা দিতেছিল। আর তার দাপটে ভাইকে শুধু টিফিন দিতেই নয়, পৌঁছে দিতে আসা আর নি আসাটাও যুক্ত হয়েছিল মেয়েটির। তার মানে বাকী ছ'দিনে তিন ছ'য়ে আঠারোবার হয়েছিল।

আর ছ'দিনে যার সঙ্গে আঠারোবার দেখা হয়েছে তার সঙ্গে যদি উনিশবার দেখা ক তৃষ্ণা জাগে খুব কিছু অস্বাভাবিক নয়। শেষ দিন তাই ঠিকানার আদান প্রদান করেছি তাঁরা পরস্পরকে যার যার বাড়ি যাবার আবেদন জানিয়েছিলেন, যেমন পরিচিত লো বিদায়ের সময়ে করে থাকে।

কেউ কারো বাড়ীতে যাবার অনুরোধ করলে যে যাওয়া উচিত এ বিষয়ে তিলমাত্র স ছিল না ভবতোষ রায়ের। এবং সেটাই যে সৌজন্য তাও সংশয়ের অতীত বলেই হয়েছিল। অতএব সৌজন্যের খাতিরেই সাতদিনের দিন ঠিকানা মিলিয়ে তাঁর চলে যেতে ই

।। দিনে রাত্রে সেই ইচ্ছার প্রেরণায় কষ্টও পেয়েছিলেন তিনি। তিনি ছটফট করছি অস্থির বোধ করছিলেন, সেই সঙ্গে সংযম অভ্যাসও করছিলেন। এই করতে করতেই কে এক সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে পথ চিনে চিনে কখন যেন সেই টালিগঞ্জের একটা সরু গ মধ্যে এসে দিশেহারা হয়ে দাঁড়ালেন। উঁকি ঝুঁকি মেরে ভীরু হাতে একটি দরজার ক নাড়লেন। আর দরজা খুলে দিতে যিনি এসে মুখোমুখি হলেন তার দিকে তাকিয়ে বুকের ডানা ঝাপটান পাখিরা গান গেয়ে উঠল। সহজ হতে সময় গেল খানিক।

অপ্রস্তুত হেসে আস্তে বললেন, 'এলাম।'

চোখ নামিয়ে তার চেয়ে আস্তে মেয়েটি বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

'অসুবিধে করলাম কি?

সে তাকিয়ে হাসল একটু, জবাব দিল না।

তারপর ভিতরে নিয়ে এল তাঁকে।

অবিশ্যি ভিতয়ে বলতে মাত্রই একখানা ঘর। তারই অপরিসরে দশ বছরের বালক ভাই ার অকাল বৃদ্ধ অসুস্থ মাকে নিয়ে মেয়েটির সংসার। সামনে একটু বারান্দা, সেই ছোট্ট রান্দাটুকুতেই মোড়া এগিয়ে সে বসতে দিল, মুখটা লাল দেখাল তার, বলল, 'তা হলে সত্যি ্নে করে এলেন?'

লাজুক ভঙ্গীতে বসে ভবতোষ রায় বললেন, 'কথা দিলে আমি কথা রাখি।'

'শুনে সুখী হলাম—' নিজেও একটি মোড়া নিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসল, 'কিন্তু কথাটা ঃ আর পাঁচদিন আগে রাখা যেতো না?'

'পাচ দিন?'

'আমার তো যতদূর ধারণা, মঙ্গলবার বিকেল চারটা নাগাদ এই প্রতিশ্রুতিটি পাওয়া ায়েছিল এবং ক্যালেন্ডারে দেখলুম আজ সোমবার। প্রায় এক সপ্তাহ আগের কথা, কী ্লেন?'

ভবতোষ মাথার চুলে হাত ডুবোলেন, বললেন, 'প্রতিশ্রুতি কি শুধু একা আমারই ছিল? ার কেউ কি কিছু বলেনি?'

'বলেছিল নাকি?'

'ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেওয়া বৃথা। যাকগে সে সব, কেমন আছেন তাই বলুন।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'পাঁচদিন যোগাভ্যাস করে ঈষৎ ক্লিষ্ট।'

'যোগাভ্যাস!'

'বলছিলাম, আপনার স্মরণশক্তির চাইতে আমার স্মরণ-শক্তিটা একটু বেশি, ঠিক এসে াজির হয়েছি। নীলাঞ্জন কোথায়?' সচেতন হয়ে প্রসঙ্গান্তরে এলেন। নীলাঞ্জন! মেয়েটি হাত ল্টোল—পরীক্ষা শেষ, আর তাকে পায় কে? কোথায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার । আছেন, তিনি অসুস্থ, বসুন আগে চা করি, তারপর তাঁকে ডেকে আনি।'

'মা আছেন?' কোথায় তিনি?

'এই রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে, দেখছেন তো কতবড় বাড়ি খুঁজতে সময় লাগবে।'

ভবতোষ রায় চারদিকে তাকালেন। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিয়ে ললেন, 'আমার কিন্তু বেশ লাগছে বারান্দাটা।'

'তা তো লাগবেই, বারান্দাটার তো গুণের অভাব নেই? একাধারে বসবার, পড়বার, রান্না রবার—আরো যে কতো কিছু তারও হিসেবও নেই।' মোড়া ছেড়ে উঠলো সে, এ পাশে াসে তাকে সাজান চায়ের বাসনের থালা থেকে ছোট্ট এলিউমিনিয়মের একটা কেৎলি হাতে াল, 'বসুন, চায়ের জলটা চাপিয়ে নি।'

'না না, চায়ে দরকার নেই আমার। আপনাকে যেতে হবে না, আপনি আসুন।'

মেয়েটি হেসে ফেলল 'কোথায় যাব? এই তো আমার রাজ্যপাট, এটুকু বারান্দার এ মাথা । ও মাথা, এখানে বসেই তো চা করব। সত্যি, কোন মাননীয় অতিথি এলে যে বসতে দেব ামন জায়গাটুকু আমাদের নেই।'

গলা নরম করলেন ভবতোষ 'তাই ভাল, জায়গা ছোট হলে মানুষেরা ঘনিষ্ঠ হয়, চা আপনাকে করতে হবে না, বসুন।' দাঁড়িয়ে টেবিলের উপরে রাখা স্টোভটা ধরাতে ধরাতে মেয়েটি হেসে বলল, 'জায়গা ছোট না হলেও মানুষ ঘনিষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু অতিথিকে এক কাপ চা না দিলে অনন্ত নরক বাস হয়।'

রান্নাঘর আর বসার জায়গাটুকুর সঙ্গে একটা শাড়ি কাটা পর্দার ব্যবধান আছে বটে, তবে সেটা না থাকারই সমান। পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সব, দেখা যাচ্ছে পরিপাটি করে সব গোছান। হয় সেলফে নয় টেবিলে। মেঝেতে কিছু নেই। বোঝা গেল রান্নাও স্টোভে হয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ভাবতোষ, এই গৃহস্থালীটুকু ভালো লাগলো তার। অভাবের মধ্যেও স্বভাবের গুণে যে শ্রী ফোটে এটা উপলব্ধি করলেন।

ক্ষিপ্র হাতে চা করল মেয়েটি, পাঁপর ভাজল এক প্লেট, পরিষ্কার একটি কাঠের বারকোষে সাজিয়ে নিয়ে এল কাছে।

বিছানা ছেড়ে এসে বসলেন দরজার ধারে। একটা জলচৌকি এগিয়ে দিল মেয়েটি। ভবতোষবাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

রুগ্ন শীর্ণ নিরাভরণ বিধবা, কিন্তু সৌন্দর্যের জৌলুষ তখনো থমকে আছে চোখের কোলে, নাকের গড়নে, চুলের ঢৌলে, থুতনীর ডিম্বাকৃতিতে। মেয়ের রূপ যে মায়ের দান সেটা বোঝা গেল। মিষ্টি হেসে ভবতোষকে বসতে বললেন তিনি। বললেন, তোমার কথা আমি সব শুনেছি লাবুর কাছে। দেখে খুব ভাল লাগছে।

ভবতোষবাবু বললেন, 'আপনার শরীর খুব খারাপ দেখছি—' 'সে কি আজকের?' মাথার খসে যাওয়া আঁচলটা টেনে দিলেন তিনি। 'পাঁচ বছর এই চলছে। কখনো বিছানা ছাড়তে পারি, কখনো সেটুকুও পারি না।'

'কী হয়েছে?'

'হার্টের অসুখ। মেয়েটার ঘাড়েই সব বোঝা। সংসারের বোঝা, মায়ের বোঝা।'

লাবণ্য কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য হেসে বলল, 'জান মা, ইনি বলছেন, এই বারান্দাটা নাকি ওঁর ভাল লাগছে। আমি বলছি, মানুষের টানে না আসুন, বারন্দাটার টানেই না হয় আসবেন মাঝে মাঝে।

ভদ্রমহিলাও হাসলেন, 'হ্যাঁ, উপলক্ষ্য যাই হোক, এলেই খুশি। বল তো, মানুষ কি মানুষের সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে? অথচ আজকাল, আত্মীয়রা প্রায় বর্জনই করেছেন, বন্ধুরাও আস্তে আস্তে কত কমে গেল।'

লাবণ্য পরিত্যক্ত চায়ের বাসন সরিয়ে ঐ কোনে নিয়ে রেখে এসে বলল, 'আর বেশি বন্ধুতে কাজ নেই মা। বেশ আছি।

ভবতোষ হেসে বললেন, 'এটা ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো হচ্ছে না তো?'

'মানে?' একদিকের ভুরুটা বাঁকা করল লাবণ্য।

'মানে, যে মানুষটি এই মুহূর্তে বন্ধু হতে উৎসুক, পথ খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হয়েছে তাকে ফিরে যেতে বলাও তো হতে পারে।'

মা মাথা নেড়ে ঈষৎ শব্দ করে হাসলেন, 'ঠিক বলেছ, ওর কথার তো এই জবাবই হওয়া উচিত।'

'বা রে' লাবণ্য মায়ের গা ঘেঁষে বসল, 'তুমি আমার বিপক্ষে কথা বলছ দেখছি।'

'বন্ধুতে কাজ নেই বললি কেন?'

'অনেক বন্ধু তো দেখেছ জীবনে। কাজে এসেছে কি?

'যখন এসেছে তখন তো এসেছে? জান ভবতোষ, আমার স্বামী ছিলেন মস্ত '
নুষ, মানুষ জন ছাড়া থাকতেই পারতেন না। আর মানুষ জন আসতও স্রোতের মত। খাওয়া
ওয়া বেড়ান, হৈ চৈ—বাড়িটা একেবারে সরগরম। তারপর একদিন সব আলো নিবে
ল—' হাসিমুখে বলতে শুরু করেছিলেন, চোখের জলে শেষ করলেন।

একটু পরেই উঠে শুতে গেলেন তিনি। লাবণ্য ম্লানমুখে বলল, 'বাবার মৃত্যুর পর থেকেই
ভুগছেন এরকম। আঘাতটা খুব অপ্রত্যাশিত ছিল। বাবা প্রতিদিনের মতই খেয়ে দেয়ে
সিমুখে বিদায় নিয়ে আপিসে গিয়েছিলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না। বিকেলের দিকে
খানেই স্ট্রোক হয়, সেখানেই মারা যান, বাড়িতে যখন আমরা তাঁর আসতে দেরী দেখে প্রায়
না পুলিশ করছি, এমন সময় আপিসের সহকর্মীরা আমাদের কাছে তাঁর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে
লেন। আর সেই দেখেই যে মা অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, আর বিছানার সংশ্রব ত্যাগ করতে
রলেন না। এই পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে আরো খারাপ হয়েছে। তবু তখনো কিছু টাকা হাতে
ল। ডাক্তার, অসুখ, পথ্য, যত্ন, চলতে পারছিল; ঝি রেখে দিয়েছিলাম একটা, শেষে আস্তে
স্তে অল্প সঞ্চয় শেষ হয়েগেল, আমার পরীক্ষা দেয়া হল না, অষুধ পথ্যে টান পড়ল, ঝি
ঠে গেল, আত্মীয়রা পাছে ধার চাই সেই ভয়ে আসা ছাড়লেন—'

চুপ করল লাবণ্য। ভবতোষ রায়ও চুপ করে রইলেন। নিজেকে সমব্যথী মনে হল তাঁর,
কটা ভারি মনে হল।

সেইদিন আরো অনেকক্ষণ ছিলেন তিনি। বিদায় দিতে এসে লাবণ্য কুণ্ঠিত হয়ে বলল,
আজ এমনসব ব্যক্তিগত কথা বলে আপনাকে বিব্রত বিরক্ত করলুম যে ভেবে লজ্জা হচ্ছে।'

ভবতোষ বললেন, 'কিন্তু আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'কৃতজ্ঞ! কেন?'

'আমাকে আপনারা দূরে ঠেলে রাখেন নি, সাহসে বুক বেঁধে আবারও আসবার ইচ্ছেটা
হয়তো সার্থক করা যেতে পারবে।'

লাবণ্য তাকাল। ভবতোষবাবুও তাকালেন।

লই বাহুল্য পরের দিনই আবার যাবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন ভবতোষবাবু। কিন্তু
জ্জা করল, সঙ্কোচ হল। স্কুল থেকে ফিরে উন্মনা হয়ে রইলেন তিনি, তারপর ঢাকুরিয়া
কে গিয়ে একা বসে রইলেন চুপচাপ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত বাড়লে তবে বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিনও তাই করলেন, তারপরের দিন আর পারলেন না। যাওয়া বিষয়ে অনেকগুলো
ক্তি মনে পড়ল তাঁর। প্রথম নম্বর সেদিন আসবার সময় লাবণ্যর মা'র কাছে বিদায় নেয়া
নি, সেটা অন্যায় হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ লাবণ্যর ভাই বাবলু তার ছাত্র, তার সঙ্গেও দেখা করা
চত ছিল, পড়াশুনো বিষয়ে অনেক আদেশ নির্দেশ দেবার ছিল, আর তৃতীয়তঃ—এইখানে
স নখ খুঁটে, ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ভাবলেন তিনি, ভেবে ভেবে অনেক সময় লেগে গেল
বুও তৃতীয় কারণটা আর খুঁজে বার করতে পারলেন না। তা নাই বা পারলেন, অন্য দুটো
রণের গুরুত্বও তা বলে কিছু কম নয়।

সুতরাং তেমনি সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় আবার গিয়ে তিনি সেই গলিতে ঢুকলেন মৃদুহাতে কম্পিত বুকে আবার কড়া নাড়লেন, আবার এসে লাবণ্য দরজা খুলে দিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল। সেদিনের মতই তিনি হেসে বললেন, 'এলাম।'

মুখ ভার করে লাবণ্য বলল, 'সময় হল?'

'সময়? মুখের দিকে তাকালেন তিনি, 'সময় হলেই কি আসা যায়?'

'যায় না, না?'

'না। একটা ভদ্রতা আছে তো।'

'আসতে আবার ভদ্রতা লাগে নাকি?'

'লাগে। শুধু তো নিজের সুখটা দেখলেই চলবে না, অন্যদের কথাও তো ভাবতে হবে।'

'সেই অন্যরা কে?'

'কেন, আপনি।'

'ও।'

'বিরক্তও তো হতে পারেন।'

'তা তো ঠিকই।'

'সেজন্যই কিঞ্চিৎ পুনরায় কৃচ্ছসাধনে নিযুক্ত ছিলুম।'

এগিয়ে এলেন তিনি, দরজা ছেড়ে দাঁড়াল লাবণ্য।

আবার সেই বারান্দা, বারান্দায় মোড়া। আবার গল্প, আবার চা, পরিপাটি গৃহস্থালী, এ বাড়ি তার উঠোন ডিঙিয়ে এক চিলতে আকাশ, আকাশের তারা—ভবতোষ রায় জীবনে অন্য জগতে প্রবেশ করলেন। বিদায় দেবার সময় লাবণ্যর মা বললেন, 'সুন্দর কাটলে সন্ধ্যাটা। আবার এসো।'

ভবতোষ রায় বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

মহিলাটি চমৎকার। শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন। আর লাবণ্যর ভাইটিও ভারি চমৎকার মাস্টার মশায়কে দেখে একেবারে গদগদ। আর লাবণ্য!

না, তার কোনো তুলনা নেই। সে অনন্যা।

এরপরে লাবণ্যর মামার সঙ্গেও আলাপ হলো, একদিন। হাসিখুশি সুশ্রী সুঠাম এক বলি ভদ্রলোক। প্রথম দর্শনেই তিনি আপন করে নিলেন। বয়স বেশি নয়, চল্লিশের কাছাকাছি মাথা ভরা চুল। একাই জমিয়ে রাখলেন আসর। তিন প্রস্থ চা হলো, নিজেই দৌড়ে গি প্যাকেট ভর্তি কাজু বাদাম, ছোলাভাজা আর মশলামুড়ি নিয়ে এলেন। রাত দশটা পর্যন্ত আড্ড চলল। গাড়ি ছিল ভদ্রলোকের, নিজেই চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁকে।

অনেকদিন পর্যন্ত ভবতোষ জানতেই পারেন নি যে ইনি এদের সত্যিকারের কো সম্পর্কিত মামা নন, লাবণ্যর বন্ধুর মামা। পরে ধীরে ধীরে সব শুনেছিলেন তিনি। লাবণ্য বাবার মৃত্যুর পরে যে তারা কী ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় পড়ে গিয়েছিল বলতে বলতে গলা বন্ধ হ এসেছে লাবণ্যর।

সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক যখন মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান, তাঁদে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ নগণ্যই থাকে। থাকার মধ্যে কলকাতা শহরে বাড়ি ছিল একটি ঠাকুরদার বাড়ি, কিন্তু ভদ্রমহিলার শোকতাপ আর লাবণ্য বাবলুর নাবালকত্বের সুযোগে

ড় তাদের কাকা বিক্রী করে দিলেন। সামান্য কিছু টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু তার মেয়াদ আর দিন। বাবার সঞ্চয় আর সেই টাকা মিলিয়ে প্রথমটায় মন্দ চলছিল না, তারপর সবই লানিতে ঠেকল। আই. এ. পরীক্ষা দিতে পারেনি লাবণ্য, তার আগেই চাকরি নিতে হয়েছিল। ান এক কারখানায় প্যাকিং বাক্সে কাঁটা ঠুকতে হতো দিবারাত্র, কিন্তু অসুখ করে সে চাকরীও াছে মাস কয়েক আগে। তা ছাড়া মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী, ঐটুকু ছোট একটা ভাই, সারাদিন ন্নাবান্না কাপড় কাচা বাসন মাজা লেখানো পড়ানো এসব করে শরীরও আর দিচ্ছিল না। বাৎ যদি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা না হয়ে যেত, হয়তো না খেয়েই মরতে হতো। ইনি যে করেন তাদের জন্য, কোন তুলনা হয় না।

শিবতোষবাবুর কথা বলতে বলতে লাবণ্য উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। ভালোবাসা ভক্তি আর তজ্ঞতায় ছলছল ক'রে ওঠে তার গলা।

ভবতোষবাবুও কৃতজ্ঞ বোধ করেন বৈকি! ভদ্রলোককে তাদের মত করেই তিনিও ালোবেসে ফেলেন।

ভবতোষের সঙ্গে পরিচয় হবার ছ'মাসের মধ্যেই আয়ু শেষ হয়ে এলো লাবণ্যর মা'র। নি বুঝতে পারলেন ডাক এসেছে। অসহায় ছেলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে দুই চোখে তার বন নামল। তারপর কোন এক সন্ধ্যায় ভবতোষকে কাছে ডাকলেন। তিনি নিজের শীর্ণ তের মুঠোয় তাঁর পুষ্ট হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, 'ভবতোষ মরবার আগে জেনে যেতে ও, আমার অবর্তমানে লাবণ্যকে তুমি ভাসিয়ে দেবে না।' ভবতোষ রায় ভেজা গলায় লেন 'এসব আপনি কী বলছেন, আপনি শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবেন। শিবতোষবাবু লেছেন কালকেই তিনি হার্ট স্পেশালিষ্ট ডক্টর অধিকারীকে নিয়ে আসবেন।' মহিলা হাসলেন। র্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বুঝতে পারি না পূর্ব জন্মে শিবতোষ আমার কে ছিল। আর এই বতোষকে দেখে দেখে দুঃখ আমার উন্মুখ হয়ে আসে, ঈশ্বর যে নিষ্ঠুর নন, তা উপলব্ধি রে যেন ঈশ্বরকেই পাই। কিন্তু শিবতোষের এই চেষ্টা বৃথা। তার দিদির দিন শেষ হয়ে সেছে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি, মৃদু গলায় বললেন, 'লাবণ্যকে তোমার হাতে দিয়ে াতে পারলে আর আমার কোন ভাবনা থাকে না, বাবলুর জন্য চিন্তা করি না, জানি বতোষই তাকে মানুষ করে তুলবে। শুধু তুমি যদি আমার মেয়েকে অযোগ্য না ভাবো—।'

ুপ করে থেকে ভবতোষ বললেন, 'আপনার এ ইচ্ছে স্বার্থক করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। কিছু ভাববেন না আপনি, কিছু ভাববেন না।'

ভবতোষের হাতের পাতায় এবার গাল রাখলেন তিনি, অস্ফুটে বললেন, আমার বাবা, র মানিক—'

আদরে অভ্যস্ত নন ভবতোষবাবু। তার মায়ের স্বভাবে কোমলতা কম, ভাষায় মধুরতা । বিশেষভাবে ভবতোষের সঙ্গে সম্পর্কটা তাঁর শুধুই দেনাপাওনার, কাজেই এই বিগলিত স্নেহের জায়গাটা অনেক আগেই শক্ত হয়ে গেছে, এই উচ্ছ্বাসে তিনি বিচলিত হলেন, তাঁর পেল। আর তখুনি তিনি মনোস্থির করলেন,আর দেরি নয়, এঁর মৃত্যুর আগেই লাবণ্যকে বিয়ে করবেন, যতো ক্ষণিকের জন্যই হোক, এই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ স্বাদ তিনি সঞ্চয় রাখবেন হৃদয়ে।

'আরে এই যে, এই যে থামো থামো—'

চিন্তা করতে করতে কখন গন্তব্য ছাড়িয়ে এসেছেন বুঝতেই পারেননি। তাড়াতাড়ি ে পড়লেন ট্যাক্সি থেকে, এদিকে ওদিকে তাকালেন। ঈশ, কতো অন্যরকম হয়ে গেছে পাড় কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কোন বাড়িটাতে ছিল ওরা। এই তো, এই গলিটাই তো।' ক এসেছেন, কিন্তু চিনতে পারছেন না কেন? তখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ছিল জায়গাটা। একটা এবড়ো খেবড়ো মাঠ ছিল পাশে। বৃষ্টি হলেই জল জমতো, কাদা হতো, সেই ডিঙিয়ে এসে সন্তর্পণে কড়া নাড়তেন তিনি বাড়ির দরজায়। সেই সব গেল কোথায়?

বিশাল এক দোতলা বাড়ির সামনে এসে তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মনে হ একটা চাঞ্চল্য উঠেছে বাড়িটার মধ্যে। দারোয়ান এবং কর্মচারী জাতীয় কয়েকজন লোক ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, বাড়ীর ভিতরকার বাগান, বারান্দা লন, পরিষ্কার কর' লোকজনেরা—তাকিয়ে দেখলেন তিনি। বুঝতে পারলেন আশেপাশের দুটো তিনটে বাড়ি ' মাঠটা কিনে নিয়ে সেই পুরোনো বাড়িটার সঙ্গে মিশেল দিয়ে তবে এই রাজপ্রসাদ গ উঠেছে। কে কিনে নিল বাড়িটা? বাড়িটা না বলে পাড়াটাই বলা উচিত।

লাবণ্যরা যখন এখানে থাকতো, এটা ব্লাইন্ড লেন ছিল। বড় রাস্তা থেকে নির্জন গলি ঢুকে ডানহাতি তিনখানা বাড়ি পেরিয়ে শেষ বাড়িটি ছিল তাদের। আর ঐ তিনখানা বা মাঝখানে যে মাঠটা ছিল সেটা পাড়ার বাচ্চাদের খেলার মাঠ, ভৃত্যদের ময়লা ফে আস্তানা। বর্ষার জল জমে ব্যাঙ ডাকত, মশা হতো, পচা গন্ধ বেরুত।

কিছু নেই, কিছুই নেই। সামনের মাত্র একখানা বাড়ি রেখে সেই মাঠ ঘাট নিয়ে তৈ হয়েছে এই বিশাল বাড়ি।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই ভবতোষবাবুর। যা দেখতে এসেছিলেন খুব ভাল ক দেখা হল, কবে, কোথায় কোন ধূলোয় মিশে গেছে সেই ছোট বারান্দা, বারান্দার আ যেখানে মোড়া পেতে মুখোমুখি বসে আকাশের তারা গুণেছেন, উনুনে চাপান ভাতের টগ শব্দ শুনেছেন। লাবণ্য উঠে গিয়ে চা করে এনেছে, জল গড়িয়ে এনেছে, নড়ে চড়ে সংসা সমস্ত কাজ একা হাতে সাঙ্গ করেছে। ভবতোষবাবু পলকহীন হয়ে তাকিয়ে দেখেছেন ত দেখতে দেখতে অসহ্য আবেগে ভরে উঠেছে হৃদয় মন।

শেষ পর্যন্ত সবই তো স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়। সেই ছোট্ট বারান্দাটিই বা তার ব্যতি হবে কেন?

হতাশ হৃদয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন আবার। সময় নেই, শীগ্‌গির স্টার্ট দাও। দেখলেন তিনি আর তারপরই কী শুনে চকিতে হয়ে কান খাড়া করলেন।

মস্ত গাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক নামলেন গেটের কাছে, তিনি ফুল নিয়ে এসে দারোয়ান দৌড়ে এসে গেট খুলে দিল।

ব্যস্ত হয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কোন খবর এসেছে?'

'হ্যাঁ জি।'

'কী। কী খবর।'

'সোরকার বাবু ট্রাঙ্ককল করিয়েছে।'

'কী বলছেন?'

'মা জি বহুৎ অস্থির হো গিয়া, আভি তো থোরা থোরা ভালো ভি আছেন।'

'তা হলে আসছেন?'

'হাঁ?'

'কবে তা কিছু বললেন?'

'পেলেইন রিজার্ভ হোবে, তোবে ভি আসবেন। সে কাল ভি হতে পারে, পরশু ভি হোতে ারে, আজও ভি হতে পারে—'

'ঠিক আছে।' দ্রুতপায়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি।

ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা কতগুলো লোক জটলা পাকাল, 'তা হলে ঠিকই শুনেছি, কী লিস?'

'স্পেশাল টেলিগ্রাম বেরিয়েছে যে।'

'রাজেন আমাকে সবিস্তারে বলেছে সব।'

'তা হলে এখন আউট অফ ডেঞ্জার,!'

'আমি মানত করেছি।'

'ভাল না থাকলে আর আসছেন কী করে?'

'জ্ঞান হতেই নাকি বলেছেন, কলকাতা আসতে চান। আরে বাবা, হাজার হোক বাঙালী ময়ে, ওই বম্বেতেই থাকুন আর বিলেতেই থাকুন, দেশের উপর টান যাবে কোথায়?'

'জানিস, পাঁচ বছর আগে কিনেছেন বাড়িটা।'

'বাড়িটা আবার কোথায় কিনলেন, বানালেন তো। পাশে একটা মাঠ ছিল, তারপরে আরো টো বাড়ি ছিল, সবগুলো কিনে নিয়ে ভেঙে তারপর আবার নতুন করে—'

আবার ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লেন ভবতোষ রায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন লাকগুলোর কাছে। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'এ বাড়িটা কার?'

লোকগুলো তাঁর অনভিজ্ঞতা দেখে অবাক হলো। চোখ কুঁচকে বলল, 'কোথা থেকে াসছেন বলুন তো?'

'মফঃস্বলের নিশ্চয়ই' একজন টিট্‌কিরি দিল একটু।

অন্যজন বলল 'নেমপ্লেট দেখছেন না? অনুশ্রী দেবীর বাড়ি।'

'অনুশ্রী দেবী? উনি তো বম্বেতে থাকেন, অসুস্থ—'

'কিন্তু বম্বেটা ওর দেশ নয়, তিনি আমাদেরই গৌরব, বাংলাদেশের মেয়ে। শেষ ইচ্ছে কাশ করেছেন, কলকাতা নিজের দেশে এসে এই বাড়ীতেই তাঁর যা হবার হোক।'

'তা হলে উনি আসছেন?'

'একটার সময় টেলিগ্রাম বেরিয়েছে, কিনে নিন গে, সব খবর পাবেন।'

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তারা আবার নিজেদের মধ্যে নিজেদের আলোচনায় নিমগ্ন হল।

ভবতোষবাবুও আর দাঁড়ালেন না, উঠে এলেন ট্যাক্সিতে, আবার এয়ার পোর্টের দিকে টতে ছুটতে ভাবতে লাগলেন, কী করা উচিত। কলকাতাতেই বসে অপেক্ষা করবেন না ম্বেই চলে যাবেন।

মফঃস্বলে থাকেন, একদিন পরে কাগজ যায়, সব বাসি খবর। একদিনের ব্যবধানে গৎসংসারে কত কি না ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু স্পেশাল টেলিগ্রামটা কোথায় পান? সেটা একবার দেখা দরকার। অবিশ্যি কাগজের বক্রীর জন্য এই ধরণের টেলিগ্রামগুলো প্রায়ই মিথ্যে খবরে ভরা থাকে। কিন্তু কাগজের

খবরে যাই থাক, রানী আসবেন বলে রাজপ্রাসাদে যে চাঞ্চল্য তিনি নিজের চোখে দেখে এলেন সেটা তো মিথ্যে নয়।

তাহলে বাড়িটা অনুশ্রী দেবী কিনে নিয়েছেন? ঐ বারান্দাটা আছে কী? সেই ছোট বারান্দাটা!

বারান্দাটা! বারান্দাটা কেন থাকবে? যে বারান্দা লাবণ্যর ছিল, সেই বারান্দার মূল্য অনুশ্রীদেবীর কাছে কী? তিনি কতোবড়ো একজন অভিনেত্রী, সারা ভারত জোড়া তাঁর কতো নাম, সারা বাংলা জোড়া তাঁর কতো দান, ঐ একটা একতলার এঁদো ঘরের সামনে এক এঁদো বারান্দার খবর তাঁর বড় বড় হিসেবের কোন কোণেই লেখা থাকতে পারে না।

কিন্তু ঐ বারান্দাতেই লাবণ্যর মায়ের মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছিল, ঐ বারান্দার ফাটা চটা সিমেন্টের উপর গড়িয়ে লাবণ্যরা দুই ভাইবোন কেঁদেছিলো। একদিন দু'দিন নয় মায়ের জন্য জড়াজড়ি করে দুই ভাইবোন আরো অনেকদিন ধরে কেঁদেছিল।

শিবতোষবাবুই শান্ত করেছিলেন শেষে। সেই সময়ে একাধারে তিনিই মা তিনিই বাপ আর তিনিই বন্ধু হয়ে রক্ষা করেছিলেন ঐ অসহায় ভাইবোন দু'টিকে! না, ভবতোষ কিছুই পারেন নি, কিছুই করেন নি, শুধু গিয়েছেন আর এসেছেন আর ভেবেছেন।

শিবতোষবাবু বেশীর ভাগ সময়টাই ওদের সঙ্গে কাটাতেন। এক বুড়ি ঝি রেখে দিয়েছিলেন দিন রাত্রির জন্য, খুব ভাল ছিল সেই স্ত্রীলোকটি। কী মিষ্টি ব্যবহার ছিল, কি স্নেহভারা হৃদয় ছিল। লাবণ্যকে যেন ঘিরে রাখত মা হয়ে।

সেই সময়ে লাবণ্য ভাবতোষবাবুর দিকে চোখ তুলে তাকাতো না, তাকালেই জলে ভরে যেতো চোখ। তার অভিমান হয়েছিলো। বেদনাহত হয়েছিল ভবতোষবাবুর ব্যবহারে। সে কল্পনাও করতে পারেনি, এতোবড়ো বিপদের দিনে ভবতোষ এমন চুপ করে থাকবেন। বিয়ের কথা এড়িয়ে গিয়ে কেবল আসবেন যাবেন আর আলাপ করেই জিইয়ে রাখবেন সম্পর্কটাকে। লাবণ্য মেয়ে। সে আর কেমন করে উত্থাপন করে? মায়ের মৃত্যুশোকের চেয়ে ভবতোষবাবুর এই অদ্ভুত ব্যবহারের বেদনাও তাকে কিছু কম কষ্ট দিত না।

কিন্তু কষ্ট কি ভবতোষবাবুও পেতেন না? পেতেন। খুব পেতেন। যাকে দিনে রাত্রে বুকের মধ্যে ভরে রাখতে ইচ্ছে করতো তাকে দূর থেকে দুটি কথা নিক্ষেপ করলেই কি হৃদয় শান্ত হতে পারে? অবিশ্রান্ত তিনি লাবণ্যকে স্ত্রী হিসেবে পাবার বাসনায় চকিত হয়ে থাকতেন। তাঁর ভিতরকার অন্ত্রীতন্ত্রী যেন ছিলে পরানো ধনুকের মত টান টান হয়ে থাকত। প্রত্যেকদিন প্রতিজ্ঞা করতেন যা হয় হবে, মা যত রাগ করেন করবেন কিন্তু এর একটা হেস্ত নেস্ত করবেন তিনি, যতো তাড়াতাড়ি হয় বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসবেন লাবণ্যকে, তাঁকে রক্ষাণাবেক্ষণের সমস্ত ভার গ্রহণ করে ধন্য হবেন।

লাবণ্যদের বাড়ি থেকে ফিরবার পথে সারাটা রাস্তা মনকে সজুত করতে করতে আসতেন, কিন্তু বাড়িতে ঢুকে মায়ের মুখের দিকে তাকালেই সব কেমন গোলমাল হয়ে যেত। মায়ের পরিচ্ছন্ন সাজসজ্জা হাসি পরিপাটি আঁচড়ান চুল—হঠাৎ গুটিয়ে যেতেন তিনি। মনে হত থাক, আর কয়েকটা দিন থাক, নিজের সুখকে না হয় পিছিয়ে দেয়া যাক আর কয়েকটা দিন। মায়ের মুখের এই সুখ এই হাসি মুছে নিতে ইচ্ছে করত না তাঁর।

সেই সময়ে তাঁর উপার্জন তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল। খুব ভাল ভাল তিনটা টিউশনি য়েছিলেন। স্কুলের মাইনে আর সেই টিউশনির টাকা মিলিয়ে বেশ মোটা অঙ্ক তিনি তাঁর য়র হাতে ধরে দিতেন। একটা পাই পায়সাও রাখতেন না নিজের কাছে। দরকার মত চেয়ে তন। সেই সময়ে মায়ের মেজাজ প্রসন্ন ছিল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসার যাত্রা তাঁর ন্দের সঙ্গে নির্বাহিত হচ্ছিল। সাদা ধবধবে ফরাস ডাঙার ধুতি পরে খাটো হাতের ব্লাউজ য় দিয়ে পায়ে শান্তিনিকেতনী চটি গলিয়ে মেয়েদের সঙ্গে সিনেমায় যেতেন তিনি। মেয়েরা য়ে দামী শাড়ি পরত। ঠোঁটে নখে রং লাগাত, পাউডারের ঘণ প্রলেপে আসল রং লুকিয়ে ত। পরিতোষ সিগারেট খেত, শিস দিত, ধোপদুরস্ত শার্ট প্যান্ট পরে মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে স্তোরায় গিয়ে চা খেত।

ভবতোষকে ভাঙিয়ে সেই সময়ে বেশ সুখে ছিল তারা। ভীরু ভবতোষ, মেরুদণ্ডহীন াপুরুষ ভবতোষ আধা ময়লা শার্ট আর ধুতি পরে লাবণ্যর কাছে যেত আর আসত। যেতে াসতে রোজ যে ক'টা পয়সা বাস অথবা ট্রাম ভাড়া খরচ হতো সে ক'টা পয়সা মায়ের কাছে চেয়ে নিতে লজ্জায় মাথা কাটা যেত তাঁর। অপরাধ বোধ হতো মনে মনে।

বয়েস ছিল তার আটাশ। কিছু কম নয়। বিয়ে করতে চাওয়াটা অন্যায় নয়, তিনি যদি াও চান মায়ের দিক থেকেইতো কথাটা ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু মা সে রাস্তা মাড়াতেন না। াছে ছেলে কিছু বলে বসে বা করে বসে তার জন্যই কান খাড়া করে সবাধান হয়ে থাকতেন।

শেষে একদিন শিবতোষবাবু শক্ত হাতে হাল ধরলেন। বোঝা গেল, বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ভবতোষকে নিয়ে নিজের বড়িতে এলেন।

টালিগঞ্জ গঙ্গার কাছাকাছি তাঁর সুন্দর ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি। একা থাকেন, ঠাকুর াকর নিয়ে সংসার। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই স্ত্রী মারা যান, তারপর আর বিয়ে করেন নি। সেটা অবিশ্যি অতীত যুগের কথা, কেন না সেই ঘটনার পরে প্রায় সতেরো বছর কেটে গেছে এবং সময়ের স্রোত শোকের গ্লানি অনেক আগেই ধুয়ে দিয়েছে। তবুও সেই মুছে যাওয়া ানুষটার স্মৃতিটুকু লালন করতে বোধহয় ভাল লাগত তাঁর, মনে করতে ভাল লাগত যে তনি এখনও তাকে তাঁর হৃদয়ে অনন্যা করে রেখেছেন। যদি পরপার বলে কিছু থাকে, যদি আত্মা বলে কিছু থাকে তা হলে পরপারের সেই আত্মা তাঁর স্বামীর এই একনিষ্ঠতা দেখে নিশ্চয়ই তৃপ্ত হবেন। শিবতোষবাবু বলতেন, জীবনের কতটুকু আর সে ভোগ করে গেছে? সুখ দুঃখ আলো ছায়া ভরা এই জগতের কতোটুকু সে দেখেছে? ফুটতে ফুটতেই তো ঝরে গেল মানুষটা। কে জানে, স্বামীর বিশ্বস্ততাই হয় তো পূর্ণতা দেবে তার আত্মাকে।

আসলে এখন আর বিয়ে করার কথা ভাবেনই না শিবতোষ ভট্টাচার্য। ঐ একটা ধাক্কাতেই সে ইচ্ছে তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে। এতদিন এক বিধবা দিদি ছিলেন সংসারে, মায়ের বাড়া ছিলেন সেই দিদি। বছর কয়েক আগে মারা গিয়ে তাঁকে একেবারেই মুক্ত পুরুষ করে দিয়ে গেছেন।

কিন্তু নতুন জালে জড়িয়েছেন এই লাবণ্যদের নিয়ে। লাবণ্য আর বাবলু। ওদের মাকে দিদি ডেকে যেন নিজের দিদিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। আর তাঁর মৃত্যুর পরে লাবণ্য আর বাবলুর অসহায় অবস্থা তাকে নতুন বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেছে।

সুন্দর ড্রইংরুমটি। সারাঘরে টুকটুকে কার্পেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরামের আসন, দেয়ালে ছবি। শিবতোষবাবুর ঘরে বসে চারদিকে তাকিয়ে ভবতোষ শিবতোষবাবুর রুচি এবং অ দুইয়েরই মাপটা অনুমান করে নিতে চেষ্টা করেছিলেন সেদিন।

শিবতোষবাবু তাঁকে চা খাওয়ালেন, সিগারেট এগিয়ে দিলেন, একথা ওকথার অনেক প গম্ভীর গলায় বললেন, 'কি স্থির করলে?'

ভদ্রলোকের গলাই সেদিন গম্ভীর ছিল না, চেহারাও থম থমে দেখাচ্ছিল, চোখের স্থি দৃষ্টি দিয়ে তিনি বিদ্ধ করছিলেন ভবতোষকে, অন্তরের ছবিটা দেখে নিতে চাইছিলেন।

রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ভবতোষ, কেঁপে গিয়ে বলেছিলেন, 'কী বিষয়ে।'

'তুমি কি বিয়ে করবে, না করবে না?'

'বিয়ে।'

'হ্যাঁ বিয়ে। বলছি লাবণ্যর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী?'

'আপনি তো জানেন।'

'না জানি না, কিন্তু আমার জানা দরকার।'

এবার স্পষ্ট গলায় ভবতোষবাবু জবাব দিয়েছিলেন 'আমি খবু শীগ্‌গিরই তাকে বি করব।' এ কথাটা যে তার মুখ দিয়ে কেমন করে বেরিয়েছিল, কী সাহসে বেরিয়েছিল তিনি জানেন না। কিন্তু এটাই ছিল তাঁর একান্ত মনের কথা। শিবতোষবাবু সে কথায় একপল বিচলিত বা আশ্বস্ত হলেন না। তেমনি গুরু গম্ভীর গলায় আবার প্রশ্ন করলেন, 'সে শীগ্‌গিরটা তোমার কবে?'

'একটু সুবিধে হলেই—'

'কিসের সুবিধে?'

'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমার বাবার সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই প্রতিপালন করতে হ

'জানি। কিন্তু এ-ও জানি তোমার ভাইবোনেরা সকলেই যথেষ্ট বড়, নিজেদের ভার নিজে না নেবার মতো কেউই ছোট নেই।'

। তারা—'

'তোমার উপরেই থাকে।' ভবতোষবাবুর নিঃশব্দ মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বাঁ হাতে ধ সিগারেটের টিনের উপর ডান হাতের সিগারেটটা ঠুকতে ঠুকতে পাদপূরণ করছিলে ভবতোষ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'তারা লেখাপড়ায় কেউ ভালো না।'

'ক'টি ভাইবোন?'

'পাঁচজন।'

'নিশ্চয় তুমিই বড়।'

'হ্যাঁ।'

'তারপরে?'

'ভাই।'

'তার বয়েস কত?'

'তেইশ।'

'কী করে?'

'বি. এ. পড়ছে।'

'তেইশ বছর বয়সে সে বি. এ. পড়ছে? কতবার ফেল করেছে?'

ভাইয়ের অকৃতকার্য্যতার অসম্মান যেন তাঁর নিজেরই অসম্মানের মত মনে হল, অন্যের মুখের ঠাট্টাটা হজম হল না। একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সবাই লেখাপড়ায় সমান হয় না।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে। বোনেরা?'

এখানে ভবতোষবাবুর লজ্জা। তারাও এ বিষয়ে পরিতোষের চেয়ে কিছু উন্নত স্তরের নয়। চুপ করে থেকে বললেন, 'বড়টি ম্যাট্রিক পাশ করে আর পড়ল না। পরের দুজন একসঙ্গে ম্যাট্রিক দিচ্ছে।'

'তুমি তো অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেছ, টিউশনি করে ভাইবোনদের খরচ জুগিয়েছো, দেখা যাচ্ছে তোমার আদর্শে তারা খুব বেশি অনুপ্রাণিত হয়নি। তা যাই হোক নিজেদের খরচটা নিজেরা চালাবার মত অন্তত সৎবুদ্ধি আছে নিশ্চয়ই। কী বল?

ভবতোষ জবাব দিলেন না।

'কে ক'টা টিউশনি করে বলো তো?'

'কেউ করে না।'

'করে না!'

'না।'

তাহলে কী করে চলে? এতটি ভাইবোনের পড়ার খরচ—।'

'আমি চালাই।'

শিবতোষবাবু অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, 'এরপর থেকে যার যার খরচ তাদের নিজেদের চালাতে বলবে বুঝলে? এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয়। এভাবে প্রশ্রয় দিলে তারা কোনদিনই তোমার কষ্ট বুঝবেনা, মানুষ হবে না। এটা ভালোবাসা নয়, শত্রুতা। আর তা ছাড়া, মাতৃ-ভক্তিরও একটা সীমা থাকা উচিত, বিদ্যাসাগরেরও ছিল। এটা জেনো, মায়েরও তাঁর সন্তানের উপর অনেক দায়িত্ব আছে, সেগুলো পালন করা তাঁর ধর্ম। কিন্তু তোমরা কোন পক্ষই তা করছ না। থামলেন শিবতোষবাবু। সিগারেট ধরালেন। খেলেন যতটুকু ফেললেন তার চেয়ে বেশি। সেই আগুনেই আর একটি ধরিয়ে বললেন, জানি, অন্যের পারিবারিক ব্যাপারে কোন তৃতীয় ব্যক্তির কোন মন্তব্য শুধু অভদ্রতাই নয়, রীতিমত অন্যায়। কিন্তু তোমাকে ভালবাসি, আর তার চেয়ে বেশি ভাবি মেয়েটার কথা। শোন, যদি মনে করে থাক তোমার এইসব পারিবারিক দায়িত্ব এড়িয়ে, তোমার বিয়ে করার মত অবস্থা হওয়া সহজ নয়, অথবা মা অনুমতি না দিলে তুমি এক পা নড়বে না তা হলে ওকে তুমি কষ্ট দিও না, তুমি দেখা কোরো না ওর সঙ্গে। আমি ভেবেছি ওদের দু' ভাইবোনকে আমার কাছেই নিয়ে আসবো, লাবণ্যকে আবার ভর্তি করে দেব কলেজে। পড়াশুনো করুক, আস্তে আস্তে ভুলে যাবে সব।'

স্টেট এক্সপ্রেসের টিনটি এগিয়ে দিলেন তিনি, 'একটা নাও। বাড়ি গিয়ে ভেবে দেখ, সাতদিনের মধ্যে কথা চাই।'

সেই একবার, একবার মাত্র তিনি জ্বলে উঠেছিলেন, তার ভিতরকার ভেজা বারুদে একবার মাত্র অগ্নিস্ফুলিংগ ছিট্‌কে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে মায়ের বিরুদ্ধে সত্যিই

সাতদিনের মধ্যে স্থির করে ফেলেছিলেন মন।

লজ্জিত হয়ে লাবণ্য বলেছিল, 'মামার কথায় তুমি কিছু মনে করো না। মামা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, আমার কষ্টটাই তিনি বড় করে দেখেছেন।'

ভবতোষ রায় উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'আজ ফাল্গুন মাসের তেরো তারিখ আর সতেরো দিন বাকি আছে মাসের, এই সতেরো দিনের মধ্যে সবচেয়ে কাছের তারিখটাই আমাদের বিয়ের তারিখ হবে। আমি শিবতোষবাবুর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব এই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি তিনিই তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমার জীবনে এগিয়ে আনলেন বলে।

লাবণ্য মুখ নীচু করল। ভবতোষবাবু খুব কাছে সরে এলেন, নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন তার হাত, নিঃশ্বাস বড় বড় হল, বুকটা ধ্বস ধ্বস করল, আস্তে ছেড়ে দিয়ে রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আর পারছি না ছেড়ে থাকতে।'

সব শুনে মা বললেন, 'কী; নিজের বিয়ে তুই নিজে করছিস? এত তোর স্পর্দ্ধা? আমাকে তোর গ্রাহ্য নেই? সব ঠিক করে শেষে জানাতে এসেছিস?' ঠাণ্ডা গলায় ভবতোষবাবু বললেন, 'আগেও জানিয়ে-ছিলাম, তুমি কান দাওনি।'

ক্রুদ্ধ মাতা গলার স্বর চড়িয়ে প্রায় প্রতিবেশীদের চকিত করে তুললেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাইবোনেরাও টিকা টিপ্পনিতে কম গেল না। তাদের মনে এই ভয়ই প্রবল হয়ে উঠেছিল, বিয়ে করলে বৌ এলে শুধু যে তাদের একজন অংশীদারই বাড়ল তা নয়, নির্বিরোধে যে মানুষটা কলুর বলদের মত বোঝা বয়ে যাচ্ছে সে না হঠাৎ মানুষ হয়ে উঠে নিজের সুখ দুঃখের দিকেও তাকাতে শিখে ফেলে।

ছেলেকে টলাতে না পেরে মা শেষে মরা কান্না তুললেন। 'ওরে তুই এত নিষ্ঠুর তা কে জানত রে। তোকে নিয়ে আমার কত সাধ আহ্লাদ গৌরব ছিল, কত ভেবেছিলাম দেখেশুনে রাঙা টুকটুকে বৌ আনবো। বড়লোক শ্বশুর হবে, মুরুব্বি হবে একজন। এ তুই মা খাগি বাপ খাগি এক কোন হা ঘরের মেয়ে ধরে আনছিস। জাতের ঠিক আছে কিনা তাই বা কে জানে—'

ভবতোষ রায় বড় বড় চোখের সাদা অংশে লাল ছিটিয়ে সোজা তাকিয়ে দেখছিলেন মাকে, এরপরে উঠে যেতে যেতে বললেন, 'বাড়ি বদলাবো, কান্না থামিয়ে গোছগাছ করো।'

যে বাড়িটায় ছিলেন, মাত্র দুটি ঘর আর একটি বারান্দা ছিল তাতে। বিয়ে করলে অবশ্যই আস্ত একটি ঘর তাঁরই দরকার হবে, সুতরাং পাগলের মত বাড়ি খুঁজছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ভবানীপুরেই সুন্দর একটি ফ্ল্যাট পেয়ে গেলেন। মা আর বোনেরা বাড়ি দেখে গেল। মা চোখ টান করে বললেন, 'বাড়ি তো দেখলুম, ভাড়াও শুনলুম, গাছে না উঠতেই কাদি, উঠলে না জানি কী হবে। বৌ আসবে আর তাকে বড়োমানুষী দেখাতে অমনি ফট করে একশো টাকা থেকে দেড়শ টাকার বাড়িতে গিয়ে হাজির হতে হবে। সংসার চলবে কী দিয়ে শুনি?'

মায়ের কথার জবাব দেয়া অনেকদিন ধরেই ছেড়ে-ছিলেন ভবতোষ। একথারও জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। তাছাড়া সময়ও ছিল না। হাজার হোক, একটা বিয়ে তো। সে তো আর মানুষের বারে বারে হয় না? একটু আয়োজন আছে বৈকি! দু'দশ জন বন্ধুবান্ধবকে ডাকতেই হবে। কিছু কেনা-কাটা করতেই হবে। আর সব কিছুর জন্যই টাকার দরকার। টাকাটাও তো তাকেই জোগাড় করতে হবে? সেই ধান্দাতেই তখন বেশি ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

তিন তিনটি অবিবাহিত বোন রেখে বিয়ে করতে সত্যি তাঁর লজ্জা কম ছিল না। মা বারে বারে সেকথা মনে করিয়ে না দিলেও সেকথা ভুলতেন না তিনি। কিন্তু লাবণ্য যে সেই সময়ে

কতো অসহায় হয়ে পড়েছিল তা তিনি কেমন করে মাকে বোঝাবেন?

শিবতোষবাবু হাজারই আপনজনের মত করুন, তবু তো তিনি লাবণ্যর আপন মামা ছিলেন না। আর লোকজনেরা এ কথা কখনোই বিশ্বাস করতে চায় না যে একজন নিঃস্ব পর বিনা স্বার্থে কারো জন্য কিছু করতে পারে। শিবতোষবাবুর মহত্ব, উদারতা, হৃদয়াবেগের অনাবিলতা সবই তারা নোংরা চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিল। অতবড় এবং অত সুন্দর একজন মেয়েকে দেখাশুনো করতে যে কেন শিবতোষবাবু উৎসুক তার কারণ আবিষ্কার করতে বেশি মাথা খাটাতে হয়নি তাদের।

আর তারা নিজেরা! ছি ছি!

লাবণ্য। লাবণ্য। লাবু। আমার লাবু। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

ট্যাক্সির মধ্যে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলেন ভবতোষ রায়।

কবে কেমন করে যে নিঃশব্দে মানুষটিকে নিয়ে একটি মস্ত কালো গাড়ি এসে লক্ষ্মীকুটিরের ভিতরে ঢুকে গেল কাক-পক্ষীটি জানতে পারল না। শোবার ঘরের মস্ত খাটের আরাম বিছানায় আস্তে শুইয়ে দেওয়া হল। পায়ের কাছে, মাথার কাছে দু'জন নার্স খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেবার অপেক্ষায়। যে বড় ডাক্তারটি সঙ্গে এসেছেন, তিনি নাড়ি ধরলেন, হৃদয় দেখলেন, ব্লাডপেশার মাপলেন, খুশি মুখে বললেন, 'অলরাইট।'

দু'জন ছোট ডাক্তার নির্দেশের জন্য তাকিয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে, বিখ্যাত ডিরেক্টার মিঃ ভট্টাচার্য ব্যাকুল স্বরে বললেন, 'সব ঠিক?'

বড় ডাক্তার বললেন, 'কোন ভয় নেই।'

চোখ খুলে অনুশ্রী দেবী বললেন 'জল।' পায়ের তলার নার্স ছুটে মেজর গ্লাসে জল নিয়ে এলো। মুখের কাছে ধরতেই মাথা নাড়লেন অনুশ্রী, কনুইতে ভর দিয়ে মাথা তুলতে চাইলেন।

মিঃ ভট্টাচার্য হা হা করে উঠলেন, 'না, না, না, এখন নয়। একটুও উঠতে দেবো না তোমাকে। এইমাত্র এতবড় একটা জার্নি করে এলে, না না, ওসব হবে না। শুয়ে শুয়ে হাঁ কর জল ঢেলে দেবে।'

'ও রকম করে খেলে আমার তেষ্টা মেটে না।'

'মিটবে। খুব মিটবে!'

'আমি ভালো আছি।'

'সে তো খুব সুখের কথা।'

'তবে উঠতে দিচ্ছ না কেন!'

'আমাকে জ্বালাবে ভয়ে।'

অনুশ্রী দেবী আবছা হাসলেন। মিঃ ভট্টাচার্যও হাসলেন। হাতের উপর হাত বুলিয়ে বললেন 'ভগবানের অনেক দয়ায় চট করে সামলে উঠেছ। যা ভয় পেয়েছিলাম।'

'ভয়ের কী। গেলে তো বেশ হতো।'

'তোমার হতো, আমাদের নয়।'

-'তোমাদের না হোক, তোমার অন্তত হাড় জুড়োত।'

'অসম্ভব। এ হাড় আর জুড়োবে না। কিন্তু এবার বিশ্রাম। আর কথা নয়। ডাক্তার বলেছেন অতি অল্পের উপর দিয়ে গেছে বটে কিন্তু একটু সাবধান থাকতে হবে এবার থেকে। খাবে দাবে ঘুমোবে, ব্যস। আর এই মুহূর্তে আর একটি কথা নয়। লক্ষ্মী মেয়ে।' মাথার চুলে বিলি কেটে ঘর ছাড়লেন তিনি।

নার্স বলল', 'বড় আলোটা নিবিয়ে নীল আলোটা জ্বালিয়ে দেব?'

ক্লান্ত গলায় অনুশ্রী দেবী বললেন, 'তাই দাও। আর শোন, ঘরের ভিতরে অপেক্ষা করবার কোন দরকার নেই, বাইরে যাও, বারান্দায় গিয়ে বোসো, চা খাও, খাবার খাও, বেল তো হাতের কাছেই আছে, আমি দরকার হলে ডাকব, তখন এসো।'

বিনীত স্বরে একজন নার্স বলল, 'একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দেব কি?'

'কিচ্ছু দরকার নেই।'

অন্যজন বলল, 'আমি বরং একটু পা টিপে দি।'

অনুশ্রী দেবী বললেন, 'আমাকে একটু একা হতে দাও আমি ঘুমিয়ে পড়ব।'

কিন্তু ঘুমিয়ে তিনি পড়লেন না, ঘুম তাঁর এল না। একটা ভীষণ আকাঙ্খা কোথায় তাকে নিয়ে গেল। অনেক অনেক দূর ধূ ধূ তাকালেন তিনি, কিন্তু যাদের ভাবতে চাইলেন তারা ধূ ধূ রইল না। পরিষ্কার স্পষ্ট হয়ে চোখের তলায় ধরা দিল। একটি যুবক, আর একটি শিশু। যুবকটির বড় বড় চোখ শ্যামলা রং, ছিপছিপে শরীর। পরনের কাপড় আধময়লা, ঘন চুলগুলো অবিন্যস্ত, পাক খেয়ে খেয়ে এসে কপালে পড়েছে।

ঐ লুটিয়ে পড়া চুলে ভরা কপালের দিকে তাকালেই বুক কাঁপতো একজন মেয়ের। অমন সুন্দর ঠাণ্ডা কপাল আর সে জীবনে দেখল না। বড় ভাল ছিল মানুষটি, বড় বেশি ভাল, বড় বেশি ঠাণ্ডা। সেই ভাল মানুষটির ভালমানুষীর উপরই যত রাগ ছিল মেয়েটির। মনে হত ওর রক্ত কি জল দিয়ে তৈরী? তা কি কখনো গরম হতে জানে না?

আর তাই নিয়ে মেয়েটি কত অভিমান করত, কত দুঃখ পেত, কত রাগারাগি করত। কিন্তু অন্ধকার বিছানায় শুয়ে যুবকটি যখন তাকে টেনে নিত বুকের মধ্যে, চোখে গালে ঠোঁটে অজস্র অজস্র চুম্বনে বিধ্বস্ত করে গাঢ় গলায় বলত,' সোনামণি, রাগ কোরো না, রাগ কোরো না।' তখন সে সব ভুলে যেত। কে তার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছে, কে কটু কথা বলেছে, খাওয়া পরা নিয়ে খোঁটা দিয়েছে কিছু মনে থাকত না।' যুবকটির বুক ভাসিয়ে দিত চোখের জলে, সব বেদনা ধুয়ে যেত।

স্বামীর প্রেমে সত্যিই আত্মহারা ছিল মেয়েটি। তবু সে সইতে পারত না, শাশুড়ি ননদের গঞ্জনা পাগল করে তুলত তাকে। আবার সে কাঁদত, আবার শান্ত হত রাত্রির অন্ধকারে।

অদ্ভুত মানুষ। একদিনও কি তার স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করত না? সে কি জানত না তার স্ত্রী সহ্যের শেষ সীমায় না পৌঁছুলে এমন করে কাঁদত না প্রতিদিন, এমন করে না খেয়ে পড়ে থাকত না বিছানায়।

ভয়, শুধু ভয়। এই বুঝি মা রাগ করলেন, এই বুঝি মা ব্যথা পেলেন, এই বুঝি তাঁর মুখভার হলো। শুধু এই ভয়। মায়ের ব্যথা, মায়ের রাগ, মায়ের মুখভারটাই তার সব? স্ত্রীরটা কিছুই না? তবে কেন বিয়ে করেছিলো? সারা পরিবারকে দিয়ে নিগ্রহ করবার জন্য? মানুষের তো একটা বিবেকও থাকে? ন্যায় অন্যায় বোধও থাকে। হলেনই বা মা। তাই বলে যথেচ্ছাচার করবেন?

স্বামীর মুখ চেয়ে মেয়েটিই বা আর কতো সহ্য করবে? আর কেনই বা করবে? কারো রই কারো অন্যায় করবার অধিকার নেই। আসলে মায়ের ঝগড়া করবার অসাধারণ টাকেই ভয় করতো সে, চিৎকার চ্যাঁচামেচির ত্রাসে সবকিছু এড়িয়ে চলতো। সে জানতো া করেই সে মায়ের কাছে যথেষ্ট অন্যায় করেছে, তার উপরে তার পক্ষ নিয়ে ঠোঁট ফাঁক মাত্রই এমন অনর্থ হবে যে সম্পর্ক আরো জটিল হয়ে উঠবে।

হতোই বা জটিল। এমন সম্পর্ক না থাকলেই বা কী হতো? না, শেষে আর লক্ষ্মীসীতা হয়ে করে থাকতে পারেনি মেয়েটি। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। স্বামী যখন কোনো প্রতিকার বেই না স্থির, তখন আত্মরক্ষা করতে হবে বৈকি। শেষের দিকে একটা কঠিন কথা বলেও পাননি শাশুড়ি, তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করছে সে, আঘাতের বদলে সমানে আঘাত ফিরিয়ে াছে। নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে শাশুড়ি তখন তাঁর মৃত স্বামীকে ঘন ঘন স্মরণ াছেন, যতো শীগ্‌গির হয় নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন, পুত্রবধূটি যে জাত মর ঠিক নেই সে বিষয়ে তার স্ত্রৈণ পুত্রটিকে অবহিত করে, বলেছেন সে কেন এমন স্ত্রীকে ক্ষণাৎ ত্যাগ করছে না। তাতেও তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত হয়নি, না খেয়ে আঁচলে মুখ ঢেকে পড়ে ক—বাড়ির হাওয়া বিষাক্ত করে ছেড়েছেন।

সেই সঙ্গে ননদরাও ভুরু কুঁচকে মনের বিদ্বেষ সরবে উদ্‌গার করেছে। একমাত্র বখা দেওর স্মাৎ একটা অপমানজনক কথা বলে উধাও হয়ে গেছে। আর সেই দুর্বলচরিত্র লোকটি ণব্দে হজম করেছেন সব।

কোনো এক রাত্রে মেয়েটি বললো, 'তুমি কি আমার কথা কিছু ভাববে না বলেই স্থির ছে?'

স্ত্রীর গলার অনমনীয় স্বর শুনে ঢোঁক গিলে সে বললো, 'তোমার কি ধারণা তা আমি বি না?'

'আমার উপর কি তোমার কোনো কর্তব্য নেই?'

'তা কি আমি করছি না?'

'না।'

'তাহলে তুমি কী চাও?'

'আলাদা হতে চাই, আলাদা।'

'আলদা!'

'হ্যাঁ, আলাদা।'

'তা কেমন করে হয়।' শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো সে। মেয়েটি নিষ্ঠুরের মতো বললো, 'সেটা ার জানবার কথা নয়। আমি আর থাকতে পারছি না।'

মুখ নিচু করে ভারি গলায় ছেলেটি বললো, 'আসলে তুমি আর মা একই ধাতুতে গড়া। াকে কষ্ট দেয়াই তোমাদের একমাত্র ধর্ম।'

এ কথায় মেয়েটির দুঃখে ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো। অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে ালে নিয়ে কম্পিত গলায় বললো, 'আমি তোমাকে সেইরকমই গঞ্জনা করি, না?

'তা ছাড়া আর কী। সবাই তোমরা অবুঝ। আমার কষ্টটা কেউ দেখো না।'

'ঠিক আছে, আমি চলে যাব এখানে থেকে, তুমি শান্তিতে থেকো।'

'আর শান্তির দরকার নেই। এইসব ঝগড়াঝাটি দেখতে দেখতে আমার আত্মহত্যা করতে করে।'

এবার গভীর অভিমানে মেয়েটি রুদ্ধস্বর হলো। আর একটি কথা বললো না, শুয়ে পড়া আলো নিবিয়ে।

এই সুখ দুঃখ আশা অশান্তি নিয়েই যে কোথা দিয়ে কেটে গেল একটা বছর! শরীরটা খারাপ চলছিলো তখন। খাওয়ার রুচি ছিলো না, রাত্রে ঘুম হতো না। স্বামী অস্থির হ উঠলেন। ডেকে নিয়ে এলেন মামাকে, মামা ডেকে নিয়ে এলেন বড়ো ডাক্তারকে। রকম স দেখে বৌ'র উপর ছেলের আদর যত্নের ঘটায় আরো রেগে গেলেন শাশুড়ি। ডাক্তার বলে বাচ্চা হবে।

এবার অতি সাহসে ভর করে ছেলে গিয়ে মায়ের কাছে দাঁড়ালো, হেসে সহজ হবার ে করে বললো, 'মা, ডাক্তারের কথা তো শুনলে এবার ওকে একটু ভালো করে দেখাশু করতে হয়। আমি দুধ বাড়িয়ে দিচ্ছি, রোজ যেন অন্ততঃ আধসের দুধ ও খায়।'

মা নিঃশব্দ।

'আর খাটাখাটনিটাও যতো কম হয়।'

মা নিঃশব্দ।

ছেলে চলে এলো ঘরে। জানালায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীকে পিছন থেকে জা ধরলো আদরে। কিন্তু স্কুলের সময় হয়ে গিয়েছিলো, তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে ত ছুটতে হলো। আর সে স্কুলে যাওয়া মাত্রই একগ্লাস ফোটান দুধ নিয়ে এলেন শাশুড়ি, ে টান করে বললেন, 'কই গো নবাবের বেটি, দয়া করে দুধটা খেয়ে নাও, শেষে যেন আ আমার নামে স্বামীর কানে লাগিও না।'

মেয়েটি ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে রইলো শাশুড়ির দিকে। শাশুড়ি গ্লাসটা মুখের কাছে এগি দিলেন, খেয়ে নাও।'

'আপনি রাখুন।'

'না তুমি খেয়ে নাও।'

ফোটানো দুধ কি খাওয়া যায়?'

'খাও বাছা খাও, খেয়ে নিস্তার দাও। তোমার মতো বসে শুয়ে থাকলে তো আমাদের না। আমরা যে তোমার দাসী বাঁদী। কাজ কর্ম তো আছে?'

মেয়েটি শাশুড়ির হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সোজা রান্না-ঘরে চলে গিয়ে কড়াইতে ে রেখে এলো। আর সেইটাকে কেন্দ্র করেই ধূমায়িত আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। ঘরে আর কাক চিল বসতে পারলো না সেই দুপুরে। মায়ের সঙ্গে মেয়েরাও গলা মিলা দেওর রত্নটি পরিপাটি করে সেজেগুজে টেরি বাগাতে বাগাতে চোখ বাঁকিয়ে মন্তব্য কর 'সুখের পায়রা, সুখের পায়রা।'

এতোক্ষণও ধৈর্য্য ধরে চুপ করে ছিলো মেয়েটি' এবার তার রক্ত যেন মাথায় চড়ে উঠ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বললো, 'কী বললে?'

'কিছু না।'

'লেখাপড়া না হয় না-ই শিখেছ, ভদ্রলোকের ছেলে তো? ইতরের মতো ব্যবহারটা এ ছাড়ো।'

দেওরও এবার রুখে উঠলো 'তুমি আমাকে ইতর বলছো?'

'ইতরই তো।'

'আর তুমি বড়ো ভদ্দরলোক, না?' বুড়ো নখ বাড়িয়ে মুখের সামনে এগিয়ে এলেন াশুড়ি, 'কতো ভদ্রলোক তা আমার জানতে বাকী নেই। যতো সব বস্তির মাল এনে ঘরে লেছে, আমি বলে তাই চুপ করে থাকি।'

'আপনি, আপনি সব সময়ে আমাকে এরকম অপমান করবেন না যা তা বলে।' মেয়েটির লা প্রায় বন্ধ হয়ে এলো।

গ্রাহ্য করলেন না শাশুড়ি, বললেন, 'তোমার আবার মান অপমান কী? একটা থিয়েটারের লাকের সঙ্গে তো থেকেছ বিয়ের আগে। তোমার কু-কীর্ত্তির কথা কে না জানে শুনি?'

'আপনি আমাকে যা খুশি বলুন আমার মামাকে কিছু বললে আমি সহ্য করবো না।'

'ও বাবা আঁতে ঘা লেগেছে।' এটা বড়ো ননদের উক্তি।

'তা আর লাগবে না? ব্যাধির চেয়ে যে আধি বড়ো।' এটা শাশুড়ির।

'আপনারা সত্যি অত্যন্ত ছোটো, অত্যন্ত নোংরা।'

'আমরা নোংরা, না? আর তুমি একেবারে গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসী পাতা? ছলা কলা করে তা আমার ছেলের মাথাটা খেয়েছ, ভেবছ ঐ ভেড়াটার মতো আমরাও সবাই তোমাকে ভয় রে চলবো! জিজ্ঞাসা করি তুমি যে আমার ছেলেকে তার বাপ তুলে গালি দিলে তার বিহিতটা ক করবে?'

'হ্যাঁ বিহিত একটা আজ হবে ঠিকই। আপনারা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন অনেকদিন, আমিও াবার সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছি।'

উঃ কী আমার সহ্য রে। খেতে পেতে না, ছুঁচ হয়ে ঢুকেছ সংসারে, এবার ভেবেছ ফাল য়ে বেরুবে। ভেবেছ সোয়ামী বুঝি হাতের মুঠোয়। নিয়ে ভিন্ন হবে। অত সোজা না। এখনো ামার ইচ্ছে হলে তোমাকে আমি তাড়িয়ে ছাড়তে পারি।'

'না, ততোটা শক্তি আপনার নেই।'

'আছে, আছে, আছে, হাজারবার আছে।'

'আমি স্ত্রী, বাড়ির অভিভাবক আমার স্বামী, আপনার হাজার ইচ্ছে থাকলেও আমাকে খান থেকে উচ্ছেদ করা আপনার সাধ্য নয়।'

ধড়াম করে সে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। ফুলে ফুলে াঁদতে লাগলো।

বাইরের কলরোল তখনি থামলো না, আরো অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগলো একটানা। দওরের গলা শোনা গেল, 'ভাবের রাধা বুঝি গোঁসা করে ঘরে খিল দিলেন। সখা, বৃন্দাবন ছড়ে এবার মামার মথুরায় গমন করুন না।'

হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লো মেয়েরা, গড়িয়ে গড়িয়ে বললো, তুই এতো হাসাতে পারিস।'

সারাদিন খাওয়া হলো না মেয়েটির, কেউ ডাকলোও না তাকে।

স্কুল থেকে ফিরে গায়ের জামাটা ব্রাকেটে ঝোলাতে ঝোলাতে শুয়ে থাকা স্ত্রীর দিকে াকিয়ে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলো স্বামী, কপালে হাত রাখলো, মাথার চুলে মুখ রাখলো, নরম লায় বললো, শুয়ে রয়েছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?'

মেয়েটি শক্ত হয়ে পড়ে রইলো। স্বামী তখন কাছে বসলো, চারিদিকে তাকিয়ে সভয়ে চুম্‌ খেল ভেজা চোখের পাতায়, আস্তে ডাকলো, 'সোনামণি।'

এই ডাক শুনে কতো যে কষ্ট হলো মেয়েটির। সত্যি স্বামীর উপর রাগ করা তার বৃথা হঠাৎ মনে হলো কর্মক্লান্ত এই মানুষটাকে আর দুঃখ দিয়ে লাভ নেই। এই মানুষ কখনোই পারবে না তার মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। যে কারণেই হোক, এদের সম্পর্কটা ঠিক স্বাভাবিব নয়।

বিয়ের আগে থেকে পূর্বাপর সব কথা মনে পড়লো তার। মা অনুমতি দিচ্ছিলেন না বলে বিয়ে করতে পারছিলো না এই মানুষ। তার নিজের হৃদয় যে চঞ্চল ছিলো না তা তো নয় মনোনীত মেয়েটিকে কাছে পেতে যে সে উৎসুক ছিলো না তাতো নয়, তার চোখের প্রত্যেকটি পলকপাতে মেয়েটির উপর কী গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেতো তা কি সে অহরহ উপলব্ধি করেনি? দেখা হওয়া মাত্র সারা মুখে যেন আলো ছড়িয়ে পড়তো। অথচ কী এক অদ্ভুত মায়ায় ডাইনীর মতো ঘিরে রেখেছিলো মা তাকে কোনোবকমেই ছাড়াতে পারতো না। অতবড়ো ছেলে, একেবারে মায়ের ইচ্ছের পুতুল।

মামা যদি সেই সময়ে ওরকম একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলে না দিতেন, কে জানে আজ পর্যন্তও সে বিয়ে করতে পারতো কিনা।

নতুন নতুন যখন এবাড়িতে এসেছিলো, এদের মা ছেলের ব্যবহারটা দেখলে যেন মনে হতো একটা অনধিকার প্রবেশ হয়েছে তার। শাশুড়ি নয়, যেন সতীন। হা হুতাশ ঈর্ষা—এতে মন খারাপ হয়ে যেতো! সারাদিনে একবার তিনি ঘর ফাঁকা রাখতেন না, বেশীর ভাগ সময়েই তাঁর ছেলের ঘরে কাজ থাকতো। অন্তত যতোক্ষণ না ছেলে কাজে বেরিয়ে যায়। ঘুরে ঘুরেই ঢুকছেন তিনি, এক ফোঁটা নিবিড় হবার অবকাশ নেই।

রাত্রিবেলাটাও যে একান্ত হবে সে রাস্তাটাও বন্ধ করে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। পাশাপাশি তিনখানা ঘরের, মাঝের ঘরটিতে থাকতে দিলেন তাদের এবং দুপাশের অন্য দুখানা ঘরে সংলগ্ন দুটি দরজাতে যেন পাহারা বসালেন নিজেরা। কিছুতেই দরজা বন্ধ করে শুতে দেবে না। কী অস্বস্তি। নব, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে কি ওরকম হাট করে দরজা খুলে রাখা সম্ভব

মেয়েটি রাগ করতো, বলতো, 'একি ছি! ওরকম শোয়া যায় নাকি?'

স্বামী বলতো, 'অন্ধকার করে দিলে আর কি?'

'তবু দরজা বন্ধ করবে না?'

'মা যখন চাইছেন না—'

'অত্যন্ত বিশ্রী!'

শেষে মেয়েটি মোটা পর্দার কাপড় কিনে টাঙিয়ে দিল। শাশুড়ি বললেন, 'পর্দা দিলে যে

বৌ বললো, 'শোবার ঘরে একটু আব্রু না হলে ভালো লাগে না।'

'কার কাছে আব্রু? শাশুড়ি দেওর ননদ বুঝি সব বাইরের লোক?

'না, তা কেন।'

'দ্যাখো ওসব সাহেবী ঢং এখানে করতে যেয়ো না। মেমেদের মতো লোকলজ্জা ভুলে ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচ আমি বরদাস্ত করবো না।'

তাজ্জব বনে গিয়েছিলো মেয়েটি। মহিলা বলছেন কী? বিবাহিত স্বামী স্ত্রীকেও তিনি আড়াল হতে দেবেন না নাকি? এ কী ধরনের মনোবৃত্তি?

শাশুড়ি সেদিন নিজে হাতে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন পর্দার দড়ি। কিন্তু তক্ষুনি মেয়েটি আবার ঙিয়ে নিয়েছিলো। দৃঢ় গলায় বলেছিলো, 'ওটা থাকবে।'

তখন ফিতে ভরে টাঙিয়েছিলো, পরে মার্কেট থেকে রড কিনে এনেছিলো। স্বামী কেবারে ভয়ে জুজু।

াজ এতোদিন পরে সেই অল্পবয়সী মেয়েটির কথা ভেবে ভেবে উদ্বেলিত হতে লাগলেন নুশ্রী দেবী।

না, মেয়েটিকে তিনি সত্যিই দোষ দিতে পারেন না কিছু আত্মসম্মান জ্ঞান থাকলে ওভাবে াকা প্রকৃতই অসম্ভব কিন্তু তবু তো ছিলেন। তবু তো, এতো, অশান্তিতে তো তার নিজেকে খনো দুঃখী মনে হয়নি, ব্যর্থ মনে হয়নি। কেন হবে। স্বামী তার যতোই ভীরু হোক রুদণ্ডহীন হোক (সাত্য কি সে মেরুদণ্ডহীন ছিলো? ভীরু ছিলো? ঐ একটি জায়গা ছাড়া ার তো কখনো তাকে সে রকম মনে হয়নি!) স্ত্রীকে সে প্রাণতুল্য ভালোবাসতো। কিংবা াণের চেয়েও বেশী।

ন'মাস পরে অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে মেয়েটির মেয়ে হলো একটি। হাসপাতালে ছিলো সেই ময়ে, উদভ্রান্ত স্বামী দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকতো ফুটপাথে, হাসপাতালের দরজায়। পারতো না রে ফিরতে, পারতো না কোনো কাজেই মন দিতে। দেখা করার নির্দিষ্ট সময়ে যখন দেখা তো স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতো সে। তার বড়ো বড়ো চোখে প্রেমের বন্যা য়ে যেতো, তখন মেয়েটি নিজেকে জগতের সেরা সুখী মেয়ে বলে কল্পনা করে ছল ছল করে ঠতো।

বুকের কাছে সন্তান, মাথার কাছে স্বামী, আর তৃতীয় সংসার শাসনহীন পরিবেশের ক্ষণিক লন, সেইটুকুতে হাসপাতালটাকে যেন স্বর্গ মনে হতো তখন।

পুরো দশদিন ছিলো, মনে হচ্ছিলো এই দশদিন কেন দশ বছর হলো না।

কিন্তু বাড়ি এসে আবার যে কে সেই। দু'দিন ভালো কাটে তো তৃতীয় দিন লেগে ওঠে। ময়ের মা হয়ে মেয়েটিরও সাহস বেড়ে গিয়েছিলো তখন। জবাব দিতে সেও কসুর করতো কিন্তু সবচেয়ে রাগ হতো তার ঐ অপদার্থ দেওরটির উপর। ছেলেটা একেবারে রোমাত্রায় বয়ে গিয়েছিলো।

একদিন সেই ছেলেটার একটা কথা শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো তার। কথা রা নিজেদের ঘরে বসেই বলছিলো হঠাৎ কানে এসে তীরের মতো বিঁধলো। সে কথা এতো ৎসিৎ ছিলো, নিজের দাদার স্ত্রীকে যে কেউ ওরকম ভাবে বলতে পারে, ভাবতে পারে তা ল্পনাও করতে পারছিলো না মেয়েটি। সেই মামাকে জড়িয়েই কথা। মামা সেই সময়ে তাদের নেক আর্থিক সাহায্য করছিলেন, তার জন্য অষুধ পথ্য দুহাত ভরে আনছিলেন। সেটাই দের ঈর্ষার কারণ হয়েছিলো বোধহয়।

এতো ঘেন্না করলো যে জবাব দেবার প্রবৃত্তি হলো না। বসে রইলো স্বামীর অপেক্ষায়, নে মনে বললো এর হেস্ত নেস্ত করতেই হবে একটা।

রাত্রির অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধরে রইলো সে। যথারীতি কাজকর্ম খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হলে ে কঠিন হয়ে স্বামীকে বললো। 'শোনো কথা আছে।'

ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুয়ে পড়ে তাকে আদর করতে করতে স্বামী বললো, 'বলো।'

'পরিতোষকে বলে দিও এ বাড়িতে আর তার জায়গা হবে না।'

'কী!' তৎক্ষণাৎ এ পাশে মুখ ঘোরালো স্বামী।

'ফের যদি কোনোদিন আমাকে অসম্মান করে কোনো কথা বলে আমি সোজা ওকে জুতে মারবো।'

'কেন, কী হলো, কী হয়েছে, কী বলেছে?'

'ডেকে জিজ্ঞেস কর না।'

'এখন এই রাত্রে ডাকাডাকি করে সারাবাড়ি জাগিয়ে লাভ কী?'

'লাভ লোকসানের প্রশ্ন নয়, মান সম্মানের প্রশ্ন। আমার জন্য যদি তোমার এক কণা কর্ত্তব্য বোধ থাকে. তা হলে ঐ ছাব্বিশ বছরের বি. এ. ফেল করা বেকার বখা ভাইটিকে কা ধরে এই মুহুর্তে বার করে দাও বাড়ি থেকে।'

স্বামী চুপ করে রইলো। অনেক পরে বললো, 'ওকে ক্ষমা করো।'

'ক্ষমা! কাকে ক্ষমা? সব কিছুই ক্ষমা করা যায় না, উপেক্ষা করা যায় না

'আমি বুঝেছি সে অত্যন্ত গর্হিত ব্যবহার করেছে তোমার সঙ্গে।'

'কিন্তু—কিন্তু—আমি তাড়িয়ে দিলে ও যাবে কোথায়?'

'সেটা ওর নিজেরই ভাববার কথা।'

'জানো, আমার বাবা যখন মারা গিয়েছিলেন—'

'সেই পুরনো কাসুন্দি আর আমি শুনতে চাই না।'

'তবে আমাকে কী করতে বলো?'

একবার পুরুষের মতো দাঁড়িয়ে স্ত্রীর হয়ে দুটো কথা বলতে বলি, রক্ষা করতে বলি। তি বছর হতে চললো বিয়ে হয়েছে, একদিনও কি তুমি আমার কোনো সুখ দুঃখের দিে তাকিয়েছ, আমার অসম্মানে অসম্মানিত হয়েছো? নিজের স্ত্রীকে গোটা পরিবারের দা বানিয়ে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেবল কতগুলো অপদার্থের বেয়াদপির খোরাক জুটো ধান্দা করে বেড়াও আর রাত্রিবেলা শ্রান্ত শরীরে এসে ঘুমোও। আমার দিন কেমন করে কা খোঁজ নাও কখনো?'

'নিই না?'

'না, নাও না। উপার্জনের পাই পয়সাটি এনে মায়ের হাতে উপুড় করে দাও, এটা ি কখনো মনে হয় তোমার যে আমিও একটা মানুষ, আমারও দুটো চারটে পয়সার দরকার হ পারে?'

'মায়ের কাছ থেকে নিলেই পার।'

'পারি না।'

'কেন?'

'তোমার মা'র সঙ্গে আমার সম্পর্ক সুখের হয়নি, তুমি খুব ভালো করেই জানো তি আমাকে কী ভয়ঙ্কর ভাবে অপছন্দ করেন আর আমিও তাঁকে আজকাল সহ্য করতে পারি ন তা ছাড়া তুমিই বা দেবে না কেন?'

'মা জানলে রাগ করবেন, দুঃখ পাবেন।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলো মেয়েটি, স্বামীর উপর বিতৃষ্ণা হলো তার, 'তোমার বিয়ে করা চিত হয়নি, করলেও এই মা ব্যাধি সারিয়ে নেয়া উচিত ছিলো। বোঝা উচিত ছিলো, যে র্তব্য মানুষ শুধু তার স্ত্রীর উপরেই করে থাকে সেটা যতক্ষণ সে তার মায়ের উপরে করে তক্ষণ, আর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না।'

একথা শুনে স্বামীর মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। সে কপালে হাত রেখে চোখ ঢাকলো।

হাতটা টেনে সবিয়ে দিল মেয়েটি, যন্ত্রণা দিয়ে বললো, 'চুপ করে থাকলে চলবে না, মার কথার জবাব দিতে হবে।'

'আমি বড়ো ক্লান্ত।'

'কেন ক্লান্ত? কে বলেছে এই কলুর বলদ হয়ে ঘানি ঘোরাতে?'

স্বামী এবার তার উত্তেজিত স্ত্রীর কোলের উপর হাতটা বিছিয়ে দিয়ে গাঢ় গলায় বললো, ক্ষ্মীটি' শান্ত হও। এসো, কাছে এসো। আমিই তো আছি, কিসের দুঃখ তোমার?'

পাষাণ গলে গেল, কান্নায় উথলে উঠলো মেয়েটি, স্বামীর আকর্ষণে তার বুকের মধ্যে মুখ জে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো, 'তোমার বোনেদের যে বিয়ে হয় না তার জন্য কি আমি দায়ী? মি বস্তির মেয়ে, আমি থিয়েটারের লোকের সঙ্গে বাস করতাম—'

স্বামীর আদরে কথা ডুবে গেল তার।

স্তু এই নিত্যকার অশান্তিতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল মেয়েটির। এমনিতেই বাচ্চা নিয়ে গলদঘর্ম, র উপর সংসারের প্রত্যেকটি লোক তার বিরোধী, একা স্বামীর রাত্রিবেলাকার বুকের আশ্রয় র শেষে তাকে দিনের জ্বালা ভুলোতে পারছিলো না। দেখেশুনে একদিন স্বামী নিজে থেকেই লো, 'তুমি বরং কদ্দিন মামার কাছে গিয়ে থেকে এসো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্ত্রী বললো, 'না না।'

'না কেন। উনি তো কতোদিন থেকে তোমাকে নেবার জন্য অস্থির। তাছাড়া তোমার ইও আসবে বোর্ডিং থেকে—'

'সেটা কিছু সমাধান নয়।'

'সমাধানটা কী, বলো?'

'সেটা তোমারই জানবার কথা।'

'আমি জানি না।'

'ভাইকে ডেকে বলে দাও আর বি. এ. পাশ হবার দরকার নেই, চাকরী বাকরীর চেষ্টা রুক, অন্তত নিজের খরচটা নিজে চালাবার যোগ্য হওয়া তো উচিত। টিউশনি নিক। ওর য়সে তুমি তো ঐ টিউশনি করেই সারা সংসার পুষেছ। আর মাকেও বলো, মেয়েদের শুধু গড়া না শিখিয়ে, আর পরের মেয়ের কুৎসা না রটিয়ে একটু ঘরের কাজকর্ম শেখান, তা না ারেন ভদ্র হতে বলুন। ফেল করে করে ঠোঁটে নখে রং মেখে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে া, যদ্দিন বিয়ে না হয় তদ্দিন কোথাও কোনো চাকরীতেই লেগে যাক না। এতগুলো সাবালক ানুষ বসে বসে একটা লোকের ঘাড় মুচড়ে খাবে, এ যে দেখতেও অতি খারাপ। আচ্ছা উনি

তো তোমারও মা, তোমার কষ্টটা বোঝেন না কেন? আমি না হয় শত্রু, কিন্তু তুমি (ছেলে?'

গালে হাত দিয়ে চুপ করে রইলো স্বামী। মেয়েটি অপেক্ষা করে বললো, 'তুমি এখন নি সন্তানের বাপ হয়েছ, পিতার সন্তান আর কতোকাল টানবে, এবার নিজের সন্তানের ভা(মন্দের দিকে তাকাও, আমার দিকে তাকাও।'

'ওদের কি তাড়িয়ে দেব আমি?'

'মা'র কথা উঠছে না, তাঁর স্বভাব যেমনই হোক, সে দায়িত্ব নিতেই হবে কিন্তু অতোব(বুড়ো বুড়ো ধেড়ে অবুঝ ছেলেমেয়েদের নিজেদের যদি অন্যের ঘাড়ে পড়ে থাকায় কো দুঃখ বা লজ্জা না জন্মায় তা হলে সেই চৈতন্যোদয়ের জন্য দরকার হলে তাদের যার যার ' দেখতে বলতে হবে বৈ কি।'

'মানে?'

'মানে এখন আর তুমি তাদের খাওয়াতে বাধ্য নও।'

'তার মানেই তাড়িয়ে দেয়া।'

'সে তুমি যেমন বোঝ। এটা তো দেখা যাচ্ছে যে ওরা কিছুতেই আমাকে সহ্য কর পারছে না, প্রথম থেকেই পারছে না। তিন চার বছর ধরে হাজার চেষ্টায়ও আমি ওদের ফেরাতে পারলাম না, আর এখন তা চাইও না, এখন ওদের আমার বিষের মতো মনে ' আমার মনে হয় ওরা আমার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না, এই রকম যখন অবস্থা তখন ি একটা সমাধান দরকার বৈ কি। আমি তো আর মরে যেতে পারি না, স্বামী ছেড়ে মা আশ্রয়ে গিয়ে জীবন কাটাতে পারি না? আজ যাবো, কাল ফিরে আসবো। তারপর? ' তাছাড়া সেই ভদ্রলোককেই কি এরা ওদের কদর্য ব্যবহার থেকে নিস্তার দেয়? উনি এক(রীতিমতো সম্মানিত ব্যক্তি। কী ভালোবাসেন আমাদের, কতো করেছেন, আমার কি কো কৃতজ্ঞতার শেষ আছে? আর তুমিই কি জানো না তিনি কতো সহৃদয়, সজ্জন এবং সৎ। ছি ছি, সেই তাঁকে জড়িয়ে বা কতো কথা। এই যে আমি মধ্যে মধ্যে যাই, এক আধ বেলা থে আসি—ঈশ্! উচ্চারণও করা যায় না কতো সব নোংরা কথা বলে। এ সব তুমি দেখেও দেখ না, বুঝেও বুঝবে না, কেবল এড়িয়ে যাবে।'

চিন্তিত হয়ে বসে রইলো স্বামী। মেয়েটি তার মোটাসোটা সুস্থ সবল বাচ্চাটাকে শুই দিল দোলনায়। কোঁকড়া কোঁকড়া মাথাভরা চুলে চুমু খেল নিচু হয়ে, তারপর শো(আয়োজন করতে লাগলো।

চাকর নেই দুদিন থেকে, সমস্ত কাজ মাথার উপরে, দুর্বল শরীরে হাঁপ ধরছিলো তা নির্বাক স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার সে উত্তেজিত হয়ে উঠে বললো, 'সমাধানটা শোন হলে। তোমার সাবালক ভাইবোন চারটিকে ডাক, ডেকে কাজকর্মের চেষ্টা করতে বলো। ব দাও তাদের দাদার এমন অবস্থা নয় যে চার চারটি বেকার স্ত্রী পুরুষকে অকারণে বসি খাওয়াতে পারেন, পরাতে পারেন, সপ্তাহে দুদিন সিনেমা দেখার টিকিট কেটে দিতে পা(তাদের বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে এনে কাপের পর কাপ চায়ের খরচ যোগাতে পারেন।'

স্বামী ভদ্রলোক এবার উঠে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন পায়চারি করতে লাগলো। বোঝা গেল অ লাগছে তাঁর, বোঝা গেল স্ত্রীর কোনো পরামর্শই সে কাজে পরিণত করতে পারবে না। ' লাগলো মানুষটার জন্য কিন্তু তবু সে সেদিন থামলো না; বললো, 'জানি আমার কোনো

দুঃখ কিছুতেই তোমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু যাদের তুমি এতো ভালোবাসো, এতো করো, তাদের মঙ্গলের জন্যই তোমার শক্ত হওয়া উচিত। আর যদি মনে করো তা তুমি পারবে না, কোনোদিনই এই পঙ্ক থেকে আমাকে রক্ষা করবে না, তা হলে ছেড়ে দাও আমাকে, আমি চলে যাই। এদের সংসর্গ আর আমি সহ্য করতে পারছি না।'

'কোথায় যাবে?' এতোক্ষণে বাক্যস্ফূর্তি হলো স্বামীর।

ঝাঁঝিয়ে উঠে স্ত্রী বললো, 'তুমি যদ্দিন ছিলে না আমি কি বেঁচে ছিলাম না? এর চেয়ে অন্ততঃ সুখে ছিলাম।'

এ কথায় রাগ হলো তার, চোখে চোখে তাকিয়ে বললো, 'সেই বেঁচে থাকা এর চেয়ে সুখের ছিলো?'

'নিশ্চয়ই। আর যাই থাক, তার মধ্যে অপমান ছিলো না, ছোটোলোকামি ছিলো না, এমন প্রতিকারহীন অসহায় অবস্থা ছিলো না। অক্ষম। কাপুরুষ।

'বেশ, তা হলে তাই থাকো গিয়ে।'

'এই তোমার জবাব?'

'আর কী জবাব আশা করো?'

'না আশা আর তোমার কাছে আমার কিছুই নেই।'

কথা শেষ করে মেয়েটি আলো নিবিয়ে মাদুর বিছিয়ে রাগ করে মাটিতে শুলো। স্বামী পা ঝুলিয়ে বসে রইলো খাটে, মেয়ে দোলনাতেই ঘুমুতে লাগলো। একটা দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল রাতটা।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতেই মেয়েটি কাউকে কিছু না বলে চলে এলো তার মামার কাছে। স্থির করলো স্বামী যদি তাকে তার পরিবারের এই অত্যাচার থেকে রক্ষা না-ই করেন সত্যি সে আর ফিরবে না।

কিন্তু তা কি পারা যায়? দু'রাত পরেই প্রাণ কাঁদতে লাগলো মানুষটার জন্য। তবু অপেক্ষা করলো, যদি এসে সেধে নিয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয় দিনেও যখন স্বামী এলো না, অভিমানে কান্না এলো তার। মামা বললেন, 'সাত দিনের আগে কিন্তু ছাড়ছিনে।' তখন ভাগ্নির চেয়ে তার নাতনীর উপরই প্রেম বেশী, দৌড়ে গিয়ে বেবি কট কিনে এনেছেন, খেলার সামগ্রীতে ভরে ফেলেছেন ঘর, কাজকর্ম চুলোয় গেছে, সারাদিন বাড়ির মধ্যে বসে আছেন।

স্বামী চতুর্থ দিনে এলেন। মামা শুয়েছিলেন বাচ্চা নিয়ে, সে উপুড় হয়ে পাকা চুল খুঁজছিলো। মামার বয়সই হয়েছে, দেখতে পরিপূর্ণ যুবক, চুল তেমনি ঘন, তেমনি কালো। তারই মধ্যে দু একটা রূপোর রেখা।

আর সত্যি বলতে বয়সই বা এমন কী। পার্টটাই করেন বুড়ো মানুষের।

ঠিক এই সময়েই স্বামী এসে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো। টের পেয়ে মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে, এসো এসো। এ ক'দিন আসনি কেন? আমি কিন্তু বাপু সাতদিনের আগে ছাড়ছিনে।'

মেয়েটির স্বামীকে দেখে নববধূর মতো বুক কাঁপতে লাগলো। নিজেকে সামলে চা আর জল খাবারের বন্দোবস্ত করতে গেল সে। বিপত্নীক মামার সংসারে তার স্বামীকে তারই যত্ন করতে হবে।

কিন্তু সেই রাত্রেই কি স্বামীর একটু ভাবান্তর লক্ষ্য করলো না সে? সর্বনাশের কি সেখানেই সূত্রপাত নয়? তার চারদিনের অনুপস্থিতিতে শাশুড়ি তার কানে কী বিষ ঢেলেছিলো! আর সেই বিষেই কি শেষ পর্যন্ত সব জ্বলে গেলো না?

অভাব। অভাব। আর অভাব। দিনে রাত্রে সারা-বাড়িতে ঐ একটি সোচ্চার অনুভূতি। সংসার করতেন শাশুড়ি, প্রত্যেকটি পয়সা খরচ হতো তাঁর হাত দিয়ে। বড়ো ছেলের রক্ত নিংড়ে তিনি ছোটো ছেলের মর্জি মেটাতেন। মেয়ে তিনটির বিলাসিতার যোগান দিতেন। আর বৌকে আধপেটা খাইয়ে রাখতেন।

সব কথাই কি সব সময়ে বলা যায় স্বামীকে? বিশেষত এই সব খাওয়া পরার কথা। ছেলের সামনে শাশুড়ির অন্য মূর্তি। ভুলেও তার সামনে তিনি কটু কথা বলেননি বৌকে, বরং যত্ন দেখিয়েছেন। সেই যত্নের তলায় যে কী লুকিয়ে রাখতেন তা তার স্বামী কখনো কল্পনাও করতে পারতেন না। শেষের দিকে বরং মায়ের নামে নালিশ শুনতে সে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতো।

অবশ্য বিরক্ত সে জগৎ সংসারের সব কিছুর উপরই হয়ে উঠছিলো। সেই সময়ে প্রায়ই মেজাজ খারাপ থাকতো তার। অমন শান্তমানুষটা খিটখিটে হয়েগেল। সেই সময়ে ছেলের ওপর খুব আদর বাড়লো শাশুড়ির। তিনি যে তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে কী বলতেন, কী করতেন, কেন একেবারে মধু ঢেলে দিতেন ব্যবহারে মেয়েটি বুঝতে পারতো না। যত্ন করে কাছে বসে খাওয়াতেন, গায়ে মাথায় হাত বুলোতেন, চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতেন, আর থম থম করতো স্বামীর মুখ।

সেই সময়ে মেয়েটি মামার কাছে যাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তার আর ভালোই লাগতো না বাড়ির মধ্যে। মনে হতো সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো।

একদিন স্বামী বললেন, 'মামার বাড়ি গিয়ে কী সুখ পাও বলো তো? বাড়িতে তো লোক বলতে ঐ একটি পুরুষ। যদি তার স্ত্রী থাকতো বা ছেলে মেয়ে থাকতো বা তোমার নিজের ভাইটিও থাকতো তা হলেও বোঝা যেতো আকর্ষণটা কিসের। সেই ছেলেটাকেও তো কোথায় কোন দূরে এক বোর্ডিংয়ে রেখে দিয়েছেন ভদ্রলোক। তবু রোজ যেতে হবে?'

বলার ধরনটা ভালো লাগলো না, সে চেয়ে রইলো স্বামীর দিকে, অনেক পরে বললো, 'কিছু অকর্ষণ একটা নিশ্চয়ই আছে।'

স্বামীর মুখে বাঁকাহাসি দেখা গেল, বললো, 'সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু কী তা বোধহয় আমাকে বলা যায় না, না?'

'না।'

'আমাকে গোপন করার মতো কথাও তা হলে তোমার আছে?'

'সকল মানুষেরই থাকে। তোমার নেই?'

'না।'

'তা হলে রোজ রোজ মায়ের ঘরে গিয়ে চুপে চুপে কী শুনে আস?'

'কিছু নিশ্চয়ই শুনি?'

'তা কি তুমি আমাকে বলো?'

বললে কি তোমার খুব ভালো লাগবে?'

লাগুক না লাগুক তোমার বলার ভাগ তুমি বলবে।'

মায়ের সঙ্গে ছেলে কথা বলবে সেটা নিয়ে স্ত্রীর কোনো সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে না, অনাত্মীয় পুরুষের কাছে স্ত্রী গেলে—'

কী।'

কিছু না।'

নিশ্চয়ই কিছু।'

তবে তাই।'

মা বুঝি এই সব বুদ্ধি দেন?'

হাজার হোক, মা, নিশ্চয়ই কু-বুদ্ধি দেবেন না।'

মায়ের সুবুদ্ধির ওপর তোমার আস্থা থাকতে পারে, আমার নেই।'

রেগে মেয়েটি জানালায় দাঁড়িয়ে রইলো গিয়ে, ছেলেটি তোয়ালে কাঁধে স্নান করতে গেল। আছে তার।

ামী স্কুলে গেল, কিন্তু মেয়েটি সারাদিন ভুলতে পারলো না স্বামীর কথাগুলো। ইঙ্গিতটা করে প্রায় দাঁতে কাঁকর পড়তে লাগলো তার। শেষে তার স্বামীও। সে-ও এতো ছোটো ভাবতে পারলো? পারলো।

কেন পারবে না। যার মা ভাইবোন ওরকম সে নিজে আর কী রকম হবে?

সেদিন সারাটা বেলা যে তার কী করে কেটেছিলো, তা শুধু সেই জানে।

বিকেলে স্বামী যখন ইস্কুল থেকে ফিরে এলো, কর্তব্যের কোন ত্রুটি করলো না সে। দিনের মতো সব এগিয়ে দিলো, চা করলো, খাবার সাজালো। কিন্তু একটি কথা বললো আড়চোখে সেটা লক্ষ্য করেছিলো স্বামী। একবার দুবার চেষ্টা করেছিলো কথা বলতে, সে র দেয়নি। দেবার প্রবৃত্তিই হয়নি।

াত্তিরে ও যখন খাট ছেড়ে মেঝেতে মাদুর বিছালো, অন্ধকার হতেই সেখান থেকে কোলা করে তুলে তাকে ছেলেটি খাটে এনে শুইয়ে দিলো। প্রবল বেগে বুকের মধ্যে য়ে ধরে বললো, 'জানি তুমি রাগ করেছো। রাগ করাও তোমার উচিত। আমি একটা লোক হয়ে গেছি, ইতর হয়ে গেছি, চারদিকের যন্ত্রণায় আমার মাথার ঠিক নেই। আমাকে ার শাস্তি দেওয়াই উচিত। কিন্তু এবারের মতো তুমি আমাক ক্ষমা করো। সোনা, এবারের করুণা কর আমাকে।

ুকের মধ্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মেয়েটি, ছেলেটি সারা রাত তাকে আদরে দিল। ভুলতে সময় লাগলো না।

কিন্তু পাথরে ফাটল ধরলে কি আর সে ফাঁক কোনো কিছু দিয়েই জুড়ে রাখা যায়? াকে বিমুখ করবার এই উদ্যত অস্ত্রকে একদিনের জন্যও মা বিরাম দিলেন না। শেষ পর্যন্ত চনি চান তাই ঘটলো!

মধ্যেই তিনি বড়ো মেয়ের জন্য এক সম্বন্ধ স্থির করে ফেললেন। বৌকে এসে ধরলেন, াকা কিন্তু তোমাকে জোগাড় করে দিতে হবে।'

অবাক হয়ে মেয়েটি বললো, 'আমি কোথা থেকে জোগাড় করেদেব?'

আদরে সোহাগে গলিয়ে দিয়ে শাশুড়ি বললেন, 'আমি জানি তোমার পক্ষে কিছু শক্ত না।' আমি বলছি, 'আমার এ অনুরোধ তুমি রাখ। নইলে আমার মেয়ে বলেছে বিয়েই ক না। এই ছেলেটিকে তার খুব পছন্দ।'

'দেখেছে নাকি?'

হ্যাঁ দেখেছে। আমাদেরই দেশের পরিচিত এক ভদ্রলোকের ছেলে। ডাক্তারি পাশ ক ভেবে দ্যাখো কোন রকমে যদি একটা ডাক্তার আমাদের আত্মীয় হয়ে যায় কী সুবিধে। জন্য তো কিছু মূল্য দিতেই হবে?'

'যদি ওরা নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে তা হলে আর মূল্য কী? বিয়ের খরচটুকু সে কোন রকমে নিশ্চয়ই যোগাড় করতে হবে।'

'কিন্তু পাত্রের পরিজনদের যে দাবী আছে অনেক? নগদ তিন হাজার টাকা তাদের দি হবে বৌভাতের খরচেব জন্য। সোনাও পঁচিশ তিরিশ ভরির কমে ওরা রাজী নয়। এক রূপোর বাসন চেয়েছে। তারপরে ছেলের হাতের ঘড়ি, শোবার খাট, লিখবার চেয়ার টে ড্রেসিং টেবিল, আলমারী, ধর গিয়ে সব মিলিয়ে হাজার দশেকের ব্যাপার তো—'

'হা-জা-র দ-শে-ক।' চোখ ছানাবড়া হলো ভদ্র-মহিলার উচ্চাশা দেখে মেয়েটির।

তাকিয়ে থেকে শাশুড়ি বললেন, 'এর মধ্যে হাজার ছয়েক তোমাকে জোগাড় করতে না বললে শুনবো না।'

'আমি কোথা থেকে জোগাড় করবো? যদি আমার কিছু গয়নাও থাকতো তা-ও অ সম্বল থাকতো একটা। কিন্তু তা-ও তো আমার নেই।'

'তোমার নিজের কাছে যে নেই তা তো জানি, তোমার মামা তো দিতে পারেন। অ ধার নেবো! শোধ করে দেবো।'

এবার মেয়েটি বুঝতে পারলো আসল কথাটা। হঠাৎ রাগ হলো তার। উঠতে বসতে ভদ্রলোককে ইনি কী যে না বলেন তার ঠিক নেই, স্বার্থের বেলা দিব্যি অন্য রকম স্বর।

মুখ গম্ভীর করে বললো, 'সে হয় না।'

'কেন হয় না?'

'আপনি খুব ভালো করেই জানেন, এ ধার আমরা শোধ করতে পারবো না।'

'নিশ্চয়ই পারবো।'

'পারবার মতো আমাদের অবস্থা নয়। আর তা ছাড়া যে ছেলে নিজে পছন্দ করে করছে, সে এতো চাইছেই বা কেন? এ ভারি আশ্চর্য।'

শাশুড়ির চেষ্টাকৃত কোমলতা কঠিন হয়ে উঠলো, রুষ্ট স্বরে বললেন, 'তোমার কাছে সবই আশ্চর্য! সবাই তো আর আমার ছেলের মতো মুর্খ নয় যে বৌ পেলেই হ্যাংলার ড্যাং ড্যাং করে বিয়ে করতে ছুটবে? মান সম্মান সকলেরই আছে।'

'তা হলে আমার মতে এখানে আপনার সম্বন্ধ ঠিক করা উচিত নয়। কী করে এতো খরচ করবো আমরা? একটা মানুষের মাস্টারির আয় কতোটুকু যে ডামাডোল বাজিয়ে হাজার টাকা খরচ করে সে বিয়ে দেবে?'

শাশুড়ি মুখ বাঁকালেন, 'ডামাডোল তো বাপু কম বাজাতে দেখিনা রাতদিন, পরের না নিজের টাকা তারও তো কোনো প্রমাণ পাই না। বেশ তো দু হাতে খরচ পাতি চলে। উপকার করতে হলেই চোখ খাড়া।'

ঝাপটা মেরে চলে গেলেন তিনি। বোঝা গেল যে কোন ছুতো ধরে একটা আগুন লাগাবেন। লাগান, তবু সে কক্ষণো তার মামার কাছে ননদের বিয়ের টাকা চাইতে পারবে না। কেন চাইবে? একি সহজ টাকা নাকি? ছ'হাজার দিলেই কি। আর চার হাজার কে দেবে? তা ছাড়া কিছুদিন আগে তার স্বামী বেশ ভালো একটি সম্বন্ধ এনেছিলেন। ছেলেটি লেখাপড়া জানে, সেক্রেটারিয়েটে ভদ্ররকমের চাকরী করে একটা, মা বাপ নেই, ঝামেলা কিচ্ছু নেই, টাকা কড়ি নেয়াটাকে বর্বরতা মনে করে। দোষের মধ্যে দেখতে ভালো না। নাক সিঁটকে মা মেয়ে সাত হাত দূরে গিয়ে বসলেন। আরে বাবা, অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা? না, কক্ষণো এ সবে প্রশ্রয় সে দেবে না। সে তো দেবেই না, স্বামীকেও বারণ করবে।

এমনিতেই তার স্বামীর শরীরটা যেন ভেঙে পড়ছিলো খাটুনিতে। উদয় অস্ত সংসার চালাবার দায়িত্বে আর ভালোমন্দ থাকছিলো না কিছু। একটু যত্ন দরকার, পথ্য দরকার, শান্তি দরকার। কোথায় সে সব? এই ভূতের হাটে তা হবারও উপায় নেই। সে মনে মনে ভাবছিলো, মামাকে বলবে পূজোর ছুটিতে কাছে পিঠে কোথাও গিয়ে থাকার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে। অনেক চেনা আছে, তাঁর অনেক ভক্ত আছে। আর তাঁর জন্যেই সে নিজেকে প্রস্তুত করছিলো দরকার মতো যাতে মামার কাছে দু'একশো টাকা চাইতে পারে। এমন একটা প্রয়োজনেও চাইতে যেখানে লজ্জা, সেখানে সে ননদের বিয়েতে ছ'হাজার টাকা দান খয়রাত করতে বলবে? আর মামার হাতে অত টাকা আছে নাকি? একলা মানুষ পাঁচভূতে লুটে খায় তার সংসার। নইলে এক একটা ছবিতে তিনি তো কম রোজগার করতেন না! বাংলা দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর ডিরেকটার তিনি। তাঁর ছবি কখনো মার খায়নি। কত নাম, কত সম্মান!

মামার সঙ্গে তার প্রথম আলাপের দিনটি মনে পড়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পরে কিছুদিন তারা কাকার বাড়িতে ছিলো। কাকিমা অকথ্য খারাপ ব্যবহার করতেন, উঠতে বসতে খাওয়া পরার খোঁটা দিতেন, আর কাকার সঙ্গে ফন্দি আঁটতেন কী করে বাড়ির অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করে বিক্রীর সমস্ত টাকাটাই নিজেরা নিতে পারেন। মা'র শরীর সেই সময়ে খুব খারাপ ছিলো, বিছানা ছাড়তে পারতেন না, একটা ডাক্তার দেখানো দরকার ছিলো, কে দেখাবে? মেয়েটি দিন রাত মনে মনে ভগবানকে ডাকতো আর বলতো আমার মাকে ভালো করে দাও, আর আমরা এভাবে থাকতে পারছি না। হয়তো ভগবান তার সে প্রার্থনা শুনেছিলেন বলেই দেখা হয়ে গেল এই মামার সঙ্গে।

মেয়েটি এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যেত মাঝে মাঝে, মন যেদিন বেশী খারাপ হতো সেদিনই চলে যেতো, গিয়ে বন্ধুকে মনের কথা বলে হালকা হতো। সেদিনও তেমনি গিয়েছিলো; দেখলো একজন ভদ্রলোক বসে বসে খুব মজার মজার গল্প করছেন, সকলে ঘিরে বসে শুনছে। তাকে দেখতে পেয়ে বন্ধুটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'আয়, আয়, একটু আগে আমি তোর কথাই বলছিলাম। আমার একজন মামা। মস্ত ফিলম্ ডিরেক্টর। এতদিন বম্বে ছিলেন, এখন বাংলা দেশে থাকবেন বলে এসেছেন। কী মজা। শোন, আমরা না একদিন স্যুটিং দেখতে যাবো, কেমন?' 'স্যুটিং! স্যুটিং কী রে?' 'স্যুটিং জানিস না? ঐ যে ফিলম্ ওঠে। ছবি, ছবি। যাবি?'

হাত ধরে টানতে টানতে বন্ধুটি তাকে তার মামার কাছে এনে বসিয়ে দিল। হাসি খুশি মামা তাকিয়ে দেখলেন তাকে, সেও মামাকে দেখলো। বোধহয় সেইদিনই অদৃশ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেল তারা।

দিন কয়েক পরে মামা বললেন, 'তুমি কোনোদিন অভিনয় করেছ?

ঘাড় হেলিয়ে মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ, কতো। স্কুলে রাজা রাণী করেছি, ডাকঘর করেছি লক্ষ্মীর পরীক্ষায় ক্ষিরি ঝি করেছি।'

শুনে মামা খুব পিঠ চাপড়ে দিলেন।

তারপর একদিন নিয়ে গেলেন স্যুটিং দেখাতে। গেলো অবিশ্যি লুকিয়ে। কাকা কাকিমা জানলে কি আস্তো রাখবেন নাকি? আর মাকে জানানো মানেই সকলের জানা। তা ছাড়া বাবলুটা নাচবে না?

মেয়েটির বন্ধু একদিন দুপুরে তাকে খাবার নিমন্ত্রণ করে এলো, বলে এলো একেবারে বিকেলে চা খেয়ে ফিরবে। এটা ফাঁকি দেয়ার কৌশল। সারাদিন খাটতে হতো গাধার মতো একদিন একবেলার অনুপস্থিতিও কাকিমার পক্ষে কম ক্ষতিকর ছিলো না কিন্তু এদেব উপরে ওঁরা বেশী কথা বলতে সাহস পেতেন না। কেন না বন্ধুর বাবা কাকার আপিসের বড়োবাবুর শালা ছিলেন।

মামা তাদের নিয়ে একেবারে সোজা স্টুডিওতে এলেন। বিরাট এক বাগানবাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকতেই বুক কাঁপছিলো মেয়েটির। ঘুরে ঘুরে দেখলো সব। কত ফুল, কত ফলের গাছ শনে ছাওয়া গোল ঘর, মস্তবড়ো মাছভরা পুকুর—মোহিত হয়ে গেল। মামা বললেন, 'এবার ফ্লোরে এসো।'

একটা বিয়ে বাড়ির দৃশ্য ছিলো! মামা হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, 'ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে নাকি?' আর এক ভদ্রলোক বললেন, 'এসো এসো, খুব ভালো হবে।' সত্যিই শেষ পর্যন্ত শট নেবার সময়ে ঢুকিয়ে নিলেন তাদের। সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত বুকে দুই বন্ধু দাঁড়ালো গিয়ে। মামা আবার তাকে একটু প্রমিনেন্ট করারজন্য একটা শাঁখ হাতে দিয়ে দিলেন। ঝাঁকের সঙ্গে হাসলো, একা হয়ে শাঁখ ফুঁকলো আর একতলা থেকে দোতলায় ছুটলো। এই হলো পার্ট—। বেশ হলো। উঠে গেল ছবি। শুধু তাই নয়, মজুরী পেল পঞ্চাশ টাকা। দুই বন্ধুই পেলো।

সেই পঞ্চশ টাকা হাতে নিয়ে সে কেঁদে ফেলেছিলো। তারপর সেই পঞ্চশ টাকাতে মায়ের ডাক্তার ডাকা হলো ওষুধ এলো, ভাইয়ের শার্ট প্যান্টও হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে বন্ধুর দুরসম্পর্কের মামা তার নিজের মামা হয়ে গেল।

তারপর থেকে মামা তাদের জন্য কী না করেছেন। সেই কাকার বাড়ি থেকে যখন বাড়ি বিক্রীর টাকা ক'টা হাতে নিয়ে আলাদা হয়ে চলে এলো, মামাই বাড়ি খুঁজে দিলেন। তাঁর চাকরী যোগাড় করে দেয়া, বাবলুর পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করা, রুগ্ন মায়ের চিকিৎসা, তাঁর মৃত্যু, মৃত্যুর পরে রক্ষণাবেক্ষণ, মেয়েটিকে বিয়ে দেয়া—এর কি কোনো তালিকা আছে? বাবলুটা তো তার কাছেই মানুষ হলো। এমনই অদৃষ্ট যে বিয়ে হয়েও একটামাত্র মাতৃহীন ভাইয়ের ভার সে নিজে নিতে পারলো না। কী করে নেবে? স্বামী অবিশ্যি বলেছিলেন, নীলাঞ্জনের দায়িত্ব আর তোমার মামার উপর চাপিয়ে দরকার কী? আমরাই তো আছি।

আমরা! আমাদের আবার স্বাধীনতা আছে নাকি, আমরা কি আর মায়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে এ সংসারের কুটো গাছ নাড়াতে পারি? পারি না। মেয়েটি খুব ভালো করে জানতো, ঐ সংসারে তার সম্পর্কিত কিছুই তিনি টিকতে দেবেন না। তাই সে সব প্রস্তাবও কোনদিন করেনি। অতএব মামার কাছেই রইলো। কিন্তু মামা কখন বাড়ি থাকেন আর থাকেন না ঠিক

ছে কিছু? মাসের মধ্যে দশদিন তো বাইরে বাইরে স্যুটিং; দেখবে কে বাবলুকে? রেখে লেন দামী বোর্ড়িংয়ে। খরচও তাঁরই।

মামা মানুষ নন, দেবতা। এখন শাশুড়ির প্ররোচনায় সে কি সেই মানুষকে ছলনা করে র ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে ননদের বিয়ের টাকা আদায় করবে? না, কক্ষনো না। তাদের ন্য মামা যা করেন সেই লম্বা হাত সে এই সংসারের কতগুলো অপদার্থ মানুষের জন্য ড়াতে দেবে না। দিলে তার অধর্ম হবে। আর একজন মানুষ এতো অবুঝ, এতো হৃদয়হীন বনই বা কেন? কেন তিনি তাঁর অবস্থা ভুলে গিয়ে মেয়ের বিয়েতে দশহাজার টাকা খরচের ন্দাবস্ত করে বসে থাকবেন? এ অন্যায়, ঘোর অন্যায়।

মেয়েটি মনে মনে স্থির করলো, শীগ্‌গির একদিন গিয়ে মামাকে বলে আসবে তিনি যেন র কক্ষনো তাদের বাড়িতে না যান। যে বাড়িতে তাঁর সম্পর্ক নেই, যে বাড়ির লোকেরা র নিন্দা না করে জলগ্রহণ করেন না, সে বাড়িতে আসবেন কেন তিনি? হ্যাঁ, একবার গিয়ে মাকে এদের মনের ভাবটা খুলেই বলতে হবে। শাশুড়ি এসে যে মিষ্টি কথার ডালা খুলে জেই টাকাটা ধার চাইবেন না তার ঠিক কি? এ ধার যে কোনোদিন শোধ করবেন না এটা নেই চাইবেন তিনি। তারপর কাজ হাসিল হয়ে গেলে আর চিনবেন না। আর মামা দিতে রুন, চাই না পারুন, টাকা টাকা করে যে গলদঘর্ম হয়ে ঘোরাঘুরি করবেন তা-ও মেয়েটি নে।

তা ছাড়া অন্য কারণেও একবার যেতে হবে মামার কাছে। একটা কাজ চাই, এ ভাবে আর াছে না। যতদিন একা ছিলো, তবু চলছিলো কোনোরকমে। এখন একটা বাচ্চা হয়েছে, কতো ছু ইচ্ছে হয়, সাধ হয়। অথচ তার জন্য একটা সাবান কিনতে হলেও শাশুড়ির মুখাপেক্ষী। ইতে হবে পয়সা। এ জন্য স্বামীর উপরই তার অভিমান হয়। মা রাগ করবেন, মা অসন্তুষ্ট বন, মা দুঃখ পাবেন, এই তার কথা? স্ত্রীর রাগ অভিমান দুঃখ বেদনার যেন কোনো মূল্য ই? রাগ অভিমানের কথাই বা কেন? প্রয়োজনের দিকটাও তো দেখতে হবে। এ ভাবে শূন্য তে থাকতে পারে মানুষ? বাধ্য হয়েই সে মামার কাছ থেকে দু পাঁচ টাকা নিয়ে আসে। শুড়ির কাছে চেয়ে নেবার চাইতে সেটা সহজ। কিন্তু মান সম্মানের প্রশ্নটা তো ভুলে গেলে ল না?

অবিশ্যি এই মুহূর্তে কাজটা সে তার স্বামীকে নিয়ে বাইরে কোথাও চেঞ্জে যাবার কথা বেই চেয়েছিলো। মামা বলেছেন সে রকম সুবিধে মতো কিছু হাতে এলেই জানাবেন। হয় া ভুলে গেছেন, হয় তো তেমন জরুরী বলে ভাবেন নি, তাই একটা তাগাদা দিতে যাবার থা ভাবছিলো।

কিন্তু তার আগেই হৈ হৈ করে তিনি নিজেই এসে হাজির হলেন। লরি ভর্তি জিনিসপত্র। ব্যাপার? না, বাচ্চার কট এসেছে, আরাম কেদারা এসেছে একটি—মেয়েটির স্বামী ব্যস্ত াকুল হয়ে উঠলো জিনিষ পত্র দেখে।

'এ সব—মানে এ সব কেন?'

'কেন আবার ব্যবহারের।' দরাজ গলা মামার; আসলে জিনিষগুলো কিনে খুব খুশি, 'বিয়ে রে মেয়ে তো এ বেলা যান, ও বেলা আসেন। মাঝে গিয়ে চারদিন থেকে মিছি মিছি মায়া ড়িয়ে এলো। নতুন মানুষটা নিয়ে গিয়ে নতুন করে আমার বাড়ি খালি করে দিয়ে এলো। ব তার জন্য আনা। কটটা তো তখুনি কিনেছিলাম, আলমারীটাও কিনে ফেললাম ভাবলাম

মা মেয়ের দুজনেরই সুবিধে হবে। ভেবো না, ভেবো না, মেয়ের বাপের জন্যও এনেছি। এই আমার কেদারাটা তোমার। তুমি স্কুল থেকে এসে বসবে।' মাথার আঁচল টেনে শাশুড়ি এসে দাঁড়ালেন, মুখে একটি অর্থপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু ভুল হলো শিবতোষবাবু ওটিতে আমার ভবর আর বসা হবে না কখনো, ও আপনার বসবার জায়গাই আপনি নিয়ে এসেছেন।'

'কেন? কেন?'

'নিজেই ভেবে দেখুন। আমাদের ঘরে সময়ে অসময়ে এসে আপনারই বসতে কষ্ট হয় আমার ছেলে আর কতটুকু থাকে বাড়িতে? আর সে যখন বাড়িতে থাকে আপনি তো আর তখন আসেন না আজ কার মুখ দেখে উঠেছে ছেলে তাই রোববার দিন এ বাড়িতে এলেন

মামা বুঝলেন না, কিন্তু মেয়েটি এ কথার একটা প্রচ্ছন্ন ইংগিত তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো।

মামা হাসলেন, 'তা যা বলেছেন, বিয়ে করিনি অথচ দেখুন আপনার বৌমা আমাকে কেমন সংসারী বানিয়ে ফেলেছে। রাতদিন সেই চিন্তা সেই ভাবনা। হতভাগ্য আর কাকে বলে।'

'তার চেয়ে বলুন যে যেমন ভাগ্য চায়। পরের মেয়ে পরের বৌ দায় দায়িত্ব নেই একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট, অথচ পাওয়া যায় সবই। কী বলেন?'

'ঠিক। ঠিক।'

'তবে আর বিয়ে করে কোন মূর্খ।'

মেয়েটি রাগে লাল হয়ে স্বামীর দিকে তাকালো। চোখ সরিয়ে নিল স্বামী। আর সেই মুখে মেয়েটি যেন কিসের ছায়া দেখে কেঁপে উঠলো।

আসলে খাট আলমারী নয়, মামা সুখবর নিয়ে এসেছেন একটা। মেয়েটির কাজের খবর মাত্র দু'মাসের কাজ কিন্তু টাকা পাবে প্রচুর। ঘরেঘরে মামাই শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন, কি শক্ত পার্টও নয়। তার উপরে খুব ছোট্ট পার্ট। জমিদারের আদরিণী মেয়ে, জোর করে অন্যে সঙ্গে বিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করায় বিষ খেয়ে মরে যাবে! মাত্র এইটুকু।

রাত্রিবেলা স্বামী বললো, 'তা হলে তুমি সিনেমায় নামছো?'

মেয়েটি বললো, 'কেন, তোমার মত নেই?

'তাতে কি তোমার কিছু যায় আসে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তা হলে আগে আমাকে জিজ্ঞেস করনি কেন?'

'জানতাম তুমি অরাজী হবে না।'

'এ রকম জানাটা দেখছি খুব সুবিধের।'

সরল গলায় মেয়েটি হেসে বললো, 'বারে, সেই যে একবার ভীড়ের দৃশ্যে নেমে পঞ্চা টাকা পেয়েছিলাম, তোমাকে তো বলেছি, মনে নেই? শুনে তুমি বললে, একবার একজ নায়িকার পার্ট করো না মামাকে বলে। আমি বলেছিলাম, 'অভিনয় করতে আমার ভালে লাগে না, আর মামারও তেমন আগ্রহ ছিলো না।'

'এখন বুঝি মামার খুব আগ্রহ হয়েছে?'

'মামার আবার আগ্রহ কী, আমি বলেছি তাই।'

'তুমি যা বলবে তাই বুঝি মামা শুনবেন?'

'হ্যাঁ, মামার উপর আমার যথেষ্ট অধিকার আছে, জোর আছে।'

'আর নিজের স্বামীর উপর কিচ্ছু নেই, না?'

'না। এ বাড়িতে আমি তো একা তোমার স্ত্রী না, তোমাদের পরিবারের সকলের স্ত্রী, লের অধীন।'

'তা মামাই তো সেটা পুষিয়ে দিচ্ছেন।'

'দিচ্ছেনই তো, মামা না থাকলে সত্যি আমি টিকতে পারতুম না।'

স্বামীর গায়ে হাত রাখলো মেয়েটি, ছলছল হয়ে বললো, 'তুমি কি কখনো আমার দিকে কাও?'

স্বামী চুপ করে রইলো।

'শোন।'

'বলো।'

'আমি ভাবছি কি, তোমার একটু বিশ্রাম দরকার।'

'হুঁ।'

'টাকা টাকা করে কি খাটতে খাটতে শরীরটা ভেঙে ফেলবে?'

'সেই জন্যই নিজে রোজগারের কথা ভেবেছ?'

'তোমাকে নিয়ে আমি চেঞ্জে যাবো। কী চেহারা হয়েছে দেখেছো আয়না দিয়ে?'

স্ত্রীর চোখে চোখে তাকালো স্বামী, 'সত্যি আমার কথা ভেবেই কি তুমি এ কাজটা নিতে ছো?'

'তা ছাড়া আর কী? তুমি সারাদিন খেটে খেটে মরে যাবে আর আমি চেয়ে চেয়ে থবো—'

'তা নয়—'

'কী তা নয়।'

'তার জন্য অস্থির হয়ে এ কাজ নিতে চাওনি তুমি।'

'তবে কী জন্যে?'

'ঘর সংসারে তোমার মন টিকছে না, আমার মতো গবীব স্বামীকে বিয়ে করে তোমার প্ত হচ্ছে না।'

চুপ করে থেকে মেয়েটি বললো, 'আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো? আজকাল যেন মন ব্যবহার করো তুমি! কেবল বাজে বাজে কথা বলো।'

'তা হলে কাজটা তুমি নেবে?'

'মাত্র দু'মাসের কাজ, অথচ টাকার অঙ্কটা লোভনীয়। আমি ভাবছি কি জানো, এই কাজের াস আমি মামার ওখানেই থাকবো।'

'ওখানে কেন?'

'এঁদের আমি জানাতে চাই না।'

'এঁরা কি জানবেন না।

'জানবেন। পরে। ততোদিনে কাজ শেষ হয়ে যাবে আমার। তোমার মা ভাইবোনদের আর তোমার অজানা নেই? উঠতে বসতে আমাকে বাপান্ত করবেন। আর কী কুৎসিৎ মন, সন্দেহ—জঘন্য।'

'কেউ যখন কিছু ভাবে বা বলে নিশ্চয়ই তাদেরও একটা পয়েন্ট অব ভিউ থাকে।'

'সকলের থাকে না। অন্তত তোমার মা ভাইবোনদের নেই। এঁরা কদর্য কথা ভালোবাসেন বলেই বলেন। আমার কোনো ব্যবহার এঁদের পছন্দ নয় বলেই বলেন।'

'যে ব্যবহার ওদের পছন্দ নয় সেটা না করলেই হয়।'

'আমি গরু ভেড়া নই, আমার নিজেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে।'

'তা নিশ্চয়ই আছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে কে কাকে কী বলতে পারে। তবে, ও ধারণাগুলো যে সবই অর্থহীন তাও তুমি বলতে পার না।'

'পারি না? একশোবার পারি। ওরা আমাকে সব সময় মামাকে জড়িয়ে কথা বলে, নোংরা ভাবতে পার? উনি যে যখন তখন আসেন সেটা পর্যন্ত ওদের সয় না।'

'বাড়ীতে যখন ওদেরও কিছুটা অংশ আছে তখন সেটাও তো মান্য করতে হবে?'

'মানে?'

'হাজার হোক, ঐ প্রৌঢ়া মহিলা আমার মা, ঐ চারটি ছেলে মেয়ে তোমার কাছে যত অপদার্থ হোক, আমার তারা ভাইবোন, তারা যদি কারো যখন তখন আসা পছন্দ না-ই ব তা হলে সেটা তোমার বন্ধ করা উচিত।'

'এ সব তুমি কী বলছো?' মেয়েটি থমকে গেল। নিজের মনের আয়নায় স্বামীর মনটা যেন এতোদিনে পরিষ্কারভাবে ধরতে পারলো।

স্ত্রীর ভঙ্গি দেখে কথাটা শুধরে নিলে স্বামী, 'মানে আমি বলছিলাম মা যখন তো মামাকে পছন্দ করেন না—'

'না, তিনি আর কখনো আসবেন না এ বাড়িতে।'

স্বামীর কথার পাদপূরণ করে মেয়েটি পাশ ফিরে শুলো। কিন্তু তখুনি যেন একটা অ যন্ত্রণায় উঠে বসলো সে মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় বললো, 'শোন।'

'কী।'

'আমার মনে হচ্ছে এ ভাবে আর চলতে পারে না।'

'কী ভাবে?'

'তোমাদের কারো সঙ্গেই আমার কোনোদিকে কোন মিল নেই। তোমরাও আমাকে প করো না, আমিও তোমাদের করি না। যে সব কথা আমি অত্যন্ত ছোটো বলে ভাবি সে কথাই তোমাদের কাছে সহজ সত্য।'

স্বামী চুপ করে রইলো।

'এই শিবতোষ ভট্টাচার্য্য নামে মানুষটির বিষয়ে তোমার মা বা ভাইবোনদের কথা ত তুলবো না, কেননা তাঁকে বিচার বিশ্লেষণ করার মতো শিক্ষা বা উদারতা কোনোটাই তা নেই। কিন্তু তুমিও যখন তা থেকে ব্যতিক্রম নও তখন আমার মনে হচ্ছে যে আগুন লাগা জন্য তোমার মা বদ্ধপরিকর, তা সত্যিই লেগে গেছে। এবং তা আর নিববে না।'

মাথা নিচু করে ঈষৎ লজ্জিত গলায় স্বামী বললো, 'আমার নিজের শিবতোষবাবু বিষয়ে কান ইয়ে নেই, তবে আমি বলছিলাম—'

'দু'টো রাস্তা খোলা আছে শান্তি পাবার।' স্বামীর কথায় কান দিল না মেয়েটি, 'হয় আমাকে ত্যাগ করো, নয় ওদের ত্যাগ করো।'

'এ পরামর্শ তো চার বছর ধরেই শুনছি।'

'এবং চার বছর ধরেই তা অগ্রাহ্য করে আসছো, এই তো?'

'যা সম্ভব নয় তা অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় কী?'

'উপায় তোমার নেই, আমার আছে।'

'এতোদিনে জেনেছো সে কথাটা?'

'জেনেছি। জেনেছি যার জন্য সব সহ্য করা যায় সে-ও ঐ এক ঝোপেরই বাঁশ। সুতরাং আর কারো মুখ চেয়ে এই পরিবারের পায়ের তলায় আমি পিষ্ট হবো না।'

'হচ্ছো বুঝি?'

'হ্যাঁ, হচ্ছি।'

'ওটা তোমার ধারণা, তুমি যথেষ্ট স্বাধীন।'

'ভালো। তা হলে সেই স্বাধীন সত্তা থেকেই তোমাকে জানিয়ে দিই, আর একদিন একবেলাও আমি ওদের সঙ্গে থাকবো না।'

'আমার সঙ্গে?' তীর্যক চোখে টিটকিরির ভঙ্গিতে তাকালো স্বামী।

'তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছো?'

'না।'

'তবে?'

'জানতে চাইছি কী তুমি চাও।'

'অনেকবার বলেছি, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।'

'এ বাড়ির চেয়ে মামার বাড়িটা কি বেশী সুখের হবে?'

রুষ্ট হয়ে মেয়েটি বললো, 'তোমার মতো মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের ঘর করার দুঃখের চেয়ে আর সব ঘরই সুখের।'

'বেশ তা হলে তাই যাও।'

'তাই যাবো!'

আর এসো না কোনোদিন।'

'কোনদিন আসবো না।' গলা কেঁপে উঠলো মেয়েটির। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে খাট থেকে নামলো সে, মেঝেতে পড়ে রইলো সারারাত।

ঐ মেঝেতে শোয়া পর্যন্তই। সত্যি বলতে আর কী করতে পারে সে? কোথায় যেতে পারে? কে আছে তার? মা নেই, বাপ নেই, একটা বড়ো ভাইও যদি থাকতো!

মামা আছে। মামা তার মা বাপের বাড়া। কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে সে কী বলবে? স্বামীর ঘর ত্যাগ করছি? সে কখনো বলা যায়? বাবাকেই কি বলা যেতো? যেতো না। এ শুধু মেয়েরা মাকেই বলতে পারে। মেয়েদের এই মর্মান্তিক দুঃখে শুধু মা-ই সান্ত্বনা হতে পারে। আর কেউ না। আর কেউ না।

সুতরাং আবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই সংসারের চাকাতেই নিজেকে আবদ্ধ করে ঘুরতে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় রইলো না।

শাশুড়ির জেদই বজায় রইলো শেষ পর্যন্ত। সেই ডাক্তার পাত্রের সঙ্গেই তিনি বিয়ে দিলেন মেয়ের। তবে খরচ অনেক কম লাগলো। কেননা পরে শোনা গেল ঐ নগদ তিন হাজার টাকা পেলে অন্য কিছুর জন্য নাকি আপত্তি নেই তাদের।

তাদের না থাক, ননদের গাল ফুললো। ভিখিরির মতো গিয়ে সে বিয়ের আসরে বসবে না এই তার পণ। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিই তার হাতের চুড়ি, গলার হার, কানের ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিলো তাকে। মামার দৌলতে পাওয়া নিঁভাজ দামী দামী শাড়ি ক'খানাও দিয়ে দিলো সেই সঙ্গে। স্বামী চক্রবৃদ্ধি সুদে অন্যান্য খরচের টাকা ধার করে নিয়ে এলো।

আর বিয়ে চুকে যাবার পরে দেখা গেল খাওয়া পরার টান ধরেছে। দৈনন্দিন বাজার খরচের টাকাটাও জুটছে না ঠিকমতো। এতোদিনে স্বামী একটা চাকরী ঠিক করে এলো ভাইয়ের জন্য। এতোদিনে সে মুখ ফুটে বললো, 'আর আমি পারছি না, এবার নিজে দাঁড়াও।

ঘাড় তেরচা করে পরিতোষ বললো, 'সামনে আমার পরীক্ষা।'

দাদা বললো, 'আর পরীক্ষা দিতে হবে না। আমি কাজ ঠিক করে এসেছি।'

'কী কাজ?'

'আমাদের স্কুলেই খালি ছিলো একটা। বি. এ. টাও পাশ করিসনি, তবু বলে কয়ে—'

'আমি স্কুল মাস্টারি করবো না।'

'কী করবি?'

'ও রকম টিম টিম করে আমার পোষাবে না।'

'কিসে তোমার পোষাবে?'

'আমি পরীক্ষা দেবো।'

'আর ফেল করবো এই তো?'

মা বললেন, 'ফেল তো আর সাধে করে না, এ বাড়িতে কি পড়বার একটা জায়গা আছে

স্বামী রেগে বললো, 'যারা পাশ করে তারা তো সব রাজপ্রাসাদে বসেই করে কিনা—'

নববিবাহিতা ভগ্নি অনুভা বললো, 'ও রকম অপমান করে কথা বলা উচিত নয়।'

ক্রন্দন বিজড়িত স্বরে পরিতোষ বললো, 'তোমারটা খাই বলেই তো এতো কথা? ঠিক আছে, নিজেরটা আমি এবার নিজেই দেখে নেবো।'

'নিবি তো নিচ্ছিস না কেন?'

'এই আমি চললাম।'

'ওরে, কোথায় যাসরে—' তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়ালেন মা, 'তোরা চুপ করে আছিস কী, ধর ধর ধরে ফিরিয়ে আন। এতো দুঃখে কী করতে ছেলে আমার কী করে বসবে—'

নিজেই টেনে আনলেন তিনি। তারপর বড়ো ছেলের উপর একেবারে ক্রুদ্ধ বেড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'বলি যার পরামর্শে তুই বাড়িসুদ্ধু লোক তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছিস, সে তোকে কতোটা পোঁছে তার খোঁজ নিয়েছিস কী?'

মায়ের মুখোমুখি ছেলের শিশুর ভয়, সেটাই তার আসল রোগ। তিনি ধমকে উঠলেই ার সমস্ত সাহস কর্পূরের মতো উবে যায়। হঠাৎ দেয়ালে ঠেসান দিয়ে স্ত্রীকে চুপ করে াড়িয়ে থাকতে দেখেই বোধহয় তার বীরত্ব জেগে উঠলো, মুখে মুখে বললো, 'কারো রামর্শেই আমি কারোকে তাড়াতে চাই না, যা উচিত তাই বলছি।'

'এই উচিত তোর এতোদিন কোথায় ছিলো শুনি? ভেবেছিলাম, একটু আধটু সাবধান করে িয়েই চুপ করে থাকবো। কিন্তু তোমার বৌ যখন আমাদের পিছনে লেগেছে, আমিও আর াড়বো না তাকে। নিজের চক্ষে যা দেখেছি সব বলে দেবো, হাটে হাঁড়ি ভাঙবো আজ। তাতে াদি তোমাদের সংসার ভেঙে যায় তো ভাঙুক।'

'কী, কী দেখেছো তুমি?'

'কী দেখিনি? বলুক, ও নিজে মুখে বলুক কাল সারা দুপুর ও কী করেছে? সাহস থাকে তা বলুক সোয়ামীর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে।'

শান্ত গলায় মেয়েটি বললো, কী 'করেছি?'

'জানো না কী করেছো? মামা এসেছে তাতে দরজা বন্ধ করবার দরকার ছিলো কী শুনি? াবো ডুবে ডুবে জল খাও একাদশীর বাপেও জানতে পারে না।'

'কি সব বলছেন আপনি?'

'কি সব বলছেন আপনি' ভেঙ্গিয়ে উঠলেন শাশুড়ি, 'সত্যি করে বলো তাকে নিয়ে দরজা ুমি বন্ধ করেছিলে কিনা?'

'হ্যাঁ, ভেজিয়ে দিয়েছিলাম।'

'কেন ভেজিয়ে দিয়েছিলে?

'আপনারা অসভ্যের মতো আড়ি পাতেন বলে।'

'শোন্, শোন্ বৌ'র কথা শোন্ তোর। শাশুড়িকে বলছে অসভ্য। কী সভ্য নিজে। আরে াপু, কথা তো বলছিলে মামার সঙ্গে, আড়িই পাতি যাই করি, তাতে তোমার দরজা বন্ধ রবার তো কথা ওঠে না। আর দরজা বন্ধ করেই কি তুমি এতোগুলো লোকের চোখকে াকি দিতে পেরেছো? ঐ লোকটার বুকে তুমি মাথা রাখোনি? সে তোমাকে জড়িয়ে ধরে াদর করেনি?'

'ছিছি'! আরো কতো ছোটো করবেন নিজেকে?

'ছি তোমার চোদ্দোপুরুষকে আর ঐ নটের শালা শিবতোষ ভট্‌চায্ কে। ভেবেছো ্যাবলা স্বামী ভুলিয়ে যা খুশি তাই করে পার পাও বলে, আর সবাইর চোখে ধুলো দেবে?'

কেঁদে ফেললো মেয়েটি, স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার সামনে আমাকে এই রকম অপমান করছে, তুমি কিছু বলছো না?'

চোখটান করে অনুভা বললো, 'তার আগে তুমিই বলো না শিবতোষবাবুর বুকে মাথা রেখে অমন কাঁদছিলে কেন?'

মেয়েটি দুর্জয় বেগে স্বামীর হাত ধরে নাড়া দিলো, 'তুমি কি পুরুষ, তুমি কি মানুষ, তা াদি হও কেমন করে সহ্য করছো?'

হাত ছাড়িয়ে নিঃশব্দে স্বামী চলে গেলো নিজের ঘরে। দ্রুত পায়ে মেয়েটিও এলো সঙ্গে সঙ্গে, চীৎকার করে বললো, তা হলে তুমিও এই দলে?' গলা যেন ছিঁড়ে গেল তার। তার চুল খসে গেল, আঁচল খসে গেল।'

স্বামী পাথরের মতো নিস্তব্ধ।

'জবাব দাও কথার।'

চুপ।

'বলো, বলো, আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'কী শুনতে চাও?'

'তা হলে তুমিও এই দলে?'

চুপ।

'জবাব দাও।'

'জবাব তো আমার দেবার নেই, তোমারই আছে—'

'না। আমার কোনো জবাবদিহি নেই এই সংসারে। কারো কাছেই নেই। কিন্তু তোমা প্রত্যেকের আছে। তোমার মা ভাইবোন প্রত্যেকের জাবাবদিহি দেবার আছে আমার ক সবচেয়ে আগে আছে তোমার। একদিন আগুন সাক্ষী করে তুমি আমাকে ঘরে এনেছিলে, স্ত্রী তুমি সকল অসম্মান থেকে সকল আঘাত থেকে বাঁচাতে প্রতিশ্রুত ছিলে—'

'প্রতিশ্রুতি!' অদ্ভুত করে হাসলো স্বামী, তোমার কাছে কি আর সেই প্রতিশ্রুতির কে অর্থ আছে নাকি, আমি কে তোমার? কিছু না। তুমি যাও, যে তোমাকে বাঁচাতে পারবে কাছেই যাও।'

অনেকক্ষণ স্বামীর দিকে এক পলকে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি, এক সময় দাঁতে দ আটকে বললো, 'তাই যাবো। তোমার মতো নোংরা, নীচ, হীন একটা পুরুষকে আর ' কোনোদিন স্বামী বলে স্বীকার করবো না।'

'এই সত্যটা এতোদিন না লুকোলেও পারতে। আমার একটু কম ক্ষতি হতো, অ মেয়েটা জন্মাতো না। না কি তাও মিথ্যে?'

মেয়েটি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অনেক পরে বললো, 'ইতর।'

স্বামী হাসলো, 'এই ইতরের কাছেই কিন্তু একদিন সেধে যেচে এসেছিলে।'

'এসেছিলাম, ভুল করেছিলাম।'

'না, ভুল করবে কেন? একটা স্বামী নামের আড়াল দরকার ছিলো বোধ হয়—'

'কী!'

'ভদ্রলোকটি যে চতুর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তাঁর নাম তুমি মুখে আনবারও যোগ্য নও। চুপ করো।'

'চুপ করে তো অনেকদূর এলাম।'

'ভেবেছিলাম সংসারে একটা লোক অন্তত ভদ্র আছে—' কিন্তু আর না, আর এক ম আমি এখানে থাকবো না—'

রেগে এগিয়ে এসে মেয়েটি দোলনা থেকে টেনে তুলে নিলো বাচ্চাটাকে। শান্তভাবে নাড়লো স্বামী, 'না, ওকে তুমি পাবে না। ও আমার, আইনত আমার। যদি যেতে হয় এ যাবে। অবিশ্যি সত্যি যদি আমারই হয়।'

কথা শুনে, হাত-পা অবশ হয়ে এলো মেয়েটির। অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে ধীরে বাচ্চাটিকে আবার শুইয়ে দিলো বিছানায়, চুমু খেলো কপালে তারপর যেমন ছিলো তেমনি অবস্থাতেই রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

ঁপাথ ধরে হেঁটে হেঁটেই এসেছিলো সে। শেষের বেলা অনভ্যস্ত পায়ে তীব্র পড়ন্ত রোদে তখানি পথ হেঁটে আসা কঠিন কি সহজ সেই জ্ঞানবোধ সেদিন ছিলো না তার। তার ক্লান্তি লো না, বিশ্রামের ইচ্ছে ছিলো না, ভয় ছিলো না, বেদনা ছিলো না, কিছুই ছিলো না সেদিন। ছিলো তাও সে জানে না। আর কেন যে সে সোজা গঙ্গার জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো না, মের তলায় মাথা দিলো না, গলায় ফাঁসি দিয়ে গাছের ডালে ঝুলে পড়লো না, তাও বুঝতে রলো না।

ধুঁকতে ধুঁকতে এসে যখন মামার বাড়িতে পৌঁছেছিলো, প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে তখন। জা খুলে দিয়ে মামার রাঁধুনি হরিবল্লভ চমকে উঠেছিলো, 'কী হয়েছে দিদিমনি?'

'কিছু না,জল দাও একগ্লাস।'

'এসো, ঘরে এসো।'

ঢুকলো ঘরে। বসলো চেয়ারে। মনে হলো সব শূন্য, সব ফাঁকা। হরিবল্লভ আলো জ্বেলে লো।

'মামা কোথায়?'

'উনি তো কাল রাত্তিরে স্যুটিংয়ে গেছেন।'

'স্যুটিংয়ে? হঠাৎ?'

'হ্যাঁ, হাজরাবাবু এসে নিয়ে গেলেন।'

'কোথায় গেলেন জান?'

'হ্যাঁ। তোপচাঁচি গেলেন।'

'তবে তো ফিরতে দেরী হবে।'

'তা হবে বৈকি।'

'আমাকে তো কিছু বললেন না কাল।'

'ঠিক ছিলো না যে।'

'হরিবল্লভ।'

'বলুন।'

'তুমি আমাকে একটা কাগজ কলম দাও তো।'

'চা করবো?'

'সে সব পরে হবে, তুমি আগে কাগজ কলমটা দাও।'

'জামাইবাবু ভালো আছেন দিদিমণি?'

'খুব।'

'আর খুকি?'

'সব ভালো।'

খুঁজে পেতে এক টুকরো কাগজ আর একটা পেনসিল নিয়ে এলো হরিবল্লভ, ছোটো ছোটো অক্ষরে একটি চিঠি লিখলো মেয়েটি। ভাঁজ করে হরিবল্লভের হাতে দিয়ে বললো, ামাকে দিও, বুঝলে? জরুরী। তুমি তো পড়তে জান না, না?'

'না দিদিমণি।'

'ঠিক আছে। সাবধানে রেখো।'

'আপনি কি খাবেন বলুন।'

'এক গ্লাস জল। আচ্ছা থাক, জল পরে খাবো। তুমি একটা কাজ করবে?'

'বলুন।'

'আমাকে দু'টো টাকা ধার দেবে? মামা এলে নিয়ে নেবে?'

'কেন দেবো না। বাবু তে অনেক টাকা রেখে গেছেন আমার কাছে।'

'তা হলে শোনো, আমি লিখে দিচ্ছি, এই অষুধটা এনে দাও তো লক্ষ্মীটি। বড় মা ধরেছে।'

সামনেই ডাক্তারখানা, অষুধ নিয়ে ফিরে আসতে হরিবল্লভের দেরী হলো না। পুরো এ ফাইল সারিডনের শিশিটির দিকে তাকিয়ে হাত বাড়ালো মেয়েটি। বললো, 'তুমি আমা এবার এক গ্লাস জল এনে দাও।'

অবিশ্যি এক গ্লাস জলে কুলোলো না। বাথরুমে গিয়ে কল থেকে জল ধরতে হলো। এ সঙ্গে এক মুঠো পিল খেয়েই সে হরিবল্লভের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

আত্মহত্যা করবার যে খুব একটা সুতীব্র বাসনা ছিলো তা নয়, হঠাৎই ঠিক করে ফেল ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই মামা বাড়ি থাকলে এটা হতো না। কিন্তু বাঁচবারই বা আর কী অর্থ থাক পারে জীবনে। স্বামীর মন থেকে এই সন্দেহের পাপ কি সে আর কখনো উৎপাটিত কর পারতো? এ বীজ বড়ো ভীষণ, ঢুকলে অঙ্কুরে না গজিয়ে ছাড়ে না। তাতো সে দেখলোই। আগেও যে এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত তার স্বামীর কাছ থেকে সে পায়নি তা তো নয়? আব ঠাণ্ডা মনে ভেবে চিন্তে নিজেই লজ্জিত হয়েছে, দুঃখিত হয়েছে ক্ষমা চেয়েছে, অকৃত্রিম আদ ভুলিয়ে দিয়েছে তাকে। তবু আবার মাথা তুলে সাপের মতো হেলেছে সেই বিষ তার বেদিনীর মতো সুকৌশলে সেই ফণাকে নাচিয়েছেন, দুলিয়েছেন।

ভেবেছিলো সামনেই যে একটা নিরিবিলি ছোট্ট মাঠ আছে সেখানে গিয়ে পড়ে থাকা কাল সকালে ঝাড়ুদারেরাই প্রথম দেখবে তার মৃতদেহ।

রাস্তায় বেরিয়ে বাচ্চাটার জন্য বুকটা ফেটে গেল। একবার, আর একবার, শেষবা মতো তাকে দেখার একটা ব্যাকুল তৃষ্ণায় হৃদয় ছটফট করে উঠলো। বাড়ি ফিরবার জন্য অধীর হলো। আর তারপরই সব ছাপিয়ে বাঁচবার আশায় তার চিৎকার করে উঠতে ই করলো, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটনো না।

মামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু'চার মিনিট হাঁটতেই কপালে ঘাম দেখা দিলো। পিঠ বে ঘাম নামলো। হাত পা অবশ হয়ে এলো, শরীর অবসন্ন হয়ে এলো, একটা নিথর ঘুমে আচ হয়ে এলো সারা দেহ। গ্যাসের আলো জ্বলা নির্জন লম্বা রাস্তাটা পাক খেয়ে খেয়ে রা ফিতের মতো দুলতে লাগলো চোখে, শেষে সব অন্ধকার। মাঠ পর্যন্ত পৌঁছুনো হলো পথের উপরই বসে পড়তে হলো।

জ্ঞান ফিরলো হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে। ঝাপসা ঝাপসা জ্ঞান। ঝাপসা ঝাপসা স্মৃ

পথচারীরা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলো এইখানে, এঁরা প্রাণ বাঁচিয়েছেন। ডাক্তা আর নার্সেরা, এই মুহূর্তে তাকাতে দেখে যারা ঝুঁকে পড়েছিলেন মুখের উপর বেঁচে ভেবে তারা তৃপ্ত হলেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরলে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন।

হায় রে, তখন কি আর কোনো ঠিকানা ছিলো তার? সব ঠিকানা মুছে দিয়েই তো সে বিদায় নিয়েছিলো। বিদায় নিয়েও তাকে ফিরে আসতে হলো বটে কিন্তু সেই ঠিকানায় পৌঁছুবার রাস্তায় কি কাঁটা পড়ে গেল না?

হাত বাড়িয়ে নার্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আজ কতো তারিখ?' নার্স বললো, 'নয়।'

'নয়!' বিস্ময়ে হতাশ হয়ে রইলো মেয়েটি। বুঝতে পারলো জীবনের পাতা থেকে তার অলেক্ষ্যে পুরো তিনটে পাতা খসে গেছে। পাঁচ তারিখে বিকেলে ঘর ছেড়েছে সে, সন্ধ্যে পর্যন্ত মনে আছে সব। মামার বাড়ি থেকে যে বেশ কিছুটা হেঁটে এসেছিলো সেইটুকুও মনে আছে, তারপরই কিছু নেই। তা বলে এতোগুলো ঘণ্টা? এতোগুলো ঘণ্টা ফাঁকি দিয়ে পালালো? এতোগুলো ঘণ্টা ডুবে গেল বিস্মৃতির আঁধারে?

তি-ন দি-ন! তিনদিন সে ঘর ছাড়া? নিরুদ্দেশ! কী করছে তার শিশু? কে রাখছে তাকে? কে খাওয়াচ্ছে? কে ঘুম পাড়াচ্ছে। হায়। হায়। এ সে কী করলো? এতো তার রাগ? এতো অভিমান?

এখন সে কোথায় যাবে? কী করবে? আবার গিয়ে দাঁড়াবে দরজায়? স্বামীর ঘরের দরজায়? এতোদিনের গৃহত্যাগী স্ত্রীকে দেখে কী ভাববে স্বামী? সে কি পারবে হাসিমুখে গ্রহণ করতে? ভাববে আমার হারানো মানিক ফিরে এসেছে? তেমনি করে আবার জড়িয়ে ধরবে, চুম্বনের আবেগে ভুলিয়ে দেবে সব। দেবে। দেবে। দেবে। কেন দেবে না? সে হলে কী করতো? কাদা মাটি ধূলো যাই লাগুক না দেহে, সব কি সে আঁচলে মুছিয়ে দিত না? নিশ্চয়ই দিত।

কিন্তু সে যে স্ত্রী! স্ত্রী সব কিছুর বিনিময়েই গ্রহণ করতে পারে স্বামীকে, স্বামী পারে না। সে যে প্রভু। প্রভুত্বে আঘাত লাগে তার। নামই তার স্বামী, নামের মধ্যেই তো সবচেয়ে বড়ো অহংকারটা জাতসাপের মতো দিনে রাত্রে গর্জাচ্ছে। এই নাম কে দিয়েছিলো? কে রেখেছিলো? সমাজ! পুরুষ শাসিত সমাজ।

একে স্বামী, তার উপরে তার স্বামী। অকারণেই যার মন গরলে ঠাসা, সেই লোক তো তাকে দেখলে মরে যাবে সন্দেহে। স্বয়ং রামচন্দ্র ভগবান হয়েও ভুলতে পারেন নি তিনি স্বামী, নিতান্ত অন্ত্যজের মতো কঠিন তিরস্কারে অনায়াসে অপমান করেছিলেন দুঃখিনী সীতাকে, যে সীতা স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেননি, যে সীতা ব্যথিত, নিগৃহীত এবং একান্ত মনে পতিপ্রাণা।

সন্দেহ, সন্দেহ, সন্দেহ। স্ত্রীকে সন্দেহ করার মধ্যে কি পুরুষের কোনো যুক্তি লাগে? বুদ্ধি লাগে? কিছু লাগে না। সেখানে মানুষের আর দেবতার তফাৎ নেই। ঐ রামচন্দ্রও যা, তার স্বামী ভবতোষ রায়ও তা। আসল শব্দটা হচ্ছে স্বামী। প্রভু। কর্ত্তা। মনিব। বন্ধু নয়, সখা নয়, প্রেমিক নয়। নামটাই সববে জানিয়ে দিচ্ছে তুমি নিচে আমি উপরে। তুমি তোমার মানুষ্যত্বের মর্যাদা ততক্ষণই পাবে, যতোক্ষণ—আমি দেব। আমার অঙ্গুলি হেলনই হবে তোমার জীবনের নিয়ন্ত্রণ-কাঠি।

তবু মেয়েটি ভালো হয়ে গিয়ে, পুরো ন'দিন পরে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভবানীপুরের ট্রাম ধরতেই রাস্তা পার হয়ে এলো। কী করবে? আর সব ছাড়তে পারলেও শিশুকে ছাড়বে কেমন করে। ভিতরে ভিতরে কেঁদে কেঁদে আর তো পারেনা

সে। সে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, পরাজিত। ওরা তাকে নিয়ে যা খুশি করুক, তবু সে পড়ে থাকবে ওখানে। মেয়ের জন্য পড়ে থাকবে।

কিন্তু ট্রামে উঠেই মনে হলো, সে তার সন্তান চাইলেও সন্তানের পিতা এবং পরিজন কি সেই অধিকার দিতে চাইবে তাকে?

দেবে না? নিশ্চয়ই দেবে। সহস্রবার দেবে। সে মা না? সে-ই-তো-দশমাস গর্ভে ধারণ করেছে, প্রসব ব্যথা সহ্য করে জন্ম দিয়েছে, এক বছর ধরে লালন করেছে, তার রক্ত মাংস মজ্জা দিয়েই তো তৈরী ঐ শিশু। একটা শিশুকে সংসারে আনতে পুরুষের কতোটুকু দান? তার তো শুধু উপভোগ।

আমি মা। লক্ষ্মী আমার মেয়ে। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে যা খুশি তাই করবো। আমার চেয়ে বড়ো অধিকার আর কার? নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই আমি যাবো তার কাছে, ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবো, ভিক্ষে করে মানুষ করবো। লোকে কথায়ই বলে মা মরলে বাপ তালুই। বাপ আবার কবে দেখে তার সন্তানকে? মা মরে গেলে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করে, বিয়ে করেই কষাই হয়ে ওঠে।

আর ভবতোষ রায়ই যেন না বিয়ে করে বসে থাকবেন তার মেয়েকে নিয়ে। কাণে ধরে মা নিয়ে পিঁড়িতে দাঁড় করাবেন, আর তক্ষুনি মেরুদণ্ডহীন পুরুষ নামের অযোগ্য মানুষটা ভয়ে ভয়ে মন্ত্রপাঠ করতে শুরু করবে। এবার মা দেখেশুনে তার পছন্দমতো মেয়ে এনে দাপটে সংসার চালাবেন।

তারপর? কে দেখবে তার মেয়েকে?

না দেখুক, কাটুক, মারুক, তবু তারই অধিকার। নিষ্ঠুর সমাজ এই নিয়মই বেঁধে দিয়েছে। আর যদি বা এমন হয়, তার স্বামী এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে অন্তত শিশুর মা বলে গ্রহণ করে তাকে, শাশুড়ি আছেন না? তিনি দাঁড়াবেন না খড়্গ হস্তে? স্বামীর সব ইচ্ছেকে কেটে ফেলবেন না কুচি কুচি করে? আর মাকে ডিঙিয়ে স্ত্রীকে ভালোবাসার শক্তি কি আছে নাকি লোকটার।

তবে? তবু কোথায় যাবো? কী করবো? মামা। হ্যাঁ, মামা আছে তার! মামার আশ্রয় সব সময়েই অবারিত তার জন্য। তা ছাড়া বাবলু আছে না? বাবলু কোনোদিন বড়ো হবে না? দিদি ছাড়া আর কে আছে তার?

কিন্তু চার বছর বোর্ডিংয়ে থেকে, বাবলুওকি অনেকটা ছেড়ে যায়নি জীবন থেকে? সেই নিবিড়তা কি আছে নাকি আর? বাবলুর উপরেই বা সে কেন তার নিজের ভার চাপাতে যাবে? না, কারো উপরেই সেটা চাপানো উচিত নয়। মামার উপরেও না।

'টিকিট।'

কন্ডাকটার এসে টিকিট চাইতেই চমকে উঠলো মেয়েটি। টিকিট! সত্যিই তো, টিকিট তো লাগবে, এটা তো একেবারে ভাবেনি সে। পয়সা কই তার কাছে?

বৃদ্ধ কন্ডাকটারের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠলো। কন্ডাকটার বললো, 'কোথায় যাবেন?'

কে যেন তার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল, 'এলগিন রোড।'

'এলগিন রোড! তা হলে তো এসে পড়েছেন, নামুন।'

'কিন্তু—কিন্তু—।'

'ব্যাগ ফেলে এসেছেন? ঠিক আছে। নেমে যান।'

না, সেই কন্ডাকটারের দয়া সে জীবনে ভুলবে না। আজ তার মুখ ভুলে গেছে, কিন্তু হার ভুলে যায়নি।

এলগিন রোডেই নামলো সে। রোদ চড়ে উঠেছে মাথার উপর, গরমকাল, পায়ে জুতো না না, পা দুটো যেন পুড়ে যাচ্ছিলো পীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। সে ভাবতে লাগলো কী বে। যা সিদ্ধান্ত নেবে, এই মুহূর্তেই নিতে হবে। সংসারে ফিরবে, না অন্য কোনো পথ? নটা?

আস্তে আস্তে কখন মিহির মুখার্জির ফ্ল্যাটে এসে থামলো, যেন নিজেই টের পেলো না। টা ধুক ধুক করতে লাগলো। ভদ্রলোক থাকলে হয়।

বাবা বেঁচে থাকতে এই ভদ্রলোক তার গানের মাস্টার ছিলেন। আজকের কথা নয়। জকের মিহির মুখার্জি আর সেদিনের মিহিরদা সম্পূর্ণ দুই জগতের মানুষ। বৃদ্ধ মা বাপ । পঙ্গপালের মতো আট দশটি ভাইবোনের সংসারে সেই মিহির হাবুডুবু খেতো। বুদ্ধিমান না কিন্তু সুযোগ সুবিধার অভাবে ম্যাট্রিক পাশ করার পরে আর বিদ্যা এগোয়নি। গানের । আবাল্যের। বড়ো হতে হতে সেটাকেই কাজে খাটালো। না খাটালে চলবেই বা কেমন ? ছোট্ট থেকে উপার্জনের ধান্দা। সতেরো বছর বয়েস থেকেই গানের টিউশনির হাতে । পাঁচ পাও, দশ পাও, পেতেই হবে।

মেয়েটির সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিলো তখন অবিশ্যি বাইশ বছরের যুবক। বাবা ধরে নিয়ে ন একদিন। খুব আড্ডা জমলো, অনেক রাত পর্যন্ত গান চললো, সকলকে মোহিত করে । গেল। বাবা বললেন, 'লাবির জন্য রাখলে হয়।' মা বললেন, 'হাঁ, খুব ভালো।'

'কার ছেলে জান তো?'

'কার ছেলে?'

'আরে ঐ যে বক্রযোগীনির মুরারী কাকা, মনে নেই—'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মুরারী মুখার্জির ছেলে বুঝি? ওমা, তা কেন আগে বলো নি?'

'আগে বললে কী করতে?'

'কী আবার। বেশ চেনা ছেলে হতো।

'অচেনা হয়েও তো ক্ষতি হয়নি কিছু।'

'তোমার খালি এঁড়ে তক্ক। যাক গে, তুমি কালই ওকে মাস্টার ঠিক করো। মাইনে কতো ব?'

'সে যা নেয় নেবে।'

সুতরাং মিহির মুখার্জি এলো, এবং অতি সত্বরই তাদের পরিবারের প্রথা অনুযায়ী ঘরের ল হয়ে উঠলো। মা খুব ভালোবাসতেন, আর মিহিরদারও স্বভাবের তুলনা ছিলো না। ষ্ঠতা যতো তাড়াতাড়ি হয়েছিলো, ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো তার চেয়ে অল্প সময়ে। কী যেন ক ধরে বম্বে চলে গিয়েছিলো মিহিরদা, সেখানে গিয়েই ফেটে গেল কপাল। কী থেকে কী া! কী না হলো! সারা ভারতে মিহির মুখার্জির মতো নাম, যশ, অর্থ আর প্রতিপত্তি অন্য নো বাঙালী গায়কের নেই। বাঙালীরও নেই, অন্য প্রদেশেরও দু'একজন ছাড়া আর কারো

নেই। চিত্র জগতের হিরো সে। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনা অদ্বিতীয়। তাঁর গলার গানের দা
অতুলনীয়।

কিন্তু গানের জন্য আসেনি মেয়েটি, এসেছে চেহারা নিয়ে। খবরাখবর সবই জান
দু'একবার দু' এক জায়গায় যে দেখা হয়ে যায়নি তা-ও নয়। মামার দৌলতে সিনেমা জগতে
সঙ্গে একটু আধটু যোগ সূত্র আছে তার। তবুও এতোদিন পরে এই অবস্থায় প্রার্থী হয়ে এ
দাঁড়িয়ে তার যে কেমন লাগছিলো সে শুধু সে-ই জানে।

একটু অপেক্ষা করে টোকা দিলো দরজায়। মনে মনে আশঙ্কা হলো যদি না থাকে তারপ
কী করবে, তারপর কোথায় যাবে। অবিশ্যি থাকলেই যে সে যা চায় তা হবেই এমন কথাই
তাকে কে বলেছে? শুধু চেষ্টা। এই চেষ্টায় ব্যর্থ হলে সে দস্তিদারদের আপিসে গিয়ে ধ
দেবে। কিন্তু সেটা হবে নিরুপায়ের চেষ্টা। এটাও কি তাই নয়? তাই। তবুও একটু ডিগ্রী
তফাৎ আছে।

'তুমি?'

দরজা খুলে দিয়ে মিহির মুখর্জি অবাক হয়ে গেল। তারপর আপাদমস্তক তাকালো।

সন্ত্রস্ত হয়ে মেয়েটি বললো, 'মিহরিদা শুনুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'কী ব্যাপার বলো তো? এসো, ভিতরে এসো।'

কলকাতায় এই ফ্ল্যাটটা নিয়ে রেখেছে মিহির মুখার্জি। সপরিবারে সে বম্বেতেই বাস করে
মাঝে মাঝে বাঙলা ছবিতে কাজ করতে এলে উঠতে হয় বলে এটা রেখে দেওয়া।

মেয়েটি বললো, 'আপনি একাই আছেন বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আমি আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে চাই।'

'কী করে জানলে আমি কলকাতা এসেছি?'

'জানতাম না, কপাল ঠুকে এসেছিলাম।'

'ভালো আছ সবাই?'

'দেখে নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, কিছু একটা ঘটেছে।'

'তা পারছি।'

'আমি আমার স্বামীকে ছেড়ে এসেছি।'

'ভবতোষবাবুকে?'

'আমার মেয়েটিকেও। হঠাৎ কান্নায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো মেয়েটি' 'আপনি জানে
একমাত্র বাবলুটা ছাড়া আপন জন বলতে আমার কেউ নেই। ছেলেবেলায় অতি অল্প সময়ে
জন্য হলেও আপনার সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো, আমি সেই দাবীতেই এই দুঃসময়
আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, আমাকে বম্বে নিয়ে চলুন। যে কোন ছবিতে যে কোনো পা
ঢুকিয়ে দিন আমাকে।'

মিহির চুপ করে তাকিয়ে রইলো।

'বলুন, কথা দিন।'

'ঠিক আছে। এবার কী খাবে বল।'

'খাবো না।'

'শিবতোষবাবুর খবর কী?'

'জানি না।'

'তুমি কি তাঁর সঙ্গেও দেখা করতে চাও না?'

'না।'

'কিন্তু আমি বলি কি,—যদিও তোমাদের মধ্যে কী ঘটেছিলো আমি জানি না তবু একটা যখন বাচ্চা আছে—,

'মিহিরদা, আমি ছেলেমানুষ নই, কিছুমাত্র উপায় থাকলে সন্তান ছেড়ে—'

'লাবণ্য, আমি জানি তুমি হঠাৎ কিছু করে বসবার মেয়ে নও, তবুও আমি বলছি—'

'মিহিরদা, যদি মনে করেন কাজ দেয়া সম্ভব নয়, আমি চলে যাবো কিন্তু এসব আদেশ নির্দেশ শুনতে পারবো না দাঁড়িয়ে।

'কিন্তু শিবতোষবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত।'

'মামা জানলে আমাকে বাধা দেবেন। কিন্তু হাজার বাধা দিলেও আর আমি সেখানে ফিরে যেতে পারবো না।'

'কিন্তু আমি আজই যাচ্ছি, তুমি কি এতো তাড়াতাড়ি যেতে পারবে?'

'পারবো।'

'আমাকে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরুতে হবে, বোম্বেতে প্রথমে গিয়ে তুমি আমার ওখানেই উঠতে পারবে, কোনো অসুবিধে নেই, তারপর কাজও আমি তোমাকে যোগাড় করে দিতে পারবো, কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নেই, মন আমার পাথরের মতো স্থির।'

কিন্তু সত্যিই যে তা নয়, মনকে পাথর করা যে তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, সেটা সে বম্বে গিয়ে পৌছানো মাত্রই টের পেলো। পুরো ন'দিন ঘর ছাড়া থেকে ঘরে ফিরতে তার যতো সঙ্কোচ এবং যতো ভয় হয়েছিলো, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী কষ্ট হলো ছেড়ে এসে। কী করে যে তার দিন আর রাত কাটতো সে জানে না।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে সে ক্লান্ত হয়ে গেল। এক মাসের মাথায় মামাকে চিঠি লিখলো একটি।

মামা,

আমি সব ছেড়ে এই রাস্তায় কেন এসেছি তার বিশদ বিবরণ দিয়ে তোমাকে ভারাক্রান্ত করবো না। চেয়ে-ছিলাম বিদায় নিতে, কিন্তু আয়ু আমাকে ছাড়লো না, আমি বেঁচে উঠলাম। অথচ রাস্তা আমার অন্ধকার ছিলো, আমি ফিরতে পারিনি। বাবলু কী ভাবছে জানি না, তাকে বলো পুজোর ছুটিতে এখানে নিয়ে আসবো।

আর সব ছাড়তে পারলেও বাচ্চাটার জন্য আমি আর তিষ্টোতে পারছি না, আমি আমার মান সম্মান সমস্ত কিছুর বিনিময়ে শুধু তাকে চাই। তুমি আমাকে ও বাড়ির খবর জানিয়ো। সেই অপদার্থ ব্যক্তিটির জন্যও যে কেন কষ্ট পাচ্ছি কে জানে। যদি হৃদয় মন ছুঁতে পারতাম,

জায়গাটা উপড়ে দিতাম। তুমি এই চিঠি পেয়েই জবাব লিখো, আমি ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত আছি জেনো।

মিহির মুখার্জীর সহায়তায় আমি কৃতজ্ঞ। ভালো কাজও পেয়েছি দু' একটা। আসবার আগে তোমার কাছে এই জন্যই যাইনি, জানতাম তা হলে তুমি আমাকে আসতে দেবে না। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়া বা না করার দুর্বুদ্ধি আমার পূর্ব জন্মের কর্ম ফলের দায়। আমার অশান্তি আর অস্থিরতার ভার আমি আর সইতে পারছি নে।'

মামা জবাব দিলেন না, চলে এলেন। তাঁর কাছে শোনা গেল, ভবতোষ রায় বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে মেয়ে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। ঠিকানাটা জানতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, ওরা দেয় নি।

কেমন করে দেবে, দিলে যে মেয়েটি আবার তার স্বামী সন্তান ফিরিয়ে পাবে। কিন্তু অন্যের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেদেরও কি ক্ষতি হয়নি তাদের? হয়েছে। একটু বেশীই হয়েছে। এক ভবতোষ রায়ের অভাব শেষ পর্যন্ত তাদের নরক দেখিয়ে ছেড়েছে। জানে, মেয়েটি সব জানে। সব শুনেছে। শুধু তাদের কোনো কথাই শোনেনি, যাদেরটা শোনার জন্য সারাটা জীবন তৃষিত হয়ে কাটলো।

এক কুল ভাঙ্গে, অন্য কুল জোড়ে, প্রকৃতির নিয়মই এই। তার প্রথম ছবিটাই ধরে গেল দর্শকদের মনে। হুল্লোড় পড়ে গেল এই নতুন মুখ নিয়ে। তারপর একের পর এক, একের পর এক। যেন ঝড়ের বেগে ভাগ্য এসে ধরা দিল হাতের মুঠোয়। মান সম্মান যশ প্রতিপত্তি—কী না। আর অর্থ? সে হিসেব করে কি থৈ পাওয়া যাবে? তিন বছরের মাথায় মেরিন ড্রাইভের মস্ত বাড়িটি কিনে নিল। বাবলু এলো বোর্ডিং ছেড়ে, বাংলাদেশ ছেড়ে মামা এলেন, একটি ছোট্ট সংসারের গোড়াপত্তন হলো। আর তার পরেই আঠেরো বছর বয়সে সামান্য কী একটু অসুখে মারা গেল বাবলু। মেয়েটির শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে থাকা একমাত্র বন্ধনটুকুও ছিঁড়ে গেল।

দাঁতে দাঁতে চেপে সে সহ্য করেছিলো সেই শোক। তার হৃদয়ের ক্ষুধিত তৃষিত মাতৃত্ব ঐ ভাইটির উপর ন্যস্ত করেই সে স্থির হয়েছিলো আবার ভেঙ্গে গেল সব। ঈশ্বরের বিধান! মেনে নিতেই হয়। মনে মনে বুঝলো, পূর্ব জন্মের ঋণ এভাবেই এ জন্মে শোধ দিতে হবে তাকে। বুক থেকে স্বামী খসিয়ে, সন্তান খসিয়ে, আর ভাইয়ের অকাল মৃত্যু দিয়ে।

কী নিষ্ঠুর বিধাতা। কী নির্মম। তবু বাবলুর মৃত্যু যতো কঠিনই হোক, সেটা ছিলো একটা অবসান। যে দেহটা জগৎ থেকে মুছে যায়, একদিন না একদিন মন থেকেও মুছে আসে সেটা কিন্তু যারা থেকেও নেই তাদের বিরহ সহ্য করা যে কী ভয়ানক, তা কি সে ছাড়া আর কেউ জানে?

এই তো, এই মুহূর্তেও তো তাদের জন্যই বুকের ভিতরটাতে তার তুফান বয়ে যাচ্ছে দেখতে ইচ্ছে করছে তাদের। ভীষণ, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। ওগো, মৃত্যুর আগে একবার তোমাদের দেখবো আমি। একবার। তোমরা কোথায়? কোথায়? একবার এসো, এসো আমার কাছে। এসো। এসো।

বুকে হাত চেপে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন অনুশ্রী দেবী। বালিশের মধ্যে মাথাটাবে অস্থিরভাবে নাড়তে নাড়তে কেবলি বলতে লাগলেন 'কিন্তু কেন আমি এখনো ভুলতে

রলাম না।' বারান্দা থেকে ছুটে এলো নার্স দু'জন, শিবতোষবাবু এলেন, ডাক্তার এসে নাড়ি
।লেন।

পরের দিন সকাল থেকেই আবার ছটফট করতে লাগলেন তিনি। আবার তাঁর অসুখ
ড়লো। হঠাৎ ব্লাড প্রেসার নেমে গেল অনেক নীচে। সারাদিন বৃষ্টি পড়লো টিপ টিপ করে,
রাদিন আকাশ ভেজা শ্লেটের মতো লেপে পুছে রইলো। শিবতোষবাবু কাছে বসে রইলেন।

'মামা।'

'বল।'

'কে বলে তুমি আমার মামা।'

'তবে কী?'

'আমার বাবা। তোমাকে আমি বাবার মতো ভালোবাসি, ঈশ্বরের মতো ভক্তি করি।'

'খুব ভালো কথা।'

'আমার শাশুড়ি বলতেন তুমি খল।'

'ঠিক কথা।'

'তবু আজ আমি তাঁকে ক্ষমা করলাম।'

'লক্ষ্মী মেয়ে।'

'মামা।'

'আবার কী?'

'আমি আর বাঁচবো না।

'বেঁচে গেছ, আর বাঁচবে না কী?'

একটু চুপ।

'মামা।'

'আবার কী!'

আচ্ছা বলো তো ও কতো বড়ো হলো।

'একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর লাবণ্য।'

'লাবণ্য, না? তোমার কাছে আমি এখনো লাবণ্য।'

'ডাক্তার তোমাকে কথা বলতে বারণ করেছেন।'

'আমি অনুশ্রী দেবী।'

'বেশ তো।'

'তবে লাবণ্য বল কেন?'

'খুব লাবণ্য আছে বলে।'

'ঠাট্টা করছো?'

'ঠাট্টা কেন?'

'আমি যদি লাবণ্য হই তবে আমার লক্ষ্মী কই?'

শিবতোষবাবু চুপ করে বসে রইলেন।

'মামা।'

'লাবণ্য, তুমি একটু ঘুমোও।'

'ঘুমুতে খুব বেশী দেরী নেই, তার আগে কথা বলি।'
'এবার আমি বাইরে চলে যাবো।'
'মামা, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'
'সব আছে। সব আছে। আমি সকলকে ধরে নিয়ে আসবো তোমার কাছে।
'তবে কি খোঁজ পেয়েছ?'
'তুমি একটু সুস্থ হলে তবে তো খোঁজ করবো?'
'আমি সুস্থ আছি।'
'বেশ তো, তা হলে ঘুমোও।'
'আমি একটা উইল করবো।'
'ভালো কথা।'
'এখুনি করবো।'
'এখন হয় না।'
'কেন হয় না?'
'এখন রাত।'
'রাত্রিই তো ভালো।'
'না।'
'কেন?'
'লাবণ্য—'
'মামা, বারণ করো না, এমনও তো হতে পারে, এই রাতই আমার শেষ রাত।'
'ছি।'
'আমার বাড়ি ঘর টাকা সব লক্ষ্মীর।'
'সে তো একশোবার।'
'কিন্তু লক্ষ্মীর বাবা যদ্দিন বেঁচে থাকবেন তদ্দিন না।'
'নিশ্চয়ই।'
'মামা।'
'বলো।'
'অভিনেত্রীর টাকা কি ও ছোঁবে?'
'নার্স।'
'নার্সকে ডাকছো কেন?'
'তোমার মাথাটা ধুয়ে দিক এসে, ঘুম হবে।'
'এটা বৈশাখ মাস না?'
'হ্যাঁ।'
'এই বৈশাখেই—'
'কী।'
'আমার সর্বনাশের সূত্রপাত হয়েছিলো। বাবলুর যান্মাষিক পরীক্ষা ছিলো তখন-মামা—মামা—'

'শোন লাবণ্য, তুমি যদি আর কথা বলতে চেষ্টা করো—'

'কেন, কেন আমি ঐ অপদার্থ লোকটাকে ভালোবেসেছিলাম, কেন, কেন?'

কেন? কেন? কেন তুমি চলে গেলে? কেন?' ভবতোষ রায়ের সমস্ত অন্ত্রীতন্ত্রী কেঁপে কেঁপে ়তে লাগলো জিজ্ঞাসায়। 'নিষ্ঠুর, তুমি কি শুধু আমার মুখের কথাটাই শুনতে পেয়েছিলে? মার অন্তরটা দেখনি? আমার দ্বন্দ্ব দেখনি? আমার দুঃখ দারিদ্র অশান্তি ক্লান্তি সেই সব কি ছু না?'

লাবু, আমার লাবু। আমার প্রিয়তমা। আমাকে ক্ষমা করো তুমি। আমাকে ক্ষমা করো। সব কথা আমি বলিনি, বলিনি। বলতে চাইনি। না। না। না। আমার ভিতরকার শয়তান মার মায়ের প্ররোচনায় আমাকে দিয়ে বলিয়েছে সে সব। তুমি তো জান না, শুধু সেদিনই দিনের পর দিন আমার বুকের মধ্যে কতো ধীরে ধীরে কতো কৌশলে এই ছোট্ট কাঁটাটিকে ক্কুরিত করেছিলেন তিনি! সযত্নে লালন করছিলেন তাঁর যত্ন দিয়ে, শঠতা দিয়ে, নির্মমতা য়ে। তবু, তবু আমি শপথ করে বলছি তোমার ভালোবাসায় আমার এক বিন্দু আবিশ্বাস লো না। কিন্তু শত হলেও আমি পুরুষ, মাঝে মাঝে বিকৃত না হয়ে পারিনি। ঈর্ষার চিতা মাদের বুকে সাজানোই থাকে, শুধু এক ফোঁটা ইন্ধনের অপেক্ষা। লাবণ্য, লাবু, লা, আমাকে মি সে জন্য যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছ, নির্বাসন দিয়েছ এবার দয়া করো, ক্ষমা করো, আর আমাকে ল বুঝে দূরে সরিয়ে রেখো না।'

ট্যাক্সি চালাতে চালাতে অবাক হয়ে ড্রাইভার ফিরে তাকাল। বৃদ্ধ সৌম্য চেহারার শিখ ইভার, চোখের দৃষ্টিতে কোমলতা মাখানো, পশমের মত সাদা পাকা দাড়ি বুক পর্যন্ত ঝুলে

'আপকো কী হয়েছে বাবু।'

'উ।'

'খারাব খোবোর কিসু—'

'হাঁ সর্দারজি—'

'কী খোবোর।'

'আমার স্ত্রীর বড়ো অসুখ।'

'কলকাত্তাসে?'

'আমি বম্বে যাচ্ছি।'

'আপকো পরিবার বোম্বাইতে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে, অনুশ্রী দেবীকা কুঠিমে—'

সর্দারজি, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন।'

'ঠিক হ্যায়।'

সর্দারজি ঠিক সময়েই আবার এরোড্রামে এনে হাজির করে দিল। ভবতোষবাবু নেমে ড়া মিটিয়ে ঢুকে এলেন লবিতে। ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন অশান্ত পায়ে। বেশী সময়

ছিলো না। দেখতে দেখতে নড়ে চড়ে উঠলো যাত্রীরা, আইন কানুন পেরিয়ে চত্বরের ব
এসে দাঁড়ালো। ভবতোষবাবু তাকিয়ে দেখলেন, লাল গোল মস্ত সূর্যটা টুক করে ডুবে
দিগন্তে। বুকটা যেন হাহাকার করে উঠলো। হঠাৎ ঘুরলেন তিনি। তারপর হেঁটে হেঁটে অ
লবিতে ফিরে এলেন, একটু দাঁড়িয়ে বাইরে এলেন। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধ
হয়ে এলো দিনটা। অনেক পরে, অনেক ভেবে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাগটা নিয়ে বড়ো রাস্তায়
একটা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

লাভ নেই বম্বে গিয়ে। কলকাতাতেই অপেক্ষা করতে হবে, এখানেই আবার দেখা
আমাদের। এই আমাদের জায়গা। বম্বে গিয়ে অনুশ্রীদেবীর মতো বিখ্যাত অভিনেত্রীর
দেখা করা অসম্ভব। মনে মনে ভাবলেন তিনি। তাছাড়া বম্বের কিছুই তিনি চেনেন না। খুঁ
খুঁজতেই তো কেটে যাবে দিন। খুঁজে পেলেও কি তার মতো একজন দীন হীন গ্রাম্য মাস্টা
ঢুকতে দেবে কেউ? দেবে না।

তবু এটা কলকাতা, এখানে তাঁর অবিরাম চেষ্টার ফল ফললেও ফলতে পারে। তা
নিজের কানে শুনে এসেছেন যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারেন, সুতরাং বম্বে গিয়ে
নষ্ট ছাড়া আর কিছুই হবে না।

কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি? নেই। এতো অকাল পড়েছে ট্যাক্সির? এই শহরে? এই কলকাত
আগে তো তিনি সাধাসাধি করতে দেখেছেন। চড়বার লোকই পাওয়া যায়নি। এই
যুদ্ধোত্তর কলকাতার চেহারা? তা ভালো। সমৃদ্ধি হয়েছে লোকেদের।

মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি নিজে ক'দিন ট্যাক্সি চড়েছিলেন কলকাতা থাকতে।
গোনা যায়। ভাবতেই পারতেন না ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতার কথা। প্রতিদিনের বাস ট্রা
পয়সা থাকলেই যথেষ্ট। সত্যি, জীবনটাকে বিকিয়ে দিয়েদিলেন। একেবারে কাঙাল
রেখেছিলেন তাঁর মা।

যেদিন লাবণ্য চলে গেল তাকে ছেড়ে, মেয়েকে আঁকড়ে ধরে মরার মতো পড়েছি
তিনি, তারপর হঠাৎ মহেশকে ডেকে ট্যাক্সি আনতে বললেন একটা, আর বলেই মনে পড়
আজ মাসের ছাব্বিশ তারিখে ট্যাক্সি চড়বেন তিনি! পয়সা কই? কুড়িটা টাকা কোনো
ছাত্রের বাবার কাছ থেকে আগাম চেয়ে এনে আগের দিন মা'র হাতে দিয়েছিলেন।
নিজের হাতে মাত্র কয়েক আনা পয়সা।

মা এসে শিয়রে বসলেন, মাথায় হাত বুলোলেন, বোনেরা সেবা যত্নে তৎপর হয়ে উঠ
ভবতোষ বললেন, 'টাকা দাও।'

চোখ কপালে তুলে মা বললেন, 'টাকা! টাকা কোথায় পাবো?'

'কাল কুড়ি টাকা দিলাম না?'

'আজ বাজার করে তার আর কী অবশিষ্ট আছে?'

'যা আছে তাই দাও।'

'কী করবি?'

'দরকার আছে।'

'ট্যাক্সি চড়বি?'

'হ্যাঁ।'

'খাবার পয়সা নেই, ট্যাক্সিতে উড়োবি?'

'মা, কথা বোলো না, দাও।'

মা ভুরু বাঁকালেন, 'ট্যাক্সি চড়ে বৌ আনতে যাবি, এই তো? ভব, তুই কি পুরুষ?'

'আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারবো না।'

'তুই স্বামী তোর দর্প নেই একটা? যাক না, থাকুক না গিয়ে মামার বাড়ি, দেখুক না কেমন াগে। মেয়ে পর্যন্ত নিল না, বুঝতে পারছিস না কেমন মেয়ে?'

'উঃ মা—'

লাফিয়ে নামলেন তিনি খাট থেকে, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। না, সোজা তিনি াবতোষবাবুর বাড়িতে যাননি। ঘুরে-ছিলেন, অনেক ঘুরেছিলেন। পথে, পার্কে, লেকের ধারে াটতে হাটতে পা ধরে এসেছিলো তাঁর। তারপর এক সময়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে শিবতোষবাবুর াড়ি গিয়ে কড়া নেড়েছিলেন জোরে জোরে। তিনি বুঝেছিলেন তাঁর অন্যায়, তাঁর অবিচার, াঁর কাপুরুষতা। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছিলেন লাবণ্যকে নিয়ে সত্যিই আর এদের সঙ্গে া। এরা আস্তে আস্তে তাকে বিষ করে তুলেছে, এ বিষ আরো দূরে তাঁকে নিয়ে যাবে। যদি াই না হবে, তা হলে কি তিনি শিবতোষবাবুকে দিয়ে নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করতে পারতেন? ারকম বিশ্রীভাবে সন্তানকে তুলে কথা বলতে পারতেন। ছি। ছি। ছি। লক্ষ্মী যে তার নিজের ময়ে এ বিষয়ে সত্যি কী তার সংশয় ছিলো কোনো? তবুও ছোটোলোকোমি না করে পারলেন া। কী করে পারবেন? একটা ছোটোলোক তাঁর বুকের ভিতরে কায়েমী হয়ে আসন পেতে

সেই ছোটলোকটাকেই সেদিন তিনি উপড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। সত্যি অনেক নীচে নমেছেন, আর না। আর না।

শিবতোষবাবুর ঠাকুর এসে দরজা খুলে দিয়ে এক গাল হাসলো 'ওমা, আজ কী ভাগ্য। াকবার দিদিমণি একবার জামাইবাবু আসুন, আসুন।'

'দিদিমণিকে ডাক তো।'

'উনি তো চলে গেছেন।'

'কখন?'

'সে তো অনেক আগে।'

'বাবু কোথায়?'

'বাবু নেই।'

'হুঁ। আবার বুকের ভিতর জ্বলে উঠলো। একসঙ্গে বেরিয়েছে তা হলে। মনে মনে বললেন তনি। হাতের ঘড়ি দেখে বললেন 'ক'টার সময় এসেছিলেন দিদিমণি?'

'তা পাঁচটা টাচটা হবে।'

'গেছেন কখন?'

'তখুনি।'

'তখুনি?'

হিসেব করে দেখলেন যদি তখুনি ফিরে যায় তাহলে আটটার মধ্যে পৌছোনো অবশ্যই ছিলো। তা লাবণ্য ফেরেনি। কেননা আটটা পর্যন্ত তিনি বাড়ি ছিলেন, এখন প্রায় সাড়ে 'টা।

'ঠিক আছে।' ফিরছিলেন তিনি কিন্তু তক্ষুনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাবু আর দিদিমা
একসঙ্গেই বেরিয়েছেন তো?'

'আজ্ঞে, বাবু তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'স্যাটিংয়ে!'

'কবে?'

'কাল রাত্রে।'

'কাল রাত্রে, স্যাটিংয়ে গেছেন?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দিদিমণি জানতেন?'

'আজ্ঞে না! দিদিমণিও বাবুকে না পেয়ে চলে গেলেন।'

'কিন্তু আপনার ভাই জানেন।'

'আমার ভাই?

'পরিতোষবাবু তো কাল এসেছিলেন।'

'পরিতোষ!'

'হ্যাঁ, জামাইবাবু। উনি তো পেরায়ই আসেন।'

'কেন বলো তো?'

'বোধ হয় টাকা নিতে।'

'টাকা নিতে?'

'এলে বাবু টাকা দেন, আমি দেখেছি।'

'তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, দরজা বন্ধ করে দাও।'

'এক কাপ চা খেয়ে যাবেন না।'

'না ঠাকুর, পরে আসবো।'

রাস্তায় এলেন তিনি। রাগে পরিতোষকে ধরে তাঁর চাবকাতে ইচ্ছে করছিলো। স্কাউন্ড্রেল
এখানে এসে টাকা চেয়ে নিয়ে যায়? আজই এর তিনি হেস্ত নেস্ত করবেন।

কিন্তু লাবণ্য? তবে সে কোথায় গেল? আর তো কোথাও যায় না সে। আর কে আ
তার?

. কেউ থাকার দরকার কী? পার্ক আছে, লেক আছে, ময়দান আছে, হয় তো কোথাও গি
বসে বসে কেঁদেছে তারপর বাড়ি গেছে। বেদনায় ভরে উঠলো মনটা। সত্যি, বিয়েই করেছে
স্বামীর কর্তব্য কিছুই পালন করেননি।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিললেন তিনি।

যতো তাড়াতাড়িই ফিরুন, দশটা বেজে গিয়েছিলো, পাড়া দশটাতেই নিঃঝুম। বা
অন্ধকার। হবেই। দশটা রাত্রি নিতান্ত কম নয়। কিন্তু যতো রাত্রিই হোক, লাবণ্য ঠিক আ
জ্বেলে রাখে, বসে থাকে না খেয়ে। বাড়ির সকলের তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া অভ্যেস।

াতোষবাবুর টিউশনি সেরে ফিরতে রোজই রাত হয়। দূর থেকে তিনি নির্দিষ্ট জানালায় লো দেখে দেখে এগিয়ে আসেন। তিনি জানেন, এ জানালার পাশে একটি মানুষ ঠিক ড়িয়ে আছে অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে। ভাবতে ভালো লাগে তার, ক্লান্তি কমে আসে। যখন জায় টোকা দেন, খুলে দিয়ে সে অভিমান করে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়, ভবতোষবাবু জড়িয়ে বন তাকে চুম্বন করেন সব দুঃখ ভুলিয়ে দেন।

কিন্তু আজ সে জানালা অন্ধকার। অন্ধকার। অন্ধকার। সারাবাড়ি অন্ধকার। তা তো বই। আজ তো তার অভিমান নয়, অপমান। আজ কেন সে আলো জ্বালিয়ে রাখবে। আজ র অন্ধকারে শুয়ে কাঁদবার কথা। সত্যি অন্যায় করেছেন তিনি। অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। ১দিন নয়, দু'দিন নয়, দিনের পর দিন তিনি এই অন্যায় করে চলেছিলেন স্ত্রীর উপর। আজ র অবসান করবেন। তিনি বুঝেছেন এ ভাবে জীবন চলে না, চলতে পারে না। যাদের জন্য নি সর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছেন, যাদের সুখ সুবিধার দিকে তাকিয়ে নিজের অস্তিত্বের অসম্মান রছেন তারা কখনো তার দিকে তাকাবার কথা ভাবে না, ভাববেও না। মনে মনে বারবার মা চাইলেন তিনি স্ত্রীর কাছে।

লাবণ্য। আর তুমি রাগ করো না, আমি তোমার সব কথা শুনবো, সব কথা বুঝবো। আমি াতে পেরেছি সকলেই কেবল সুবিধে নিচ্ছে। আমার কাছ থেকে তো বটেই, তোমার কাছ ওে। ভাই-বোনদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, নিজের মা হয়েও শত্রুতা করছেন অম্লান মুখে। মি কালই এর যা বিহিত করতে হয় করবো। আমি ওদের পাঠিয়ে দেব দেশে। থাকুক, খুক, বুঝুক কতো ধানে কতো চাল।

যার যা খুশী করবে আর একটা লোককে উদয়অস্ত গাধার খাটুনি খাটাবে, এ আর চলবে কর্তব্যের দিক থেকে নিজের স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ—করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ। বাবাও কি ই করেন নি? ঠাকুমা তো চিরদিন দেশে থেকেছেন। মাসে মাসে সামান্য মাসোহারা গেছে। একবার যা-ও-বা এসেছেন ছেলের কাছে থাকতে, মা কি টিকতে দিয়েছেন তাকে? না কি কে অমান্য করে বাবাই রাখতে পেরেছেন তাঁকে। ভবতোষবাবু তখন সাত বছরের বালক। লো লাগতো তার ঠাকুমাকে! সাদা থান, সাদা চুল আর সাদা রং' শান্ত নরম স্বল্পভাষী কুমা! ঠাকুমা এলে মা'র কাছে শুতে ইচ্ছে করতো না। ঠাকুমার বিছানায় গিয়ে ঘুমের ভান র পড়ে থাকতেন; মা দু'একবার ডেকে চলে যেতেন। ঠাকুমা হাত বুলোতেন গায়ে মাথায়, রারাত পাখার বাতাস করতেন। ঐ সাত বছর বয়সেই ঠাকুমাকে শেষ দেখা। শেষে মারা ালেন তিনি। বাবার প্রায় মায়ের বয়সী এক দিদি ছিলেন, তিনি এলেন, ভাই বোনে কাঁদলেন ড়াজড়ি করে, মা রান্না ঘরে দাঁড়িয়ে মুখ বাঁকালেন।

অতি অল্প বয়সের স্মৃতি। সব ভালো মনেও নেই। তবু ঝাপসা ঝাপসা ভাবে এতোদিন দে সে সব ছবিই মনে পড়তে লাগলো তাঁর। মায়ের উপর মনটা কেমন তিক্ত হয়ে উঠলো। ই মায়ের জন্যই বাবা ঠাকুমাকে সুখী করতে পারেন নি। এই মায়ের জন্য ভবতোষও আজ র স্ত্রীকে দেখছেন না। জীবনে একটা জিনিস তিনি হাতে করে নিয়ে আসেন নি তার জন্য, ছে মা রাগ করেন। কোনো দিন যদি নেহাৎ প্রয়োজনে দু'চারটা টাকা হাতে দিয়েছেন, মা নতে পারলে সারাবাড়ি তোলপাড় করে তুলেছেন। আর তিনি, ভবতোষ রায়, ভয়ে কেঁচো য় বেরিয়ে গেছেন বাড়ি থেকে! নিজে অশান্তির হাত এড়িয়ে এগেছেন কিন্তু পিছন ফিরে

দেখেননি স্ত্রীকে। আর শুধু কি ওরা তাঁকেই খাটায়? লাবণ্যকে খাটায় না? উদয়াস্ত লেগে ৎ
সংসারের কাজ। এ তো তিনি নিজের চোখেই দেখেন সারাদিন। মানুষটা সকাল থেকে
চরকির মতো ঘুরতে থাকে। ভোর ছ'টায় উঠে ঘরে ঘরে চা পৌঁছে দেয়া থেকে সুরু :
স্বামীকে খাইয়ে স্কুলে পাঠানো পর্যন্ত তাকে একবারের জন্য বসতে দেখেছেন বলে তো
পড়ে না।

অথচ বোনেরা দিব্যি বসে শুয়ে গল্পের বই পড়ে সময় কাটায়। মা শুধু তরকারীটুকু
দেন এই। পরিতোষের আটটার আগে কোনোদিন ঘুম ভাঙে না, মেয়েরা প্রায় তথৈবচ, সুে
সকলের সব খেজমৎ বাইরে তিনি আর ভিতরে তাঁর স্ত্রী। লোক সংখ্যা শহরের পক্ষে নি
কম নয়। কাজের লোক তো ঐ একটি, মহেন্দ্র। সে তো রান্না নিয়েই ব্যস্ত। না, না কক্ষনো
কক্ষনো আর এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবো না আমি। কিছুতেই না।

অনুতপ্ত বিগলিত হৃদয়ে নিজেকে লাবণ্যর পায়ের তলায় আছড়ে ফেলার ব্যাকুল বাসনা
দরজার কড়া নাড়লেন তিনি। একবার, দু'বার, তিনবার। তবু কারো সাড়া পাওয়া গেলো
বোঝা গেল ঘুমিয়ে পড়েছে সব। চতুর্থবারের বার মহেন্দ্র এসে খুলে দিল। আলো ে
নিজের ঘরে ঢুকলেন তিনি। ঢুকেই চমকে উঠলেন। কোথায় লাবণ্য! ঘর তেমনি বিশৃ
তেমনি বিপর্যস্ত শূন্য। বিছানাটাও পাতা হয়নি, মেয়ের দোলনাটাও খালি। তবে? ম
দাঁড়িয়েছিলো পিছনে। ত্রাসিত গলায় ভবতোষ বললেন, কোথায়? কোথায় সব?

মাথা চুলকে মহেন্দ্র বললো, 'আজ্ঞে সবাই তো ঘুমুচ্ছেন। বৌদি ফেরেন নি।'

'ফেরেন নি?'

আজ্ঞে না। বাচ্চা কাঁদছিলো খুব, মা খুব রাগারাগি করছিলেন আমি কোলে করে চা
চাপড়ে ঘুম পাড়িয়েছি। এখন মা'র বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

'বৌদি ফেরেন নি?'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক জান?'

'আমি তো সব সময়েই বাড়ি ছিলাম।'

'তা হলে—তা হলে—'

'আপনি ভাববেন না দাদাবাবু। বৌদি নিশ্চয়ই তেনার মামার কাছে গেছেন।'

'মামার কাছে।'

'রাগ করলে তো বৌদি মামার কাছেই চলে যান। কী করবেন, এখানে বড়ো কষ্ট
বৌদির। মা এতো—মহেন্দ্র চুপ করে মাথা চুলকালো।

ভবতোষ দাঁড়িয়ে থাকলেন স্তব্ধ হয়ে।

মহেন্দ্র গলা খাটো করে বললো, 'মা বড়ো কষ্ট দেন বৌদিকে। কতোদিন খেতে মাছ
না, ভাত কম পড়ে। এ সব বৌদি খেয়ালও করেন না কিন্তু ঐ মামাকে নিয়ে কিছু বল
কেঁদে ফেলেন। মামাবাবু যে কতো ভালো আমি তো জানি। মানুষের বাপও এমন থাকে
আপনি তো সব কথা জানেন না, শোনেনও না। কাল দুপুরে বাড়িওয়ালার ছেলেটা এে

লা। চিৎকার করে ডাকাডাকি গালাগালি। ছোট দাদাবাবু ঘরে বসে, একবার বেরুলেন না। ও না, দিদিরাও না। বেরুলেন শেষে বৌদি। আমার খুব রাগ হলো সকলের উপর। মাকে য় বললাম, 'বাড়িওয়ালার ছেলে ভাড়া পাচ্ছে না বলে যা তা বলছে বৌদিকে, আপনি । মা চুপ করে রইলেন, ছোটদাদাবাবু বললেন যাদের বাড়ি তারা সামলাক, মা কী করবেন। মি বললাম, 'তা হলে আপনি যান। বলেন তো দাদাবাবু অন্যায় বলেছিলাম? ব্যাটাছেলের ং ব্যাটাছেলেরই কথা বলা উচিত। নয়তো মা বুড়ো মানুষ মা বেরুবেন। তা, ছোটবাবু াকে প্রায় মারতে বাকী রাখলেন। এ বাড়িতে আর এক মিনিটও আমি থাকতাম না, লাম বৌদির জন্য। আমিই গিয়ে বৌদির পিছনে দাঁড়ালাম এমন সময় মামাবাবু এসে ঙ্গর। ভবানীপুরে কোথায় কাজে এসেছিলেন, দেখা করে যেতে এসেছেন বৌদির সঙ্গে। থেকে নেমে শেষে তিনি কথা বললেন বাড়িওয়ালার ছেলের সঙ্গে। বাড়ী ভাড়া দিয়ে ায় করলেন। আমি তো সব জানি? বৌদি কাঁদছিলেন, আদর করে শান্ত করলেন মামাবাবু। ায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, আমার কাছ থেকে নিতে তোর কান্না? সে কী। তা হলে আর মামা ডাকিস না, বাবা ডাকিস। তা হলেই লজ্জা চলে যাবে। বাবার কাছ থেকে নিতে আর মেয়ের অপমান হবে না? এই বলে খুব হাসলেন। হাসি শুনে মা আর দিদিমণিরা ঝুঁকি করতে লেগেছিলেন, আমি মামাবাবুর জন্য এক কাপ চা করে নিয়ে এসে দেখলাম দি তাই দেখে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। বাবু, আমি এ বাড়ির চাকর, আর এতো কথা বলা ভা পায় না কিন্তু মামাকে নিয়ে মা যে সব কথা বলেন আমার তো সহ্য হয় না। আমার দির হয়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।'

ভবতোষ জবাবে একটা কথাও না বলে প্রায় ঝড়ের বেগে আবার বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। ার ছুটে এলেন টালিগঞ্জে শিবতোষবাবুর বাড়িতে। কিন্তু কোথায়? কোথায় লাবণ্য?

ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভেঙে ঠাকুর এসে দরজা খুললো। ব্যস্ত গলায় ভবতোষ বললেন, াথায়? কোথায় তোমার দিদি? ডাক, ডেকে দাও তাকে।' বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ঠাকুর লো, 'তিনি তো সেই সন্ধ্যে বেলায় চলে গেছেন, আর তো আসেননি।'

'আসেননি?'

'না তো।'

'তবে? তবে সে কোথায় গেল?'

'বাড়ি যাননি?'

'না ঠাকুর, না, সিঁড়ির উপরেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ভবতোষ।

হতভম্ব ঠাকুর কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুদ্ধি করে লাবণ্যর লেখা চিঠিটা এনে দিয়ে বললো, া পড়ে দেখুন তো। যাবার আগে লিখে রেখে গেছেন এটা।

ভবতোষ সাগ্রহে টেনে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন।

মামা,

তোমাকে আমি পিতার মতো ভালোবাসি, ঈশ্বরের মতো ভক্তি করি। এই তোমাকে য়ও আমার স্বামীর বাড়িতে যে কুৎসিৎ সব মন্তব্য প্রত্যহ আমাকে শুনতে হয় তাতে আমার া পুড়ে যায়! শেষ পর্যন্ত আমার স্বামীর মনেও যখন এই বিষ সংক্রামিত হয়েছে তখন ার আর বেঁচে থাকার কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। যাবার সময়ে তোমার সঙ্গে

দেখা হলো না এই দুঃখ। তা একরকম ভালোই হয়েছে। দেখা হলে হয় তো আমি দুর্বল পড়তাম, কাঁদতাম, চোখের জলে মনের জোর মুছে যেতো। ঐ অপদার্থ ব্যক্তিটিকে আবার হ তো ক্ষমা করতাম। এই ভালো হলো। কিন্তু বাচ্চাটার জন্য বুকের অন্ত্রী-তন্ত্রী ছিঁড়ে যাচ্ছে শুনে স্তম্ভিত হবে যে ওর বাবা ওকে নিয়েও সন্দেহ করছেন। এর চেয়ে দুঃসহ অসম্মান আ সে আমাকে কী করে করতে পারে। এই প্রমাণ করতেই আমার জীবনপণ। শেষবারের মতে তোমাকে আমার অনেক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই

আমার মৃত্যু জন্য কেউ দায়ী নয়।

হতভাগিনী লাবণ্য

মৃত্যু! মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়? তার মানে সে আত্মহত্যা করেছে?

লাবণ্য! লাবণ্য আত্মহত্যা করেছে? তাকে ফেলে? তার মেয়েকে ফেলে?

'ঠাকুর। ঠাকুর।' উদ্‌ভ্রান্তের মতো চিৎকার করে ডেকে উঠলেন ভবতোষ। ঠাকুর চমকে মুখ তুলে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে রইলো। ভবতোষ তার হাত চেপে ধরলেন, 'বল বল, সে কোথায় গেছে, কী খেয়েছে, কী বলেছে, সব—ঠিক মতো বলো।'

ভবতোষের অবস্থা দেখে ঠাকুর ভয় পেয়ে গেল।

'ঐ তো বললাম জামাইবাবু। যখন এলেন দিদিমণির চেহারা খুব কেলান্ত ছিলো, আমি খেতে বললাম, খেলেন না, কাগজে মাথা ধরার অষুধ লিখে দিলেন, আমি নিয়ে এলাম—

'মাথাধরার অষুধ? কী অষুধ?'

'সে তো জামাইবাবু আমি জানিনা।'

'কোথা থেকে আনলে?'

'অনিলবাবুর ডাক্তারখানা থেকে।'

'হায়। হায়। না জেনে তুমি কী করেছ ঠাকুর । অষুধ তুমি তাকে এনে দিলে—'

'ঐ অষুধ আমি চিনি জামাইবাবু। ঐ অষুধ খায় মাথা ধরলে। আমাদের বাবু খান। আমি জল এনে দিলাম—'

'তারপর!'

'তারপর আমি দিদিমণিকে বসিয়ে রান্নাঘরে চলে গেছি। চা করে এসে দিখি দিদিমণি কেবল শিশিটা পড়ে আছে।'

'শিশিটা? কই? দেখি?'

'সেটা ফেলে দিয়েছি।'

মাথার চুল ছিঁড়লেন ভবতোষ। আবার বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। আবার একটা ট্যাক্সি নি বাড়ি এলেন।

রাত দুটো পর্যন্ত এই ছুটোছুটি চললো। একবার এ বাড়ি একবার ও বাড়ি রাস্তায় রাস্তা ঘুরলেন, পার্কে পার্কে খুঁজলেন, যেতে পারে এমন সম্ভাব্য কোনো জায়গা বাদ দিলেন ন কিন্তু কোথায় এক ফোঁটা আলোর রেখা দেখতে পেলেন না।

সাতদিন ধরে একটা পাগলের মতো তিনি শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছু বেড়িয়েছিলেন। তারপর হতাশ হয়ে একদিন থামলেন। এমন কি শিবতোষবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হলো না। ঠাকুর বললো, স্যুটিং থেকে ফিরেই টেলিগ্রাম পেয়ে আবার কোথা চলে গেছেন।

আপদ তাড়িয়ে বাড়ির লোকেরা নিশ্চিন্ত হলো। দেড় বছরের লক্ষ্মী তিন মাস ধরে সমানে মায়ের অভাবে চিৎকার করে করে ভবতোষের ন্যাওটা হলো, আর ভবতোষ দু'মাস আঠেরো দিন পরে কলকাতা ছাড়লেন।

আশ্চর্য! কতদিন কেটে গেল তারপরে। অথচ তখন মনে হয়েছিলো—এই, ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—একটা ট্যাক্সি পাওয়া এতো কঠিন হয়েছে কলকাতায়? দৌড়ে গিয়ে ধরলেন, হাতল ঘুরিয়ে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি।

ভবানীপুরেই ফিরে এলেন আবার। দেখে দেখে যে কোনো একটা হোটেলে এসে নামলেন।

অপেক্ষা করতে হলো না বেশী। ঠিক করলেন কি ভুল করলেন ভাববার তেমন অবকাশ হলো না, তৃতীয় দিনের দিনই জেনে গেলেন যার জন্য কলকাতাতেই থেকে গেলেন, তিনি এসে গেছেন। আর জানা মাত্রই দৌড়ে গিয়ে হাজির হলেন দরজায়। কিন্তু দরজার বাইরে গিয়ে পৌঁছুলেই যে ভিতরে ঢোকা যায় না সেটা মনে হয়নি আগে! শুধু তিনি একাই তো খবর পাননি, সারা কলকাতাই যে জেনেছে। সুতরাং সারা কলকাতাই যে ভেঙে পড়বে তার আর আশ্চর্য কী?

অগণিত ভক্তের ভিড়ে আরো একজন হয়ে পুরো দু'দিন ঠেলাঠেলি করে ফিরে এলেন হতাশ হৃদয়ে। রাত্রিবেলা মনস্থির করলেন ফিরে যাবেন। এত কষ্ট হলো। আর তো কিছুই তিনি চাননি, শুধু একবার একটু চোখের দেখা। ভীষণ, ভীষণ তৃষ্ণা ঐ দেখাটুকুর জন্য। লাবু, আমার লাবু, একবার, শুধু একবার দেখতে চাই তোমাকে। যতো বড়োই হও, যেমনই হও, যদি অন্য কারো স্ত্রী-ও হও, তবু আমি তোমাকে দেখতে চাই, একবার। তোমার পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে বলতে চাই, আমাকে ক্ষমা করো।

বুদ্ধিটা হঠাৎ এলো মাথায়। বন্দরপুর ফিরে আসবার জন্য হাওড়া স্টেশনে এসেও ফিরলেন তিনি, ফিরেই চিঠি লিখলেন একটা।

লাবণ্য,

স্বামীত্বের অধিকারে নয় তোমার সন্তানের পিতা বলেও নয়, শুধু ভালবাসি বলেই তোমাব রোগশয্যায় একবার তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। যদি অনুমতি দাও কৃতজ্ঞ হবো।

আজ ছ'দিন যাবত তোমার ভক্তদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে হেরে বাড়ি ফিরে আসছি। বুঝেছি তুমি নিজে ডাক না দিলে তোমার কাছে যাবার অন্য কোনে উপায় নেই।

আমি ততটা নির্বোধ নই আমি জানি তুমি এই দীর্ঘ দিনে আমার কথা মনে করে বসে থাকনি। আমি জানি তোমার সফল সার্থক আনন্দময় জীবনে আমার মতো একজন অপদার্থের কোনো জায়গা থাকা সম্ভব নয়। হয় তো তুমি এতোদিনে আর কারোকে ভালোবেসে আমার অযোগ্যতাকে আরো জমাট করে উপলব্ধি করেছ, তবু—সেই সব বুঝেও অবুঝের মতো একবার তোমাকে দেখবার জন্য আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছি।

হতভাগ্য ভবতোষ।

চিঠিটা খামে ভরে, টিকিট লাগিয়ে ডাকে দিয়ে এলেন নিজ হাতে।

আর একটি উদ্বিগ্ন বিনিদ্ররাত ভোর হলো লক্ষ্মীর। চিন্তিত মনে মুখ ধুয়ে সে বারান্দায় এসে বসলো, আয়া চা নিয়ে এলো। কাল রাত্রে ঝড় গেছে খুব, বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আছে

বাগানে, ফুলগাছগুলো তচনচ। আকাশের মুখ তখ্যনো ভার। লক্ষ্মী সেদিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিল।

সুখন বললো, 'আজ রোববার। অন্য রোববার বাবু কলকাতা গেছেন। আটদিন।'

'আটদিন! এর মধ্যে আটদিন হয়ে গেল? লক্ষ্মী যেন আঁতকে উঠলো।

আয়া বললো, 'কাজে গেলে অমন দেরি হয়। বাবা তো লিখেছেন কাজ শেষ হলেই চলে আসবেন।'

'ওটা কি একটা লেখা? এক লাইনের একটা পোষ্টকার্ড। আয়া, আমি কলকাতা যাবো।' প্রায় কান্না বেরুলো লক্ষ্মীর গলায়।

আয়া যত্ন করে রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিল। সেই রুটি লক্ষ্মী ঠেলে সরিয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকলো।

মুখ ঢেকে এই কান্নার উৎস যে তার শুধুমাত্র বাবার জন্য তাই নয়, আরো একটি অলিখিত অনির্দ্দেশ্য কারণে মন তার অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে দু'দিন ধরে। এই দু'দিন তার সময় কাটছে না, তার ভালো লাগছে না কিছু, এই দু'দিনে জীবনের স্বাদ কমে গেছে তার।

আয়া মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। সুখন বললো, 'সাহেব বাবুকে কি ডেকে আনবো গিয়ে?'

বলা মাত্রই মুখ তুলে প্রায় চেঁচিয়ে ধমকে উঠলো লক্ষ্মী, চোখ পাকিয়ে বললো, 'খবরদার। কক্ষণো যদি সাহেববাবুর বাংলোয় যাস তা হলে আর আস্ত রাখবো না তোকে।'

সুখন এই অপ্রত্যাশিত ধমকে অবাক হয়ে চুপ করে গেল। আর লক্ষ্মী চা ফেলে চলে গেল ঘরের মধ্যে। গিয়ে তো জানালায় দাঁড়ালো, সে জানালায় দাঁড়ালো এটা নাড়লো, সেটা ফেললো, তারপর চিঠি লিখতে বসলো বাবাকে। লিখলো।

'বাবা, তুমি আজ আট দিন হলো এখান থেকেই গেছ, গিয়ে সেই যে একখানা দু' লাইনের পোষ্টকার্ড লিখেছ তারপরে আজ পর্যন্ত আর কোনো খবর নেই। তুমি কেন আমার সঙ্গে এইরকম লুকোচুরির মতো ব্যবহার করছো? আমি কী করেছি? আমি কখনো ভাবিনি তুমি আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে রেখে কোনো কিছু করতে পার।

লিখেছ, বম্বে যাবে বলে রওনা হয়েছিলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে হলো না, প্রয়োজনটা কলকাতাতেই মিটবে বলে। অথচ সে প্রয়োজনটা যে কী, সেটাই এখনো আমাকে জানাওনি। অর্থাৎ সেটা আমাকে তুমি জানাতে চাও না। আমি কোনদিন ভাবিনি তুমি আমাকে এই রকম দূরে ঠেলে রাখবে, কিছু জানাবে না। ঠিক আছে। আমিও এখন থেকে আপন মনে থাকবো, কোনো কথা খুলে বলবো না।

এই পর্যন্ত লিখে দাঁতে কলম কামড়ালো, লক্ষ্মী তারপর লিখলো, 'আমি যে এখানে একা একা রইলাম সেজন্য তোমার বোধ হয় একটুও চিন্তা নেই। বোধহয় মনে মনে ভাবছো তোমার অনুগত ছাত্রটি আমাকে কতোই না দেখছে। তা মোটেও নয়। কয়েকদিন ভালো মানুষী করে একটু এসেছিলো ঠিকই, কিন্তু তারপরেই কর্তব্য শেষ। পুরো দু'দিন হয়ে গেল তাঁর পাত্তা নেই। নেই তো নেই—তা বলে আমিও সেধে ডেকে আনতে চাই না।

বেশ তো যা মন চায় তাই করুন না। আমি কি আর জানি না এখানে আসবার তার সময় হয় না কেন? জানি। ভালো করেই জানি। শীতল কাকিমা সব বলে গেছেন আমাকে।

সেফের স্ত্রী চিঠি লিখে তাঁর বোনকে নিয়ে এসেছেন এখানে। সুপ্রকাশ সেনকে নাকি তাঁর ব পছন্দ। বোনের বিয়ে দেবেন তার সঙ্গে। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ চলছে খুব। এখন কি আর প্রকাশের সময় আছে তার মাস্টার মশায়ের মেয়েকে দেখতে আসার? নেই। একেবারেই নেই।

বাবা, আমার আর এখানে থাকতে ভালো লাগছে না। আমি কলকাতা চলে যেতে চাই। বাবা, তুমি এখানে না থাকায় আমার দিন কাটছে না। বাবা গো—'

এখানেই থাকতে হলো লক্ষ্মীকে। কেননা বারান্দার নীচে বৃত্তাকার পাথরের নুড়িতে শব্দ লে একটি গাড়ি এসে থামলো এবং সেই গাড়িটি যে কার তা উঁকি মেরে না দেখলেও লক্ষ্মী ঝতে পারতো।

সুখন খবর নিয়ে এলো। তবু একটু অপেক্ষা করলো লক্ষ্মী, ধীরে আস্তে শাড়িটা ঠিক করে, লোমেলো মাথায় চিরুণী বুলিয়ে তারপর এলো।

'কেমন আছেন?' বসেছিলো সুপ্রকাশ, তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

'ভালো।' লক্ষ্মী চোখ তুললো না।

'দু'দিন আসতে পারিনি—'

'স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক কেন?'

'প্রত্যেক দিন এখানে আসবারতেমন সঙ্গত কারণ কী-ই বা আছে।'

'নেই বুঝি?'

'ব্যক্তিগত কাজ থাকে না মানুষের?'

'কার যে কোনটা ব্যক্তিগত কাজ তা কেউ বলতে পারে না।'

'সে তো ঠিকই।'

'কার যে কোনটা ব্যক্তিগত কর্ম তা কেউ বলতে পারে না।'

'হয় তো কিছুটা আন্দাজ করা যায়।'

'আমার সম্পর্কে আন্দাজটা আপনার কতোদূর গেছে বলুন তো।'

জবাবে লক্ষ্মী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। মনের উত্তাপটা কেবলি বেরিয়ে আসতে ইছে। সংযত হলো সে। দাঁড়িয়ে থাকা সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে দূরের মানুষের মত ভদ্রতা রে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কী আশ্চর্য। বসুন। চা খাবেন?'

'আপনার কী হয়েছে?' গলার স্বর গভীর করলো সুপ্রকাশ।

'কী হবে?'

'এতো মুখভার কেন?'

'না তো।'

'আমি চলে যাবো?'

'ইচ্ছে হলেই যাবেন, আমার বলবার কী আছে।'

'আশা করি এই দু'দিন বেশ ভালেই ছিলেন।'

'মন্দ নয়।'

'মাস্টার মশায়ের চিঠি এসেছে?'

'না।

এরপরে হঠাৎ যেন কথা ফুরিয়ে গেল। টেবিলের উপর ফেলে রাখা ওয়াটার-প্রুফট হাতে নিয়ে সুপ্রকাশ পা বাড়ালো, 'মনে হচ্ছে আমি আসতে আপনি বিব্রত বোধ করছেন। ত হলে আসি।'

লক্ষ্মী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থেকে বললো, 'হ্যাঁ, রোববারে বেলাটা আ এভাবে নষ্ট করবেন কেন।'

'কী করলে সার্থক হয় বলুন তো?'

'যে ভাবে এ দু'দিন হয়েছে।'

'এ দু'দিন? এ দু'দিন কোথায় ছিলাম কেমন ছিলাম কী খেয়েছি, কেমন করে ফিরে এসে তা কি আপনি জানেন?'

'জানি।'

'কী জানেন?'

'এই শহরটা তো কলকাতা নয়, আর মুন্সেফ কাকিমারা খুব কিছু দূরে বাস করেন না

'মুন্সেফ কাকিমা!'

'মনে হচ্ছে চেনেন না।'

'চিনি বলেও তো মনে হচ্ছে না।'

'আমরা তো শুনতে পাই দ্বিতীয় মুন্সেফ রীতেনবাবুর বাড়িটাই এখন আপনার সবচে প্রিয় জায়গা।'

'রীতেনবাবুর বাড়ি?' অবাক হতে হতেও সুপ্রকাশ কৌতুকে চক চক করে উঠলো। আবা বসে পড়ে সহাস্যে বললো, 'তা অবিশ্যি ঠিক।'

'তবে আর এখানে কেন?' লক্ষ্মী থম থম করলো।

'কর্তব্য।'

'কর্তব্য? কর্তব্য কিসের?'

'মাস্টার মশায়ের আদেশটা মানতে হবে তো?'

'মাস্টার মশায়ের আবার কী আদেশ?'

'তিনি যে তাঁর কন্যার নিরাপত্তার ভার আমাকেই দিয়ে গেছেন।'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি নাবালিকা নেই। তাছাড়া এই বন্দরপুর শহরে আমি আবা প্রতিপালিত। এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ আমার আপন। আমার নিরাপত্তা নিয়ে আপনা মাথা ঘামাতে হবে না।'

'তা কখনো হয়?' মাস্টার মশায়কে কথা দিয়েই তো দায়ে পড়েছি। নইলে সত্যি এম সুন্দর রোববারের সকালটা—আরতিকে তো চেনেন আপনি, না?'

'আরতি।' দুই ভুরু এক হলো লক্ষ্মীর।

'আমি রীতেনবাবুর—'

'না চিনিনা। চিনতে চাই না।'

'কেন?'

'পৃথিবীর সকল লোককে চিনে বেড়ানো আমার কাজ নয়।'

'আরতি কি সকল লোক হলো নাকি?'

'কিছু মনে করবেন না—' লক্ষ্মী বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নিল।

'আপনার কাছে তিনি যতোই বিশেষ হোন, আমার তাতে বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।'

'নেই?'

'বাজে কথা থাক। সময় নষ্ট না করে আপনি বরং সেখানেই যান, আমিও আমার গাছগাছটা সেরে নিই।

গোছ গাছ? কিসের গোছ গাছ?'

'কলকাতা যাবো।'

'কবে?'

'আজ রাত্তিরেই।'

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ কী, আমি তো সেখানেই থাকি।'

'তা থাকেন, কিন্তু এখন তো ছুটি।'

'ছুটির মধ্যে কলকাতা আমার নিষিদ্ধ এটা ভাবছেন কেন?'

'না, তা নয় তবে—'

এর মধ্যে কোন তবে নেই।'

'এই সিদ্ধান্তটা কি এইমাত্র নিলেন।'

'কৈফিয়ৎ দিতে পারব ন।'

'একটু যে দিতে হবে।'

'কেন?'

'আমি অনুমতি না দিলে তো আর যাওয়া হবে না?'

'তার মানে?'

'তার মানে আপনার বাবার অনুপোস্থিতিতে আমিই আপনার অভিভাবক।'

কথা শুনে হাড় জ্বলে গেল লক্ষ্মীর। ব্যঙ্গ করে বললো, 'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনার আদেশটা কী?'

প্রথমত, কলকাতা যাওয়া হবে না, দ্বিতীয়ত এক কাপ চা, তৃতীয়ত শ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার অমার্জনীয় অপরাধ, চতুর্থ—' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসলো সুপ্রকাশ, ঈষৎ গাঢ় গলায় বললো, রাগ করেছেন?'

'রাগ! রাগ আবার কী?'

'তবে কী হয়েছে?'

'কী হবে?'

'কিছু না?'

'তা হলে আমি কি সত্যি চলে যাবো?'

'বললেও যাবেন না বললেও যাবেন। আর যাবেনই যদি তাহলে আর বিশেষ মানুষটিকে অপেক্ষায় রেখে লাভ কী?'

'অপেক্ষার চেয়ে উপেক্ষাব দারস্থ হতে যে আমি বেশী উৎসাহী তা কি বোঝা যাচ্ছে না?

ছলনাকারী লোকেদের মুখ মিষ্টিই থাকে। লক্ষ্মী অত বোকা নয় যে সেটুকুও বুঝবে না তার ভঙ্গী সে তেমনি অনমনীয় করে রাখলো, গলার স্বরও যথাসম্ভব কঠিন রেখে বললে 'এসব কথা যথাস্থানে বললেই বেশী সমাদৃত হবে।'

'আর কোনো স্থান যে আমার জানা নেই, তা নইলে এতো ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি না ফিে এখানে আসবো কেন।'

'বাড়ি না ফিরে মানে?'

'মানে এ দু'দিন বনে বাদাড়ে চড়াইতে উৎরাইতে সফর করতে হলো কিনা?'

'সফর?'

'সরকারের গোলাম আমরা, কখন কোন মুহূর্তে হুকুম আসবে তারই আশায় বসে থাকা দেখুন না, পরশু রাত্রে হঠাৎ ট্রাঙ্ককল, তখুনি সোনাদহ যেতে হবে। গেলুম। এতো রাত হে গিয়েছিলো যে আপনাকে জানিয়ে পর্যন্ত যেতে পারলুম না।'

'আপনি টুরে গিয়েছিলেন?'

'কী ঝড়, কী ঝড়! আর তার মধ্যে সারারাত দেড়শো মাইল গাড়ি চালিয়ে এই তো এে পৌছোলাম, সমাদরও মন্দ পেলুম না। এবার তাহলে উঠি।'

'আয়া, সুখন', দেয়ালে ঠেসান থেকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীকে কে যেন সোনা কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণদান করলো। ছটফট করে সে ভিতরে ঢুকে গেল আবার বাইরে বেরিয়ে এলো! গুছিয়ে ফেললো টেবিল, খাবার সাজিয়ে দিল। কৃষ্ণচূড়া ছায়াঘেরা বারান্দার কোণটি স্বর্গ হয়ে উঠলো এতোক্ষণে।

চা খেতে খেতে ভালোমানুষের মতো সুপ্রকাশ বললো, 'আচ্ছা ঐ মুন্সেফ কাকিমা বোনের উপর আপনার এতো রাগ কেন বলুন তো?'

রাগ হবে কেন? আমি কি তাকে চিনি নাকি?'

'না চিনেই এই?'

'আপনারই বা তার কথায় এতো আগ্রহ কেন?'

'হাসিতে চোখ ভাসিয়ে সুপ্রকাশ বললো, 'আমার তো বেশ ভালো লাগে মেয়েটিকে।'

'তা লাগুক না আমার কী।'

'না, তাই বলছিলাম।'

'আপনার ভালোলাগার জন্যই তো এতো আয়োজন।'

'সেটা কী রকম?'

'মুন্সেফ কাকিমা তো তাই চান।'

'বাংলাদেশে এমন সুপাত্র কি চাইলেই মেলে?'

'সুপাত্র নাকি?'

'তার কাছে নিশ্চয়ই।'

'আপনার কাছে?'

লক্ষ্মী ভ্রূকুটি করলো, 'আমার কাছে আবার কি? আমি তো আর কোনো বিবাহযোগ মেয়ের অভিভাবক নই।'

যদি হতেন?

'যদির কথা আমার জানা নেই।'

'বলুন না।'

'কী আশ্চর্য! আমি কি করে বলবো?'

'বেশ। আপনার বাবার মতটাই তাহলে বলুন।'

'এখানে বাবার মতামতের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।'

'নিশ্চয়ই ওঠে। তিনিও তো একজন অবিবাহিতা বিবাহযোগ্যা কন্যার অভিভাবক।'

আরক্ত মুখে লক্ষ্মী চায়ের বাসন গুছোতে মনোযোগ দিল; দূরের কাঁপা কাঁপা রোদ্দুরে তাকিয়ে একটু সময় চুপ করে থেকে গলা গাঢ় করলো সুপ্রকাশ, 'একটা কথা।' সেই গলার স্বরে লক্ষ্মীর বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করলো। 'আমি মনস্থির করেছি।'

অধিক রাত্রে টেলিগ্রাম এলো একটি। ভবতোষবাবু করেছেন। লিখেছেন, 'তোমার মা অসুস্থ, তোমাকে দেখতে চান, এক্ষুনি চলে এসো।'

'আমার মা।' স্তম্ভিত লক্ষ্মী বারে বারে পড়তে লাগলো লাইনটা। বাকী রাত ঘুম হলো না তার। সকাল না হতেই সুখনকে দিয়ে ডেকে পাঠালো সুপ্রকাশকে। সুপ্রকাশ চলে এলো ব্যস্ত সমস্ত হয়ে। টেলিগ্রামটা পড়ে সেও লক্ষ্মীর চেয়ে কম অবাক হলো না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, তা হলে প্রস্তুত হয়ে নাও, আমিই নিয়ে যাবো।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তুর জন্য দেরী করে আর লাভ কী। তুমি জান না এমন কিছু নিশ্চয়ই লুকোনো ছিলো তোমার জীবনে।'

'আমার মা! কে আমার মা। কোথায় আমার মা? এতোদিন তাহলে তিনি বেঁচে ছিলেন?' লক্ষ্মীর বুকের মধ্যে যেন সহস্র প্রশ্ন সহস্র বানের মতো উদ্ধত হয়ে তাকে খোঁচা দিতে লাগলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো। মনে পড়লো খবরের কাগজের ছাপা ছবিটি। মনে হলো সেদিন বাবা সেই ছবিটির দিকেই অপলকে তাকিয়ে দেখছিলেন, সেই ছবিটি দেখতে দেখতেই তাঁর ভাবান্তর হয়েছিলো, তাঁরই অসুখের খবর বেরিয়েছিলো সেদিনের কাগজে, নিশ্চয়ই সেই খবর পড়েই তিনি বিচলিত হয়ে তাঁকে দেখতে আকুল আগ্রহে ছুটে যাচ্ছিলেন বম্বেতে, তারপর কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। সেই ছবি যে এখন কলকাতায়।

তবে কি, তবে কি—সমস্ত ভাবনা এলোমেলো হয়ে গেল লক্ষ্মীর। ভিতরে ভিতরে একটা দুঃসহ অস্থিরতা বোধ কবতে লাগলো সে। এই রহস্যের পর্দা কখন উন্মোচিত হবে সে কথা ভেবে তার পাখি হয়ে উড়ে যেতে ইচ্ছে করলো তখুনি।

অনুশ্রীদেবীর অবস্থা সকাল থেকেই খারাপ চলছিলো। বিকেলের দিকে আরো খারাপ হলো। ডাক্তার প্রেশার মেপে মুখ গম্ভীর করে বেরিয়ে এলেন। শিবতোষবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে

রইলেন বারান্দায়, নার্স দু'জন চকিত হলো, বয়-বেয়ারারা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। আর ভবতোষ স্থির হয়ে বসে রইলেন মাথায় কাছে।

এই তিনদিন, চিঠি পেয়ে যেদিন শিবতোষবাবু তখুনি গিয়ে ধরে নিয়ে এসেছেন তাকে সেদিন থেকে ঠিক একই ভাবে তিনি বসে আছেন দিন আর রাত। অনুশ্রীদেবীর শয্যার চারপাশে যে মৃত্যু ক্রমেই ছায়া ফেলে ফেলে অন্ধকারের মতো ঘনিয়ে আসছে, নিজের অবিরত উপস্থিতি দিয়ে সে ছায়া তিনি দু'হাতে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

'লাবণ্য, লাবু, লা—'

'আর পারি না।'

'তুমি ভালো হয়ে ওঠো। আমি নিতে এসেছি, তোমাকে। আমি আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে দেব না।'

'বড্ড যে দেরী হয়ে গেল।'

'দেরি! না, না, একটুও দেরি না। তুমি দেখ, আমার বুকের মধ্যে সেই তাজা হৃৎপিণ্ডট এখনো সমান উত্তপ্ত হয়ে আছে তোমার জন্য। আমি প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক মুহূর্তের প্রেম নিয়ে অপেক্ষা করছি। এই দিনটিকে ফিরে পাওয়াই ছিলো আমার এই সতেরো বছরের একমাত্র সাধনা। আমি নির্বাসিত হয়ে থেকেছি, আমি একফোঁটা অপচয় করিনি নিজেকে। লাবু আমার লাবু—

'ভবতোষ, একবার যে তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।'

'আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।'

'সে কি আমাকে মা বলে ডাকবে?'

'তোমার মেয়ে তোমাকে মা বলে ডাকবে না?'

'কতো বড়ো হয়েছে? কার মত দেখতে হয়েছে? অভিনেত্রী মাকে সে গ্রহণ করতে পারবে কি?'

'লাবণ্য।'

'তুমি কাছে এসো ভবতোষ।'

'লাবু—'

'মণি, আমার ভাল হয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে।'

'সোনা, তুমি ভালো হয়ে উঠবে। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'ভবতোষ, আমাকে একবার ঐ বারান্দাটায় নিয়ে যেতে পারো? সেই বারান্দা, মনে আছে তোমার? তুমি যখন আসতে আমি চা করতুম, মোড়া পেতে বসে—'

'মনে আছে, সব মনে আছে। লাবণ্য, তুমি ভালো হয়ে ওঠো আবার আমি সে সব দিন ঠিক তেমনি করে ফিরিয়ে আনবো।'

'জান, সেদিন আমি কতো কষ্ট পেয়েছিলাম, আমার বুকের অস্ত্রীতন্ত্রী ছিঁড়ে গিয়েছিলো আমার বুকের পাঁজর আমি খসিয়ে রেখে এসেছিলাম। আমার মেয়ে, আমার নাড়ি ছেঁড়া ধন আমার স্বামী, হায় হায়, কেন আমি অমন সর্বনাশা অভিমান করে ঘর ছেড়েছিলাম। আর তো ফিরতে পারলাম না। কেন তুমি আমাকে বাধা দিলে না, কেন যেতে দিলে।' অনুশ্রীদেবীর চোখের জলে বালিশ ভিজে উঠলো।

'চুপ চুপ, চুপ করো লাবণ্য। আমার কান পুড়ে যায়।'

'আমাকে ক্ষমা করো ভবতোষ।'

'ক্ষমা! আমিই যে আজ কাঙালের মতো তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। অপরাধ তো ।ার! আমাকেই তুমি ক্ষমা করো। তুমি ভালো হয়ে ওঠো।'

'ভালো? অনুশ্রীর ঠোঁটের কোণে একফোঁটা হাসি চমকালো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো, ভালো। দেখো, কালকেই আমাদের মেয়ে আমাদের একমাত্র সন্তান, ।াদের লক্ষ্মী এসে বসবে তোমার কোলের কাছে। তোমাকে মা বলে ডাকবে।'

'লক্ষ্মী আসবে? আমাকে মা বলে ডাকবে? আমাকে ঘেন্না করবে না?'

'ছি।'

'তুমি ঘেন্না করছো না?'

'ছি, ছি।'

'আমার অভিনেত্রীর জীবন—'

'লাবণ্য, চুপ করো, চুপ করো।'

'কিন্তু আমি একদিনের জন্যও আর কারোকে ভাবিনি, ভাবতে পারিনি—'

'কেন আমাকে এসব বলে দুঃখ দাও। তুমি তুমিই।'

'আমি একটা উইল করেছি—'

'ও সব থাক।'

'আমার খরচ কম ছিলো, আয় ছিলো অনেক। নিজে থেকেই জমে গেছে। সব আমি নামে লিখে দিয়েছি, তারপর মেয়ে আর আমার মামা—'

'আমি শুনতে চাই না।'

'শোনো।'

'না।'

'কিন্তু আমার যে সব অন্ধকার হয়ে আসছে।'

'সে অন্ধকার আমি নখে দাঁতে ছিঁড়ে দেব।'

'ভবতোষ, মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না।'

আমি করবো, আমি করবো। আমি আর কোথাও যেতে দেবো না তোমাকে। আমি যে ঃ পারছি না। এই একা জীবন বহন করতে। তোমাকে নিয়ে যাবো আমি। তোমাকে বুকের ্য ভরে রাখবো আমি—'

'এ কথাটুকু শোনাব জন্যই আমি বেঁচে ছিলাম, ভবতোষ। আর আমার কোন দুঃখ নেই। একবার যদি তাকে দেখে যেতে পারতুম। বন্দরপুর থেকে কলকাতা আসতে কি খুব দেরি ?

'লাবণ্য, যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, তার শাস্তি আমি অনেক পেয়েছি। অনেক অনেক বেশী। আমার প্রাণ, আমার আলো, আর তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিতে পারবে না। তুমি মি আর লক্ষ্মী, আমরা তিনজনে আবার একসঙ্গে হবো, লক্ষ্মীর মাতৃহীন তৃষিত মন তুমি য় ভরে দেবে, আমাদের ছোট্ট সংসার স্বর্গ হয়ে উঠবে।

'কিন্তু, ছাড়া আর ধরা যে সেই একজনেরই হাতে।'

সুন্দর করে হাসলেন অনুশ্রীদেবী, হাত বাড়িয়ে ছড়িয়ে দিলেন ভবতোষের কোলে উপরে, কেঁপে কেঁপে বললেন, 'শুনেছি তিনি মঙ্গলময়, জানি না কী মঙ্গল তিনি করলে কিন্তু ডাক আমার এসে গেছে, আমার এসে গেছে, আমার কষ্ট, বড়ো কষ্ট। তুমি মামা ডাকো।'

'একি! একি! কী হলো! লাবণ্য। লাবণ্য!'

'মামাকে ডাকো। ডাক্তার আনো। অমি ভেসে গেলাম, ভেসে গেলাম, ভবতোষ, লক্ষ্ম আমার মামণি—'

বারান্দা থেকে শিবতোষবাবু দৌড়ে এলেন, ডাক্তার এলেন, নার্স এলো, ওষুধ-পথ ইনজেকশন অক্সিজেন—চিকিৎসার কোনো প্রক্রিয়াই বাদ গেল না।

দেখতে দেখতে বাড়ির সব ক'টি মানুষ এসে দরজায় দাঁড়ালো। অনুশ্রীদেবীর আশ্রি পালিত সব। তারা বিষণ্ন হলো, ঘন ঘন চোখের জল মুছলো।

আর যখন বেলা পড়ে এলো, যখন পাখিরা ঘরে ফিরলো, একটা হাওয়ার ঝাপটা উড়ি নিয়ে গেল ধূলোবালি, তখন অনুশ্রীর নিঃশ্বাসের ঘনতায় ঢেউয়ের মত অবিরাম ওঠা-প বুকের উদ্ধত স্পন্দনটা কমে এলো আস্তে আস্তে। আস্তে আস্তে এক সময়ে তিনি থামলেন

উঠে দাঁড়ালেন ভবতোষ, দাঁত দিয়ে হাত কামড়ালেন, কোনো অদৃশ্য প্রতিযোগীর বিরু রুষে ফুঁসে একাকার হয়ে লুটিয়ে পড়লেন সেই থেমে আসা বুকের উপরে। তাঁর গলা থে উচ্ছ্রিত পুরুষকান্নার ভাঙার মোটা অস্ফুট শব্দটা সমস্ত বাড়ির আনাচে কানাচে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরতে লাগলো।

শিবতোষবাবু এসে সরিয়ে নিলেন তাঁকে, নার্স এসে অনুশ্রীদেবীর সুন্দর মৃত মুখের উপ সাদা চাদরটা টেনে দিল।